বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস বিভাগে
পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সানিয়া সিতারা
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন (অবসরপ্রাপ্ত)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
সৈয়দ মো: শাহান শাহ
পিএইচডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

নভেম্বর, ২০২০

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। গবেষণায় প্রদত্ত বিচার বিশ্লেষণ, মন্তব্য ও অনুসিদ্ধান্ত আমার নিজের। আমার জানা মতে উক্ত শিরোনামে কোনো গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য লিখিত হয়েছে। আমি এই গবেষণাকর্ম বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

সৈয়দ মো: শাহান শাহ
পিএইচডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৫১
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জনাব সৈয়দ মো: শাহান শাহ কর্তৃক দাখিলকৃত **"বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমাদের জানা মতে এই শিরোনামে অন্য কোনো গবেষণা অভিসন্দর্ভ ইতোপূর্বে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি। আমরা অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস বিভাগে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

Sitara 12.11.2020.

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সানিয়া সিতারা
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন (অবসরপ্রাপ্ত)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

অনুমোদনপত্র

জনাব সৈয়দ মো: শাহান শাহ কর্তৃক সম্পাদিত **“বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা”** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম। পিএইচডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস বিভাগে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হল।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সানিয়া সিতারা
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন (অবসরপ্রাপ্ত)
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় মা ও আব্বাকে

আমি যাদের গর্ব

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা" শীর্ষক বর্তমান পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনের ফসল। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিএইচডি গবেষণার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কে. এম. মোহসীন স্যার এর প্রতি, যিনি আমাকে তাঁর অধীনে গবেষক হিসেবে গ্রহণ করে অত্যন্ত যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে এ কাজে আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং নিজ উদ্যোগে বেশ কিছু পুস্তক ও গবেষণা প্রবন্ধ সংগ্রহে সহায়তা করেছেন। একজন আদর্শ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর কাছে ঋণী। প্রফেসর ড. কে. এম. মোহসীন স্যারের অবসরজনিত কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সানিয়া সিতারা আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। কলা অনুষদের ডীন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন স্যারের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা ছিলো অভূতপূর্ব। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষক, গবেষক এবং বিভাগের গবেষকগণের প্রতি, যারা আমাকে গবেষণাকালীন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল, প্রফেসর ড. শরীফউদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর ড. আশা ইসলাম নাঈম, প্রফেসর ড. শরীফ উল্লাহ ভূইয়া, প্রফেসর ড. প্রদীপ চান দুগার, ড. আশফাক হোসেন দীপু, জনাব এম. এ কাউসার, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক মরহুম গোলাম সাকলায়েন সাকী আমাকে গবেষণার কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁদের কাছে আমার অশেষ ঋণ। কৃতজ্ঞতা জানাই ইতিহাস বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অমায়িক ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর স্যারের প্রতি। গবেষণাকর্মটি উৎসাহের সাথে চালিয়ে যাবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে দু'বছরের জন্য একটি গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। এজন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার গণগ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষ ব্যবহার করা হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আমানুল্লাহ ভাই, জনাব রতন দাদা, আর্কাইভস এর জনাব আলী আকবর এবং বাংলা একাডেমীর মনি হায়দার ভাইকে ধন্যবাদ জানাই। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে একাধিকবার বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের শরনাপন্ন হতে হয়েছে। আমি তাঁত বোর্ডের লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা মো: মাসুদুর রহমান ও অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী রতন কুমার দে ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ

গবেষণাকালীন সময় আমাকে যে সহযোগিতা ও সৌজন্যতা প্রদর্শন করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র মৌসুমী সুরাইয়া, তাসনিম আলম ও জয় হোসেন এর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা জানাই। কলেজ শিক্ষক ছোট ভাই ও বন্ধু আব্দুল মুকিত, সাংবাদিক আব্দুল হালিম এবং নিজ গ্রামে আমার প্রতিষ্ঠিত কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক স্নেহভাজন মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান গবেষণার প্রথম পর্যায়ে লেখনী, তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ে তাঁতীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আমার সংগী হয়ে আমাকে মনোবল যুগিয়েছেন। রূপগঞ্জের নওয়াপাড়া জামদানী পল্লীর বাসিন্দা জামদানী ব্যবসায়ী মো: সাইদুল ইসলাম সাধু তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতায় আমার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছেন এজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার অফিস সহকর্মীদের মধ্যে আমাকে যারা বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন শাহিনা আক্তার শুচি, সজল কর্মকার, নাজমুল হোসেন, হিমেল মাহমুদ এবং যাতায়াত ও পরিবহনে দায়িত্ব পালন করেছেন মো: ওলিউল্লাহ তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিভাগের অগ্রজ প্রতিম ড. হাবিবুল্লাহ বাহার, উপ-সচিব, গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক লিটন ভাই, বন্ধু ও বড় ভাই মো: হেলাল উদ্দীন, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক ড. জুয়েল হোসেন দেওয়ান ও বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক ড. মো: খালেকুজ্জামান, থিসিসের বানান সংশোধনীসহ বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ দিয়ে এই অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করেছেন সে জন্য কৃতজ্ঞতা রইল।

সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদের প্রতি, যাদের প্রভাব আমার জীবনে অস্বীকার করা অসম্ভব। তারা হলেন- আমার স্ত্রী উম্মিয়া আক্তার শিলা যিনি আমাকে সর্বদা এ কাজে উৎসাহ ও মানসিক সমর্থন দিয়েছেন; আমার দুই সন্তান (সিমরিন নাওয়ার ও সিয়াম শাহরিয়ার) যারা আমাকে সব সময় তাদের ভালবাসা দিয়ে গবেষণার কাজে মানসিক শক্তি যুগিয়েছে, আমার মা ও আব্বা যাদের আর্শীবাদ আমার চলার পথের সার্বক্ষণিক পাথেয় তাদের প্রতি আমার অকৃত্রিম ঋণ। তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার সন্তান হলেও এ সম্পর্কে গবেষণা এবং লেখালেখি সত্যিই জটিল কাজ। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা থাকাটা স্বাভাবিক, তথাপি আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে যদি তাঁত সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এবং এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে সরকার ও নীতি নির্ধারক মহল গবেষণাটি পাঠ করেন এবং গবেষণার প্রদত্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

সৈয়দ মো: শাহান শাহ

তারিখ: নভেম্বর, ২০২০ খ্রী:

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার-সংক্ষেপ

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত শিল্পগুলোর একটি। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি এই বাংলা ভূখন্ড তাঁত শিল্পের ধারক ও বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা জেলার রয়েছে সুক্ষ্ম সুতিবস্ত্র, মসলিন, জামদানী কাপড়ের মত উন্নত বস্ত্রের ঐতিহ্য। তাঁতশিল্প বা বয়ন শিল্পের উদ্ভব বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় বয়নশিল্প মানুষের সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ বুনন কৌশল আয়ত্ব করেছিল। প্রাথমিকভাবে বুনন কৌশল পেশার নেপথ্যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বিশেষত মাকড়সার জাল তৈরি, পাখির বাসা তৈরি ইত্যাদি বিষয় দেখে মানুষ বয়নশিল্প সর্ম্পকে ধারণা লাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। এক সময় মানুষ নিজেই, বিছানার মাদুর বা ঘরের ছাউনি ও বেড়া ইত্যাদিতে বয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। বস্ত্রবয়ন বা তাঁতশিল্পের উদ্ভবের নেপথ্যে এসব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে সহজে অনুমান করা যায়। কারণ মানুষ প্রথম দিকে এই বয়ন কৌশল কাজে লাগিয়ে নিজেদের তৈরি সুতা বা সুতাজাতীয় দ্রব্য দিয়ে কাঠ ও বাঁশের সাহায্যে যন্ত্র বানিয়ে কাপড় তৈরি শুরু করে। সেই বস্ত্র নিজেরা ব্যবহার করে এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত শুরু করে।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এই শিল্পে কি অবস্থা বিরাজমান ছিল? স্বাধীনতা উত্তরকালে তাঁতশিল্পের বিকাশ কিভাবে হয়েছিল? তাঁতশিল্পের বিকাশে বিভিন্ন সময়ে সরকারসমূহের গৃহীত উদ্যোগ কেমন ফলপ্রসূ হয়েছে? তাঁতিদের কর্মপরিধি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন? প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ার লুম কী তাঁতশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে? ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাঁত শিল্প কিভাবে ঘুরে দাঁড়ালো? তাঁত শিল্পের বাণিজ্যিক দিক এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা কেমন? তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কী বর্তমানে অবনতি ঘটেছে, না উন্নত হয়েছে? তাঁতশিল্পে কী নবগতির সঞ্চার হয়েছে? হয়ে থাকলে তা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? এসকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণায়।

বিভিন্ন সময়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পাশাপাশি চতুর্দিকে নৌপথে সংযোগের কারণে ঢাকা ছিল বরাবরই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়েছিল ঢাকাকে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরও ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকাকে বাংলাদেশের রাজধানী

ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং পরবর্তী সময়ের ১৯টি বৃহত্তর জেলা গুলোর একটি হলো ঢাকা। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাস এর কারণে বাংলাদেশের জেলা হয় ৬৪টি। বর্তমানে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নায়য়াণগঞ্জ এই ছয়টি জেলা নিয়ে বৃহত্তর ঢাকা গঠিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ব জুড়ে থাকলেও বিশেষ করে মিহিকাপড় শতশত বৎসর ভিনদেশী বণিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। সুক্ষ্ম উন্নত মসলিন জামদানী এবং প্রিয়, শাড়ি, লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি বেশীর ভাগেই উৎপাদিত হত মূলত ঢাকায়, ঢাকা থেকেই দেশ-বিদেশে এ বস্ত্র রপ্তানী হয়েছে। ঢাকার বস্ত্র বয়ন, ঐতিহ্য, সুনাম ও ভৌগলিক বাস্তবতার নিরিখে বৃহত্তর ঢাকাকে এই গবেষণায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলা তাঁত শিল্পের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ তাঁত উৎপাদক এলাকা হিসেবে এ অঞ্চল গবেষণার দাবি রাখে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের এই শিল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবার মত গবেষণামূলক লেখনী খুব বেশী নেই। তাছাড়া ইংরেজী ভাষায় রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা থাকলেও সেগুলোতে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় তাঁতশিল্পের মূলধারা এবং বৈশিষ্ট্য যথাযথ প্রতিফলন হয়নি। ১৭৫৭-১৯৪৭ পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার বস্ত্রশিল্প নিয়ে কিছু গবেষণা ও প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচিত হলেও বৃহত্তর ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়নি। অথচ ঢাকা বস্ত্র-শিল্পে দীর্ঘকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প দেশীয় শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আর ঢাকা ছিল সেই বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ এ বিষয়ে ঢাকাকে ঘিরে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। তাঁত প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে গবেষক এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার তাগিদ অনুভব করছেন এবং তিনি গবেষণার দায়িত্ব নিয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করছেন।

তাঁতশিল্প বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় আলোচ্য লেখক গবেষকগণ যার যার গন্ডি থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্র এবং দৃষ্টিকোণ থেকে এ শিল্পকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা করতে গেলে এসকল তথ্য গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে। কারণ প্রকাশিত লেখা এবং বইগুলো থেকে অনেক তথ্য পেতে সহায়তা করবে। তথাপি বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের বিষয় এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এসব প্রকাশনা যথেষ্ট নয় বিধায় গবেষক তাঁত শিল্প সম্পর্কে বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকার তাঁতশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

যে কোন নতুন গবেষণাকর্মে কিছু বিষয় এর উপস্থিতি প্রয়োজন। যেমন- নতুন তথ্যাবলী সংযোজন; এবং বিষয়বস্তুর নতুন ব্যাখ্যা। বর্তমান গবেষণায় এ দুটি বিষয়ই স্থান পেয়েছে। গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে এ গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক এ উভয় প্রকার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্র, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস ও লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বৃটিশ প্রশাসনিক নথিপত্র, রিপোর্ট, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট ও মন্তব্য প্রতিবেদন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোরশুমারীসমূহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর জরিপ ও শুমারীসমূহ, বাংলাদেশে হ্যান্ডলুম বোর্ড সংক্রান্ত অধ্যাদেশসমূহ, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস, সংসদে তাঁতশিল্প সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে সেগুলোকে প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁতী, কারিগর, সুতা ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মধ্যসত্বভোগী, পাইকার, মোকাম এর দোকানদার, শহরের ফ্যাশন হাউজের মালিক, সংবাদকর্মী, উদ্যোক্তা এমন অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

সমকালীন বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে (ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি; (খ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি; (গ) সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে গবেষণাকর্মটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি: অতীতের ঘটনা ও পরিবর্তনের আলোকে বর্তমানকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য ইতিহাস থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর যাচাই-বাছাই করে গবেষক ব্যাখ্যা দান করে থাকেন।

এই পদ্ধতিতে সমকালীন ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বইপত্র, সংবাদপত্র, বিভিন্ন বক্তৃতা, চিঠি-পত্র, আইন-কানুন ও সংবিধান ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণমূলকভাবে যথারীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের বস্তুনিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করার জন্য এ পদ্ধতির মাধ্যমেই বিষয়বস্তুভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন এবং সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়কে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

গবেষণার ক্ষেত্রে এ গবেষণা পদ্ধতিটিও অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমেই বর্তমান গবেষণার বিষয়াবলী বিশেষ করে তাঁত মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পুঁজিলগ্নীকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্প্রদায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়। গবেষণা পদ্ধতির কৌশলগুলোর মধ্যে বর্তমান গবেষণার উপযোগী হিসাবে, সংসদীয় কমিটির তাঁত ও বস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা, পত্রিকার

রিপোর্ট, আইন-আদালতের মামলার বিবরণী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট ইত্যাদি। গবেষণার মধ্যে এই বিষয়টি সামনে এসেছে যা প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকে আজও পর্যন্ত বাংলায় হস্তচালিত তাঁতশিল্প একটি প্রবাহমান শিল্প হিসেবে মানুষের চাহিদামাফিক টিকে আছে। ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদর্শ শতক ছিল এই শিল্পের স্বর্ণালী যুগ। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, সুতি কাপড়ের বিকল্প কাপড় তৈরী, বৃটিশ নীতির কারণে তাঁতশিল্প ধাক্কা খায়। তথাপি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই শিল্প আবার ঘুরে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে সরকারগুলোর সহযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের ব্যাপক উদ্যোগে তাঁতশিল্প আবার জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। আশির দশকে সুতার দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পলিয়েষ্টার কাপড় উৎপাদন ইত্যাদির কারণে তাঁতশিল্পে আরেকটি ধকল আসে। তথাপি তাঁতশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা, তাঁতীগণের প্রতি সাধারণ মানুষের চাহিদা, শহরের মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর মধ্যে সুতি কাপড়ের চাহিদা, ফ্যাশন হাউজগুলোতে তাঁতবস্ত্রের ব্যবহারের ফলে তাঁতশিল্প আজও মাথা উঁচু করে টিকে আছে তা এই গবেষণায় বিধৃত করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে তাঁতশিল্পের বিকাশ বলতে আলোচনায় আসবে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারসমূহের নানা উদ্যোগে কিভাবে তাঁতশিল্প বিকশিত হয়েছে। বিবর্তন বলতে আলোচনা হবে কিভাবে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের পাশাপাশি ১৯৮০ দশকে Power Loom প্রচলিত হয়। হস্তচালিত তাঁতসমূহের মালিক, কারিগর এবং এর সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী কীভাবে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করেছে, কেউ বা হস্তচালিত তাঁত ছেড়ে Power Loom স্থাপন করেছে। কেউবা আবার হস্তচালিত তাঁত ছেড়ে তাদের আদিপেশা কৃষিতে ফিরে গেছেন। বাংলাদেশ সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ, বেসরকারী উদ্যোগ ও বিনিয়োগ এর ফলে কাপড়ের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসেছে। উৎপাদিত পণ্যের নতুনত্বের কারণে পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, তাঁত পর্ণের সুলভ মূল্য ও সহজ প্রাপ্তির কারণে চাহিদার ক্ষেত্র বেড়েছে। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পরিবেশ বান্ধব কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ফ্যাশন সচেতনতার কারণে কিভাবে তাঁতপণ্য আজ শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে এসব বিষয় আলোচনায় এসেছে।

বিষয়বস্তুর আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন এদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-১৩
প্রথম অধ্যায়: বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশ: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত	১৪-৬৭
দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ	৬৮-১১১
তৃতীয় অধ্যায়: তাঁত শিল্পের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ	১১২-১৫৮
চতুর্থ অধ্যায়: তাঁতশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্য	১৫৯-২২৪
পঞ্চম অধ্যায়: তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা	২২৫-২৮২
ষষ্ঠ অধ্যায়: লোকগাঁথা প্রবাদ-প্রবচন, গান, লেখনীতে তাঁতশিল্প	২৮৩-৩২০
উপসংহার	৩২১-৩২৫
গ্রন্থপঞ্জি	৩২৬-৩৪১
পরিশিষ্ট-১	৩৪২-৩৪৯
পরিশিষ্ট-২	৩৫০-৩৬৪
পরিশিষ্ট-৩	৩৬৫-৩৭৬
পরিশিষ্ট-৪	৩৭৭-৪০০

বাংলাদেশের মানচিত্র

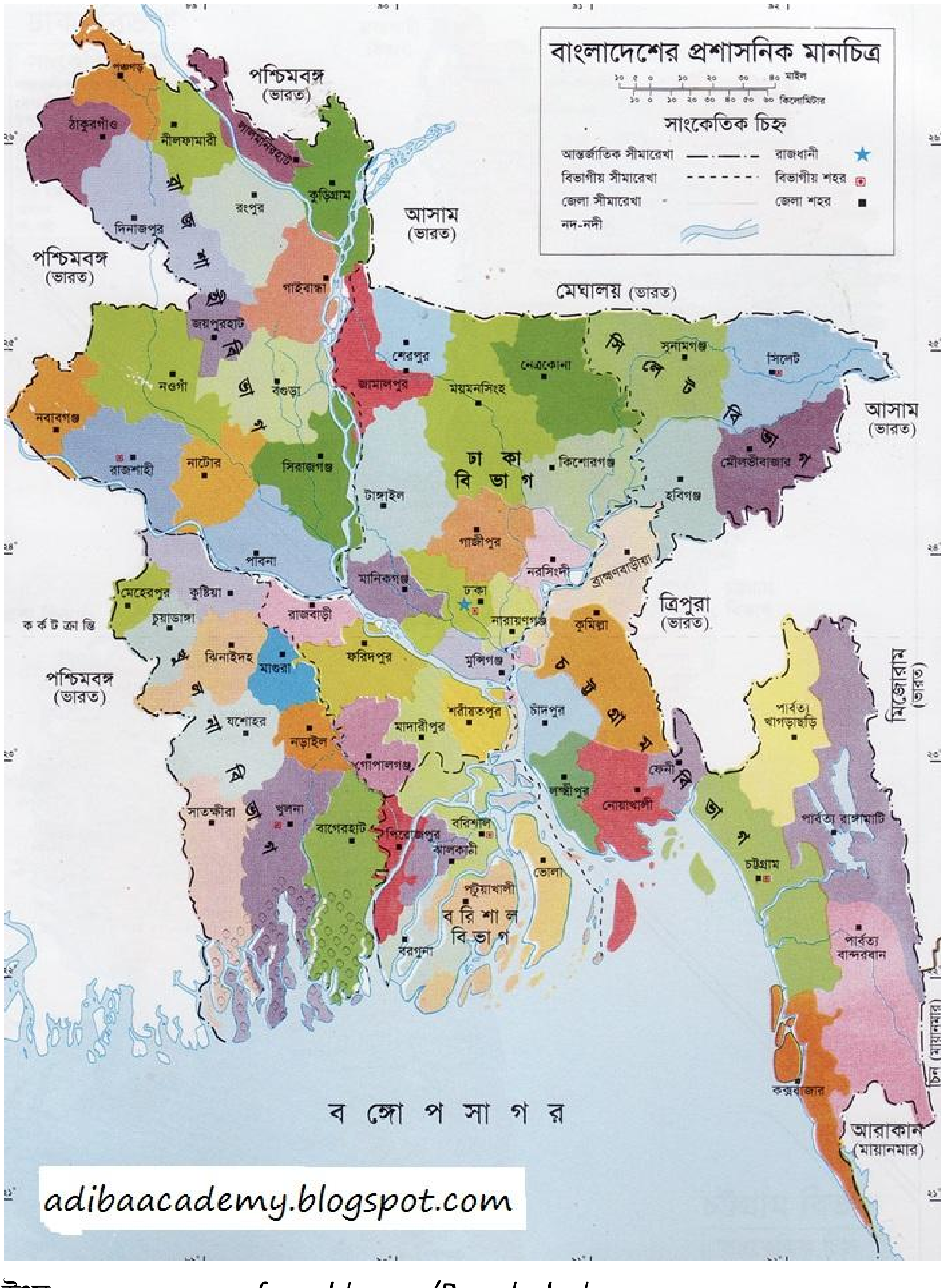

উৎসঃ *www. maps of world. com/Bangladesh.*

বৃহত্তর ঢাকা জেলার মানচিত্র

উৎস: গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও অন্যতম বৃহৎ শিল্প হলো তাঁতশিল্প। দেশের কৃষি বহির্ভূত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা নি:সন্দেহে তাঁতশিল্পের সাথে। তুলা এবং বস্ত্র উৎপাদনে এই ভূখণ্ডের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। মধ্য যুগে বাংলা সূক্ষ্ম সুতার মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। মসলিন শাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয় তুলা চাষ করা হতো ঢাকার আশেপাশের উঁচু জমিতে যেখানে বেশীর ভাগ তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছিল। তন্তু বা সুতা বা তার দিয়ে কাপড় তৈরি করার প্রক্রিয়া হলো তাঁত। যে যন্ত্রের সাহায্যে সুতা দিয়ে কাপড় উৎপাদন করা হয় তা তাঁতযন্ত্র বা Loom নামে পরিচিত। তন্তু বা সুতা দিয়ে যারা কাপড় তৈরী করে তাদের তন্তুবায় বা তাঁতি বলা হয়। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তন্তু, তাঁত ও তাঁতি এই তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশক।

তাঁতশিল্প বা বয়ন শিল্পের উদ্ভব বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় বয়নশিল্প মানুষের সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ বুনন কৌশল আয়ত্ব করেছিল। প্রাথমিকভাবে বুনন কৌশল পেশার নেপথ্যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বিশেষত মাকড়সার জাল তৈরি, পাখির বাসা তৈরি ইত্যাদি বিষয় দেখে মানুষ বয়নশিল্প সর্ম্পকে ধারণা লাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে মানুষ নিজেই, বিছানার মাদুর বা ঘরের ছাউনি ও বেড়া ইত্যাদিতে বয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। বস্ত্রবয়ন বা তাঁতশিল্পের উদ্ভবের নেপথ্যে এসব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে সহজে অনুমান করা যায়। কারণ মানুষ প্রথম দিকে এই বয়ন কৌশল কাজে লাগিয়ে নিজেদের তৈরি সুতা বা সুতাজাতীয় দ্রব্য দিয়ে কাঠ ও বাঁশের সাহায্যে যন্ত্র বানিয়ে কাপড় তৈরি শুরু করে।

তাঁতশিল্প সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্যিক উৎস হল ঋগ্বেদ। এমনকি রামায়ন ও মহাভারতেও বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বিবরণ আছে। ভারতীয় বস্ত্র মেসোপটেমিয়া, গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। গ্রিক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ানের (২য় খ্রিঃ) ইন্ডিকা থেকেও ভারতবর্ষের বস্ত্র শিল্পের বিবরণ পাওয়া যায়। ইতালির পর্যটক মার্কো পোলো তার বর্ণনায় গুজরাট, কাম্বে, তেলেঙ্গনা, মালাবার ও বাংলায় তুলা উৎপাদন ও কার্পাসজাত বস্ত্র শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। চীনা পর্যটক মা হুয়েন চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও প্রভৃতি শহর উল্লেখের পর গৌড়ের বর্ণনায় সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুতের কথা বলেছেন।

তাঁত শিল্পের উদ্ভব সঠিক কবে থেকে এসেছে তা বলা মুশকিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদি বসাক সম্প্রদায় এর তাঁতীরাই হলেন আদি তাঁতী। এরা আদিকাল থেকে প্রধানত তাঁত বুনে আসছে। এই পোশাক শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষরা 'তন্তবায় বা তাঁতী নামে পরিচিত। এরা প্রধানত যাযাবর শ্রেণির অন্তর্গত ছিলো। প্রথমে এরা সিন্ধু উপত্যকায় অববাহিকায় বসবাস করতো কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের

কারণে তারা সেই স্থান পরিত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে এসে তাঁতের কাজ শুরু করে। আবহাওয়া প্রতিকূলতার কারণে পরে তারা রাজশাহী অঞ্চলে চলে আসে। তাঁত শিল্পের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মনিপুরে অনেক আগে থেকেই তাঁত শিল্পের কাজ আসছে। মনিপুরীরা মূলত নিজেদের পোশাকের প্রয়োজনে তাঁতের কাপড় তৈরি করতো। তাদের তৈরি তাঁতের সামগ্রী পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কুটির শিল্প হিসেবে হস্ত চালিত তাঁত শিল্প ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বকালে কেবল দেশেই নয় বর্হিবাণিজ্যেও বিশেষ স্থান দখল করেছিলো। বংশ পরম্পরায় দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বয়ন উৎকর্ষতায় তাঁতীরা দেশ ও সমাজে নিজেদের সৃষ্টি করেছিলো একটি প্রয়োজনীয় অবস্থান।

গবেষণার উদ্দেশ্য

উক্ত গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে জানা, কিভাবে বৃহত্তর ঢাকাতে এই তাঁত শিল্প বিকাশ লাভ করেছিলো এবং সময়ের পরিক্রমায় তাঁত শিল্পের যে বিবর্তনগুলো ঘটেছে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। বর্তমান সময়ে এই শিল্প কোন অবস্থায় আছে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর কতটুকু চাহিদা মেটাতে পারছে ইত্যাদি সম্পর্কে জানা এবং ঢাকা কেন্দ্রীক তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য গৌরবগাঁথা ও আধুনিক শহুরে মধ্যবিত্তদের মাঝে এই শিল্পে উৎপাদিত কাপড় কতটা সমাদৃত তা অনুসন্ধান করা।

মূল উদ্দেশ্য অর্জনে গবেষণায় অন্যান্য যে সব বিষয় আলোচিত হবে তা হলো:

১. প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এই শিল্পে কি অবস্থা বিরাজমান ছিল তা সম্পর্কে জানা।

২. স্বাধীনতা উত্তরকালে তাঁতশিল্পের বিকাশ কিভাবে হয়েছিল, তাঁতশিল্পের বিকাশে বিভিন্ন সময়ে সরকারসমূহের গৃহীত উদ্যোগ কেমন ফলপ্রসূ হয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৩. তাঁতিদের কর্মপরিধি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রযুক্তির বিবর্তনে পাওয়ার লুম কী তাঁতশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে কিনা, ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাঁত শিল্প কিভাবে ঘুরে দাঁড়ালো সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

৪. তাঁত শিল্পের বাণিজ্যিক দিক এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে জানা।

৫. তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন, বর্তমানে কেমন অবনতি বা উন্নতি হয়েছে, তাঁত শিল্প আধুনিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারছে কিনা এবং পারলে কিভাবে তা সম্ভব হয়েছে এসকল বিষয়ে জানার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৬. তাঁত শিল্পকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে যেসকল লোকগাঁথা প্রবাদ-প্রবচন, গান, লেখনী, ছড়া, শ্লোক প্রচলিত সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও প্রেক্ষাপট

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলা তাঁত শিল্পের জন্য বাংলা ভূখন্ডের মধ্যে বৃহত্তর ঢাকা খ্যাতি লাভ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ তাঁত উৎপাদক হিসেবে এ অঞ্চল গবেষণার দাবি রাখে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের এই শিল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবার মত গবেষণামূলক লেখনী খুব বেশি নেই। তাছাড়া ইংরেজী ভাষায় রচিত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা থাকলেও সেগুলোতে বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় তাঁতশিল্পের মূলধারা এবং বৈশিষ্ট্য যথাযথ প্রতিফলন হয়নি। ১৭৫৭-১৯৪৭ পূর্ব পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার বস্ত্রশিল্প নিয়ে কিছু গবেষণা ও প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচিত হলেও বৃহত্তর ঢাকার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কাজ সম্পন্ন হয়নি। অথচ ঢাকা বস্ত্র-শিল্পে দীর্ঘকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। আর ঢাকা ছিল সেই বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ এ বিষয়ে ঢাকাকে ঘিরে কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। তাঁত প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে গবেষক এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার তাগিদ অনুভব করছেন এবং তিনি গবেষণার দায়িত্ব নিয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করেছেন।

বৃহত্তর ঢাকা: বিভিন্ন সময়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু ছিল। পাশাপাশি চতুর্দিকে নৌপথে সংযোগের কারণে ঢাকা ছিল বরাবরই বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরবর্তীসময়ও পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়েছিল ঢাকাকে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরও ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক রাজধানী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকাকে বাংলাদেশের রাজধানী ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের ১৯টি বৃহত্তর জেলা গুলোর একটি হলো ঢাকা। ১৯৮০ এর দশকে অধিকতর প্রশাসনিক পূর্ণবিন্যাস এর কারণে বাংলাদেশের জেলা হয় ৬৪টি। বর্তমানে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নায়য়াণগঞ্জ এই ছয়টি জেলা নিয়ে বৃহত্তর ঢাকা গঠিত। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের খ্যাতি প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ব জুড়ে থাকলেও বিশেষ করে মিহিকাপড় শতশত বৎসর বিদেশী বণিক, পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছে। সুক্ষ্ম উন্নত মসলিন জামদানী এবং প্রিয়, শাড়ি, লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি বেশীর ভাগেই উৎপাদিত হত মূলত ঢাকায়, ঢাকা থেকেই দেশ-বিদেশে এ বস্ত্র রপ্তানী হয়েছে। ঢাকার বস্ত্র বয়ন বস্ত্রের ঐতিহ্য, সুনাম ও ভৌগলিক বাস্তবতার নিরিখে বৃহত্তর ঢাকাকে এই গবেষণায় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

বাঙালী জাতি ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৭২ সালের শুরুতেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার পেছনে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism) কাজ করে। জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার ঐতিহ্যপূর্ণ তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সাল থেকে মূল গবেষণা শুরুর সময় হিসেবে ধরা হয়েছে, ঐ সময়টাতে তাঁতশিল্পের বিকাশের

পিছনে Economic Nationalism প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত গবেষণার মূল সময়সীমা ধরা হয়েছে, তথাপি পরবর্তী সময়গুলোতে তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ গবেষণায় স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম ফ্যাশন হাউজ 'আড়ং' আশির দশক থেকে তাদের তৈরী পোশাকে হস্তচালিত তাঁতে তৈরী কাপড় ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯০ এর দশক থেকে এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশে অনেকগুলো ফ্যাশন হাউজ তাদের পণ্য, হস্তচালিত তাঁতে তৈরী কাপড় ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করে। যেমন: বিবি রাসেল প্রডাকশন্স, গ্রামীণ চেক (গ্রামীণ উদ্যোগ) অন্যতম। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে দেশীয় বেশ কয়েকটি ফ্যাশন হাউজ একত্রিত হয়ে তাদের ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু করে। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী এই ১০টি ফ্যাশন হাউজগুলো হলো- দেশাল, রং, বিবিয়ানা, নিপুণ, সাদাকালে, কে ক্রাফ্‌ট, অঞ্জনস্‌, নাগরদোলা, বাংলার মেলা, সৃষ্টি সমন্বিতভাবে একই ছাদের নীচে ব্যবসা শুরু করেন। সারা দেশে বর্তমানে তাদের ১১টি আউটলেট রয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। এতে বুঝা যায় সবাই সবার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতপণ্য কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা ভোক্তাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো ঈদ, পূজা-পার্বণসহ সকল মৌসুমেই ভাল ব্যবসা করছে। হস্তচালিত তাঁতপণ্যের বাজারে নবগতির সঞ্চার হয়েছে তা বোঝার জন্য এটি একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। ২০১০ সালকে এইজন্য একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গবেষণা পদ্ধতি

সমকালীন বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে (ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি; (খ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি এবং (গ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

(ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি: অতীতের ঘটনা ও পরিবর্তনের আলোকে বর্তমানকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য ইতিহাস থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর যাচাই-বাছাই করে গবেষক ব্যাখ্যা দান করে থাকেন।

(খ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে সমকালীন ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে বইপত্র, সংবাদপত্র, বিভিন্ন বক্তৃতা, চিঠি-পত্র, আইন-কানুন ও সংবিধান ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণমূলকভাবে যথারীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যের বস্তুনিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করার জন্য এ পদ্ধতির মাধ্যমেই বিষয়বস্তুভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন এবং সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়কে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(গ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ: তাঁত শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক সাক্ষাৎকার গ্রহণ। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো থেকে প্রয়োজনীয় অংশ গবেষণাকর্মে প্রয়োজন মাফিক সংযুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও এ গবেষণার বিষয়াবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে বিশেষ করে তাঁত মালিক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, পুঁজিলগ্নীকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক আচার-আচরণ সম্প্রদায় ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করা

হয়েছে। জাতীয় সংসদে তাঁত ও বস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা, পত্রিকার রিপোর্ট, আইন-আদালতের মামলার বিবরণী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট, আধুনিক ফ্যাশন হাউজগুলো উদ্যোক্তাদের আত্মকাহিনী, পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা তথ্যের উৎস

যে কোন নতুন গবেষণাকর্মে কিছু বিষয় এর উপস্থিতি প্রয়োজন। যেমন- নতুন তথ্যাবলী সংযোজন; এবং বিষয়বস্তুর নতুন ব্যাখ্যা। বর্তমান গবেষণায় এ দুটি বিষয়ই স্থান পেয়েছে। গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে এ গবেষণায় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক এ উভয় প্রকার তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে: সরকারি-বেসরকারি দলিলপত্র, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস ও লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বৃটিশ প্রশাসনিক নথিপত্র, রিপোর্ট, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ার রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট ও মন্তব্য প্রতিবেদন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শুমারীসমূহ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এর জরিপ ও শুমারীসমূহ, বাংলাদেশে হ্যান্ডলুম বোর্ড সংক্রান্ত অধ্যাদেশসমূহ, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস, সংসদে তাঁতশিল্প সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে হয়েছে সেগুলোকে প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া প্রাথমিক উপাত্তের মধ্যে রয়েছে-বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের গবেষণা ও জরিপ রিপোর্ট, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পসমৃদ্ধ এলাকাগুলো সরেজমিন পরিদর্শন এবং এ শিল্পের সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন লোকদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী, গবেষণা পত্রিকা, ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ ইত্যাদি। বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকী বা জার্নাল থেকে এতদসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রেডিও বা বেতার গণমাধ্যমের কিছু খবরাখবর, বক্তব্য বা ভাষণ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁতশিল্প সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খন্ডিত হওয়ায় প্রাথমিক উৎস যোগাড় করতে গবেষক যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁত শিল্পের সাথে গবেষকের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা গবেষককে এ বিষয়ে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে কাজ করতে এবং তথ্য নির্বাচনে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাস বিষয়ের কোন গবেষকের পক্ষে এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বর্তমান গবেষণায় উক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী যথেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও গবেষক তার নিজ গবেষণার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট থেকে কাজ করেছেন। গবেষক তাঁতপ্রধান এলাকাগুলোতে সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। গবেষণা সম্পন্ন করতে গিয়ে তাঁতশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের (Stake holder/partner/associate/contributor) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে তাঁতী (কারিগর/সাগরেদ), তাঁত মালিক, ক্ষুদ্র তাঁত ব্যবসায়ী, সুতা ব্যবসায়ী, তাঁত

কারখানার মালিক, স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রেণির নেতৃত্বদানকারী প্রতিনিধি এবং ভোক্তা অর্থাৎ পণ্য ব্যবহারকারীগণ বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাঁতের কারিগরদের সাথে কথা বলে ক্ষুদ্র তাঁত মালিক ও কারখানার মালিকদের সাথে এবং সমজাতীয় শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তথ্যগুলো আবার cross check করা হয়েছে। তেমনি সুতা ব্যবসায়ী, বাজারের পাইকারী তাঁতবস্ত্র ক্রেতা তাদের সাথে কথা বলে পরস্পরের তথ্যসমূহ যাচাই বাছাই করা হয়েছে। একাধিক ফ্যাশন হাউজের মালিক, কর্মকর্তা ও তাঁতবস্ত্র সরবরাহকারী, বাজারের আড়তদার, চেম্বার নেতৃবৃন্দ, পাওয়ারলুম মালিক ও শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

১৮৬৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) W.W. Hunter রচিত The Annals of Rural Bengal গ্রন্থটি অত্যন্ত দুস্প্রাপ্য একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ, বইটির PDF কপি প্রিন্ট করে গবেষক এই বই থেকে বৃটিশ আমলে বাংলার তাঁতশিল্প, এই শিল্পে কৃষি নির্ভরতা ও তাঁতীদের উপর মারাঠা আক্রমণ ও তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন যা উক্ত অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন অংশে সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত The Cotton Weavers of Bengal : 1757-1833 শীর্ষক দেবেন্দ্র বিজয় মিত্রের পিএইচডি অভিসন্দর্ভে কোম্পানি আমলে বাংলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা রয়েছে। এ গবেষণাকর্মে তাঁত শিল্পের বিভিন্ন দিক যেমন এ শিল্পের সাথে এদেশীয় তাঁতিদের সম্পর্ক, তাঁতিদের সাথে বৃটিশ ও ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের সম্পর্ক, ইউরোপীয় বাজারে তাঁত বস্ত্রের অবস্থান এবং বাংলার অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখনিটিতে কোম্পানি আমলে তাঁতিদের সংখ্যা এবং তাঁতবস্ত্র রপ্তানির পরিমান সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু এ গবেষণাকর্মে তাঁত শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলেও বৃটিশ আমলে গবেষণা সীমাবদ্ধ হয়েছে। তাঁত শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বৃহত্তর ঢাকার উপর কোন বিশেষ আলোচনা নেই। এতদসত্ত্বেও এ গ্রন্থে ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানি আমল পর্যন্ত বাংলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ড. হামিদা হোসাইনের The Company Weavers of Bengal. The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813 নামক গ্রন্থে বাংলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে পর্যালোচনা কোম্পানি আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলাদেশ তাঁতশিল্পের ঐতিহাসিক ক্রম বিকাশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পলাশীযুদ্ধের পূর্বে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাঁত শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁতীদের কাজের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়

অধ্যায়ে তাঁত বস্ত্রের বাজার এবং তাঁতীদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কোম্পানির উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ বিশেষ করে ঢাকা এবং পাশ্ববর্তী এলাকার আড়ংসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটিতে আঠার শতাব্দীর পাঁচের দশকে নিত্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্য যেমন- চাল, চিনি, সরিষা তেল, গুড়, ঘি ইত্যাদির মূল্য তালিকা প্রদান করা হয়েছে।এর মাধ্যমে কোম্পানির অধীনস্থ তাঁতীদের জীবন মান সম্পর্কে জানা যায়। ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিশিষ্টে যথাক্রমে বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য এবং বস্ত্র ব্যবসায়ী বণিক সংঘের তালিকা দেয়া রয়েছে।

১৯৮৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত শ্রীত্রৈলোক্য নাথ বসুর *তাঁত ও রং* শীর্ষক গ্রন্থে তাঁত শিল্পের পরিচয় এবং তাঁতবস্ত্রে ব্যবহৃত রং সম্পর্ক মুগ্ধকর আলোচনায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁত বস্ত্র বয়ন প্রণালী, গর্ত ও ফ্রেম তাঁতের তারতম্য, ফ্রেম লুমের প্রধান প্রধান অংশ যেমন-মাকু, নলি, দক্তি, সুতায় ব্যবহৃত মাড় প্রকরণ, সুতা কোমল রাখার উপাদান, সুতা টানা প্রকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার সুতা, সুতা নির্বাচন, সুতার পরিমাণ নির্ণয়, সুতার ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে খুটিনাটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে রং সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। বস্তুত বস্ত্র বয়ন এবং কাপড়ে ব্যবহৃত রং সম্পর্কে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ। এ গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা হলো এখানে কোনো এলাকা নির্ধারণ করা হয়নি অথবা তাঁতিদের বিষয়ে যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক কোনো বিষয়ে বিস্তারিত কিছু আলোচনায় আসেনি।

১৯৯০ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫) প্রফেসর আব্দুল করিমের *ঢাকাই মসলিন* গ্রন্থটি মসলিন বস্ত্রের উপর লিখিত একটি অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক পটভূমি শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মসলিন শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং মসলিন সম্পর্কে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটকের মূল্যায়ন উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মসলিন বুনন পদ্ধতি প্রণালী সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মসলিন কাপড়ের প্রকারভেদ এবং বিভিন্ন প্রকার মসলিনের মূল্য তালিকা ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মসলিন ব্যবসা বিশেষ করে বিদেশী ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কৃষক, তাঁতী এবং মসলিন শিল্পের সাথে জড়িত কারিগরদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। পরিশেষে মসলিন শিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে ১৮৪৪ সালে ঢাকার কমিশনার ডানবার কর্তৃক লিখিত চিঠি সংযুক্ত রয়েছে।

১৯৯৩ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ সাইদুর রহমানের *জামদানী* গ্রন্থটি বিভিন্ন রকম জামদানী ও মসলিন সম্পর্কে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে জামদানী ও মসলিনের ইতিকথা, মসলিন ও জামদানী পার্থক্য, জামদানী শিল্পে ব্যবহৃত রং ও সুতা, জামদানীর কারিগর বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলিম তাঁতীদের আলাদা বৈশিষ্ট, এই শিল্পে ব্যবহৃত পেশাগত পরিভাষা, জামদানী

তৈরিতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, কাপড় তৈরির বিভিন্ন পর্যায়, বাজার ব্যবস্থাপনা ভোক্তা, জামদানী পল্লী এলাকা, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিল্পের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে, পরিশিষ্টে বিভিন্ন সংবাদপত্রের এ সংক্রান্ত রিপোর্ট রয়েছে এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লোকগাথার অংশ বিশেষ স্থান পেয়েছে। উপর্যুক্ত গবেষণামূলক গ্রন্থগুলো থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, গবেষণা গ্রন্থগুলোর প্রায় সবগুলোই কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত Mohammad Abdul Latif এর Handloom Industry of Bangladesh, 1947-1990 গ্রন্থে পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তাঁতশিল্পের উত্থান-পতন ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেশ বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশে তাঁতশিল্পের অবস্থা এবং ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তাঁতশিল্পের গতি-প্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁত শিল্পের উৎপাদন কাঠামো, তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কর্ম-কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁতশিল্পের কারিগরি দিকের উন্নয়ন, এ শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে পুঁজি ও ঋণ সুবিধা, কাঁচামাল সরবরাহ, বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে উৎপাদন ক্ষমতা, আয়, তাঁতীদের পারিবারিক সঞ্চয়, পুঁজি গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে তাঁত শিল্প সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে তাঁত শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারে কয়েকটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গ্রন্থে ৮২টি সারণিতে তাঁতশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী প্রদান করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমলের বেশ কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হলেও তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বৃহত্তর ঢাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

২০১২ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত প্রফেসর এম. মোফাখখারুল ইসলাম রচিত An Economic History of Bengal 1757-1947 গ্রন্থটি বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পলাশী যুদ্ধের পূর্বে বাংলার অর্থনীতির বিভিন্ন দিক বিশেষ করে কৃষি, ভূমি-রাজস্ব, বস্ত্রশিল্প, দেশী ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাধারণ জনগণের জীবনমান নিয়ে কিছু ধারনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে পঁচিশ থেকে একচল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পলাশী পরবর্তী বাংলার অর্থনতিতে বিশেষ করে বস্ত্র শিল্পে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিসহ ইউরোপীয় কোম্পানি সমূহের প্রভাব এবং বস্ত্র শিল্পের সাথে জড়িত তাঁতী শ্রেণীর জীবন যাত্রা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পলাশী পরবর্তী বাংলার অর্থনৈতিক লোকসান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। Decline of Traditional Industries and Beginning of the Modern শীর্ষক এই অধ্যায়ে বস্ত্র পণ্য রপ্তানি কমে যাওয়ার এবং আধুনিক শিল্প কারখানার সূচনা এবং বাংলায় শিল্পায়নের ধীর গতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলের বাংলার অর্থনীতির

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাঁতশিল্প সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। প্রফেসর এ.জেড.এম. ইখতিয়ার-উল-আউয়াল এর The Industrial Development of Bengal 1900-1939 নামক গ্রন্থে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে এবং এক্ষেত্রে বৃটিশ ভারতীয় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। The Handloom Cotton Weaving Industries in Bengal শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে লেখক বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সম্পর্কে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের পর বাংলার বস্ত্র শিল্পের উপর ইউরোপ বস্ত্রের যে প্রভাব পড়েছিল সেটি আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে বস্ত্রশিল্পে জড়িত কর্মশক্তি, হস্তচালিত তাঁতপণ্য ও এর উৎপাদন, উৎপাদন খরচ, তাঁতীদের সমস্যাবলী এবং তাদের সমস্যা সমাধানে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রতিটি অংশে গুরুত্বপূর্ণ সারনি ব্যবহার করা হয়েছে যা শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের বাংলার বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পেতে সহায়তা করে। যাহোক গবেষক তাঁর গবেষণা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনে তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পূর্ব বাংলা বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা বিভাগের তাঁর শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাননি।

২০১২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত, সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান রচিত, উয়ারী বটেশ্বর: শেকড়ের সন্ধানে গ্রন্থটিতে বৃহত্তর ঢাকার তাঁতশিল্প সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী নরসিংদী জেলার একটি জনপদ নিয়ে লেখা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক বইটিতে বাংলার সাথে আড়াই হাজার বছর পূর্বের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যের একটি ছিল বস্ত্র বাণিজ্য, এই বইয়ের মাধ্যমে অতীত ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও একটি সত্যতা পাওয়া যায়। বইটি থেকে গবেষণার আংশিক সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

২০১৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিরাজুল ইসলাম রচিত *American Trade in Bengal* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং-৭৫) American Maritime contact with Bengal (1785-183) Commerce Competition Knowledge শীর্ষক অধ্যায়ে (তৃতীয় অধ্যায়ে) তৎকালীন বাংলার সাথে আমেরিকার সুতা ও বস্ত্র ব্যবহার কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া আরো কয়েকটি অধ্যায়ে বাংলার বস্ত্র বাণিজ্য নিয়ে বেশ কিছু ত্য পাওয়া যায় যেটা উক্ত গবেষণায় সহায়ক হয়েছে।

২০১৮ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, নরসিংদী গ্রন্থে বস্তুগত লোক সংস্কৃতি অধ্যায়ে বয়নশিল্প শীর্ষক লেখনীতে ১৭০ পৃ. থেকে ১৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বৃহত্তর ঢাকার নরসিংদী জেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এখান থেকে সংগৃহীত তথা লেখকের গবেষণার খোরাক জুগিয়েছে।

২০০০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ও ফজলুল করিম অনুদিত গ্রন্থ বৃটিশ

সার্জন জেমস ওয়াইজ রচিত গ্রন্থে, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন বর্ণ ও পেশার বিবরণ গ্রন্থে তাঁত শিল্প, তাঁতী বাজার, তাঁতীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে, এই বইটি থেকে গবেষণার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি ২০১৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত শাওন আকন্দ রচিত বাংলাদেশের তাঁতশিল্প গ্রন্থে এ শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়েছে। তবে এই শিল্পের মূল কেন্দ্রীভূত এলাকা বৃহত্তর ঢাকা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। বর্তমান বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস সংক্রান্ত কোন গবেষণা ও সমন্বিত পুস্তক এখনো পর্যন্ত রচিত হয়নি অথচ জাতীয় অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সম্পর্কে সকলেরই কম-বেশী জানা উচিৎ। বিশেষ করে তাঁত ও শিল্পের নীতি নির্ধারণের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১৯২১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত British Botanist Mr. Geoffery Evans (Director of Agriculture কর্তৃক তৈরীকৃত রিপোর্ট A Brief history of Cotton Cultivation in Plains of Bengal রিপোর্টটিতে বৃটিশ বাংলায় তুলা চাষ, সুতা উৎপাদন ও বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যা উক্ত গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখিত রিপোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁতশিল্প বিষয়ক প্রকাশনাসমূহ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় আলোচ্য লেখক গবেষকগণ যার যার গন্ডি থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্র এবং দৃষ্টিকোণ থেকে এ শিল্পকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁতশিল্পের উপর গবেষণা করতে গিয়ে যে কোন গবেষকের জন্য সহায়ক হবে। কারণ প্রকাশিত লেখা এবং বইগুলো থেকে অনেক তথ্য পেতে সহায়তা করবে এবং পরবর্তী গবেষকদের জন্য সহায়ক হবে। তথাপি বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের বিষয় এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এসব প্রকাশনা যথেষ্ট নয় বিধায় গবেষক তাঁত শিল্প সম্পর্কে বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকার তাঁতশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

অধ্যায় বিন্যাস

বিষয়বস্তুর আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের বিবর্তন এদেশের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথম অধ্যায়: বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশ: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত

প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁত শিল্পের বিকাশ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্হিবিশ্বে এবং ভারতবর্ষে তাঁতশিল্পের সূত্রপাত সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহিত্যিক বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক বিবরণ এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সময়ভিত্তিক প্রাচীন যুগ, সুলতানী যুগ, বিশেষ করে মোঘল যুগ,

ব্রিটিশ যুগেও ইংরেজ, দেশী বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের ভিত্তিতে উক্ত সময় পর্যন্ত তাঁতশিল্পের বিকাশকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ

স্বাধীনতা উত্তরকালের তাঁতশিল্পের বিকাশ, উপনিবেশিক আমলে ঢাকা ও পর্শ্ববর্তী অঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড গঠন, তাঁতশিল্প বিকাশে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ যেমন: তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, তাঁতশিল্পের প্রতিনিয়ত উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি তাঁত বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: তাঁত শিল্পের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ

তাঁতীদের কর্মপরিধি, কাজের ধরণ ও প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁত যন্ত্রের বিভিন্ন রকম বিভাজন এবং তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির পরিচিতি এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। কোন ধরনের তাঁতে কি জাতীয় বস্ত্র উৎপাদিত হয় তার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: তাঁতশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্য

বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকার তাঁত শিল্পের বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। বাংলাদেশের তাঁতপণ্য বাজারজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া কোম্পানি ও বৃটিশ শাসনামলে ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁতীদের সম্পর্ক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের সরকারি বেসরকারি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়: তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে বৃহত্তর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী তাঁত শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত জনগোষ্ঠীর কার্যক্রম, উৎপাদন ও বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: লোকগাঁথা প্রবাদ-প্রবচন, গান, লেখনীতে তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্প নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত, অপ্রকাশিত লোকগাথা-প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিতে তাঁতশিল্প সংক্রান্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকগাঁথা, কবিগান, পল্লীগীতি ও পংক্তি ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে ভূমিকায় উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দেয়ার প্রয়াস করা হয়েছে। পরিশিষ্টে তাঁত শিল্প উদ্যোক্তা, তাঁতবস্ত্র ব্যবসায়ী, তাঁতী মহাজন, তাঁতশিল্পের কারিগর ও প্রান্তিক তাঁতীদের সাক্ষাৎকার এবং কিছু সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্টে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত গেজেট ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য সহায়িকা

১. হরিচরন বন্দোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, (কলকাতা, ২০০৪)

২. শাওন আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, (ঢাকা ২০১৮)।

৩. Marco Polo (1254-January 1324), was an Italian mechant, explorer and writer who was known for the book named "*The Travels of Marco Polo*", which describes his voyages to and experiences in Asia.

৪. Ma Huan, a Chinese Traveller was one of the four officials who accompanied Zheng He (Chang Hu) during his seven voyages into the 'Indian Ocean' (the Chinese called 'Western Ocean') between AD 1405 and 1433. He was a well known figure both in China and elsewhere.

৫. বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ১৯০৫ সালে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ ও আসামকে একত্রিত করে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রশাসনিক প্রদেশ ঘোষণা করেন যা ১৯১১ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

৬. Economic Nationalism, or economic patriotism, refers an ideology that, favours state intervention over the market mechanisms with policies such an domestic on the economic labors and capital formation even if this requires the imposition of tarrifs and other restriction also.

৭. অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ মূলত দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে এবং তাদের সুরক্ষা দেবার জন্য প্রয়োজনে জাতীয় আইন প্রণয়ন করে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি প্রদান করে, এমনকি অন্য দেশের সমজাতীয় পণ্যের উপর অধিকহারে করারোপ করে থাকে। তাঁতশিল্পকে সরকারসমূহ স্বাধীনতাউত্তরকালে অনেকটা এভাবেই সহযোগিতা করেছেন।

৮. Jashim Uddin Ahmed, Afrin Rifat, Nabila Nisha & Mohammad Jasim Uddin, "Deshi Dosh: the case on integration of ten rivals in the fashion in Bangladesh", *Decision*, official journal of Indian Institute of Management, Calcutta, ISSN 0304-0941, Vol. 42, Number 1.

৯. Devendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal*, 1757-1833, (Calcutta, 1978).

১০. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal. The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813,* Oxford University, (New Delhi, 1988).

১১. শ্রী ত্রৈলোকনাথ বসু: *তাঁত ও রং*, (কলকাতা, ১৯৮৯)।

১২. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৬৫)।

১৩. মোহাম্মদ সাইদুর, *জামদানি*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৯৩)।

১৪. Mohammad Abdul Latif, *Handloom Industry of Bangladesh*, *1947-1990, (*Dhaka, 1997).

১৫. Mofakkharul Islam, *An Economic History of Bengal 1757-1947, (*Dhaka, 2012), p. 61.

১৬. A. Z. M. Ikhtiar-ul-Awal, *The Industrial Departmental of Bengal 1900-1939l,* (New Delhi-1982).

১৭. Sirajul Islam, *American Trade in Bengal*, (Dhaka, 2018).

প্রথম অধ্যায়

বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশ: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত

প্রথম অধ্যায়

বাংলার তাঁতশিল্পের বিকাশ: প্রাচীনকাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত

১.১ ভূমিকা

তাঁতশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত আছে তিনটি শব্দ তন্তু, তাঁত ও তাঁতী। বাংলা প্রাচীনকাল থেকেই তাঁত শিল্পে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে ষোড়শ শতকে তাঁত শিল্পের বিকাশ হয় ভারতীয় উপমহাদেশে। মুঘল যুগে তাঁতশিল্প চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। এসময় বাংলার তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড়-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষিজ দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং হাতে বোনা কাপড়ের বিস্তৃত বাজার। এ সময় কৃষি ও শিল্প এই দুয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য ছিল। তবে সতের ও আঠারো শতকে বাংলার অর্থনীতিতে বয়নশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোফাফখারুল মন্তব্য করেন,

> From the account of foreign travellers (Barbosa, Varthema, Macro Polo, Barrows and Mahuna) and local writers (Biprodus, Vijoy Gupta) it in clear that Bengal had been producing a large variety of textile goods and exporting these (and certain other commodities) to countries of Asia,Africa and other parts of India long before the seventeenth century.[১]

কিন্তু আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে সুতি-বস্ত্র শিল্পে মন্দাভাব শুরু হয়। একই সময়ে বৃটিশ নীতি, নতুন কৃৎকৌশল বৃটেনে এক শিল্প বিপ্লবের সূচনা করে, যার ফলে ইউরোপে এক নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলা তথা ভারতীয়রা ইউরোপীয় শিল্পের কাছে কিছুটা কোণঠাসা হলেও আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল বাংলার সুতি বস্ত্রের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। পাশাপাশি আমেরিকা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির কাছ থেকে মুক্ত হওয়ার পর বাংলার সাথে বস্ত্র বাণিজ্য চালিয়ে যায়। প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়,

> America exported predominantly agricultural products and imported manufactured goods. Bengal was traditionally an exporting country, importing practically nothing. The consequent trade imbalance was settled mainly by species (bullion); America brought with them mostly bullion to buy Bengal goods.[২]

১৭৫৭ সালের পর থেকে ফরাসি, ডাচ এবং আর্মেনিয়দের কোনঠাসা করে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার পণ্য ক্রয়ের বাজারে একক প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। উল্লেখ্য, তখন ঢাকা ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।[৩]

ঢাকার মসলিনসহ বস্ত্র শিল্পের অন্যান্য দিক নিয়ে মুঘল ঐতিহাসিক বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্র থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। কোম্পানী আমলের শুরুতে তাঁত শিল্পের অবস্থা ভাল থাকলেও পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে তাঁতশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও বস্ত্র তৈরিতে কৃত্রিম সুতা ব্যবহারের কারণে বাংলার তাঁত শিল্পের বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়ে। বৃটিশ তাঁতী ও শিল্প মালিকদের দাবীর মুখে তৎকালীন সরকারের নীতি পরিবর্তনের ফলস্বরূপ দেশীয় তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, আলীবর্দী খানের সাথে মারাঠাদের যুদ্ধ, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইত্যাদি কারণেও তাঁতশিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তাঁত শিল্পের পুনরুত্থানের সূচনা হয়। ১৯৪০ এর দশকে তাঁত শিল্পের নবযুগের সূচনা হয় বাংলায় বস্ত্রকল স্থাপিত হয়, এবং বস্ত্র উৎপাদনের পরিপূরক অনেক মিল কারখানা স্থাপিত হয়। ষাটের দশকেও তাঁত শিল্প পর্যায়ক্রমে প্রবৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ পরবর্তীকালে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও শুমারির তথ্য অনুযায়ী ১৯৪০ এর দশক থেকে ১৯৬০ দশক পর্যন্ত তাঁতশিল্পের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। সরকার ঐ সময়ে তাঁতযন্ত্রের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে মনোযোগী ছিল। ১৯৫০ এর দশকের তুলনায় ১৯৭০ সালে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার ও নতুন করে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নে মনোনিবেশ করে যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনায় এসেছে।

১.২ তন্তু, তাঁত ও তাঁতী শব্দের উৎপত্তি

সংস্কৃত তন্তু থেকে বাংলা তাঁত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তন্তু শব্দের অর্থ সুতা বা তার। তন্তু বা সুতা দিয়ে যারা কাপড় তৈরি করে, তাদেরকে ‘তন্তুবায়’ বা ‘তাঁতী’ বলা হয়। আর যে যন্ত্রের সাহায্যে সুতা দিয়ে কাপড় উৎপাদন করা হয়, তা তাঁত যন্ত্র (Loom) নামে পরিচিত। Loom শব্দটি Anglo Saxon শব্দ Flome হতে উদ্ভুত। যার অর্থ হচ্ছে বয়ন যন্ত্র বা তাঁত।[৪] যে যন্ত্রের সাহায্যে দুই বা ততোধিক সারি সুতা লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে স্থাপন করে বয়ন কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে তাঁত বা Loom বলে। সংক্ষেপে এই হলো তন্তু, তাঁত ও তাঁতী বা তন্তুবায় শব্দের আভিধানিক অর্থ।[৫] আর মূলতঃ এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে শিল্প গড়ে উঠেছে, তা তাঁত শিল্প নামে পরিচিত।

আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন তন্তু, তাঁত ও তাঁতী সম্প্রদায়-সুক্ষ্মবিচারে এই তিনটি বিষয় কিন্তু সরল ও এক রৈখিক নয়। এগুলোর প্রতিটির নানা শ্রেণীকরণ ও প্রকারভেদ আছে। নানা কারণে এগুলো বহুমুখী ও বৈচিত্রময়। যেমন: তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত তন্তু বা সুতা অনেক রকম হতে পারে। তুলা থেকে এক ধরনের সুতা হয়, যা দ্বারা তৈরি কাপড় সুতি বা কটন (Cotton) নামে পরিচিত। যার প্রমাণ বৃটিশ Director of Agriculture এর নথি থেকে পাওয়া যায়।[৬]

বৃহত্তর বাংলা বরাবরই তাঁত শিল্পে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল, কিন্তু এর মধ্যে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়,

> The handloom has a bright historical past in the Indian Sub-continent. In particular, Bangladesh used to produce the world famous 'Muslin' which was completly handloom product based in Narayanganj, Narsingdi and few other parts of Bangladesh. Later on 'Muslin' gradually became obsolete.[৭]

১৮৩৬ সালে পরিব্রাজক ড. উরে লিখেছেন, ঢাকার মসলিন বস্ত্র এবং এর সুতো তখনও এ পর্যায়ে ছিল যার নিকট ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে। সকল উৎকৃষ্ট মসলিনই ঢাকা জেলায় উৎপন্ন দেশি সুতার তৈরি। মেয়েরা তুলা পরিস্কার করে এবং তারাই সুতা কাটে। পশম থেকে বীজ ছড়ানোর জন্যে চরকি ও ডলন কাঠি ব্যবহৃত হয়।[৮] তখন এদেশের তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র পারস্য, মিশর এমনকি ইউরোপীয় দেশসমূহে বেশ সমাদৃত ছিল এবং বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করা হতো। এ সময়ে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁত শিল্প গড়ে উঠলেও তৎকালীন বাংলাবস্ত্র উৎপাদনে এগিয়ে ছিল। তখন ঢাকার তাঁতে যে পরিমাণ সুক্ষ্ণ ও সৌখিন বস্ত্র উৎপাদিত হতো তার সিংহভাগ ইউরোপীয় দেশসমূহে রপ্তানি হতো। এসব সুক্ষ্মবস্ত্রের মধ্যে ঢাকাই মসলিন ছিল অন্যতম যার চাহিদা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে। মসলিন ও জামদানীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, খ্রিষ্ট জন্মের কয়েকশত বছর পূর্ব থেকেই ঢাকাই মসলিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশ থেকে যে প্রচুর পরিমান সুক্ষ্মবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হয়েছে তারও প্রমান রয়েছে।[৯] এ অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ তাঁত শিল্পে আত্মনিয়োগ করে বা বস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করত। ঢাকাই মসলিন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ্য হয়। এমনকি আরব বণিকদের মারফত এই ব্যবসা উত্তর আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে দলে দলে ইউরোপীয় বণিকরা এবং কোম্পানিরা এদেশে আসতে শুরু করে এবং ঢাকাই মসলিন ইউরোপে এত অধিক পরিমাণে রপ্তানি হতে থাকে যে লন্ডন, প্যারী ও আমর্স্টাডাম প্রেরক প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহেও এটি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ্য হয়।[১০] অধিকাংশ দরবারের বাদশাহ, আমীর উমরা, অভিজাত সম্প্রদায় ও তাদের অন্তঃপুরচারিণীদের বিভিন্ন প্রকারের পোষাক পরিচ্ছদ, চাকচিক্য ও

জরিখচিত ঢিলাঢালা জামা, পাগড়ী, দোপাট্টা ও ঘোমটা ইত্যাদি প্রস্তুতকরণের জন্য মসলিন কাপড় ব্যবহৃত হতো। মধ্য যুগে ভারতের সুলতান, মুঘল বাদশাহ, অমাত্য ও সুবাদারগণেরও ঐসব সৌখিন বস্ত্রের প্রতি দুর্বলতা ছিল এবং তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দিতেন। ঢাকাই মসলিনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় সেই যুগের বাংলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য মুগ্ধকর ছিল।[১১]

Geoffery Evans (1883-1963) এর মতে,

> It appears to consist of different types of Gossypium neglectam and is also short staple cotton but is of fiver quality than the Comilla. In the trade it is graded as Bengal-Scind, a classification that comprises cottons of approximately the same quality, grown in a good many different parts of India.[১২]

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রসঙ্গক্রমেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হবে তন্ত্র, তাঁত ও তাঁতী সম্প্রদায়। তবে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় সঙ্গত: কারণেই আলোচনায় সম্পৃক্ত হবে যেমন: সুতা রং করা কিংবা তাঁতযন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন সংক্রান্ত বিবরণ, তাঁতীদের সমাজ জীবন ইত্যাদি। প্রধানত ঢাকার তাঁতশিল্প নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলগুলোর তাঁত শিল্পের আলোচনায় আসবে। তবে আলোচনার সুবিধার্থে সংক্ষেপে দেখে নেয়া যাক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাঁতশিল্পের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস।

১.৩ তাঁতশিল্পের উদ্ভব: সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী

কোথায়, কখন এবং কিভাবে তাঁত শিল্পের সূত্রপাত হয়েছে এবং এর উদ্ভাবক কে বা কারা, তা নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করে বলার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। বরং এ বিষয়ে যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, তা অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে নানা ধরনের লোকগাথা বা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে দ্য বুক অব লূমস (The Book of Looms) গ্রন্থের লেখক এরিক ব্রাউডি (Eric Broudy) মন্তব্য করেছেন,

> The legends of most cultures, with the exception of the Chinese, place the invention of weaving at the beginning of their own history. That it is often attributed to the gods testifies to its importance to these ancient cultures. The Peruvians creadit Mama Ocllo, the wife of manco Capac, their first sovereign. The Assyrians honor Queen Semiramis, the Egyptians the goddess Isis--usually pictured with shuttle in hand. (According

> to Egyptian mythology, flax, the fiber associated with the finest Egyptian weaving, was the first thing that the gods created for themselves before appearing on earth.) The Mohammedans believe that weaving originated with the son of Japheth, the third son of Noah, who according to some traditions, was the ancestor of the Indo-European race. In Greece the honor belongs to Athena (in Rome Minerva), the goddess of the arts, who is often represented holding a distaff.[১৩]

কাজেই তাঁত শিল্প বা বয়ন শিল্পের উদ্ভব কখনো কখন ঘটেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। স্পষ্টতই তাঁত শিল্পের বয়স মানুষের সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষ প্রথমে বুনন কৌশল আয়ত্ত করেছিল। সভ্যতার আদিপর্বে, মানুষের বুননকৌশল শেখার নেপথ্যে প্রাকৃতিক নিদর্শন ও পারিপার্শিক বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণের ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বিশেষত: মাকড়সার জাল তৈরি, পাখির বাসা তৈরি ইত্যাদি দেখে মানুষ বয়ন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছিল বলে অনুমান করা হয়। পরবর্তীকালে সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেই বুনন কৌশল আয়ত্ত করে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান যেমন লতাগুল্ম, ঘাস, শণ, কাঠ, গাছের ছাল, বাঁশ-বেতের চলটাবা বেতি ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় নানা রকম দ্রব্য তৈরি করতে শুরু করে বলে ধারণা করা হয়। বয়ন পদ্ধতি শিখে ফেলার পর, যৌক্তিক কারণেই, অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবন যাপনকে আরেকটু সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য মানুষ এই পদ্ধতির বিভিন্নভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। যেমন: বিভিন্ন ধরণের ঝুড়ি বা সাজি তৈরি, মাদুর বা ঘরের ছাউনি বা বেড়া তৈরি ইত্যাদিতে মানুষ বয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিল। বস্ত্রবয়ন বা তাঁত শিল্পের উদ্ভবের নেপথ্যে এসব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা, বুনন কৌশলের ধারাবাহিকতায় ক্রমশ: মানুষ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সরু ও সুক্ষ্ম সুতা বা সুতলি তৈরি করতে শেখে, তখন তা দিয়ে ক্রমে বস্ত্রবয়নও সম্ভব হয়। আর বয়ন কৌশল কাজে লাগিয়ে সুতা বা সুতলি দিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করার নিমিত্তে যে যন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, সেটাই তাঁত যন্ত্র। এভাবে তাঁত শিল্পের সূত্রপাত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে এই বয়ন শিল্প বা তাঁত শিল্পের কৃৎকৌশল আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় মূলত: নারীদের।[১৪]

১.৪ তাঁত শিল্পের সূত্রপাত

যদিও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে মানুষের তৈরি প্রথম বস্ত্র কিংবা প্রথম তাঁত যন্ত্র সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল, কিন্তু বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও গবেষণার পর রেডিওকার্বন পদ্ধতি, ডিএনএ ইত্যাদি পরীক্ষায় প্রত্নবস্তু থেকে প্রাগৈতিহাসিক কালপর্বের তাঁত শিল্প সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য জানা যায়।

প্রাচীন তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে ভারত উপমহাদেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর এ অঞ্চলেবস্ত্র

বয়নের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায় (আনুমানিক ৩৪০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে। এই সভ্যতার মানুষ যে তুলা ও পশুর লোম থেকে সুতা তৈরি এবং বস্ত্রবয়ন করতে জানত।[১৫] পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে পুরনো সুতি বস্ত্রের সন্ধান এখানেই পাওয়া গেছে। ইরফান হাবিব লিখেছেন, 'সিন্ধু বসতি এলাকায় আবিস্কৃত পোড়ামাটি এবং চূর্ণমিশ্রের (কাঁচ তৈরির উপাদান হিসেবে গৃহীত বিভিন্ন চূর্ণিত বস্তুর মিশ্রণ) তৈরি অসংখ্য তকলি থেকে বোঝা যায় যে, হাতে সুতো কাটা বহুল প্রচলিত ছিল। সম্ভবত: ধনী এবং দরিদ্র, প্রতিটি গৃহস্থালীতেই এটি নারীর দৈনন্দিন কাজ কর্মের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য কাঠের তাঁতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।[১৬]

সিন্ধু সভ্যতার মানুষ সুতি বস্ত্র ব্যবহার করত। এগুলো তৈরি হত উত্তর ভারতের কর্ষিত তুলা থেকে কাটা মোটা ধরনের সুতায়। কার্পাস গাছ তখন রীতিমতো কর্ষিত হত।[১৭] গবেষকদের মতে, 'এই বস্ত্র মাদারগুল্মোর রস দিয়ে রঞ্জিত করা হয়েছিল। কাপড়ের রং করার জন্য ব্যবহৃত চৌবাচ্চাও পাওয়া গেছে।[১৮] সুতরাং বলা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতায় সুতা কাটাসহ তাঁতে কাপড় বোনা এবং উন্নত শ্রেণীর বস্ত্ররঞ্জন প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল।"[১৯]

তাছাড়া সীলমোহর, পোড়ামাটির বিভিন্ন ভাস্কর্যে,চিত্রিত দেবী মুর্তিতে, মানুষের শরীরে পোশাক থেকে অনুমেয় যে, এই সভ্যতার মানুষ তাঁত শিল্পের ব্যবহার জানত। এখানে প্রাপ্ত সূত্র প্রমাণ করে যে একটি ভাস্কর্যের শরীরে যে ধরনের নকশা করা পোশাক দেখা যায়, তাতে অনুমেয় বস্ত্র বয়নের পাশাপাশি সূচি শিল্পেও খুব সম্ভবত: তারা দক্ষতা অর্জন করেছিল।[২০]

১.৫ সিন্ধু সভ্যতায় রেশমের নমুনা আবিষ্কার

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে জানা যায় যে, সিন্ধুতে যে রেশমের নমুনা পাওয়া গেছে, পরীক্ষাগারে তার কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪৫০-২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। চীনের বাইরে এটিই পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন রেশম শিল্পের নিদর্শন। এ বিষয়ে গবেষকদের ভাষ্য থেকে জানা যায়,

> The earlist evidence to date for silk in china comes from an isolated find possible as early as c.2570 BC from the Liangzhou Neolithic site of Qianshanyang. There is evidence for silk from a bead thread at nevasa in peninsular India c. 1500 BC. This new evidence of silk from both the recent excavations at the site of Harappa and from the Chanhu-daro collection curated at the Museum of Fine Arts, Boston, indicates that silk threads were being produced nearly a millenium earlier than the Nevasa finds, and were being used in more than one Indus settlement during the height of Indus urbanism. This new discover of silk

in the Induse valley pushes back the earliest date of silk outside of China by a millennium and is roughly contemporaneous with the earliest evidence for silk from within China.[২১]

রেশম আবিষ্কারের প্রথম ও একক কৃতিত্ব চীনের এবং সেখান থেকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচলিত এই ধারণাটি সঠিক নাও হতে পারে।

১.৬ উৎসের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলায় তাঁত শিল্পের সূত্রপাত ও প্রসার

অবিভক্ত বাংলায় ঠিক কবে থেকে তাঁত শিল্পের সূত্রপাত ঘটেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রধানত তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রথমত: প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু এবং সেগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রাপ্ত ফলাফল, দ্বিতীয়ত: বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্র এবং তৃতীয়ত, ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র।

১.৬.১ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বর্তমানে বাংলাদেশ নামে যে ভূখন্ড পরিচিত তাতে খ্রিস্টপূর্বকালের আদি-ঐতিহাসিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে নরসিংদী জেলার উয়ারী-বটেশ্বরে (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক)। কিন্তু এই প্রত্নস্থান থেকে এখনো এমন কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি, যার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, এখানে তাঁত শিল্পের প্রচলন ঘটেছিল। তাঁত শিল্পের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু না পাওয়া গেলেও প্রত্ন গবেষক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন এটি ছিল একটি বন্দরনগরী এবং সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে উয়ারী-বটেশ্বরের একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি এই প্রত্নস্থানটিকে মিসরীয় ও গ্রিক সূত্রে বর্ণিত সৌনাগড়া বা গঙ্গাঋদ্ধি হতে পারে বলে তার গবেষণায় তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[২২] সে হিসেবে তৎকালীন উয়ারী-বটেশ্বরেও তাঁত শিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে বলে অনুমান করা যায়। কেননা, বিদেশী সাহিত্যিক সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, সৌনাগড়া বা গঙ্গাঋদ্ধি থেকে প্রচুর উন্নত শ্রেণীর সুক্ষ্ম তাঁতবস্ত্র বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হতো।

উয়ারী বটেশ্বর যে জেলায় অবস্থিত (নরসিংদী জেলা) এটি বৃহত্তর ঢাকার একটি জেলা। নরসিংদী জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি তাঁত সমৃদ্ধ একটি জেলা। তাই এটি অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানে প্রাচীণকালে তাঁত শিল্প থাকাটা ছিল স্বাভাবিক।[২৩]

অবিভক্ত বাংলায় সবচেয়ে প্রাচীন তাম্র-প্রস্তর যুগের (Chalcolithic) মানব বসতির প্রমাণ্য পাওয়া গেছে পশ্চিম বাংলার অজয় নদীর তীরবর্তী বর্ধমান জেলার পান্ডুরাজার ঢিবি থেকে। পরীক্ষাগারে এর আদি স্তরটির কাল নির্ধারণ করা হয়েছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০-১২০০ অব্দ।[২৪] পান্ডুরাজার ঢিবি ছাড়াও কাছাকাছি এলাকায় আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান আছে যেমন- মহিষাদল, মঙ্গলকোট, ভরতপুর

ইত্যাদি। এসব এলাকা থেকে পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ তাম্র-প্রস্তর যুগের মানব সংস্কৃতি বিভিন্ন উপাদান পাওয়া গেছে, যা ইতিহাসের বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এসব প্রত্নস্থানে যেসব মানুষ বাস করত, তারা তাঁতের ব্যবহার জানত কিনা-এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অমীমাংসিত। তবে পাণ্ডুরাজার ঢিবির দ্বিতীয় স্তর থেকে একটি মৃৎখন্ডের গায়ে রেশম-সুতি বস্ত্রের ছাপ পাওয়া গেছে বলে কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন।[২৫] ইরফান হাবিবও পাণ্ডুরাজার ঢিবি সম্পর্কে জানাচ্ছেন, 'প্রথম পর্যায়ে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগে, সেখানে রয়েছে আবাদ করা ধান, আর সুতো চিত্রিত মাটির সামগ্রী।[২৬]

অবিভক্ত বাংলায় তাঁতশিল্পের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপাদান পাওয়া গেছে বগুড়ার মহাস্থানগড় (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক), পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড় (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতক) ইত্যাদি প্রত্নস্থান থেকে। এসব প্রত্নস্থান থেকে মৌর্য-সুঙ্গকার পূর্বের (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক) কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য ও ফলক পাওয়া গেছে, তাতে সে সময়ের বস্ত্র বা পোশাকের নিদর্শন দেখা যায়। এগুলোকে বাংলার তাঁতশিল্পের প্রাচীনতম দৃশ্যগত উপস্থাপন নজির (Visual representation) হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়াও বিহারের দিদারগঞ্জ থেকে প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের যক্ষী মূর্তিটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই মূর্তির পোশাকের ধরনের সঙ্গে শাড়ি পরার ধরনের সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের যেসব পুরাতাত্ত্বিক বাস্তব প্রমাণ (পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য ইত্যাদি) পাওয়া গেছে, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে সময় সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পোড়ামাটির ফলক বা ভাস্কর্যগুলোতে যে ধরনের স্বচ্ছ ও মিহি বস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়, তা উন্নত কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

প্রাক-গুপ্তযুগের চেয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গুপ্তযুগ এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাস্কর্যের উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী জেলার নিয়ামতপুর ও কুমারপুর থেকে প্রাপ্ত দুটি সূর্যমূর্তির কথা বলা যেতে পারে। চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত এই ভাস্কর্য দুটি বাংলার ভাস্কর্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত। এই ভাস্কর্য দুটিতে যে ধরনের পোশাক বা বস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়, তা পূর্বে বর্ণিত মহাস্থান বা চন্দ্রকেতুগড়ের ভাস্কর্যের মতোই সুক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বস্ত্র বলে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এ ধরনের বস্ত্র ব্যবহার পরবর্তীকালের ভাস্কর্যগুলোতেও দেখা গেছে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে থেকে যেসব ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, এগুলোর কিছু প্রস্তর নির্মিত, কোনোটি ধাতু ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত। একই বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ পোড়ামাটির ফলক চিত্র ও ভাস্কর্যও আছে প্রচুর। উদাহরণ হিসেবে আরো কিছু ভাস্কর্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমনঃ প্রস্তর নির্মিত 'অর্ধনারীশ্বর' (বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত), অষ্টধাতুতে নির্মিত 'বজ্রসত্ত্ব' (ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত), প্রস্তর নির্মিত পার্বতী বা উমা (বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত), মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র 'দম্পতি',

চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত পোড়ামটির ভাস্কর্য 'নৃত্যরত অপ্সরা', মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক 'দন্ডায়মান যক্ষিণী' ইত্যাদি ভাস্কর্যগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন বস্ত্রশিল্প ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের বস্ত্র শিল্পের দৃশ্যগত উপাদানের নিদর্শন হিসেবে পালপুঁথি চিত্রগুলোর উল্লেখ করা যায়। এর সূচনা কাল ধরা হয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই পুঁথিচিত্রের গুরুত্ব এই যে, এই চিত্রগুলো থেকে বস্ত্রশিল্পের সুক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতার পাশাপাশি কাপড়ের রং ও নকশা সম্পর্কে আরো ধারণা লাভ করা যায়।

এসব ভাস্কর্য, পোড়ামটির ফলকচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা সম্ভব যে, এ অঞ্চলের বস্ত্র শিল্প তখন উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। এতে করে বোঝা যায় বাংলার তাঁত শিল্প খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং ক্রমশ: তা বিকশিত হয়েছিল।

১.৬.২ সাহিত্যিক সূত্র

প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিবরণ ছাড়াও সাহিত্যিক সূত্র থেকেও প্রাচীন ভারতের তাঁতশিল্পের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার পর উপমহাদেশে আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। আর্য সাহিত্য অর্থাৎ বেদসমূহ, রামায়ন, মহাভারত, সংহিতা ইত্যাদিতে বর্ণিত তাঁত, তন্তুবায় ও পোশাকের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে তখনো তাঁতশিল্প প্রচলিত ছিল এবং ক্রমশ তা সমৃদ্ধ হয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের তাঁতশিল্প সম্পর্কে জানার সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যিক বিবরণী ঋগ্বেদ। এর কিছু অংশ খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগেই রচিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদ-এর একাধিক ঋকে তন্তু, তন্তুবায় ও বস্ত্র বয়নের উল্লেখ আছে। যেমন: একটি ঋকে দিন ও রাতকে 'বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের' সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে সে সময় দুজন নারী টানা ও পোড়েন সঞ্চলন করে বস্ত্রবয়ন করত ঋক থেকে তা অনুমান করা যায়। অপর একটি ঋকেও (২/৩৮/৪) বস্ত্রবয়নকারী রমণীর উল্লেখ আছে। তন্তু (টানাসূত্র) ও ওতু (পোড়েনসূত্র) এবং চেষ্টা দ্বারা বস্ত্র বয়নের উল্লেখ আছে অপর দুটি ঋকে (৬/৯/২ এবং ৬/৯/৩)।[২৭]

শুরুতে আর্যরা কার্পাসের ব্যবহার জানতো বলে মনে হয় না। তবে ক্রমে আর্যরা কার্পাস উৎপাদন, বয়ন ও রঞ্জনে দক্ষ হয়ে ওঠে। বৈদিক সাহিত্যে পরিচ্ছদের তিনটি অংশের কথা জানা যায়, একটি হলো নীবি বা অন্তর্বাস, দ্বিতীয়টি 'বাস' বা পরিধেয় বস্ত্র এবং তৃতীয়টি 'অধিবাস' বা ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র বা উত্তরীয়। বেদের পরবর্তী সাহিত্যগুলোতেও তাঁতশিল্প, বস্ত্রবয়ন, তন্তু ও পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতেও বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বিবরণ আছে। বাল্মীকি রামায়ণে প্রাচীন যুগের পোশাকের যেসব নাম রয়েছে, তার অন্যতম হলো কাঞ্চলিকা, অঙ্গিকা, চোল, কুরপাসক ইত্যাদি।[২৮] এ থেকে অনুমান করা যায়, ভারতবর্ষে ক্রমশ তাঁতশিল্প বিকাশিত হচ্ছিল এবং তা উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব কালপর্বের আর অনেক সূত্র থেকে জানা যায়, বস্ত্রবয়ন ও তাঁতশিল্প ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে তা বিপুল পরিমাণে রপ্তানি হতো।[২৯] ভারতীয় বস্ত্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল মেসোপটেমিয়া হয়ে গ্রিক ও রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস (৪৮৪-৪২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভারতবর্ষের বস্ত্র সম্পর্কে লিখেছেন, “They possess likewise a kind of plant, which, instead of fruit, produces wool, of a finer and better quality than that of sheep: of this the Indians make their clothes.”[৩০]

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আসিরীয় ও ব্যাবিলনিও ফলক লিপি থেকে জানা যায় যে, তখন ভারতবর্ষের সাথে এসব অঞ্চলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ “Assyrian and Babylonian tablets from the seventh century BC allude to the cotton cloth trade between Mesopotamia and the Subcontient.”[৩১]

এ ছাড়াও বৈদেশিক সূত্র হিসেবে মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা নামক গ্রন্থের বর্ণনা (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতক), *The pepriplus of the Erythraean Sea* নামক গ্রন্থের বিবরণ (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক), টলেমির ভুগোলে (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৩২] গ্রিক ঐতিহাসিক আ্যরিয়ানের (দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ) ইন্ডিকা থেকেও ভারতের বস্ত্রশিল্পের বিবরণ পাওয়া যায়।[৩৩]

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১)। বাংলাদেশ ভুখন্ডের অংশবিশেষ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা নিশ্চিত প্রমান পাওয়া যায় মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য (চাণক্য) রচিত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁতশিল্প, বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা, তাঁতী সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। সবচেয়ে পুরানো কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে অর্থশাস্ত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজার কোষাগারের জন্য সংগ্রহের উপযোগী দ্রব্যাদির বিবরণ দিতে গিয়ে কৌটিল্য বলছেন, ‘বাঙ্গকং শ্বেতাং স্নিগ্ধং দুকূলং স্নিগ্ধিং দুকূলং, পৌন্ড্রকং, শ্যামং মনিস্নিগ্ধং, সৌবর্ণকুড্যকং সূর্যবর্ণম। মণিস্নিগ্ধোদকবাং চতুরশ্রবানং ব্যামিশ্রবানং চ। এতে ষামেকাংমুকমধ্যর্ধ দ্বিত্রিচতুরংশুকমিতি। তেন কাশিং পোন্ডং চ ক্ষৌমং ব্যাখ্যাতম।’[৩৪] অর্থাৎ বঙ্গ দেশের (বাঙ্গক) দুকূল খুব নরম ও সাদা; পুন্ড্রদেশের (পৌন্ড্রক) দুকূল (কামরূপঃ) দুকূল উদিত সূর্যের মতো জ্যোতিবিশিষ্ট। এ ছাড়াও দুকূলের বুনন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মণির মতো চিকন তন্তু জলে ভিজিয়ে রেখে পরে তা তুলে নিয়ে, সেটিকে মণির সাথে ঘর্ষণ ভিজেয়ে রেখে তা দিয়ে যে বস্ত্র হয়, এই ধরনের বুননের নাম ‘মণিস্নিগ্ধোদকবান’। আরেক ধরনের বুনন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, একই বর্ণের তন্তুর দ্বারা নির্মিত এবং চারকোণে চিত্রিত বস্ত্রবিশেষ এর নাম ‘চতুরশ্রবান’। এ ছাড়া ব্যামিশ্রবান নামে একধরনের বুননের কথা বলা হচ্ছে, যে বস্ত্র কার্পাস তন্তুর সাথে

কৌশেয়ক তন্তু (সিল্কের সুতা) মিশিয়ে তৈরি হয় কিংবা যে বস্ত্র নানা রঙ্গের সুতা দিয়ে তৈরি হয়। এই দুকূলগুলোর মধ্যে 'একাংমুক' বস্ত্রগুলো অর্থাৎ যাদের তান (বা তানা) ও বান (পোড়েন) একই প্রকার সুতার দ্বার প্রস্তুত এবং সেগুলো সুক্ষ্ম।

দুকূল ও ক্ষৌমবস্ত্র কী, তা নিয়ে বিভিন্ন লেখক-গবেষক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় মত হলো, ক্ষৌমবস্ত্র মানে লিনেন, যা তিসি (Flax) থেকে উৎপন্ন হয়।[৩৫] অধিকাংশ লেখক অবশ্য ক্ষৌমবস্ত্র বলতে কার্পাসমিশ্রিত মোটা লিনেনের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু 'ক্ষৌম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ করলে আমরা কিছু ভিন্ন অর্থের ইঙ্গিত পাই। ক্ষৌম শব্দটি 'ক্ষুমা' থেকে জাত। 'ক্ষুমা' শব্দের দুটি অর্থ: ১. অতসী, তিসি, মসিনা ২. শণ, নীলিকা, লতাবিশেষ ইত্যাদি।[৩৬] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, 'ক্ষুমা' শব্দটি দিয়ে অতসী বা তিসি যেমন বোঝায়, তেমনি শণও বোঝায়। যদি তাই হয়, আমার ধারণা, বিষয়টা এমনও হতে পারে, এসব গাছের বাকল থেকে যে সুতা উৎপন্ন হতো এবং তা দিয়ে যে বস্ত্র তৈরি হতো, তাকে ক্ষৌমবস্ত্র বলার রেওয়াজ ছিল এই দেশে। সেটা হতে পারে তিসি বা শণ। যদিও পশ্চিমা উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষ্য অনুযায়ী শণ (Hemp) ও তিসি (Flax) এক জিনিস নয়।

আর দুকূল হলো লিনেনের সুক্ষ্ম বস্ত্র এই মতামত অধিকাংশ লেখকের। যদিও কখনো কখনো একে সিল্ক বা সুতির সুক্ষ্ম বস্ত্রও বলা হয়েছে।[৩৭] রোমিলা থাপার আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনি এটা কোনভাবেই লিনেন নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি দুকূল সম্পর্কে লিখেছেন,' "Afine quality cloth made from the inner bank of a delicate plant, It should not be confused with linen."[৩৮] কোন বৃক্ষ বা উদ্ভিদের বাকল বা অংশ থেকে এটা তৈরি হতো, তা তিনি নির্দেশ করেননি। তবে এ বিষয়ে মতি চন্দ্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অমরকোষ এবং এর টীকাকারের সূত্রের মাধ্যমে মতিচন্দ্র ক্ষৌমবস্ত্র বা দুকূল আসলে একই বস্তু। তাঁর ভাষায়, "Dukula according to Anarasimha was synonym of ksauma (linen),...It seems that at some later date all thin bleached materials were being classicied as dukala"। মতি চন্দ্রের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হবে, দূকুল ও ক্ষৌমবস্ত্র আসলে একই জিনিস। অর্থাৎ এ দুটিই তিসি থেকে উৎপন্ন হতো। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যেগুলো সুক্ষ্ম ও মিহি হতো, সেগুলো 'দুকূল' পরিচিত হতো। আর অপেক্ষাকৃত মোটা মানের বস্ত্র 'ক্ষৌমবস্ত্র' নামেই পরিচিত হতো। এমনকি মতি চন্দ্রের ব্যাখ্যা শুনে মনে হয়, সিল্ক বা সুতির সুক্ষ্ম বস্ত্রও হয়তো একসময় দুকূল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকতে পারে। এটা বলা যেতে পারে যে, তিসি বা অন্যান্য বাকল তন্তু থেকে জাত মোটা বস্ত্র ক্ষৌমবস্ত্র এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রগুলো দুকূল হিসেবে পরিচিত হতো।

অর্থশাস্ত্রতে তন্তুবায় ও সুতা কাটুনীদের মজুরি কী রকম হবে, কোনো তাঁতি কাজে ফাঁকি দিলে বা কাজের ক্ষতি করলে কী পরিমাণ জরিমানা করা হবে, ধোপা বা রঞ্জকদের কাজের ধরন ও প্রাপ্য বেতন

কী হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। শিল্পীদের সংঘ বা গিল্ড তখন চালু হয়ে গিয়েছিল। মৌর্য যুগে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) 'সূত্রাধ্যক্ষ' নামে একটি উচ্চপদস্থ রাজপদ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছিল, যাঁর মূল কাজ ছিল সুতা কাটা ও বস্ত্রবয়ন-সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ ও পর্যাবেক্ষণ করা। তাঁর কর্তব্যকর্মের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে অর্থশাস্ত্রে। ফলে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে বাংলার তাঁতশিল্প কতটা উন্নতি ও বিস্তার লাভ করেছিল, তা বোঝা যায় অর্থশাস্ত্র-এর বিবরণ থেকে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক সূত্র থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অনেক আগেই বাংলার ভুখন্ডে তাঁতশিল্পের সূত্রপাত হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১.৬.৩ ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র

ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের বিবরণ অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যেসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলে বসবাস করেছে, তাদের একটি হলো আদি-অস্ট্রোলয়েড বা অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠী। এই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমেই বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন হয় বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। এই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমেই বাংলাদেশে তাঁতশিল্পের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, তুলার কাপড়ের ব্যবহারও অষ্ট্রিক ভাষাভাষীদের দান। কর্পাস (কার্পাস) শব্দটি প্রধানত অষ্ট্রিক। পট (পট্টবস্ত্র, বাংলা পট, পাট), কর্পপ (পট্টবস্ত্র) এই দুই শব্দও মূলত অস্ট্রিক ভাষা হতে গৃহীত। তারা মেড়া বা ভেড়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল। 'কম্বল' কথাটিও কিন্তু মুলতঃ অস্ট্রিক, এবং আমরা যে অর্থে কথাটি ব্যবহার করি, সেই অর্থেই এই ভাষাভাষী লোকেরাও করে।[৩৯]

কিন্তু এই অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠী ঠিক কখন থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে, তা নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য-প্রমাণ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাম্র-প্রস্তর যুগের প্রত্নস্থান পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও সমসাময়িক অন্যান্য প্রত্নস্থানের মানুষেরা নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে আদি অস্ট্রোলয়েড বা অস্ট্রিকভাষী হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, এই দুই ভূখন্ডে এখনও অস্ট্রিক ভাষাভাষী পরিবারভুক্ত অনেক সাঁওতালদের বাস দেখতে পাওয়া যায়।[৪০] এই বিবরণ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে বলা যায় যে, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক (কিংবা তার আগেই) অস্ট্রিক ভাষীগণের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাঁতশিল্পের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।

১.৬.৪ বিদেশি লেখক ও পর্যটকদের বিবরণ

বিদেশী লেখক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকেও প্রাচীনকালের আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্রথমে যে প্রমাণ হাজির করা যায়, তা হলো প্লিনির বিবরণে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক, মতান্তরে খ্রিস্টীয়

প্রথম শতক)। পাওয়া যায় ভারতবর্ষ হতে যে পরিমাণ ভারতীয় পণ্য রোমে রপ্তানি হয়, তার বার্ষিক মূল্য ছিল পঞ্চান্ন কোটি রোমান মুদ্রা (সেস্টারসেজ)।[৪১] বলা বাহুল্য, এই রপ্তানি পণ্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল সুতি ও রেশমবস্ত্র। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ দাঁড়ায় চৌদ্দ লাখ পাউন্ড।[৪২]

চীন দেশের পরিব্রাজক ফা হিয়েন এসেছিলেন ভারতবর্ষে। বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ভ্রমণ করে তিনি প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দরে এসেছিলেন।[৪৩] সমুদ্রের তীরে সেটি ছিলো একটি বন্দর। তাম্রলিপ্তি বন্দরের সমৃদ্ধির কথা ফা হিয়েনের বর্ণনায় রয়েছে। যে সমস্ত বণিকেরা ঐ বন্দরে বানিজ্য করতে আসতো তারা টুকরো টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেতো প্রবাল কাছিমের পিঠের ছাল, সামুদ্রিক শংখের মালা অয়স্কান্ত মণি, গৌরিক নামক এক ধরনের খনিজ রূপো। প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প ছিল বস্ত্র শিল্প।[৪৪]

Periplus এর নামক না জানা লেখকের বিবরণ অনুযায়ী Periplus (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) এর বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গঙ্গা নদীর অববাহিকায় একটি বন্দরনগরী ছিল এবং সেখানে সে সুক্ষ্ম মসলিন উৎপাদিত হত তাকে 'গাঙ্গেটিক' হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন। Periplus এর বিবরণকে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[৪৫]

> There is a river near it called the Ganges, on its bank is a market-town which has the same name as the river, Ganges. Though this place are brouth malabathrum and Gangetic spikenard and pearls, and muslins of the finest sorts, which are called Gangetic.[৪৬]

বৌদ্ধ সাহিত্য মিলিন্দাহ গ্রন্থেও (আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) আরো অনেক বন্দর নগরীর সাথে 'বঙ্গ'কে একটি অন্যতম সামুদ্রিক বন্দর নগরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই বন্দরে বিভিন্ন দেশের জাহাজ ভিড় করত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।[৪৭] ফলে অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে অর্থশাস্ত্র এ যুগের না হলেও, অন্ততঃ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকেই বাংলার সাথে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং এটা ধরে নেয়া যায় সভ্যতার শুরু থেকেই বাংলা অঞ্চলে উৎপাদন শুরু হয়েছিল।

অবশ্য আবদুল করিম তাঁর বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "কেউ কেউ মনে করেন যে রোমান আমলে এবং পেরিপ্লাস ও টলেমির যুগে বাংলার বস্ত্র শিল্পের সুনাম ছিল এবং এদেশীয় সুতার কাপড় বাংলার রোম সাম্রাজ্যে, মিশর প্রমুখ দেশে রপ্তানী করা হতো। এর স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ

পাওয়া না গেলেও প্রাক্-মুসলমান যুগে যে বঙ্গ দেশে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও মিহি সুতী বস্ত্র তৈরী হত, তা বিনা দ্বিধায় বল যায়”।[৪৮]

এ বিষয়ে আরব বণিক সুলেমানের বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রহিমি দেশের বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন, এ দেশে এক প্রকার সুক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র উৎপন্ন হতো, অন্য কোনো দেশে এমন সুক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হতো না। এই বস্ত্র এতই সুক্ষ্ম ও সুকোমল ছিল যে একটা আংটির ভেতর দিয়ে একে চালিয়ে দেওয়া যেত। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে, এই বস্ত্র ছিল কার্পাসের তৈরি এবং এমন বস্ত্র তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। এই রহিমি দেশ সম্পর্কে পরবর্তীকালে (দশম শতকে) আরব দেশের একজন ভৌগোলিক পরিব্রাজক ইবন খুর্দদবা জানাচ্ছেন, ‘জলপথে জাহাজের সাহায্যে রহমি দেশের রাজা অন্যান্য দেশের রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন। তাঁহার পাঁচ হাজার হাতি আছে, এবং তাঁহার দেশে কার্পাসবস্ত্র এবং আগুরু কাঠ উৎপন্ন হয়।’ পশ্চিমা পন্ডিত ইলিয়ট সাহেব এই রহমি দেশটাকে বঙ্গদেশের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। স্থানীয় লেখক নীহাররঞ্জন রায় এই ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন না। এটাকে আরাকান হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন।[৪৯] অনদিকে, আবদুর রহিম এই দেশটিকে ‘রামু’ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫০] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই রহমি দেশটি কোথায় বা কোনটি; তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এটা বাংলার বিবরণ হোক বা না হোক, আংটির ভেতর দিয়ে একটি সম্পূর্ণ মসলিন শাড়ি চলে যাওয়ার কিংবদন্তিটা খুব সম্ভবত: এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছে। বৃটিশ নথিপত্র থেকে ঢাকার সুতিবস্ত্র ও মসলিন সম্পর্কে জানা যায়,

> The principal manufactures are cotton weaving, embroidery, silver-work, shell-carving, and pottery. The muslins of Dacca, once so celebrated, have now almost entirely ceased to be made. A few pieces are occasionally woven to order, to satisfy the taste of the curious. Coarse cotton cloth is still woven all over the District. The gold and silver smiths and the sheel-carvers work in their own houses, and on their own account; and their condition is decidedly prosperous. The weavers and embroideres, on the other hand, manufacture their goods on behalf of merchants, working on a system of advances. The merchants take care that the artisan shall always continue in their debt.[৫১]

এরিয়ান, প্লিনি, ফাহিয়ান, প্রমুখ পরিব্রাজক বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রাচীনত্ব এবং বহির্বিশ্বে এর চাহিদার উল্লেখ করেছেন। তাদের বিবরণ থেকে সুতিবস্ত্র ও মসলিনের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

১.৭ সুলতানী যুগ

সুলতানী যুগের তাঁত শিল্পের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট ফোকলোর গবেষক ও লেখক জনাব মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান বলেন, ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে (১২৯০) ইতালির পর্যটক মার্কোপোলো[৫২] ভারত সফর করেন। তিনি গুজরাত, কাম্বে, তেলেঙ্গানা, মালাবার ও বঙ্গদেশে তুলা উৎপাদন ও কার্পাসজাত বস্ত্রশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, বাংলার মানুষ প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে এবং কার্পাসের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ।[৫৩] মার্কোপোলো বাংলার 'কার্পাস' বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (এয়োদশ-চতুর্দশ শতক) বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তিনি বাংলার তাঁতবস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন বাংলায় ত্রিশ কিউবিট প্রাচীন পরিমাপক পদ্ধতির কথা-যা হাতের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এলাকাভেদে দামের আছে ভিন্নতা, লম্বা মিহি সুতার তৈরি সুন্দর কাপড় মাত্র দুই দিনারে বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৪] চীনা পরিব্রাজক মা হুয়েন পঞ্চদশ শতকে (১৪০৫) বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ প্রভৃতি শহর উল্লেখ এর গৌড়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, "এ দেশে ছয় প্রকারের সুক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় রেশমনির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়"।[৫৫] তখনকার সময়ে চীন সূত্র থেকে বাংলার যেসব সুতিবস্ত্রের (ব্যবসা-বাণিজ্যের) তথ্য পাওয়া যায় তা নিচে দেখানো হলো:[৫৬]

পি-পো	এটা সুতি কাপড় এবং এটা নানা রঙের হয়। এটা দৈর্ঘ্যে ছাপান্ন ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা ছাপা কাপড়ের মতো মসৃণ
মান-চে-টি	এটা আদার মতো হলুদ রঙের। দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট। এটার বুনুনি অত্যন্ত মিহি ও শক্ত।
শা-না-পা-ফু	এটা দৈর্ঘ্য ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ফুট।
কি-পাই-লি.তা-লি	এটা দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা পাতলা বুনুনিয়া মোটা কাপড়।
শা-তা-উল	এটা পাগড়ির জন্য ব্যবহার হতো। এটা দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ছিল বা দৈর্ঘ্য চার ফুট এবং প্রস্থে আড়াই ফুট ছিল।
মা-হা-মা-লি	এটা দৈর্ঘ্য বিশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট।

> "বাংলার তাঁতশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে এসব প্রাচীন নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে বাংলার নগরায়ণ, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকা থেকে উন্নত। কেননা, এসব নগর ও বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন পরিবহনে একাধিক বাণিজ্যপথ ধরে এই অঞ্চলের তাঁতবস্ত্রগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হতো"।[৫৭]

পর্তুগিজ পর্যটক ও নাবিক ভাস্কো-দা-গামার আগমনকে কেন্দ্র করে জলপথে সরাসরি ইউরোপের সাথে ভারতের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রমে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ব্যবসা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভারতে আসে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এর আমলে। পর্তুগিজরা বাংলায় আগমন ও বসবাস শুরু করে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল ঢাকার নিকটবর্তী সাতগাঁও এবং চট্টগ্রামে। পর্তুগিজরাই ঢাকায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেছিল (১৬১৬)। পরবর্তীকালে অন্যান্য ইউরোপীয় পর্তুগিজদের অনুসরণ করে। পর্তুগিজ ছাড়াও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যেসব জাতি ভারতে আসে সেগুলো হলো ফরাসি, ওলন্দাজ, বৃটিশ ইত্যাদি। এসব ইউরোপীয় বণিক বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিলেন। এগুলোকে তখন বলা হতো 'ফ্যাক্টরি'। তারা বাংলার যেসব পণ্যের বাণিজ্যে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন, তার একটি হলো বাংলার তাঁতবস্ত্র। এই বণিকদের মাধ্যমে বাংলার তাঁতবস্ত্র পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল আরো বেশি পরিমানে।

এছাড়া ইউরোপীয় বণিক ও লেখকদের বিবরণ থেকে বাংলার তাঁত শিল্পের আরো নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। ১৫০৩ থেকে ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ এই কাল পর্বে পর্তুগিজ বণিক ও লেখক লুই ভার্থেমা জাহাজযোগে 'বাঙ্গেলা' শহরে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, এটি ছিল তার দেখা অন্যতম শহর এবং এখানে সুতি ও রেশম বস্ত্রের পর্যাপ্ত বাণিজ্য ছিল। তাঁর ভাষায় সুতী, মিশ্রিত পশমী ও রেশমী বস্ত্রাদির প্রাচুর্য এত ব্যাপক যে, আমার মনে হয় এ সমস্ত জিনিসের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর সমকক্ষ অন্য কোনো দেশ নেই।[৫৮]

আরেক পর্তুগিজ বণিক দুয়ার্তে বারবোসা ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি এ দেশের বস্ত্রশিল্পের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে: এ দেশে প্রচুর সুতিবস্ত্র উৎপন্ন হয়। অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও মসৃণ নানা জাতীয় বস্ত্রের মধ্যে রঙিন কাপড় স্বদেশে ব্যবহারের জন্য এবং সাদা কাপড় বিদেশে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত হয়। সুক্ষ্ম একশ্রেণীর বস্ত্র আমাদের দেশের ও মূর রমণীদের ওড়না হিসেবে বেশ চাহিদা আছে। তাদের বোনা অন্যান্য শ্রেণীর বস্ত্র হলো মেমোনা, দু'গজা, চৌতার, সিনাবাফা এবং বিটিলহা। সিনাবাফা এগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। মুররা তা পিরহান হিসেবে খুব শখ করে ব্যবহার করে।[৫৯] ড. আবদুল করিম তাঁর *সোস্যাল হিস্ট্রি অব দ্য মুসলিম ইন বেঙ্গল* গ্রন্থে এগুলোকে যথাক্রমে সিরবন্দ, মখমল, দোগজি, চাদর, সিনাবন্দ ও বুটিদার বলে অনুমান করেছেন। বারবোসার বর্ণনার আরো জানা যায়, এগুলো সব কাটা কাপড় এবং প্রতিটি ৩×২ থেকে ৪×২০ পর্তুগিজ গজ (১ বৃটিশ ফুট=১.০৯ পর্তুগিজ ফুট)। তিনি বলেছেন, এগুলো বাঙ্গালায় অত্যন্ত কম দামে বিক্রি হয়। এখানকার নারী-পুরুষ উভয়েই এই বস্ত্রের জন্য চরকায় সুতা কাটে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৬০]

১.৮ মুঘল যুগ

মুঘল পর্বে বাংলার তাঁত শিল্প মুঘল শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল ব্যাপক মাত্রায়। বিদেশি বণিকদের চেয়ে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। মুঘল আমলকেই বাংলার তাঁতশিল্পের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে বাংলার তাঁতশিল্প দারুণভাবে বিকশিত হয়েছিল সে সময়। এর বিবরণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন লেখক-পর্যটকদের বিবরণে এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলে।[৬১]

মুঘল ঐতিহাসিক ও লেখকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁত বস্ত্রের মধ্যে বাংলার মসলিনের প্রশংসা করেছেন। আবুল ফজল বাংলার মসলিন সম্পর্কে লিখেছেন, 'সোনারগাঁও-এ এমন এক জাতের মসলিন উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত মিহি এবং যার পরিমাণও বিপুল।[৬২] সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবনী *তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী* থেকে জানা যায় যে, সুবাদার ইসলাম খান দিল্লীর সম্রাটের জন্য সোনারগাঁয়ের মসলিন পাঠিয়েছিলেন।[৬৩]

ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি সোনারগাঁর বস্ত্র সম্পর্কে লিখেছেন, 'Sinnergam is a town Six Leage from Serrepore where there is the best and finest cloth mode of cotton that is in all India".[৬৪] ষোল শতকের মাঝামাঝি সোনারগাঁও ও তাঁতশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল, র‍্যালফ ফিচের বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দিতেও ফরাসি রাষ্ট্রদূত ব্রসি ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের প্রেয়সী মাদাম দ্য পম্পোদর-এর জন্য উপহার হিসেবে বাংলা থেকে এক ডজন মসলিনের কামিজ ফরাসি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কামিজগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি নস্যি কৌটার মধ্যে ভরা ছিল।[৬৫]

তবে বিভিন্ন দেশের পরিব্রাজক ও বণিকদের বিবরণ থেকে মুঘলযুগের আরো কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। পর্তুগিজ বণিক সেবাস্তিন মানরিক ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সফর করেছিলেন। তার লেখা থেকে জানা যায়,

> The finest and richest mulsins are produced in this country, from fifty to sixty yards long and seven to eight hand-breadhs wide with borders of gold and silver or coloured silks. So fine, indeed, are these muslins that merchants place in holow bamboos about two spans long, and thus secured, carry then throughout corazane (Khorasan), Persia, Turkey, and many other countries.[৬৬]

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাসোয়া বার্ণিয়ে (১৬২৪-৮৮) বাংলা সফর করেন। তিনি ছিলেন পরিব্রাজক ও মুঘল রাজ দরবারের চিকিৎসক। তিনি লিখেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ সুতিবস্ত্র দেখে অবাক হতাম। ডাচরা এসব বস্ত্র জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করত। পাশাপাশি ইংরেজ, পর্তুগিজ ও ভারতীয় বণিকেরা এসব পণ্যের ব্যবসা করত। মুঘল রাজ দরবার ও বিদেশীদের কাছে প্রতি বছর সুতিবস্ত্র পাঠানো হতো। এজন্য বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ সুতিবস্ত্র সংগ্রহ করা হতো।[৬৭]

মুঘল আমলে বাংলার বস্ত্রশিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। এর বুননের সুক্ষ্মতা ও নকশার বৈচিত্র্য বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিস্মিত করেছে। তঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলার তাঁত বস্ত্রের চাহিদা ও বাজার ছিল। দেশি-বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে বাংলার তাঁত বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কাজেই মুঘল আমলে বাংলার তাঁত বস্ত্রের সুদিন ছিল। কিন্তু বাংলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানা যায় বিদেশি কোম্পানিগুলোর দলিল, প্রতিবেদন ও নথিপত্র থেকে।

১.৯ মুঘল যুগে মসলিন

ঢাকার মসলিনের খ্যাতির পেছনে অন্যতম কারণ হলো ঢাকায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট মানের কার্পস বা তুলা। প্রকৃতপক্ষে তিতাবাদী, ধামরাই, বাজিতপুর ও সোনারগাঁও ছিল উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের স্থান। এসব এলাকায় উন্নতমানের মসলিন তৈরি হওয়ার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। (তুলা, সুতা বা মসলিন বয়ন পদ্ধতি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) এসব এলাকা ছাড়াও, বাংলার অনেক জেলাতেই কমবেশি তাঁতের কাজ হতো। তবে তার মধ্যে বৃহত্তর ঢাকা জেলার অধিক খ্যাতি ছিল। ষোড়শ শতাব্দিতে র‍্যালফ ফিচ[৬৮] ও সোনারগাঁয়ে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট বস্ত্র শিল্পের প্রশংসা করেছেন।[৬৯]

মসলিন বিক্রয় ও বন্টন নিয়ে বাংলা বিভিন্নএলাকায় হাট বা আড়ং তৈরি হয়েছিল। এগুলোও প্রধান প্রধান মসলিন উৎপাদনকেন্দ্রের কাছাকাছিই অবস্থিত ছিল। যেমন ঢাকা আড়ং, সোনারগাঁ আড়ং, বাজিতপুর আড়ং, জঙ্গলবাড়ী আড়ং ইত্যাদি। এসব আড়ং থেকে দিল্লির বাদশাহ, বাংলার নবাব ও সুবেদারদের এবং অন্যান্য দেশি-বিদেশি বণিকের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো।

জন টেলর ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাই মসলিন বাণিজ্যের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন। এখানে তা উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১.১: ঢাকাই মসলিন বাণিজ্য

১.	দিল্লির বাদশাহের জন্য সংগ্রহ করা হয় (জামদানি, সরবন্দ, রেজা, চিকন ইত্যাদি সূক্ষ্মতম কাপড় এর মধ্যে অন্তভূক্ত।)	১,০০,০০০ অর্কট টাকা মূল্যের
২.	মুর্শিদাবাদের নওয়াব অর্থাৎ বাংলার নওয়াবের জন্য সংগ্রহ করা হয় (এর মধ্যেও সূক্ষ্মতম মসলিন অন্তভূক্ত।)	৩,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৩.	জগৎ শেঠের জন্য সংগ্রহ করা হয় (এর মধ্যে সূক্ষ্ম ও মোটা উভয় প্রকারের কাপড় ছিল।)	১,৫০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৪.	পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রির জন্য তুরানি ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে (এদের সংগৃহীত কাপড়ের মধ্যে থাকত, ফাইন, সুপার ফাইন তরান্দাম, ডোপরিয়া, আব-ই-ররওয়ান এবং শবনমজাতীয় কাপড়। মলবুস খাস বা সরকার-ই-আলীর মতো সূক্শ কাপড়ের ব্যবসা করার অনুমতি ছিল না। তাই এদের সংগ্রহীত কাপড়ে সূক্ষ্মতম কাপড় থাকত না।)	১,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৫.	পাক-ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রির জন্য পাঠান ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে (পাঠান ব্যবসায়ীরাও তুরানি ব্যবসায়ীর মতো একই রকম কাপড় সংগ্রহ করত)	১,৫০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৬.	বসরা, মছা ও জিদ্দার বাজারে কিক্রির জন্য আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীর সংগ্রহ করে (এরা সাধারণত কম দামের বাফ্তা, সরবন্দ ইত্যাদি সংগ্রহ করত)	৫,০০,০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৭.	বসরা, মছা, জিদ্দা ইত্যাদি বিদেশে এবঙ পাক-ভারতে কিক্রির জন্য মুঘল ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে (এরা সূক্ষ্ম এবং মোটা উভয় প্রকারের কাপড় সংগ্রহ করত, তবে মোটা কাপড়ের পরিমাণই বেশি ছিল।)	৪,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৮.	পাক-ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রির জন্য হিন্দু ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে (এরা সাধারণত মোটা কাপড়ের ব্যবসা করত)	২,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
৯.	ইউরোপ চালান দেয়ার জন্য ইংরেজ বণিক কোম্পানি সংগ্রহ করে (এরা সূক্ষ্ম এবং মোটা উভয় প্রকারের কাপড় সংগ্রহ করত। পলাশির যুদ্ধের পরে এদের রপ্তানির পরিমাণ অনেক গুণ বৃদ্ধি পায় এবঙ এরা বছরে প্রায় আট লাখ টাকার কাপড় ইউরোপে চালান দিত।)	৩,৫০,০০০
১০.	বিদেশের বাজারে চালান দেওয়ার জন্য ইংরেজ ব্যক্তিগত (individual) ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করে (এরাও সূক্ষ্ম ও মোটা উভয় প্রকারের কাপড় সংগ্রহ করত।)	২,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
১১.	ফরাসি বণিক কোম্পানি ইউরোপে চালান দেয়ার জন্য সংগ্রহ করে, (এরা সাধারণত: সূক্শ ডোরিয়া, চারকোনা, তন-জেব, জঙ্গল খাস্‌সা, নয়নসুখ, তরন্দাম এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের তন-জেব সংগ্রহ করত	২,৫০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
১২.	ফরাসি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা বিদেশে চালান দেয়ার জন্য সংগ্রহ করে (এরা সূক্ষ্ম ও মোটা উভয় প্রকারের কাপড়	৫০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
১৩.	ওলন্দাজ বণিক কোম্পানি ইউরোপে চালান দেওয়ার জন্য সংগ্রহ করে, (এরাও সূক্ষ্ম ও মোটা উভয় প্রকারের মসলিন সংগ্রহ করত।	১,০০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের
	সর্ব মোট	২৮,৫০,০০০ আর্কট টাকা মূল্যের

সারণি ১.১ থেকে দেখা যাচ্ছে, এক বছরে সাড়ে আটাশ লাখ আর্কট টাকার (আর্কট টাকা=১৭০ গ্রেনের খাঁটি রূপার মুদ্রা) মসলিন সরবরাহের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে টাকায় সোয়া এক মন ভালো মানের চাল পাওয়া যেত। ফলে বলা যায় টাকা অঙ্ক হিসেবে সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য বটে।

তবে সব মসলিন বস্ত্র একই মানের ছিল না। মানভেদে তাদের বিভিন্ন রকম নামও ছিল। যেমন-দিল্লির সম্রাট ও তাঁর পরিবারের জন্য মসলিন তৈরি করা হতো তার নাম ছিল মলবুস খাস এগুলো বিদেশে রপ্তানি করা নিষেধ ছিল। নওয়াব মুর্শিদ কুলি খানের সময় (১৭০০-১৭২৭) খ্রিস্টব্দ) প্রতি বছর প্রায় এক লাখ টাকার মলবুস খাস মুঘল বাদশাহের দরবারে পাঠানো হতো। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত বোল্ডের

বিবরণ থেকে জানা যায়, 'ঢাকার তাঁতীদের মতে, মুঘল বাদশাহদের জন্য তৈরি মলবুস খাস এত সূক্ষ্ম যে তা কল্পনারও অতীত। উদাহরণস্বরূপ তারা একখন্ড আব-ই-রওয়ানের উল্লেখ করেছে যা বাদশাহ আওরঙ্গজেবের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই কাপড়টির ওজন ছিল পাঁচ তোলা এবং মূল্য ছিল ৪০০ টাকা।[৭০]

১.১০ মুঘল দরবারে পাঠানো মসলিনের তালিকা

নবাবদের জন্য যে বস্ত্র তৈরি করা হতো, তার নাম ছিল সরকার-ই-আলী। এসব বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঢাকায় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল দারোগা-ই-মলবুস খাস ও তাঁতখানা। কোনো কোনো সময় তাঁদের অধীনে একজন সহকারী বা ডেপুটিও থাকতেন। এসব দারোগার তত্ত্বাবধানে প্রতিটি আড়ংয়ে একেকটি মলবুস খাস কুঠি বা তাঁতখানা পরিচালিত হতো এবং সম্রাটের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা হতো। আঠারো শতকের প্রথম দিকে মুঘল সম্রাটের কাছে যেসব মসলিন পাঠানো হতো, তার কয়েকটি তালিকা পাওয়া যায়। নিচে এ রকম একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

মলবুস খাস: ঢাকা আড়ং থেকে পাঠানো

১০০ জামদানি প্রতিটি ২৫০ টাকা হিসাবে ধোয়া ও মেরামত (dressing) খরচ	২৫,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা	২৬,০০০টাকা
৫০টি সিল্ক, চিকন প্রতিটি ২০০ টাকা হিসাবে ধোয়া ও মেরামত খরচ	১০,০০০ টাকা ২৮০ টাকা	১০,২৮০টাকা
৬০টি রেজা বা ছোট টুকরা, রূপার বাদলা সতে, প্রতিটি ১০০ টাকা হিসাবে ধোয়া ও মেরামত খরচ	৬,০০০ টাকা ২০০ টাকা	৬,২০০ টাকা
খাসনগর বা সোনারগাঁও আড়ং থেকে		
১০০ সাদা (Plain) কাপড়, প্রতিটি ২০০ টাকা করে ধোয়া ও মেরামত খরচ	২০,০০০ টাকা ২,৮০০ টাকা	২২,৮০০ টাকা
২০টি সরবন্দ, প্রতিটি ৮০ টাকা করে ধোয়া ও মেরামত খরচ	১,৬০০ টাকা ১৫০ টাকা	১৭৫০ টাকা
বাজিতপুর আড়ং থেকে		
১০০ সাদা (Plain) কাপড়, প্রতিটি ২০০ টাকা করে ধোয়া ও মেরামত খরচ	২০,০০০ টাকা ১,০৫০ টাকা	২১,০৫০টাকা
জঙ্গলবাড়ী আড়ং থেকে		
১০০ সাদা (Plain) কাপড়, প্রতিটি ১০০ টাকা করে ধোয়া ও মেরামত খরচ	১০,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা	১১,০০০টাকা

উৎস: আবদুল করিম, ঢাকাই মসলিন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ.৪৮-৪৯।

উপরের তালিকা থেকে দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাবদের জন্য যেসব বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো, তার পরিমাণ, মূল্য ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যায়। মলবুস খাস ও সরকার-ই-আলী ছাড়াও আরো অনেক ধরনের মসলিন হতো যেমন-শবনম, খাসসা, ঝুনা, ডোরিয়া, নয়নসুখ, তনজেব ইত্যাদি। বাঁশ-কাঠ দিয়ে তৈরি সাধারণ তাঁতযন্ত্রে, টাকুর সাহায্যে তুলা থেকে সুতা কেটে সূক্ষ্ম ও মিহি থেকে শুরু করে মোটা ও মাঝারি মানের বিভিন্ন ধরনের মসলিন তৈরি করা হতো।

১.১১ মসলিনের উৎকর্ষতার বিভিন্ন দিক

লক্ষ্যণীয় যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি বিভিন্ন ধরনের বণিক বাংলার তাঁতবস্ত্রের বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইউরোপীয় বণিকেরা যেমন ছিলেন, তেমনি পাঠান, মুঘল, তুর্কি, আর্মেনিয়ান বা ইরানি ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। পাশাপাশি সে সময় দেশি হিন্দু ব্যবসায়ীরাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আঠারো দশকের শেষদিকে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ঢাকা ফ্যাক্টরিতে নিচে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের মসলিন উৎপাদিত হতো:

সারণি ১.২: এলাকা ভিত্তিক উৎপাদিত বিভিন্ন রকম মসলিন

চাঁদপুর	আদি, কোসা, লাক্কারিখ ও নয়নসুখ।
ঢাকা	আব্রুয়ান, আদি, বুটা, কোসিদা, চিকন, ডুরে, জামদানি, জারি ও সাদা বস্ত্র।'
ধামরাই	বুটা, কোসিদা, তরিন্দম ও সাদা বস্ত্র।
জঙ্গলবাড়ী	আদি, বাফতা, বুটা, কোসা, শিরকার গুজী, কোরা, নয়নসুখ, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরহাদকোনা, শির আলী ও তানজিব।
নারায়ণপুর	আদি, মামুদি, মামুদিয়াতি, মুগাদিয়া, নয়নসুখ, শিরবন্দ, শিরবর্তী ও তানজিব।
সোনারগাঁ	আদি, আলাবলি, বুনিজী, কোসা, গুজী, মলমল, সাদাসিধে বস্ত্র, সমুদ্রলহর সুতা, শিরবন্দ ও শিরবর্তী।
শ্রীরামপুর	কোসা, দিমতি, হাম্মাম, ইজরি ও লং ক্লথ
তিতাবদী	তানজিব।[৭১]

সারণি ১.২ থেকে দেখা যায় যে, উক্ত পরিসংখ্যান থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের চিত্রও কিছুটা পাওয়া যায়। ইউরোপ ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য, ইরাক, ইরান, দূরপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলার তাঁতবস্ত্রের চাহিদা ছিল। তবে সূক্ষ্ম ও চিকন বস্ত্রের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত মোটা মসলিনেরও চাহিদা ছিল। বিভিন্ন দেশের বণিকেরা সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্রের পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত মোটা মসলিনও ব্যাপক পরিমাণে সংগ্রহ করতেন।

রপ্তানির জন্য বাংলায় যেসব বস্ত্র তৈরি হতো, কোম্পানির দলিলে তার একটা তালিকা পাওয়া যায়। সেখান থেকে দেখলে বাংলার বস্ত্রশিল্পের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। দেবেন্দ্র বিজয় মিত্র জানাচ্ছেন, 'মালদহ, হরিপল (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), শ্রীপুর (রাজশাহী জেলায় অবস্থিত), বলিকুশী, কাগমারী (ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি কোসা, এলাছি, হাম্মাম চৌতাহ, তুতালী, শশী, শিরসাকার, বাফতা, সেনো, মলমল এবং তানজিব উৎপাদনের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। বর্ধমান, খীরপয় (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), রাধানগর (মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত), দেওয়ানগঞ্জ এবং বলীগিসাগর শহর থেকে ইংরেজ কোম্পানির জন্য সরবরাহ হতো দরিয়া, তরিন্দম, কাটানী, শশী সুতিরুমাল, গুড়া, শিস্পেরসায়, সন্তান কুপি, চরিধারী চিলা, কুস্তা, দুসুতা প্রভৃতি নামের বস্ত্র। বীরভূমের এলামবাজার থেকে ইউরোপে সরবরাহ করা হতো বিপুল পরিমাণ গুড়া, নদীয়া জেলার শান্তিপুর এবং বুরন থেকে সরবরাহ করা হতো মলমল এবং কোসা। মেদিনীপুরের খ্যাতি ছিল মসলিন এবং রঙ্গিন বস্ত্রসম্ভারের জন্য। রংপুর, ঘোড়াঘাট (দিনাজপুরে অবস্থিত) এবং সন্তোষ বুদৌল

(দিনাজপুরে অবস্থিত) থেকে বৃটিশ কোম্পানির জন্য সরবরাহ করা হতো সোনা মলমল এবং তানজিব।[৭২]

কিন্তু সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদন এবং জামদানি নামক নকশামন্ডিত মসলিন তৈরিতে ঢাকায় অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে সবার ওপরে। যদিও উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ঢাকাই মসলিনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু টেইলরের বিবরণ (১৮৩৯) থেকে ঢাকাই মসলিন সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য জানা যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার বস্ত্রশিল্প তার সুনাম ধরে রেখেছিল এবং স্বল্প পরিমাণে হলেও মসলিনসহ নানা ধরনের বস্ত্রবয়ন অব্যাহত ছিল। ঢাকার সিভিল সার্জন জেমস টেইলর যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "...এমনকি, বর্তমান কালে বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের চরম উৎকর্ষ সত্ত্বেও এসকল মসলিন বস্ত্র এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বুননের স্বচ্ছতা, স্যেন্দর্য ও সুক্ষ্মতায় মসলিন কাপড় পৃথিবীর যেকোন অংশে তাঁতের তৈরি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"[৭৩]

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত দ্যা গ্রেট এম্পায়ার এক্সিবিশনেও মসলিন প্রদর্শিত হয় এবং বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। জানা যায়, প্রদর্শিত জিনিসের মধ্যে ঢাকাই মসলিন সর্বোত্তম বিবেচিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলার তাঁত শিল্পের সোনালি সময়ের অন্তিমকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে এরপরও যে মসলিন উৎপাদন হয়নি, তা নয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনেও ঢাকার নিতাইচন্দ্র বসাক, জগবন্ধু বসাক, হরিমোহন বাসক, গোবিন্দচন্দ্র বাসক প্রমুখের পাঠানো নীলাম্বরী, জামদানিসহ অনেকগুলো মিহি মসলিন প্রদর্শিত হয়েছিল।[৭৪] প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় যে, উচ্চ মূল্যের (দেড়শ টাকা দামের) মসলিন তখন স্বল্প সংখ্যক বিত্তবানদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। ভালো বয়নশিল্পীর চেয়ে সুক্ষ্ম সুতার দুস্প্রাপ্যতাই ছিল তখন এই শিল্পের প্রধান অন্তরায়। (১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মসলিনের উপযোগী সুতাও প্রদর্শিত হয়েছিল)। আবার ঢাকার নবাব ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ যুবরাজকে এবং পরে তৃতীয় এডয়ার্ডকে তিনখানা মসলিন কাপড় উপহার দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

এমনকি বিশ শতকের শুরুতে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির প্রদর্শনীতে ঢাকার ও রূপগঞ্জের তাঁতীরা মসলিন ও জামদানির জন্য পুরস্কার লাভ করেছিল।[৭৫] উনিশ শতকের শেষ দশকেও ধামরাইয়ে মসলিন বয়নের উপযোগী সুতা কাটার মতো কয়েকজন সুতা কাটুনি ছিলেন বলে শোনা যায়। এন.এন.ব্যানার্জি (১৮৯৮) লিখেছেন, "It is reported, though not with certainty, that there are only two persons at Dhamrai still living who can spin fine thread, which was formerly used in the manufacture of muslins.[৭৬] পরবর্তীকালে মসলিন বয়ন বা সুতা কাটা সম্পর্কে আর কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

১.১২ বৃটিশ আমল (১৭৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা ও বিহার বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রাথমিকভাবে বাংলার তাঁতশিল্প তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বাংলার সুতা, সুতি এবং রেশমবস্ত্রের বিপুল চাহিদা ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে। সেই চাহিদা পূরণ করতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বাংলার তাঁত বস্ত্রের বাণিজ্যে যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরও আগ্রহ ছিল। ফলে দেখা যায়, বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তন এ দেশের তাঁত শিল্পের জন্য শুরুতে তেমন কোন বিরুপ প্রভাব ফেলেনি। বিষয়টি বুঝার জন্য নিম্নোক্ত সারণির সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

সারণি ১.৩: ১৭৭১-১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে বৃটিশ কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত পণ্যবস্ত্রের সংখ্যা।[৭৭]

সাল	দ্রব্যাদির সংখ্যা	বিক্রয়মূল্য (প্রাঃ)	বিক্রয়মূল্য (সিক্কা টাকা)
১৭৭১	৬,০৪,৭৫৭	১০,৭৩,৮৪১	৮৫,৯০,৭২৮
১৭৭২	৬,২৬,১৬০	১০,৩৫,৬৮৬	৮২,৮৫,৪৮৮
১৭৭৩	৭,৬১,৪৮৯	১২,২৪,৪৬৭	৯৭,৯৫,৭৩৬
১৭৭৪	৬,১৬,২২৬	১১,০৫,২৩০	৮৮,৪১,৮৪০
১৭৭৫	৬,১৭,৭৬১	৯,৬০,২৪৪	৭৬,৮১,৯৫২
১৭৭৬	৬,০৭,৮৭৮	১০,৯০,৭৪৪	৮৭,২৫,৯৫২
১৭৭৭	৬,৫৫,৩৩২	১১,১৪,৭৩৪	৮৯,১৭,৮৭২
১৭৭৮	৮,০৫,০১০	১১,৯৪,৬১৩	৯৫,৫৬,৯০৪
১৭৭৯	৩,৩৮,৪৬৫	৫,২৪,৬৩৬	৪১,৯৭,০৮৮
১৭৮০	৪,৭৪,৭০৩	৯,৮৪,৭৬৩	৭৮,৭৮,১০৪
১৭৮১	৩,০১,৬১৭	৫,৮২,১১৬	৪৬,৫৬,৯২৮
১৭৮২	৪,৪৬,৪৮৮	১০,৩৩,৫৫৭	৮২,৬৮,৪৫৬
১৭৮৩	৪,৩৭,৮০২	১০,৪৯,২২৪	৮৩,৯৩,৭২২
১৭৮৪	৫,১৬,০৮৮	৯,০৮,৩৭০	৭২,৬৬,৯৬০
১৭৮৫	৭,৬৮,২২৮	১৪,২৬,২৫২	১,১৪,১০,০১৬
১৭৮৬	৭,৬৪,১৭৩	১৪,৫৮,৪১৬	১,১৬,৬৭,৩২৮
১৭৮৭	৭,৪৫,৪৪৯	১৩,১৭,৯৩৪	১,০৫,৪৩,৪৭২
১৭৮৮	৫,৯৪,৭২৮	৯,৭৮,৫০৭	৭৮,২৮,০৫৬
১৭৮৯	৪,১৪,৮৩৯	৯,৪৩,০৯৬	৭৫,৪৪,৭৬৮
১৭৯০	৮,৬৬,২৮২	১৪,৮৫,০৮০	১,১৮,৮০,৬৪৫
১৭৯১	৭,০৯,৫৪০	১১,৩১,৭১৭	৯০,৫৩,৭৩৬
১৭৯২	৬,০৭,৩২৯	১১,৯৪,৮৭৫	৯৫,৫৯,০০০

উৎস: William Milburn, *Oriental Commerce*, vol.II, (London 1813), 234.

সারণি ১.৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৭৭১ থেকে ১৭৯২ এই কালপর্বে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি করা বস্ত্র পণ্যের পরিমাণ এবং বিক্রয় মূল্য জানা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১৭৭৮ খ্রিস্টব্দ পর্যন্ত বাংলার বস্ত্র শিল্পে রপ্তানি বাণিজ্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দেও ৮,০৫,০১০টি পণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু এরপর থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাবে রপ্তানি বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়। ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মন্দাভাব প্রকট ছিল। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে আবার রপ্তানির পরিমাণ মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে রপ্তানির পরিমান ছিল কমতির দিকে,

সেটা বেশ বোঝা যায়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেসব বস্ত্র আমদানি করত, সেসব বস্ত্র সাধারণত সে দেশে ব্যবহৃত হতো না। নিজেদের দেশের তাঁত শিল্পকে বাঁচানোর জন্য ইংল্যান্ডে নানা রকম আইন করা হয়েছিল। তারপরও বাংলা থেকে তাঁতজাত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তারা আমদানি করে পুনঃরপ্তানি করত। সেগুলো চলে যেত ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে।[৭৮]

তবে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্য ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। সেটা হলো, ১৭৬৫ খ্রিস্টব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ করার পর বাংলার অতিরিক্ত রাজস্ব পণ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর আগে স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাট দ্বারা পণ্য ক্রয় করা হতো। রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিত করতে কোম্পানি তাঁতীদের ওপর প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এভাবে তাঁতীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন বাড়তে থাকে যার প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী।

১.১৩ বৃটিশ বাংলার রেশম তাঁত শিল্প

সুতিবস্ত্রই এদেশীয় তাঁত শিল্পের মূল প্রাণ। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে রেশম শিল্পও দেশের বিকশিত হয়েছিল। পূর্বে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বৃটিশ আমলে মসলিন বা সুতি ব্যবসার পাশাপাশি কাঁচা রেশম (Raw Silk) কোম্পানি আমলের শুরুতে বেশ মনোযোগ লাভ করেছিল। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস ঘোষণা করে, ‘কাঁচা রেশমের ব্যবসা ছাড়া আমাদের ব্যবসার আর কোনো শাখা নেই, যেটাকে আমরা সম্প্রসারিত করতে অধিকতর আগ্রহী হতে পারি এবং আমরা চাইব যে, যারা এখন রেশম বয়নশিল্পে ব্যস্ত, তারা সেটা ছেড়ে দিয়ে কাঁচা রেশম পেঁচানোর কাজে এগিয়ে আসুক’।[৭৯] পরে যখন চীন থেকে আমদানি সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং ইউরোপে সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তথন কাঁচা রেশম উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। কাঁচা রেশম উৎপাদনের উন্নতিকল্পে কোম্পানি বেশ কিছু পদক্ষেপও হাতে নিয়েছিল বলে জানা যায়। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাঁচা রেশম বাংলা থেকে রপ্তানি করা হতো। এর গড় ছিল ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত ৫,৬০,২৮৩ পাউন্ড।[৮০] নানা রকম উত্থান-পতন সত্ত্বেও বাংলার কাঁচা রেশম রপ্তানি বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত চালু ছিল।[৮১]

বাংলায় প্রচুর পরিমাণে রেশমবস্ত্রও উৎপাদন হতো। সেগুলোও ইউরোপে রপ্তানি করা হতো। ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ৩,২৬,০০০ এবং ৩,৯০,০০০ খন্ড করা রেশমবস্ত্র আমদানি করা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। সেগুলোর অধিকাংশই পুনরায় অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের রেশমবস্ত্রের চাহিদা ছিল ইউরোপের বাজারে। যেমনঃ বন্দনা বা ছাপানো ভারতীয় রুমাল ফ্রান্সে ব্যাপক চাহিদা ছিল। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে শুধু ফ্রান্সেই ১,৭৪৫০০ পাউন্ড মূল্যের বন্দনা রুমাল

রপ্তানি করা হয়েছিল। আসামের মুগা সুতা দিয়ে তৈরি ঢাকার কাসিদারও ভালো কদর ছিল। সচরাচর মুসলমানরা এই বস্ত্র ব্যবহার করত। আরব এবং তুরস্কে এর চাহিদা ছিল। ঢাকা, ভাগলপুর, বাঁকুড়া ও মালদহে বাফতা নামের তসর ও তুলামিশ্রিত বস্ত্র বয়ন করা হতো। ডক্টর বি. হ্যামিল্টনের হিসাব অনুসারে, ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে মালদহ তেকে রপ্তানি করা বস্ত্রের মূল্য ছিল ২,৫০,০০০ টাকা বা ২৫,০০০ পাউন্ড। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৬,০০০ টাকা বা ৬০০ পাউন্ড। মুর্শিদাবাদের চিত্রও ছিল একই রকম। বিশ শতকের শুরুতেও রেশম শিল্প টিকে ছিল বর্তমান এ শিল্প। কিন্তু মসলিনের মতো বিলুপ্ত হয়ে না গেলেও রেশম শিল্পের সোনালি সুদিন আর ফিরে আসেনি।[৮২]

১.১৪ ব্রিটিশ নথিপত্রে তাঁত শিল্পের বিবরণ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মুঘল আমলে প্রধান তাঁত শিল্পের ব্যবসার আকর্ষণে নানা জাতির বণিকদের সমাবেশ ঘটেছিল বাংলায়, বিশেষতঃ ঢাকায়। বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকায় কুঠি নির্মাণ করেছিল ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিল ও কাগজপত্র বাংলার তাঁত শিল্পের ইতিহাস রচনার একটি বড় উৎস। এছাড়াও ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় ও অন্যান্য জাতিগুলো ভিন্ন নামে নিজস্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি করেছিল। তাদের দলিল ও নথি থেকেও অনেক তথ্য জানা যায়। সতেরো-আঠারো শতক থেকে বাংলার তাঁত শিল্পবিষয়ক তথ্যের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাগজপত্র (প্রতিবেদন, চুক্তিনামা, দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদি) বিশেষ সহায়ক। পরবর্তীকালে বৃটিশ সিভিলিয়ানদের লেখা থেকেও অনেক তথ্য জানা যায়। এসব বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুঘল আমলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েক ধরনের মসলিন তৈরি হতো। এগুলোর মধ্যে বিখ্যাত ছিল সোনারগাঁও, তিতাবাদী, জঙ্গলবাড়ী, ধামরাই ও বাজিতপুর। এসব স্থানে বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল। সতেরো শতকে এসব তাঁতীর সংখ্যা নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় শুধু ঢাকা জেলাতেই বস্ত্রবয়ন শিল্পের সাথে জড়িত ছিল ১,৪৬,৭৫১ জন। এর মধ্যে ২৫,২০০ জন ছিল তাঁতী এবং ৮০,০০০ জন সুতা কাটার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে সময় বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে তুলা থেকে সুতা কাটার রেওয়াজ ছিল। রবার্ট ওরমি এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, 'করমন্ডল উপকুলে বা বাংলায় "সদর" রাস্তা বা কোনো প্রধান শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এমন কোনো গ্রাম পাওয়া কঠিন ছিল, যেখানে প্রত্যেক নারী, পুরুষ এবং বালক-বালিকা একখন্ড কাপড় তৈরীতে নিয়োজিত নেই।'[৮৩]

১.১৫ বস্ত্র বাণিজ্য ও পর্তুগিজ বণিক

মুঘলযুগে ঢাকায় তথা বাংলায় বিভিন্ন দেশের বণিকের সমাগম ঘটেছিল। তবে বাংলায় পর্তুগিজদের মাধ্যমেই ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটেছিল এবং তারা শুরুতে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে সাতগাঁওয়ের কাঁথার সঙ্গে পর্তুগিজ বণিকদের নাম যুক্ত। সাতগাঁও বা

হুগলি অঞ্চলেরবেঙ্গালা বা সাতগঞ্জ কাঁথা একসময় ইংল্যান্ডে ও পর্তুগালে খুবই সমাদৃত ছিল। সে সময়ে পর্তুগিজরা বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। যদিও তারা বাণিজ্যে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। ক্রমে তারা এই ভূমিকা থেকে সরে যায় এবং অত্যাচারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বাংলার সুবাদার হুগলি থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। এছাড়া ওলন্দাজরা ইংরেজদের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে তারা পিছু হটে বলে অনেকে মনে করেন। পর্তুগিজদের বিতড়নের মাধ্যমে সাতগাঁওয়ের কাঁথার বাণিজ্যেরও অবসান ঘটে।

১.১৫.১ বস্ত্র বাণিজ্যে ওলন্দাজ বণিকগণ

ওলন্দাজরাও প্রথমে পিপলি বন্দরে, পরে বালেশ্বরে এবং পরিশেষে চুঁচুঁড়ায় হুগলি নদীর তীরে বানিজ্যকুঠি স্থাপন করে। তেজগাঁও এলাকায় ওলন্দাজরা বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। এরপর বুড়িগঙ্গার তীরে তারা একটি কুঠি নির্মাণ করেছিল। ঢাকার মসলিন রপ্তানিতে ওলন্দাজদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।[৮৪] টাভারনিয়ারের বিবরণে ওলন্দাজ বণিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার সাথে ওলান্দাজদের বাণিজ্য চললেও তারা এ দেশ থেকে বস্ত্র পণ্যের চেয়ে শোরা (saltpetre) ও আফিম সংগ্রহে বেশি মনোযোগী ছিল। তারপরও ওলন্দাজরা বাংলা থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সাতান্ন হাজার, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঊনআশি হাজার এবং ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে একান্ন হাজার বস্ত্রপণ্য আমদানি করেছিল।[৮৫] কোম্পানি আমলের শুরুতেও এই আমদানি অব্যাহত ছিল।

১.১৫.২ ফরাসিদের বস্ত্র ব্যবসা

ফরাসিরাও বাংলার তাঁতবস্ত্র রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঢাকা শহরে তাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি ছিল তেজগাঁওয়ে। তাইফুর এর মতে, সেটা ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করা হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে তারা তাদের কুঠি কুমারটুলিতে স্থানান্তর করে। তারা একটি গঞ্জ বা বাজার স্থাপনের অনুমান পেয়েছিল ঢাকা নায়েবে নাজিমের কাছ থেকে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি ফেগুগঞ্জে নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ঢাকার ফরাশগঞ্জ নামটি আজও তার স্মৃতি বহন করছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ঢাকায় ফরাসি বাণিজ্য কুঠির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা কুঠি ত্যাগ করে চলে যায়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে তারা আবার ফিরে এসেছিল।[৮৬]

১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের পর ফরাসিরা পুনরায় বাংলায় ব্যবসা শুরু করে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ল' অরিয়েন্টে বাংলায় উৎপন্ন যে বস্ত্রের বিকিকিনি হয় তার মূল্য ছিল বেঙ্গল ক্যালিকো পাঃ ১৪৩,৭৪৮ এবং বাংলায় উৎপন্ন মসলিন পাঃ ৩,১৮,৩৪৩।[৮৭]

এছাড়াও মুঘল, পাঠান, ইরানি, তুরানি ও আর্মেনিয়ান বণিকেরা বাংলার তাঁতবস্ত্র রপ্তানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের বিবরণে সেটা পরিষ্কার দেখা গেছে। পাশাপাশি স্থানীয় বণিকদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশরা শুরুতে হুগলি থেকেই বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের অনুমতি লাভের পর ঢাকায় তারা একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করা হয়। সেটাও ছিল তেজগাঁও এলাকায়। পরে সেটা স্থানান্তর করা হয় বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকেই ইংরেজ বণিকেরা বাংলার শাসক হয়ে যায় এবং তখন থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ক্রমশ বৃটিশ বেনিয়ারাই বাংলায় তাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে এবং অন্য বিদেশি বণিকেরা তো বটেই, এমনকি ভারতীয় বণিকেরাও প্রতিযোগিতায় বৃটিশদের কাছে টিকতে পারে নি।

১.১৬ আমেরিকার সাথে বস্ত্র বাণিজ্য

দেখা যায় সমসাময়িককালে ইংল্যান্ডের পাশাপাশি আমেরিকার সাথে বাংলার বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম তার *American Trade in Bengal* গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

> Bengal Textile industry was declining fast in the wave of the foundation of the colonial state, and it was due to government policy of stifling the market forces. Wearers were brought undergarment control and piece-goods merchant class, who formerly acted as suppliers, was eliminated. The report incidentally mentioned that about six million people drew living directly or indirectly from the meanly and allocate activities in the 1780s and they faced extinction due to government'sinterference in the piece goods production.[৮৮]

ইউরোপের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সুতিবস্ত্র রপ্তানি করা হতো। নিম্নে সারণির মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

সারণি ১.৪: কোলকাতা বন্দর থেকে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাতে রপ্তানি করা সূতিবস্ত্র

বছর	ইংল্যান্ড	আমেরিকা	মোট
১৭৯৫-৯৬	১৯৮,৭৫০	৪৩৪,৪১২.৫০	২,১২২,০৮৯
১৭৯৬-৯৭	১৬২,১৯৫	৫২২,৬৯২	১,৭১২,২৪৭
১৯৯৭-৯৮	১৬১,২৭৬	৪৫৭,৯৪৫	১,৪৬৬,১৪২
১৯৯৮-৯৯	১৭৭,১৯৭	২৩৯,৯২৮	১,৪৫৪,৪৬৩
১৯৯৯-১৮০০	৩০৫,১১৯	৭৭৬-৯১৯	৩,০২৬,২৫৩
১৮২৩-২৪	১০৬,৫১৬	৩৮,৪৪০	২,১৮৯,৯২৬
১৮২৪-২৫	১৬৭,৫২৪	১২৩,৭৪৮	১,৫৪৩,০৯৫
১৮২৫-২৬	১১১,২৯৫	১৪৬,১৮৪	১,২৫৬,৫৭৩
১৮২৬-২৭	৪৭,৫৭২	২১,৬৪৮	৯৭০,৮৫৮
১৮২৭-২৮	৫০,৬৫৪	১০,৫২১	৮১৯,১৭০
১৮২৮-২৯	৩২,৬২৬	২৩,৭৮০	৬৯৫,৭২৫
১৮২৯-৩০	১৩,০৪৩	৩,৭৭১	

Source: Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. 1 (New Delhi, 1961), p. 264.

১.১৭ বৃটিশ তাঁতীদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া, সরকারের আইন প্রণয়ন এবং বস্ত্র ব্যবসা সংকোচন

বাংলার তাঁতবস্ত্র বিপুল পরিমাণে ইংল্যান্ডের বাজার দখল করলে বৃটিশ তাঁতীদের ভেতর এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, ব্রিটেনে তখনো তাঁত শিল্প তেমন একটা বিকশিত হয়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য বণিকের মাধ্যমে প্রধানত বাংলা থেকে রপ্তানি হচ্ছিল ব্যাপকভাবে। যার ফলে ইংল্যান্ডের নিজস্ব তাঁতীদের কর্তৃক উৎপাদিত বস্ত্র ব্যবসায় আঘাত করেছিল এবং তাদের তাঁত বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

'রেশমের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। প্রথম ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় স্পাইটেল ফিল্ডসের তাঁতীরা অভিযোগ করে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক পাকানো রেশম ও অন্যান্য চটকদার পরিধেয় বস্ত্র আমদানির ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে আইন প্রণীত হয়, 'এতদ্বারা এখন থেকে গ্রেট ব্রিটেনে পাকানো সিল্কের চুড়ি অথবা রেশম মিশিয়ে তৈরি কোন বস্ত্র পরিধান বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করা হলো'।[৮৯] হলেও অনুরূপ বিল পাস পার্লামেন্টের এই আইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানির বাণিজ্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই আইনের আওতায় ব্রিটেনের বাজারটি হাতছাড়া হয়ে গেলেও বাংলা অঞ্চলের তাঁত শিল্পে তাৎক্ষণিকভাবে এর খুব বেশি প্রভাব পড়েনি। কেননা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশে বাংলার তাঁতবস্ত্র রপ্তানি অব্যাহত রাখে।

বৃটিশ তাঁতীদের প্রতিবাদের মুখে দেশটির পার্লামেন্ট ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে কয়েক জাতের 'ক্যালিকো' ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। মোটা মসলিন ও মিহি ক্যালিকোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এই আইনের জন্য কয়েক ধরনের মসলিনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিছুকাল পরে, ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট অন্য আরেকটি আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে ছাপা ক্যালিকো ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আইন অমান্যকারীদের জন্য তারা জরিমানা ও শাস্তির বিধান করে। বেইনস তার বিখ্যাত *'দ্য হিস্ট্রি অব কটন ম্যানুফ্যাকচার ইন গ্রেট ব্রিটেন'* (১৮৩৫) গ্রন্থে লিখেছেন,

> This prohibition took place by the Act 11 and 12 William lll. cap. 10., (1700) which forbad the introduction of Indian silks and printed calicoes for domestic use, either as apparel or furniture, under a penalty of €200 on the wearer or seller: and as this Act did not prevent the continuous use of the goods, which were probably smuggled from the continent of Europe. Other Acts for the same pupose were passed at a later date.[৯০]

এই দুটি আইনের কারণে ইংলান্ডে বাংলার রপ্তানির বাজার সীমিত হয়ে পড়ে। যদিও অন্যান্য দেশে রপ্তানি অব্যাহত থাকে। যেসব বস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা বৃটিশ সরকার জারি হয়নি, সেগুলো ওপর উচ্চ

কর ধার্য করা হয়। এই শুল্কের পরিমাণ ছিল শতকরা পনের ভাগ। এই চিত্র ছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখল করার পূর্ব পর্যন্ত। ১৭৬৫ খ্রিস্টব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর চিত্রটা ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে।

উল্লেখ্য, বাংলা থেকে মুঘল বাদশাহ ও নবাবদের জন্য নিয়মিতভাবে যে বস্ত্র পাঠানো হতো, তা আঠারো শতকের শেষ নাগাদ বন্ধ হয়ে যায়। আবদুল করিম তাঁর ঢাকাই মসলিন গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, এই সময় ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য বণিকের রপ্তানি অর্ধেকে নেমে এসেছিল।[৯১] আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের পর প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ইংল্যান্ডও মেশিনে তৈরি সুতা ও সুতিবস্ত্র বাজারজাত করতে আরম্ভ করে। ফলে বাংলার সুতিবস্ত্রের বাজার সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। উনিশ শতকের শুরুতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেও পরিস্থিতি বুঝতে পেরে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। বছর বিশেক পরে এর পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম হ্রাস পায়। সারণি ১.৩ এ তৎকালীন বাজার ব্যবস্থার চিত্রটি পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ১.৫: ১৮০২-০৩ এবং ১৮২১-২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুতি বস্ত্রপণ্যের গন্তব্যস্থল এবং রপ্তানিমূল্য (সিক্কা টাকা)

গন্তব্যস্থল	১৮০২-১৮০৩	১৮২১-১৮২২
লন্ডন	৬৪,৭০,২০২	৬,৪৬,৬৯০
লিসবন	২৪,৩৩,০৯২	৪,৪৭,৭১২
ক্যানডিজ	৩,৭৫,৭৮২	শূন্য
আমেরিকা	৪০,২১,৯৪২	৩,৪৯,১১৮
বাটাভিয়া	৮৭,০৫৯	শূন্য
ম্যানিলা	১,২৮,৪৮৬	৫,৩৯,৩৬৮
আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ	৮,৭৭,৯১৬	১৮,৩০,৫৮০
সুমাত্রা উপকূল	৬৮,৬০০	১,৯৩,৮০৫
মালাবার উপকূল	১০,৪২,৬৪২	১,৬২,৮৮৮
করমন্ডল উপকূল	২,৪৪,৩১২	৫৯,৩৭০
পেনাং এবং ইস্টওয়ার্ড	১৪,৭৪,৫৫৯	৬,৫৮,২৬৩
চীন	৪,৭২,৫৪৪	১৮,১৩৫
পেগু	১,১৮,১৯২	২৭,৪৬৫
মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ	১৪,০০৪	শূন্য
মরিশাস	৫,১০,৬৩৪	৫,২৫,৮৪৫
মাল্টা এবং জিব্রাল্টার	শূণ্য	৪,১৫,৫৩৮
ব্রাজিল	শূণ্য	১,৩০,৮৮৩
দক্ষিণ আমেরিকা	শূণ্য	৭,৫০,২৯৫
উত্তমাশা অন্তরীপ	শূণ্য	৩,০৩,৭২৯
জাভা	শূণ্য	৬,৬০,৮৫৫
নিউ সাইথ ওয়েলস	শূণ্য	৭৩,৫০৫
অন্যান্য স্থান	২,৫৪,৭০৯	শূণ্য
মোট	১,৮৫,৯৪,৬৭৬	৭৭,০১,৩১৯

উৎস: *India Office Records*, P/174/14; Bengal Commercial Reports, 1802-03, H, 1829-30, P/174/33, Ibid.1821-22[৯২]

সারণি ১.৫ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বিশ বছরের ব্যবধানে সুতিবস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে কমে গেছে। ১৮০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে যেখানে রপ্তানি করা সুতিবস্ত্রের পরমাণ ছিল ১,৮৫,৯৪,৬৭৬ টাকা, সেটা কুড়ি বছর পর হয়েছে ৭৭,০১,৩১৯ টাকায় দাঁড়ায়। রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গিয়েছিল ।

১.১৮ চ্যালেঞ্জের মুখে তৎকালীন অর্থনীতি ও তাঁতশিল্প

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠা আক্রমণ, পূর্বদিকে মগদের উৎপাত, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং নওয়াব ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা জটিল আকার ধারন করেছিল। ফসল উৎপাদন কম হওয়ায় খাদ্য ঘাটতির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি নেমে আসে এবং পরিণামে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময়টাতে বাংলায় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল তা নওয়াবদের ক্ষমতাকে পুরোপুরি দুর্বল করে দিয়েছিল; সাধারণ মানুষের কাজকর্ম ও জীবনযাত্রাকে হুমকীর সম্মুখীন করে তুলেছিল।

১.১৮.১ মারাঠা জলদস্যুদের আক্রমণ

মারাঠা আক্রমনের ফলে বাংলায় মারাঠা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তাদের উপুর্যপুরি আক্রমণ, হত্যাযজ্ঞ, লুণ্ঠন, অত্যাচার বাংলার সামাজিক অবস্থাকে অস্থির করে তুলেছিল এবং অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করেছিল। মারাঠারা তাদের আক্রমণের সময় পুন: পুন রাজস্ব দাবী করে নওয়াবের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছিল। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের পাশাপাশি নদীয়া, বীরভূম, বানকুরা, মিদনাপুর, রাজশাহী এবং বর্ধমান জেলার গ্রামগুলোতে মারাঠাদের লুটপাট ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাব আলীবর্দী খানের পাল্টা আক্রমণ বাংলার অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে আসে। পূর্বেকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়ে বিশাল সেনাবাহিনী পালন করা তখন নবাবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠে। মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নবাব শিখদের সাথে ব্যয়বহুল মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। শিখ নেতা রঘুজী ভনসেলের আক্রমণ প্রতিহত করা জন্য আলীবর্দী খান রঘুজীর বিরোধী নেতা বাজী রাওয়ের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করে তাকে ২২ লাখ রুপী প্রদান করেছিলেন। তন্মধ্যে নগদ ১২ লাখ রুপী এবং অন্যান্য কর প্রদানের বিনিময়ে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের প্রস্তুতির জন্য রাজকোষের অর্থে নবাব তার সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু এখন মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে বিশাল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যাওয়াতে জমিদার, নবাব এবং ব্যাংকাররাও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদন ও বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলার ব্যবসায়ীরাও মারাঠা আক্রমণের শিকার হয়েছিল। ইউরোপীয় বণিকরা ও ব্যাংকারগণ মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ব্যবসা করতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠেছিল। ১৭৪২ সালে মুর্শিদাবাদের ব্যাংকার জগৎ শেঠের বাড়ী হতে ২ কোটি রুপী লুট হয়েছিল। আলীবর্দী খানের অর্থ দাবীতে ভীত হয়ে ১৭৪৮ সালে পাটনার অর্থ ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থসম্পদ উত্তর ভারতে পাচার করে দেয়।[৯৩]এর ফলে অর্থনৈতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রা বাজার সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ঋণ ব্যবস্থায় বিশৃংখলা বাংলার বস্ত্র-শিল্প ও ব্যবসাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।

স্বাভাবিক সময়ে ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন চলতো। বাংলার বড় বড় শহর বা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে (আগ্রা, মুর্শিদাবাদ) এসব হুন্ডি ভাঙ্গানো যেতো। ব্যবসায়ীরা তাদের পরিচিত দালালদের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ বিতরণ করতো। দালালরা পাইকারদের মাধ্যমে তাতীদের নিকট হতে কাপড় সংগ্রহ করতো। কিন্তু বাংলার অর্থনৈতিক দূরাবস্থার প্রেক্ষিতে অগ্রিম অর্থ-প্রদানের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করা ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মারাঠাদের আক্রমণ ও হুমকীর কারণে উৎপাদন কাজের পরিবেশও অনুকূলে ছিল না।[৯৪]

১.১৮.২ অনিরাপদ পরিস্থিতিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা

এদিকে ১৭৪১ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দালালদের মাধ্যমে বস্ত্র পণ্য ক্রয় বন্ধ করে দেয়। যদিও কোম্পানি দাদন মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃংখলার কারণে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর জন্য দাদন বা অগ্রিম প্রথা বেশ ঝুকিপূর্ণ ছিল। সম্ভবত: এটা বুঝতে পেরেই পরবর্তীতে ওলন্দাজরা পণ্য ক্রয়ের জন্য গোমস্তা নিয়োগ করেছিল। ১৭৫০ এর দশক পর্যন্ত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি পণ্য ক্রয়ের এই পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। ইতিমধ্যে অবশ্য কোম্পানি নগদ অর্থে পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ-আলোচনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কারণ এই পদ্ধতিতে বাজারে তারা উৎপাদিত পণ্যের এক তৃতীয়াংশ অর্থ ব্যয় করতে রাজী ছিল। তাছাড়া পণ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না বলে ব্যবসায়ীরা পণ্য সংগ্রহের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব গ্রহন করতে রাজি ছিল না। অধিকন্ত উৎপাদনের ৮৫% অর্থ অক্টোবরের মধ্যে প্রদান না করিলে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে অস্বীকার করে।[৯৫] তারা শুধুমাত্র অগ্রিম টাকার সমপরিমাণ পণ্যের বিক্রয় দায়িত্ব নিত। তাদের যুক্তি ছিল স্বল্প পুঁজিতে পণ্যের দাম ও মান পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

মারাঠাদের কারণে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাও ভাল ছিল না। কেননা কোম্পানির কারখানাগুলো পণ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথভবে নিরাপদ ছিল না। মারাঠাদের আগমনে কোম্পানির লোকজন অসহায়হয়ে পড়েছিল তা বিভিন্ন কারখানা প্রধানের লিখিত চিঠি হতে বুঝা যায়। কেননা ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদের কাগরামা এবং বর্ধমানের মোগ্রামে মারাঠারা ওলান্দাজ কারখানাগুলো লুটপাট করে জ্বালিয়ে দেয়।[৯৬]

কোম্পানির লাভজনক ব্যবসার জন্য এ অবস্থা মোটেও ভাল ছিলা না। ১৭৪৮, ১৭৪৯, ১৭৫৩ এবং ১৭৫৪ সালের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার কারণেই পণ্য সরবরাহে ঘাটতি ছিল। ১৭৫২ সালে কোম্পানির কারাখানা সমূহ মাত্র ৮,০০০,০০০ রূপী মূল্যের বস্ত্রপণ্য সংগ্রহ করেছিল অথচ ১.৫১ মিলিয়ন রূপীর মূল্যের কাপড়ের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছিল।[৯৭]

কোর্ট অব ডিরেক্টর এর রিপোর্টে জানানো হয়েছিল যে, স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের কারণে কাপড়ের মান ভাল হচ্ছিল না। ১৭৪৭ থেকে ১৭৫১ সালের মধ্যে ঢাকা, বালাশুর, কাশিমবাজার এবং মুর্শিদাবাদের আবাসিক বাণিজ্যক প্রতিনিধিরা তাদের বিবরণীতে এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেছিল যে, নবাব যদি মারাঠাদের পরাজিত করতে না পারেন, তাহলে হয়তো কোম্পানির কারখানাগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিতে হতে পারে।[৯৮]কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট একের পর এক এই মর্মে চিঠি এসেছিল যে, মারাঠা আক্রমণের কারণে তাঁতীরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং পণ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। মারাঠা আক্রমনের ভয়ে বালাশুর, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার আড়ং এলাকাসমূহ হতে তাঁতী, পরিছন্ন কর্মী ও অন্যান্য কারিগর কোম্পানির কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে পালিয়ে চলে যায়।[৯৯]

> "Sometimes in these conditions the protected factories appeared to be a refuge, for artisans brought their looms and took shelter there until the Maratha danger had passed."[১০০]

কারিগররা নিরাপদে জীবিকা নির্বাহ করা যায় এমন কাজকেই অধিক যৌক্তিক মনে করছিল। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে কাঁচামালের দামও বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৫৩ সালের এক বিবরণীতে দেখা যায় যে, তুলার দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি পাউন্ডের দাঁড়ায় ২২ অথবা ২৩ রুপীতে। নৌ-চলাচল বাধা গ্রস্থ হওয়াতে চাল এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের দাম তিন-চার গুন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৭৫৩ সালে বালাশুরের তাঁতীরা কাঁচা মালের অধিক মূল্য এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কম হওয়ার কারণে তাদের কাজ অব্যাহত রাখতে অস্বীকার করে।

১৭৬০ সালেও মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করে। নবাব মারাঠাদের কর দিতে অস্বীকার করলে তারা বালাশুর, মেদেনীপুর আক্রমণ করে এবং প্রায় তিন মাসব্যাপী বর্ধমানে অবস্থান করে জনগণের উপর জুলুম, নির্যাতন, চালালে জনগণ কাজকর্ম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এর আগে মারাঠারা একচেটিয়া ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদানের শর্তে কোম্পানির সাথে নবাবের বিরুদ্ধে মৈত্রি স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোম্পানি এ বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা না করায় ১৭৬৫ সালে মারাঠারা কোম্পানির নিকটও কর দাবি করে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ শুরু হতো এবং তা পুরো শীতকাল ব্যাপী স্থায়ী থাকতো। ফলে এই সময় গ্রামাঞ্চল আড়ং কারখানা ও বাজারের মধ্যে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটতো। গ্রামবাসীরা নিরাপত্তার জন্য কাজ ছেড়ে চলে যেতো এবং মারাঠারা ফিরে যাবার পর পুনরায়

গ্রামে ফিরে আসতো। মারাঠারা বংলায় কি পরিমাণ ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তার কিছুটা বিবরণ সমকালীন বাংলা সাহিত্য, লোক কাহিনী এবং ঐতিহাসিক বিবরণ হতে জানা যায়।

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর পাশাপাশি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লিপ্ত ছিল। ইউরোপের সামরিক যুদ্ধ বাংলায় বাণিজ্যিক যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। মোগল ফরমান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অনুকূল ব্যবসায়িক সুবিধা দান করলেও সেইসব সুবিধা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হয়। এটা যখন পরিস্কার হয়ে উঠল যে, রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তির মাধ্যমেই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যে টিকে থাকতে হবে তখনই প্রতিটি ইউরোপীয় কোম্পানি নিজেদের সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ নিতে থাকে এবং নবাব বিরোধী দল ও গোষ্ঠীকে সমর্থন দান করে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একজন ব্যবসায়ীকে অন্য একজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল। সর্বশেষ সম্মুখ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল ফরাসী, ওলন্দাজ এবং বৃটিশদের মধ্যে। ১৭৫৯ সালে ইংরেজরা ওলন্দাজদের ব্যবসা কেন্দ্র দখল করে নেয়। ওলন্দাজদের প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র চিনিশুরা তাদের হাতে থাকে। ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য ওলন্দাজরা সামরিক শাক্তি বাদ দিয়ে আস্তে আস্তে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১.১৮.৩ ফরাসী ব্যবসায়ীদের দুরাবস্থা

১৭৫৬, ১৭৬৩ এবং পুনরায় ১৭৭৮ হতে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ইউারোপে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার প্রভাব বাংলায় এ দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজদের পক্ষে যাওয়ার কারণে ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য কোনমতে টিকে ছিল। ১৭৬৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ফরাসীদের ব্যবসা পুন:জীবিত হলেও বৃটিশরা প্রতিক্ষেত্রেই ফরাসীদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে। ১৭৬৫ এবং ১৭৭৩ সালে ইংরেজ কোম্পানির নির্দেশে বালাশুর ও ঢাকায় ফরাসীদের কারখানাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফরাসী ব্যবসায়ীদেরকে পণ্য ক্রয়ে তেমন কোন বাধা দেয়া হয়নি। ১৭৬৯ সালে ফরাসী কোম্পানি 'ডেজ ইন্ডেজ অরিয়েন্টাল' বিলুপ্ত করে দেয়া হয় এবং এর ব্যবসায়ীক কর্মকান্ড ব্যক্তি মালিকনাধীন প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যায়। ভারতীয় শাসকেরা ফরাসীদেরকে ফরমান ও পরোয়ানা রূপে যেসব ব্যবসায়ীক সুবিধা দান করেছিল সেগুলো ভোগ ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা মূলত: বৃটিশদের হাতেই ছিল। ১৭৮৩ সালের শান্তি চুক্তির মাধমে ইংরেজ-ফ্রান্স বিরোধ মিটেনি। যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করলো ফরাসীদেরকে বাংলায় ব্যবসা ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কোন কারণ নেই। যাহোক অবশেষে ১৭৮৬ সালে ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল ও কলকাতা কাউন্সিল এবং মরিসাসস্থ ফরাসী গর্ভনর জেনারেলের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রান্স এবং বৃটিশ সরকার উভয়ই চুক্তির শর্তাবলী অনুমোদন করে। ১৭৮৫ সালে

‘কোম্পানি ডেজ ইন্ডিজ’ নামে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ফরাসী কোম্পানি বাংলায় তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা করছিল। নতুন এই ফরাসী কোম্পানি বস্ত্রপণ্য ক্রয়ের জন্য ফ্রান্স থেকে মুদ্রা আমদানি করলেও ব্যবসা ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা আংশিকভাবে দায়ী হলেও বস্তুত শক্তিশালী রাজনৈতিক ভিত্তির অভাবই এই ব্যর্থতার কারণ ছিল।

১.১৮.৪ বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র প্রভাব

বস্ত্রশিল্পে একচেটিয়া আধিপত্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা হতে রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করতে এবং বৈদেশিক বাজারগুলোতে পর্যাপ্ত মুনাফা লাভের সুযোগ এনে দিয়েছিল। এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য কোম্পানির দরকার ছিল পণ্য সরবরাহের উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা।এ পর্যায়ে কোম্পানির প্রতিনিধিরা তাঁতীদেরকে দরকষাকষি হতে বিরত রাখতে এবং অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাঁতীদের সীমিত লেনদেনে বাধ্য করতে সক্ষম হয়। হামিদা হোসেন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, “As it excused civil jurisdiction over market area, the activities of rival traders were restricted.” [১০১]

অন্যান্য কোম্পানি একইভাবে তাদের নিজস্ব কারখানা ও আড়ংসমূহে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালালেও বৃটিশদেরকার্যকরী ব্যবসায়িক প্রভাব এলাকাজুড়ে ছিল ব্যাপক। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ কোম্পানি পূর্বে কখনোই একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য লাভে সফল হয়নি কিন্তু এই অঞ্চল জুড়ে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করার ফলে বাংলার অন্যান্য ব্যবসায়িদের কর্মকান্ডকে সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার সক্ষমতা অর্জন করেছিল। বস্তুত: এর মাধ্যমে এমন শর্তাবলী তাঁতীদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল যেগুলি শুধুমাত্র কোম্পানির স্বার্থেই ছিল।

১.১৮.৫ নবাব এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বন্দ্ব

বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য শেষ পর্যন্ত কোম্পানি বাংলার নবাবের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পলাশী ও বক্সার যুদ্ধের রাজনৈতিক গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, এ দুটি যুদ্ধের মধ্যদিয়ে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার রাস্তা সহজ হয়ে যায়। নবাব সিরাজ উদ-দৌল্লা এবং মীরজাফর ইংরেজদের ব্যবসা করার বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তারা ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা অন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা সমান ভাবে ভোগ করবে। ফলে রাজকোষ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হবে এবং দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুন ভেঙ্গে পড়বে। কোম্পানির কারখানাসমূহ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের প্রতিরক্ষার জন্য কোম্পানির বল প্রয়োগনীতির ফলে মীর কাশিমের সাথে সম্পর্ক তিক্ত করে তুলে। কোম্পানি উপলব্ধি করে যে তারা পূর্ব তুলনায় শক্তিশালী। সুতরাং কোম্পানির একচেটিয়া অধিপত্য প্রতিষ্ঠার অবস্থা থেকে সরে আসার প্রশ্নই উঠেনা।

> When Nawab Sirajuddaula tried to negotiate peace through the French in 1757, the company demanded terms which could only be held by a territorial power: to protect its trade, it reserved the right to erect fortifications at its factories, it asked for restoration of all rights, privileges and immunities in trade, and permission to set up a mint.[১০২]

নবাবের প্রতি কোম্পানির আচার-আচরণ হতে বুঝা যায়, বাংলায় তাদের অবস্থান কতটা শক্তিশালী ছিল। এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে, কোম্পানি নবাবকে একজন সরকার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও কোম্পানি নবাবের কর্তৃত্বকে স্বীকার করবে না। নবাব এবং কোম্পানির মধ্যে বিরোধের মূল কারণটি ছিল যে, কোম্পানি শক্তি প্রয়োগ করেব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে নবাব চেয়েছিলেন কোম্পানির প্রভাব হ্রাস করতে। মীর কাশিম বিভিন্ন সময় তাঁতীদের উৎপাদিত পণ্য জোড় পূর্বক কেড়ে নেয়ার জন্য কোম্পানি কর্মকর্তাদের দায়ী করেন। কোম্পানির কার্গো পাহাড়া দেয়ার জন্য সিপাহী মোতায়েনের বিষয়টিও নবাবের নিকট গ্রহণযাগ্য ছিল না।

নবাবের কর্মচারী ও কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ পরোক্ষভাবে বাংলার বস্ত্র শিল্পের ক্ষতি করেছিল। ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম এবং পাটনায় স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মচারীরা জোরপূর্বক কোম্পানির মাল বোঝাই নৌকা থামিয়ে তদন্ত করে। রংপুর এবং দিনাজপুরের আমিনরা কোম্পানির দালাল এবং পাইকারদের নিকট হতে অতিরিক্ত কর আদায় করতো। পণ্য সরবরাহে অধিক বিলম্ব হওয়ার ফলে সময়মতো জাহাজ ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারেনি। ব্যবসা বাণিজ্যের শর্তাবলী নিয়ে নবাব ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলেও তাতে কোন ফল হয়নি। নবাব মীর কাশিম ছিলেন অদম্য। তিনি কোম্পানির ব্যবসায়ীদের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সমান অবস্থায় নিয়ে আসার জন্য সকল কর সুবিধা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বৃটিশ কোম্পানি নবাবের পদক্ষেপকে ক্ষতিকর মনে করে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নবাব মীর কাশিম ক্ষমতা হারান। অন্যদিকে তাঁর পরাজয় কোম্পানিকে বাংলায় শক্তিশালী প্রশাসনিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতে বৃটিশ শক্তির উত্থানে বক্সার, পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বের দাবী রাখে। বক্সার যুদ্ধ ইংরেজদের শুধু বঙ্গদেশেই দৃঢ়তা দান করেনি বরং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানি বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে। অন্য দিকে নতুন নবাবের দায়িত্ব ছিল কেবল বিচার ও শাসন কার্য পরিচালনা করা।

১.১৮.৬ বাংলায় দুর্ভিক্ষে তাঁত শিল্প

প্রচীনকাল থেকে বাংলা খাদ্য-শস্যে উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এখানকার উদ্বৃত্ত ফসল ভারতের অন্যান্য অংশে রপ্তানি করা হতো। কিন্তু ১৭৬৯-৭০ এবং ১৭৮৭-৮৮ সালে অস্বাভাবিক বৈরী আবহাওয়া ও

ইংরেজ শোষনের কারণে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। কোম্পানি জনগণের দুর্দশা লাঘবের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[১০৩]উপরন্তু কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ন ও অর্থলোভী কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থোদ্বারের জন্য এ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল। তারা চাল গুদামজাত করে পরে তা চড়া দামে বিক্রি করে বিদেশে পাচার করে। দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া সত্ত্বেও জনগণ খাজনা পরিশোধের দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়নি। কর্মচারীরা জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করতো।

জলবায়ুর উপর নির্ভরশীলতা বাংলার কৃষকদেরকে বেশি অসহায় করে তুলেছিল। চাষাবাদ ভাল হলে চাষীরা তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার সংগ্রহ করতে পারতো। পরবর্তী মৌসুমের ফসলের জন্য বীজ সংরক্ষণ করতে পারতো এবং উদ্বৃত্ত অংশ বাজারে বিক্রি করতে পারতো। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে অধিকাংশ সময়ই বাংলার কৃষকরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তো। অপর্যাপ্ত চাষাবাদের অর্থ হলো-কম খাওয়া এবং কম বিক্রি কর। চাষাবাদ খারাপ হলে কৃষকদেরকে বাজার থেকে খাবার কিনতে হতো। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য শস্যের অপ্রতুলতার কারণে বাজারে খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল কম এবং দামও ছিল বেশি। ফলে কৃষকদের পক্ষে বাজার থেকে খাবার ক্রয় করা ছিল কষ্টকর। কিন্তু যেসব তাঁতী-কারিগরদের অতি সামান্য জমিজমা ছিল এবং যাদের একমাত্র উপার্জনের উৎসছিল কাপড় বোনা, তাদের পক্ষে উঁচ্চ মূল্যে বাজার থেকে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব ছিলনা। ১৭৭২ সালের ৩রা ডিসেম্বর রাজস্ব বিভাগের এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে,

> The morality was most among the workmen, manufacturers and people employed on the rivers, who were without the secure means of laying by stores of grain as the husbandmen.[১০৪]

অত্যাধিক দ্রব্য মূল্যের কারণে তাঁতীদের খাদ্য শস্য ও কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে তারা বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি করতে সক্ষম ছিল না। তাঁতীদের বেকারত্ব পরিস্থিতিকে আরো দুর্বিসহ করে তুলেছিল। সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় ছিল বাংলার মেয়েরা। একটি বিরাট সংখ্যক নারী-কর্মী ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে মারা যায়।[১০৫]

১৭৭০ সালের মধ্যে ফসলের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেও ফসল ঘরে তুলার জন্য পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব ছিল। সাধারণ বছরগুলোতেই নদীয়ার মত শুস্কাঞ্চলে শ্রমিকের অভাব ছিল। সেখানে শ্রমিকের তখন বিশ বিঘা জমির মধ্যে কেবল মাত্র পাঁচ বিঘা জমির ফসল কাটার মত প্রয়োজনীয় শ্রমিক ছিল। রাজশাহীর একটি গ্রামে দুর্ভিক্ষের আগে ১২৬৭টি বাড়ী ছিল; দুর্ভিক্ষের পর সেখানে বাড়ীর সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২১২টি।[১০৬]

অবশ্য দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাংলার সর্বত্র সমান ছিল না। পূর্বাঞ্চলে খাদ্য শস্যের অভাব ততটা অনুভুত হয়নি। কিন্তু খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে খাদ্য-শস্য স্থানান্তর করা কঠিন ছিল। খাদ্য-শস্য পাঠানোর ব্যবস্থা ভাল থাকলে হয়তো দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় খাদ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব হতো।[১০৭]

১.১৮.৭ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সংকটে তাঁতশিল্প

১৭৮৩-৮৪ সালে তাঁতীদের ঠিক কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বন্যা এবং ঝড় একমাত্র দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল বলে ১৭৮৭-৮৮ সালের দুর্যোগ ঐতিহাসিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। এতদসত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য ঘাটতির ফলে এই দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব ছিল ব্যাপক। দুর্যোগের বিস্তারিত বিবরণ বোর্ড অব ট্রেড এবং কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট পাঠানো হয়েছিল। এ বিবরণ হতে খরার কারণে মনুষ্য জীবন এবং বস্ত্র শিল্পের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার একটা খন্ডিত চিত্র পাওয়া যায়। ১৭৮৭ সালের নভেম্বর কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে বন্যা এবং সাইক্লোনে ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, মালদা, শান্তিপুর, বারুন এবং চট্টগ্রামে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, প্রায় এলাকাতেই উৎপাদন কার্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত তাঁত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দুর্যোগের পর খাদ্য-শস্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাতে দুর্ভিক্ষের মতোই মনে হয়েছিল। এই খারাপ অবস্থা মাসের পর মাস চলতে ছিল।

১৭৮৭ সালে তৈরি প্রতিবেদন হতে অতি বৃষ্টি এবং মারাত্মক ঝড়ে ঢাকাতে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় এভাবে “The manufacturers have had their houses thrown down, their looms spoiled, their work interrupted, and from the damage done to the rising crop of grain, . . . scarcity, dearness and even famine have been felt in different parts and at Dacca in a very distaining degree among the lower people.”[১০৮] তুলা শস্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং চাল ও লবণের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৭৮৮ সালের আগস্টের মধ্যে বোরো ধান না আসার ফলে শস্যের দাম আরো বেড়েছিল। পণ্য-দ্রবের দামের হঠাৎ উঠা-নামা করাতে তাঁতীদের মজুরীর পরিমাণ সমন্বয় করা যায়নি। তাঁতীরা তাদের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ পোষানোর জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের উচ্চ মূল্য দাবী করেছিল। তাঁতীদের অনুরোধ রাখা হয়নি এর স্বাভাবিক ফল ছিল পণ্যের মানের নিম্নগতি।[১০৯]

১৭৮৮ সালের মে-জুন মাসের প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় গরীব মানুষদের উৎপীড়ন করেই চলছিল। ঢাকাস্থ আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির ভাষায় “My anxiety for the early realization of the investment is very great; from the scene of misery I frequently see and the tales of distress that my station causes me to hear, it is

perhaps greater than what you can have any idea of.... The dearth continuous and seems to increase."[১১০] চাল এবং তুলার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে কাপড় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁতীরা বস্ত্র উৎপাদনে সুতার পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার কারণে কাপড়ের মান খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত কার্পাস তুলার অপ্রতুলতা এবং সুতা তৈরীর কারিগরের স্বল্পতার কারণেই এ রকম হয়েছিল। ১৭৮৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে মালদহে তুলার দাম ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বন্যার প্রভাব বেশি পড়েছিল নিম্নাঞ্চলের পরগরনাগুলোতে। এসব এলাকার কৃষকদের গরু-বাছুর পানিতে ডুবে মারা যায়। গ্রামবাসীরা উচু এলাকায় যাবার জন্য তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করেছিল। এমনকি সিলেট, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম, চট্টগ্রাম, ময়মংনসিংহ এবং কুমিল্লাতেও খাদ্য শস্যের তীব্র অভাব অনুভূত হয়েছিল। বেকারত্ব এবং নিম্ন মজুরীর কারণে তাঁতীদের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছিল। ফলে বহু তাঁতী তাদের পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

খাদ্য শস্য উৎপাদন না হওয়াতে জমিদাররা বীজ সংরক্ষণ করতে এবং তাদের প্রজাদের কোন অগ্রীম ঋণ দিতে পারে নি। কৃষি মজুরের স্বল্পতাও ছিল ভূমি চাষাবাদ না হবার আরেকটি কারণ। এই রকম পরিস্থিতিতে ১৭৭০ সালে দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, তিরহুত এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র এলাকার জমিদাররা ভূমি খাজনা মওকুফের জন্য রাজস্ব বিভাগে আবেদন করে কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল জমিদারদের এসব আবেদন নামঞ্জুর করে দেয়। তবে ১৭৮৭-৮৮ সালের দুর্ভিক্ষের পর রাজমহল, পুরেগ, রাঙ্গামাটি, সিলেট এবং চট্টগ্রামের জমিদারদের খাজনা মওকুফের আবেদন গৃহীত হয়।

খাজনা আদায়ে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে আস্তে আস্তে ভূমির মালিকানা ও ভোগ দখলের মেয়াদে পরিবর্তন আসে। নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং চাষাবাদের সমস্যার ফলে জমিদাররা ভূমি বিক্রয় করতে শুরু করে। এর ফলে একটি মধ্যবর্তী ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে উঠে। দুর্ভিক্ষের পর ভূমি চাষাবাদের জন্য ব্যাপক আকারে ক্ষেত মজুরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে তাঁত কারিগররা জমি-শ্রমিকের চাহিদা মেটাতে সাড়া দেয়। তারা ঋণ হতে বাঁচার জন্য এবং বাড়তি মজুরী পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিনের লালিত কাজ ছেড়ে হাতে লাঙ্গল নিতে বাধ্য হয়।

১.১৮.৮ যুদ্ধ বিগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নেতিবাচক প্রভাব

১৭৩৮ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অধিকাংশ দেশী ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররা এ পরিস্থিতিতে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের মতো বড় বড় ব্যাংকিং হাউজগুলো কেবল নওয়াব ও কোম্পানির অর্থ যোগানদাতা হিসেবে তাদের অবস্থান ধরে রাখে। এক সময় এসব ব্যাংকিং হাউজগুলোর মালিকরা দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করেছিল কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। বিদেশী ক্রেতাদের সাথে বিশেষ করে ১৭৫৭ সালের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে দাদন ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ভাটা পড়ে।

কোম্পানির সামরিক বিজয় এবং বাংলায় প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পরেও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং পণ্য উৎপাদনের জন্য কোম্পানির পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল না। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভের অযোধ্যা বিজয় কিছু অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসলেও ১৭৮০-৩ সালে রোহিল্লা, ১৭৭৫ সাল থেকে মারাঠা এবং ১৭৮০-৮৩ সালে মহিশুরের সাথে হেস্টিংস এর সামরিক নীতি বাংলার অর্থনীতিতে মারাত্মক আঘাত বয়ে আনে। এসব যুদ্ধে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছিল তার বোঝা বাংলা প্রদেশকেই বহন করতে হয়েছিল কারণ অন্যান্য প্রদেশের বাড়তি কোন আয় ছিল না। শুধু রাজস্ব আয় থেকেই যুদ্ধের খরচ মেটানো হয়নি বরং ঋনপত্র বিক্রির মাধ্যমে যুদ্ধের খরচ মেটানো হতো।[১১১]

অর্থনৈতিক ব্যয়ের বোঝা বাংলার তাঁতী ও কৃষক সমাজকে বহন করতে হয়েছিল। আর্থিক প্রবাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি পুঁজি বাজারের ক্ষতি সাধন করেছিল। Hamida Hossain (1988) এর মতে, “without the assurance of adequate working capital, weavers were hard pressed to supply the export demand which emphasized regularity in production.”[১১২]

১.১৮.৯ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি

দুর্ভিক্ষজনিত কারণে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদনকারীদের ন্যায় সঙ্গত মুনাফা হ্রাস পায়। মুর্শিদাবাদে যেখানে ১৭৭০ সালের জুন পর্যন্ত এক রুপীতে ৬-৭ সের চাল পাওয়া যেতো সেখানে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে ১ রুপীতে ৩ সের চাল পাওয়া যেত।কাশিমবাজারে প্রতি রুপীতে ১৫ সের চাল মিলতো।[১১৩] ১৭৭১ সালের মধ্যে ধান-চালের ফলনে অগ্রগতি হলেও দামের স্বল্পতার কারণে চাষীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৭৭০ দশকের মাঝামাঝিতে খাদ্য শস্যের দামে স্থিরতা ফিরে আসে। ১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময় একই অবস্থা দেখা দিয়েছিল। ঢাকা ও লক্ষ্মীপুরে তুলার দাম ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। মালদাহে স্থানীয় এবং আমদানিকৃত পণ্যের দাম দ্বিগুণ হয়েছিল।

সমগ্র বাংলাব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল সেই প্রভাব হতে বাংলার গ্রামগুলো মুক্ত ছিল না। বস্তুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট গোলযোগের আগুন গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ডাকাতরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি জেলাতে দস্যু দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদাররা এসব ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। জমিদারদের যুক্তি ছিল-যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বিশৃংখলা ডাকাতদের উৎসাহিত করেছিল এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য জমিদারদের পুরনো প্রভাব আর কোন কাজে আসবে না। [১১৪]

১.১৮.১০ ফকির সন্ন্যাসী হামলা

১৭৪৩ থেকে ১৭৬৭ সাল পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসীদের হামলা একটি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফকিররা পাহাড় থেকে নেমে আসতো এবং স্থানীয় জমিদার, কৃষক এবং তাঁতীদের নিকট মোটা অংকের

অর্থ দাবি করতো। এসব ফকিররা স্থানীয় লোকজন ছাড়াও কোম্পানির কারখানার জন্যও বিরাট হুমকি ছিল। কোম্পানির শাসনাধীনেও সকল এলাকায় ডাকাতি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। একবার সন্ন্যাসীরা নিশ্চিতপুরের বৃটিশ কারখানায় হামলার হুমকি দিয়েছিল। ১৭৯৩ সালে মালদাহ থেকে খবর এসেছিল যে, সশস্ত্র ফকিররা শিল্প ও কৃষিকাজে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ থাকার কারণে কিভাবে তাঁতীরা বৃটিশ কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের সহযোগিতা পেত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। WW Hunter এর লেখনীতে তিনি বলেন,

> Some of these unfortified strongholds grew into important towns; and as one set of names tell of a time when the country seems to have been divided between robbers and wild beasts, so another, such as Tatli-parah (weaving village), disclose how the artisans and small merchants found protection by clustering together under the Commercial Resident's wing.[১১৫]

১.১৮.১১ বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেতিবাচক কর্মকান্ড

ইউরোপে বাংলার বস্ত্র শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের জন্য কোম্পানির যে পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা উচিৎ ছিল তা করেনি। উপরন্তু কোম্পানি ও কর্মচারীদের সাথে তাঁতীদের সম্পর্ক ভাল না থাকাতে কোম্পানির সে চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়নি। অধিক মুনাফা অর্জন ছিল কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য। কোম্পানির সমস্যা ছিল পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াই উৎপাদনের বিশেষ মান রক্ষার জন্য উৎপাদনকারীদের জোর করা। হামিদা হোসেন উল্লেখ করেন "Given the financial pressure following the reduction of bullion imports and an upward trend in prices this was an unrealistic objective."[১১৬]

হান্টারের লেখনির মাধ্যমে কোম্পানির কিছু সম্পর্কে জানা যায়। তিনি তাঁর *The Annals of Rural Bengal* গ্রন্থে *The* Company as a Rural Manufacture শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, The Records disclose the mercantile operations of the Company in full play. It managed its business according to two distinet systems: by covenanted servants who received regular pay, and invested the money entrusted to them without making any private profit; and by unsalaried agents, who contracted to supply goods at a certain rate, and might make what they could by the bargain.[১১৭] ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বিমুখী নীতির কারণে একদিকে যেমন তাঁতীদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে তেমনি কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ কমতে থাকে। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে ব্যবসায়িক স্বাধীনতা প্রদানের ফলে বৃটিশ উৎপাদনকারীরা তাদের যন্ত্র-তৈরি পণ্য দ্বারা ভারতীয় বাজার সয়লাভ করে দেয় এবং কোম্পানির বাণিজ্যে দ্রুত পতন শুরু হয়। প্রথমবারের মতো কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্প-

বিপ্লবের প্রভাব পুরোপুরি অনুভূত হয়। বৃটিশ কারখানাগুলো অনেক কম খরচে মসলিন জাতীয় বস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে এবং বৃটিশ উৎপাদনকারীরা বাংলার বস্ত্র পণ্য বর্জন করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ইউরোপীয় বাজারে ইংল্যান্ড এখন বাংলার সুতী পণ্যের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে। ১৮১৮ সালে ঢাকা এবং শান্তিপুরের কারখানায় ধস নামে। ১৮১৯ সালে পাটনা কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১৮২৫ সালের মধ্যে প্রায় সকল কারখানাতেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। আঠার শতকের শেষ প্রান্তে মসলিনের রপ্তানী অনেক কমে যায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ঢাকাই মসলিন ইউরোপে রপ্তানি হয় এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ঢাকাই মসলিন রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির বিলুপ্তি ঘটে এবং পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে কোম্পানির সকল বাণিজ্যিক কেন্দ্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রাইভেট ব্যবসা আরো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৩ সালের পর রপ্তানীমুখী বস্ত্র উৎপাদনকারী অধিকাংশ তাঁতই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী অর্ধশতক দেশীয় প্রয়োজনে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও অল্প কিছু আমদানিকারকগণদের প্রচেষ্টায় তাঁতশিল্প কোন মতে টিকে ছিল।

১.১৯ বাংলার তাঁতশিল্পের পুনরুত্থান

বিশ শতকের প্রথম দুই দশক ছিল বাংলার শিল্পজগতে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ।[১১৮] এই সময়ে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে বহুমুখী প্রচেষ্টা শুরু হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবি, জমিদার, দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী সকলেই আধুনিক শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। বিদেশী নির্ভরতা ত্যাগ করে স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য দেশের নেতারা আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১১৯] ১৯০৪ সনে যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ 'দ্যা আসোসিয়েশন ফর দ্য এ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজুকেশন' স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল এজুকেশন' স্থাপিত হয়। শুরু হয়ে যায় শিল্প স্থাপনের বিশাল আয়োজন। স্বদেশী যুগে বাংলা ব্যাঙ্ক ইন্সুরেন্স, কাপড়ের কল, বাষ্পীয় যানে পরিবহন কোম্পানি, সাবান, দেশলাই, ওষুধের কারখানা, রাসায়নিক ও চামড়ার কারখানা গড়ে ওঠে। বাঙালীর উদ্যোগে আধুনিক শিল্প স্থাপনের সূচনা বেশ ভালই হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য দেশের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনের অভাব ছিল না। স্বদেশীযুগে বিদেশী পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী বৃটিশ কর্মকর্তাদের রিপোর্ট গ্রহণের মানসিকতা নিঃসন্দেহে তৈরি হয়েছিল। চাহিদা বা বাজারের অভাব ছিল না।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল। বর্ধমান ও বাংলা প্রেসিডেন্সি বিভাগে বহু তাঁতি তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় ফিরে আসতে শুরু করেছিল। প্রেসিডেন্সি বিভাগে উৎকৃষ্ট শান্তিপুরী ধুতি ও শাড়ীর চাহিদা সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়াতে প্রচুর পরিমাণে কাপড়, চাদর ইত্যাদির উৎপাদন শুরু হয়। বীরভূম জেলাতে দরিদ্র মানুষদের জন্য মোটা কাপড় তৈরি হত। কামিং লিখেছেন স্বাদেশী আন্দোলনেরফলে বোলপুর, দুবরাজপুর করিধা, তাঁতিপাড়া, আলুন্দাতে উৎকৃষ্ট কাপড়, টুইল,

টেবল ক্লথ, পর্দা, বিছানার চাদর, শার্ট ও কোর্টের কাপড় তৈরি হচ্ছে। দিনাজপুর জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের ব্যবহারের জন্য কার্পাস ও পাটের মিশ্রনে এক ধরনের কাপড় তৈরি হয়। এর নাম 'কোটা'। দার্জিলিং জেলায় তাঁতে এক ধরনের মোট কাপড় তৈরি হয় যার নাম 'লেপচা কাপড়'। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা কেন্দ্রিক তাঁতশিল্পও উৎসাহিত হয়েছে। কাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের বয়নশিল্পে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি, কুমিল্লা, পাবনা ও ফরিদপুরে ঐ একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের শেষদিকে জে.এ.এল. সোয়ান (J.A.L. Swan) বাংলার শিল্পোন্নতির ওপর এক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, বাংলার স্বদেশী শিল্পগুলি বর্তমানে হোসিয়ারি ও অন্যান্য কাপড় তৈরি করছে।[১২০] বাংলার বাজারে এ সমস্ত শিল্প পণ্যের চাহিদা আছে। তবে বাংলার প্রয়োজনীয় হোসিয়ারি দ্রব্যের (গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, মোজা ইত্যাদি) ৭০ শতাংশ আসে জাপান থেকে।

১.১৯.১ স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব

স্বদেশী আন্দোলন বাংলার জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী শিল্পপতি ও বাণিকরা যে অভাবটি তীব্রভাবে অনুভর করেছিল তা হল শিল্প ও বাণিজ্যের পৃষ্টপোষক ও উৎসাহদাতা স্বদেশি ব্যাঙ্কের। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গঠন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৭ সনে কলকাতায় ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাঙ্কের পরিকল্পিত মূলধন ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। পঞ্চাশ হাজার একশ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়। দেশে শিল্প স্থাপনে উদ্যেগ গ্রহণ ও সহায়তা দান এবং শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহদান ছিল এই ব্যাঙ্কের ঘোষিত উদ্দেশ্য। বাংলার ধনী জমিদার ও শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গের যুক্ত ব্যক্তিরা ব্যাঙ্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাঙালী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক পরিচালনার অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে ন্যাশনাল ব্যাংকের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য একজন ইংরেজ ম্যানেজারকে নিযুক্ত করা হল। এতে অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটেছিল। ব্যাংকের রিজার্ভ ফাণ্ড ও লভ্যাংশের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। ১৯১৩-১৯২০ সনের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের কোন ডিভিডেণ্ড দেওয়া সম্ভব হয়নি। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাংকটি দৃশ্যমান কোন অবদান রাখতে না পারলেও দেশীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিল। এ রকম আর একটি স্বদেশী ব্যাংক ছিল কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাংক। দু কোটি টাকার মূলধন নিয়ে এ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

স্বদেশী যুগে বাঙালিদের উদ্যোগ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লিমিটেড স্থাপিত হয়েছিল। বীমা ব্যবসায়ে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটনা এবং বিদেশী নির্ভরতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ইন্সুরেন্স কোম্পানি স্থাপিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে কোম্পানি মূলধন লগ্নি করে দেশের

অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিল। এ দেশের নতুন নতুন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান হবে এমন আশাও ছিল। এক কোটি টাকার মূলধন এবং একশ টাকার এক লক্ষ শেয়ার বিক্রি করে হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়। কোম্পানি ছোট ছোট শেয়ার বিক্রি করে কিছু মূলধন সংগ্রহ করেছিল ঠিকই তবে টাকার সমস্যা রয়ে গেল। হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাজকর্ম, বিদেশী বীমা কোম্পানিগুলির ঈর্ষা উদ্রেক করেছিল। সরকারি ঋণপত্র, স্বদেশী শিল্প ইত্যাদিতে কোম্পানি টাকা লগ্নি করেছিল। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল হিন্দুস্থান ইন্সুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছিল। অপর উল্লেখযোগ্য বীমা কোম্পানি হল ইণ্ডিয়ান ইকুইটেবল ইন্সুরেন্স কোং লিঃ (Indian Equitable Insurance Co. Ltd.)। এই কোম্পানি দশ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে কারবার শুরু করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব যতটা সফল তারচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাংলার সাধারণ তাঁতীসমাজ ও জনগণ। এই আন্দোলন সবাইকে নিজের দেশ, নিজের উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়।

১.১৯.২ বাংলায় বস্ত্র কল স্থাপন

স্বদেশী যুগে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সনে কমলা মিল স্থাপিত হয়। কমলা মিল বেশিদিন চলেনি, ১৯১৫ সনে মিল বন্ধ হয়ে যায়। উদয়নাথ দাস নামে এক ব্যক্তি শ্রীনাথ মিল স্থাপন করেন। শ্রীনাথ মিল অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করেছিল। এই মিলে অনেক সুক্ষ্ম কাপড় তৈরি হত এবং মিল ২টি ভাল বাজার পেয়েছিল। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাপড়ের কল হল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস হুগলীর শ্রীরামপুরে বারো লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে দেশীয় পরিচালনায় বঙ্গলক্ষ্মীর যাত্রা শুরু হয়। এই রকম আর একটি প্রতিষ্ঠান হল মোহিনী মিলস। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকেশ্বরী কটন মিল (উৎপাদন শুরু করে ১৯২৭ সাল থেকে)। এবং ১৯৩৮ সালে ঢাকা কটন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পূর্ণ বাঙালি মূলধনে ও পরিচালনায় এটিও গড়ে উঠেছিল। এ সমস্ত প্রচেষ্টার পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও বাগেরহাটে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল। কাপড়ের কলগুলির মূলধন ও পরিচালনা সমস্যা ছাড়াও একটা বড় অসুবিধা ছিল। সমস্ত যন্ত্রপাতি ইংল্যান্ড থেকে আমরদানী করতে হত। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে ১৪টি কাপড় ও সুতোর কল ছিল। এই সমস্ত কলে কাজ করত প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক।

১.১৯.৩ প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিকা ও উদ্যোগ

বিশ শতকের শুরুতে, বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পে সনাতনী পদ্ধতিগুলোর বদলে নতুন করণ কৌশলের সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে শত বছর ধরে বাংলার তাঁতীরা যে পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে বস্ত্র বয়ন করত, তার পরিবর্তন ঘটে। এটা একটা অভূত পূর্ব ঘটনা এবং এই ঘটনার প্রভাব পড়েছে বাংলার তাঁত শিল্পে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। তৎকালীন বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প বিভাগ এবং কারিগরি

শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র দেখলে এই পরিবর্তনের কারণ ও উপলক্ষ্য সম্পর্কে জানা যায়। সেখানে দেখা যায়, বিশ শতকের প্রথম দশকেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সেই উদ্যোগের ফলস্বরূপ শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২১] পরবর্তীকালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো অনেকগুলো স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এগুলোর মাধ্যমে বাংলার তাঁতশিল্পের বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথমত: সনাতন গর্ত তাঁতে হাতে ছোঁড়া মাকুর বিকল্প হিসেবে ফ্লাই শ্যাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন ঘটে। এর ফলে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত: ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিনেরও প্রচলন ঘটে। এর ফলে তাঁতের কাপড়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা করা সহজ হয়ে যায়। তৃতীয়ত: কৃত্রিম রঞ্জন পদ্ধতির সূচনা ঘটে। এর ফলে সুতা ও কাপড়ে নানা ধরনের রং করা সহজ হয়ে যায়। রঙে নানা রকম বৈচিত্র আসে। পাশাপাশি সনাতনী প্রাকৃতির রঞ্জনশিল্প অব্যাহত থাকে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বয়ন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে যেসব পরিবর্তন ঘটে, বাংলার তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে তার ফলাফল ছিল ইতিবাচক? উন্নত তাঁত যন্ত্র ব্যবহার করার কারণে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ল। বলাই বাহুল্য, এর অধিকাংশই ছিল মোটা কাপড়। পাশাপাশি সুক্ষ্ম বা মিহি কাপড়ও অবশ্য কিছু হতো। কিন্তু তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল না। সুক্ষ্ম ও মিহি মসলিন তখন আর বয়ন হতো না।বিশ শতকের শুরুতে এর সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মসলিনের উপযোগী হাতে কাটা সুতার অভাব। কলের সুতা দিয়ে তখনো কিছু মসলিন হতো।

ফ্লাই সাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁতের পাশাপাশি ডবি ও জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার শুরু হয় এই সময়ে। এর ফলে নকশার নানা রকম বৈচিত্র আনা সহজ হয়ে যায়। নতুন এই প্রযুক্তির কারণে ডোরাকাটা, স্ট্রাইপ, চৌকোন কিংবা এক রঙা কাপড়ের বদলে বিভিন্ন ধরনের নকশাসমৃদ্ধ বস্ত্র বয়ন শুরু হয়। জামদানি ছাড়া আর কোনো তাঁতের কাপড়ে এর আগে এত পরিমাণ নকশা দেখা যায়নি। ফলে বাংলার তাঁতের কাপড়ের নকশায় পরিবর্তন আনে নতুন প্রযুক্তি-ডবি ও জ্যাকার্ড।

আরেকটি ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে রঙের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিন ধরে এদেশে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে সুতা ও কাপড় রং করার প্রদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু বয়ন বিদ্যালয়গুলোর কর্মতৎপরতায় কৃত্রিম রং করার কলাকৌশল মানুষকে শেখানো হয় এবং এই পদ্ধতিতে রং করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় রঙের কারণে এটা দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেসব পেশাজীবী সম্প্রদায় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে রং করত (যেমন: রংরেজ, নীলকসানে) তাদের বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন এক পেশাজীবী শ্রেণী তৈরি হয়, যারা কৃত্রিম পদ্ধতিতে রং করা শুরু করে। নতুন এই পেশাজীবীদের নাম হয় 'রং মাস্টার'। যেসব কৃত্রিম রং এই প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুরু হয়, তা সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো।

১.১৯.৪ তাঁতশিল্পের টেকসই উন্নয়ন

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সরকারি উদ্যোগে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, এর ফলে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তখন সুতা তৈরিতে যে তুলা ব্যবহার করা হতো, তা মূলতঃ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হতো। তাঁত শিল্পে যে সুতা ব্যবহার করা হতো, তা বিদেশে তৈরি কিংবা বিদেশি প্রযুক্তিতে তা বাংলায় তৈরি করা হতো।[১২২] যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করে সেগুলো বিদেশ থেকে আনা হয়েছে এবং এই দেশে সরকারি উদ্যোগে তা প্রচলন করা হয়েছে। এমনকি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে যে রং করার প্রক্রিয়া চালু হলো, সেটাও ধার করা। তারা নিতান্তই টিকে থাকার তাগিদে নতুন এই পদ্ধতি শিখে ও আত্তীয়করণ করে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

সন্দেহ নেই, বৃটিশ আমলে সরকারি উদ্যোগ ও সহায়তায় বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নে যেসব পরিকল্পনা ও উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছিল তার ফলে এ দেশের তাঁত শিল্পে গতি এসেছিল। তবে তাদের উদ্যোগে বাংলার তাঁত শিল্পের অন্যান্য বিষয় যেমনঃ যন্ত্র, রং, রঞ্জন প্রক্রিয়ার উপর বিদেশ নির্ভরশীলতা বেড়েছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে বৃটিশ কৌশলের কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় বস্ত্র শিল্পের ধ্বস নামতে থাকে। শত শত বছর ধরে কৃষি ও দেশীয় শিল্পে বাংলা ছিল সমৃদ্ধ। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন কাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলে আসছিল এবং ভারসাম্য বজায় রেছে চলছিল। কিন্তু ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বিমুখী নীতি, পরে বৃটিশ শাসকদের শোষনমূলক বাণিজ্য নীতির কারণে বাংলার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পের ঐতিহ্য প্রবাহমান। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পকে একেবারে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রায় অবলুপ্ত পূর্ব বাংলার তাঁত শিল্পের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয় এবং অন্যান্য শিল্পের মতো বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব শুরু হয়।[১২৩] তখন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক হারে তাঁত শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। তাঁত শিল্পের পুরনো টাকু-মাকুর পাশাপাশি আধুনিক কলের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বস্ত্র শিল্পের প্রসার পর্যায়ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও কর্ম-সংস্থানের একটি দিক উন্মোচিত হয়। ১৯৪০ এর দশক ও দেশ বিভাগের সমসাময়িক কাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী পর্যন্ত বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারার কিছু অংশ নিম্নে উত্থাপন করা হলোঃ

১.২০ দেশ বিভাগ ও পরবর্তী সময়ের তাঁত শিল্পের প্রবৃদ্ধির চিত্র

সারণি-১.৬: বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ও প্রবৃদ্ধি: ১৯৪৬-৬০ এর দশক[১২৪]

বছর	হিসাব/গণনা (উৎস অনুসারে)	তাঁতের সংখ্যা (হাজার)	চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)
১৯৪৬	টেক্সটাইল কমিশনার, ভারত	১৩৪.৩৫	৬.৪১
১৯৫১	আদমশুমারী, পাকিস্তান	১৮৩.২৫	৬.৪১
১৯৫৬	টেক্সটাইল কমিশনার, পাকিস্তান	২৫০.০০	৬.৪১
১৯৬২	পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা	২৭১.৪১	১.৩৮

সারণি ১.৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ এর তুলনায় তাঁতের পরিমান সংখ্যায় বেশি হলেও প্রবৃদ্ধির হার আশানুরুপ ছিলো না।

১.২০.১ দেশ বিভাগের পর প্রচলিত তাঁতের শ্রেণিবিভাগ ও আনুষাঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে প্রধানত তিন প্রকারের হস্তচালিত তাঁত বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে, (ক) নিক্ষেপ মাকু তাঁত (thorow shutle loom) (খ) দ্রুত মাকু তাঁত (Chittaranjan/ semiautomatic/ Japaneses) এবং (গ) চিত্তরঞ্জন বা আধা স্বয়ংক্রিয় বা জাপানী তাঁত সাধারণত: নিক্ষেপ মাকু তাঁতের মাকু (Shuttle) নিক্ষেপের গড় গতি হচ্ছে প্রতি মিনিটে ৩০, দ্রুত মাকু তাঁতে ৮০ এবং চিত্তরঞ্জন তাঁতে ১১০। কোন তাঁদের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে তার মাকু নিক্ষেপের গতি, অন্যান্য যান্ত্রিক সুবিধাদি এবং কাপড় বুননের প্রকৃতির ওপর। বাংলাদেশে সাধারণত দ্রুত মাকু তাঁতের ভৌত উৎপাদনশীলতা নিক্ষেপ মাকু তাঁতের চেয়ে ৩-4 গুণ বেশি। অপরপক্ষে চিত্তরঞ্জন তাঁতে উৎপাদনশীলতা দ্রুত মাকু তাঁতের চেয়ে ১.৩-১.৫ গুণ অধিক। সারণি-২ এ ১৯৪০ এর দশক থেকে ৬০ এর দশক পর্যন্ত সময়কালে এ তিন প্রকার তাঁতের বণ্টন দেখানো হল:

সারণি ১.৭: প্রকারভেদে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা : ১৯৪০-৬০ এর দশকের মধ্যে

বছর	নিক্ষেপ মাকু তাঁত	দ্রুত মাকু তাঁত	চিত্তরঞ্জন তাঁত	মোট তাঁত
১৯৪১	২৭.৩৫ (৩২.৯)	৫৭.২৭ (৬৭.০)	০.৮৬ (৮৫.৪৮)	৮৫.৪৮ (১০০.০)
১৯৫৬	১০.৭২ (৪.৩)	২১৬.৪০ (৮৬.৮)	২২.৮৮ (৯.১)	২৫০.০০ (১০০.০)

উৎস: *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মে, ১৯৯০, পৃ. ৬।

তবে ১৯৭২ সালের পর থেকে উপরোক্ত তিন প্রকারের যন্ত্রের মধ্যেদ্রুত মাকু তাঁত আরও বেশি প্রচলন হয় পাশাপাশি তাঁতের ব্যবহার ও দ্রুত মাকু-তাঁতের প্রচলন বেড়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রচলন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা গ্রামের তাঁত কারখানার উদ্যোক্তা ও মালিক মো: হারুন মিয়া জানান তার ফ্যাক্টরীতে যে সকল তাঁত চালু এবং অচুলা সগুলোই গর্ত তাঁত।[১২৫]

সারণি ১.৮: চালু তাঁতের শতকরা হিসাব : ১৯৫০-৭০ এর দশক

বছর	উৎস	চালু তাঁতের শতকরা হিসাব
১৯৫৫-৫৬	পাকিস্তান সরকার, ১৯৫৬	৬৭
১৯৭৬-৭৭	চৌধুরী, ১৯৮১	৬৯

উৎস: *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মে, ১৯৯০, পৃ. ৬।

সারণি ১.৯: বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্পে কাপড় উৎপাদনের হিসেব: ১৯৫৫/৫৬-৮৬/৭০

সময়কাল	বার্ষিক গড় উৎপাদন (লক্ষ মিটার)		মোট
	তুলাজাত	অতুলাজাত	
১৯৫৫/৫৬-৫৯/৬০	৩১৬৪ (৯৭.৭)	৭৪ (২.৩)	৩২৩৮ (১০০.০)
১৯৬০/৬১-৬৪/৬৫	৩৫৫২ (৯৭.৮)	৮১ (২.২)	৩৬৩৩ (১০০.০)
১৯৬৫/৬৬-৬৯/৭০	৩৭১২ (৯৭.৮)	৮৩ (২.২)	৩৭৯৫ (১০০.০)

উৎস: *দৈনিক সংবাদ*, ৭ মে, ১৯৯০, পৃ. ৬।

উপরোক্ত সারণিগুলোর তথ্য অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতের সংখ্য, প্রকারভেদ, চালু তাঁতের হিসেবে এবং হস্তচালিত তাঁত শিল্পের কাপড় উৎপাদনের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁত শিল্পের তৎকালীন প্রবৃদ্ধি ছিল আশাব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ও এই গতি অব্যাহত থাকে বলে জানান নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার করিমগঞ্জ গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী মুক্তিযোদ্ধা জনাব সোলায়মান মৃধা।[১২৬]

১.২১ উপসংহার

এই অধ্যায়ে তাঁত শিল্পের উৎপত্তি এবং বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁত শিল্প ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক এবং বাংলার অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাঁতবস্ত্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ডাচ, আর্মেনিয়, ফরাসী ও পর্তুগীজদের সাথে তাঁতবস্ত্র কেন্দ্রিক বাণিজ্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন যুগ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তাঁত ও বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন রাজদরবার ও শৌখিন শ্রেণীর মাঝে মসলিন সমাদৃত ছিল। মোঘল আমলে বাংলার বস্ত্র শিল্পের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও ছিল লক্ষ্যণীয়। তাঁতশিল্প ও তাঁতীদের প্রতি বৃটিশ, ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনাসহ স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে তাঁতশিল্পে প্রভাব ফেলেছিল তা জানা যায়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনেক বাঙালি উদ্যোক্তা বস্ত্রকল স্থাপন করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর মৌলিক চাহিদা পুরণের জন্য তৎকালীন শাষকগোষ্ঠীর উদ্যোগ, বিশেষ করে সুতার কল স্থাপন এবং বিভিন্ন জরিপ ও শুমারির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। তৎকালীন সরকারগুলো

প্রচেষ্টা ছিল কীভাবে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় বস্ত্র শিল্পকে সহযোগিতা করা যায়। শুমারি ও জরিপগুলোতে দেখা যায়, ১৯৫৬/৫৬-৫৯/৬০ সালের তুলনায় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তাঁতশিল্পে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। অত্র অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা তাঁতশিল্পের উৎস থেকেই চাহিদা মিটতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বস্ত্র কল ক্ষতিগ্রস্ত হয়,পশ্চিম পাকিস্তানী অনেক মালিক মিল বন্ধ করে পালিয়ে যায়। এসব কারণে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সুতার সংকট দেখা দেয়।

এই সংকট মোকাবেলায় ১৯৭২ সালের পর থেকে এই শিল্পটির উন্নতির জন্য সরকারি পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমন: স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা, ন্যায্য মূল্যে তাঁতীদের মধ্যে আমদানীকৃত সুতা ও রং বিতরণ, আঞ্চলিক পর্যায়ে পণ্য বিক্রির বাজার স্থাপন করা হয়। ৮০'র দশকে এসে উপর্যুপুরি সুতি তাঁতবস্ত্রের ব্যবহার্য্য, সুতার দাম বৃদ্ধি, পাশাপাশি বিদেশী নাইলন সুতা সহজলভ্য হওয়ায় তাঁতশিল্প সংকটের সম্মুখীন হয়। ঐ সময়টাতে দেশের পাওয়ারলুমের প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। প্রথমদিকে পাওয়ারলুমে শুধুমাত্র পলিয়েষ্টার কাপড় উৎপাদিত হতো। এসবের কারণে আশির দশকে কোন কোন এলাকায় তাঁত শিল্পে ক্রমাবনতি দেখা গেছে। অনেক এলাকায় তাঁতীরা তাঁতের বস্ত্র উৎপাদন প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। গোটা বস্ত্রশিল্প মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তবুও নানাবিধ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় এ শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের একটি অংশ পাওয়ারলুমে তাঁতবস্ত্রের অনুরূপ সুতিবস্ত্র উৎপাদন শুরু করে। তারা হস্তচালিত তাঁতের পাশাপাশি পাওয়ারলুম (বিদ্যুৎ চালিত তাঁত) স্থাপন করে সুতিবস্ত্র উৎপাদনে নুতন মাত্রা যুক্ত করে। এতে তাঁতীগণ একধাপ এগিয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এ শিল্পটি আজও সুনামের সাথে টিকে আছে।

তথ্যনির্দেশিকা

---

১. M. Mufakharul Islam: *An Economic History of Bengal 1757-1947* (Dhaka, 2012), p.26.

২. Sirajul Islam, *American Trade in Bengal*, *Asiatic Society,* (Dhaka, 2018), p. 100.

৩. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal* (1757-1833), (Calcutta, 1978), p.139.

৪. ড. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনু) *কৌটিলিয়ম অর্থশাস্ত্রম*, সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, (কলিকাতা, ২০০২), পৃ. ৩৩৬-৩৪১।

৫. শাওন আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, (ঢাকা, ২০১৮) পৃ. ১৭। (এখন থেকে গ্রন্থটি আকন্দ, *তাঁতশিল্প...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৬. G. Evans, "A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal", Calcutta 1921, Vol. 1, Bulletin p.7.

৭. *Bangladesh Hand Loom Census 2018*, (Dhaka, 2019), p. 3.

৮. আলী ইমাম, *বাঙলা নামে দেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ. ২৫৭।

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৭২), পৃ. ১৮৮।

১০. আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী ১৯৬৫, পৃ. ১। (এখন থেকে গ্রন্থটি করিম, *মসলিন...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

১১. তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৯। (এখন থেকে গ্রন্থটি আহমদ, *প্রাচীন শিল্প...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

১২. G. Evans, "A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal", Calcutta 1921, Vol. 1, Bulletin, p.1.

১৩. Eric Broudy, *The Book of Looms*, First Published 1979, (London, 1993), p. 9.

১৪. আকন্দ, *তাঁতশিল্প...*, পৃ. ১৮।

১৫. J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilazation*, Vol, 1, 1931, p. 32-33.

১৬. ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা*, কাবেরী বসু অনূদিত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, (কলকাতা, ২০০৪), পৃ. ৩৭।

১৭. ড. গীতা সেনগুপ্ত, *ভারতীয় পরিচ্ছদ ও পাশ্চাত্যধারা*, (কলকাতা, ১৯৯৩) পৃ. ১। (এখন থেকে গ্রন্থটি সেনগুপ্ত, ভারতীয় পরিচ্ছদ..., এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে।)

১৮. সেনগুপ্ত, *ভারতীয় পরিচ্ছদ*, পৃ. ১-২

১৯. John Gillow and Nicholas Branard, *Traditional Indian Textiles*, Thames and Hudson, F. P. 1991, (London, 2005) p. 7.

২০. আকন্দ, *তাঁতশিল্প..*, পৃ. ২০।

২১. I. L Good, J. M Kenooyer and R. M Meadow, *New Evidence for Early Silk in Indus Civiliation,* 2009 p. 2, http://havard.academia.edu/trenegood/papers/82330/New-Evidence for-silk-in-the-indus-Valley.

২২. সুফি মোস্তফিজুর রহমান, "ঐতিহাসিক যুগে মানব-বসতিঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য", সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ৩৮-৩৯।

২৩ সাক্ষাৎকারঃ হাবিবউল্লাহ পাঠান, গবেষক, বয়স-৭৭, গ্রাম- বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী, ২০১৬।

২৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাসঃ আদিপর্ব*, *দে'জ পাবলিশিং*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৪০২ বঙ্গাব্দ (প্র. প্র. ১৩৫৬), পৃ. ৬১-৬৩। (এখন থেকে গ্রন্থটি রায়, *আদিপর্ব...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

২৫. *বাংলাপিডিয়া*, পঞ্চম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৬), পৃ. ২৩৮-২৪০।

২৬. ইরফান হাবিব, *প্রাক-ইতিহাস*, কাবেরী বসু অনূদিত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, (কলকাতা, ২০০২), পৃ. ৬৯।

২৭. এখানে 'তন্তু' শব্দ দ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ এবং 'ওতু' শব্দ দ্বারা যজুঃ সমূহ ও যাগকার্য বোঝানো হয়েছে এবং উভয়ের সংগঠন দ্বারা বস্ত্র তৈরি বলতে 'যজ্ঞ' বোঝানো হয়েছে। তবে অপর একটি ঋকে স্পষ্টই মেষলোমের বস্ত্রবয়ন এবং বস্ত্র ধৌতকরণের উল্লেখ আছে। সূত্রঃ শাওন আকন্দঃ বাংলাদেশের তাঁতশিল্প, (ঢাকা, ২০১৮), পৃ. ২৬ হতে সংগৃহীত হয়েছে।

২৮. ড. গীতা সেনগুপ্ত, *ভারতীয় পরিচ্ছদ ও পাশ্চাত্যধারা*, (কলকাতা, ১৯৯৩) পৃ. ২১।

২৯ মজুমদার, ইতিহাস..., পৃ. ১৮৮। (এখন থেকে গ্রন্থটি মজুমদার, *ইতিহাস...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৩০. Edward Baines, *History of Cotton Manufacture in Great Britain*, (London, 1835), pp.17-18.

৩১. John Gillow and Nocholas Barnard, *TraditionalIndian Textile*, (London, 2005), 1st Published, 1991, p.7.

৩২ Indika is an account of Mauryan India by the Greek writer Megasthenes. It's fragements have survived in later Greek and Latin works. The earliest of these works are those by Diodorus Siculas, Strabo (Geographical) Pliny and Arrian (Indica) www.https://en.m.wikipedia,org:wiki.

৩৩ মেগাস্থিনিস (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) এবং নেয়াচারের (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক)। (Ncarchus or Ncarch) সূত্র থেকে জানা যায়, "The Indians use linen chothing as says Nearchus made from the faaz taken from the trees, about which I have already spoken, And this flax is either whiter in colour than any other flax or the people being black make the flax appear whiter in colour than any rcaching down halfway between the kncc and the anklc, and a gament which is partly thrown round the shoulders and partly rolled round the head (Arrian, the Indica in Anabasis of Alexander, togcther with the Indica, F, J Chinnock, tr, (London: Bhon, 1893), ch,1-16).

৩৪. ড. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা ও অনু), *কৌটিলীময় অর্থশাস্ত্র* (প্রথম খন্ড), (কলিকাতা, ২০০২), পৃ. ২৭৪-২৭৫।

৩৫. আহমদ, *প্রাচীন শিল্প...*, পৃ. ২০।

৩৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য একাডেমী, (কলকাতা, ২০০৪), পৃ. ৭০১-৭১১।

৩৭. Moti Chandra, *Costumes Textiles: Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaeval India*, Oriental Publishers, (Delhi, 1973), p. 56.

Zulekha Haque, `Sari: Cotton and Silk, Textile Tranditions of Bangladesh, National Crafts Council of Bagladesh, (Second revised version) 2006, p. 80.

৩৮. Thapar, `State Weaving-Shopsof the Mauryan Period', in *JasleenDhamiija and Jyotindra Jain (ed.)*, Handwoven Fabricsof India, (Ahmedabad, 1989), p. 33.

৩৯. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ৬১-৬৩।

৪০. রায়, *আদিপর্ব..*, পৃ. ৪৫।

৪১. রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কৃষ্ণা গুপ্ত অনূদিত, (কলকাতা, ১৯৯৩) পৃ. ৮৪।

৪২. ইফতিখার-উল-আউয়াল, 'দেশি শিল্পের অবস্থা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ২৫৮। (এখন থেকে গ্রন্থটি আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা,...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৪৩. Fahien was a Chinese Pilgrim who visited India during the reign of Chandra Gupta

৪৪. আলী ইমাম, *বাংলা নামে দেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ. ২০৭।

৪৫. The periplus of the Erythrean Sea a Roman Period Guide to Trade and navigation in the Indian Ocean.Justly famous for offeringa contemporary and discriptive account of early Indian Ocean Trade.

৪৬. W. H. Schoff (tr& ed,) *The Periplusof the Erythraean Sea*: Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of First Century, (London, 1912), p. 47.

৪৭. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ১৫৭।

৪৮. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৩-৪।

৪৯. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ১৪৮।

৫০. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) অনুবাদ*: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯৬) (প্র.প্র. ১৯৮২), পৃ. ৩৪।

৫১. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol-4, 2nd edition, (London, 1885).p. 86.

৫২. Marco Polo (1254-1324) Venetian (Italian) Merchant explorer, writer who traveled through Asia along the Silk Road between 1271-1295. His travels are recorded in "the Travels of Marco polo" Ref: en.m.wikipedia.org (Venice-Published-1300)

৫৩. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ১৪৮।

৫৪. মোহাম্মদ নাসির আলী অনুদিত, *ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা*, (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ২১৭।

৫৫. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ১৪৯।

৫৬. করিম, মসলিন..., পৃ. ৪-৫।

৫৭. সাক্ষাৎকার: হাবিবউল্লাহ পাঠান, গবেষক, (ওয়ারি বটেশ্বর বিষয়ক গবেষক) বয়স-৭৭, গ্রাম-বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী, ২০১৬।

৫৮. রফিকুল্লাহ খান, ইফতেখার-উল-আউয়াল (সম্পা.), *বিদেশী পর্যটকদের চোখে ঢাকা*, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, (ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ২৩।

৫৯. আহমদ, *প্রাচীন শিল্প...*, পৃ. ২৩।

৬০. আহমদ, *প্রাচীন শিল্প*, পৃ. ২৪।

৬১. আকন্দ, *তাঁতশিল্প...*, পৃ. ৩৮।

৬২. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা*, পৃ. ২৫৮।

৬৩. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৭১।

৬৪. Ralph Ftch (1550-1611), British Explorer, Who was among the first Englishmen to travel through Indian and Southeast Asia.

৬৫. আহমেদ, *প্রাচীন শিল্প*, পৃ. ১২। (এখন থেকে গ্রন্থটি আহমেদ, *প্রাচীন শিল্প...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে।)

৬৬. রফিকুল্লাহ খান, *বিদেশী পর্যটকদের চোখে ঢাকা*, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, পৃ. ৬৪।

৬৭. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৭০।

৬৮. (Ralph Eitch) 1550-1611 British explorer, Merchant who was among the first Englishmen to travel through India and Southeast Asia. Ref. www.britanica.com>biography

৬৯. মুহম্মদ জাকারিয়া খান, "ঢাকাই মসলিনের বয়নশিল্প ঃ ইতিহাস ও প্রযুক্তি", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, সপ্তবিংশতি বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র-১৪০০০), পৃ, ৩৫।

৭০. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৬০।

৭১. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৬৩।

৭২. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৬২।

৭৩. জেমস টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, (ঢাকা, ২০০১), পৃ. ৮৫।

৭৪. ১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রদর্শনীর প্রতিবেদন, পৃ. ৩৮-৩৯। এ ছাড়াও এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সুতি, রেশমি ও মিশ্র তাঁতবস্ত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে। *Official Report of the Calcutta International Exibition* 1883-84,vol. 2, Bengal Secretariet Press, (Calcutta, 1885), p. 38-48.

৭৫. George Watts and Percy Brown, *Arts and Crafts of India*, Cosmo Publications, (New Delhi, 1979) (F.ed., 1904), p. 284-285.

৭৬. N. N Banerjee, *Monograph on the cotton Fabrics of Bengal*, (Culcutta 1998), P.30.

৭৭. William Milburn, *Oriental Commerce*, Vol.II, (London, 1813), pp. 234 & 271.

৭৮. William Milburn, *Oriental Commerce*, Vol.II, (London 1813), pp. 234 & 272.

৭৯. আউয়াল, *দেশি শিল্পের...*, পৃ. ২৮৩। (এখন থেকে গ্রন্থটি আউয়াল, *দেশি শিল্পের...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৮০. আউয়াল, *দেশি শিল্পের...*, পৃ. ২৮৫।

৮১. আউয়াল, *দেশি শিল্পের...*,পৃ. ২৮০-২৮৯।

৮২. আকন্দ, *তাঁতশিল্প...*, পৃ. ৪৭।

৮৩. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৬২।

৮৪. Tavernier (1605-1689), French gem marchant and Travelor was a private individual and merchant travelling at his own expense, covered by his own account 6,0000 Leagues (12,0000) miles in making six voyages to Persian and India between the years (1640-1668).

৮৫. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৭২-২৭৩।

৮৬. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র ৩*, অনন্যা, (ঢাকা, ২০০৫), পৃ. ৮৫-৯২।

৮৭. আউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ২৭২।

৮৮. Sirajul Islam, *American Trade in Bengal*, (Dhaka, 2018), pp. 83-84

৮৯. অvউয়াল, *দেশী শিল্পের অবস্থা...*, পৃ. ১১৫-১১৬।

৯০. Edward Baines, *History of the Cotton Manufacture in great Britain*, (London 1835), pp. 79-80, Debendra Bijoy Mitra, The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833, Firma KLM Private Limited, (Calcutta, 1978), p.12.

৯১. করিম, *মসলিন*, পৃ. ১১৫-১১৬।

৯২. ইফতিখার-উল-আউয়াল, 'দেশিশিল্পের অবস্থা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ২৭৫।

৯৩. Sukumar Bhattacharya, *East India Company and the Economy of Bengal from (1704-1740)*, (London, 1954), p.178.

৯৪. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal, The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813*, Delhi, p. 3. (এখন থেকে গ্রন্থটি Hossain*, The Company.....*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৯৫. Hossain,*The Company...,* pp. 594-606.

৯৬. K. K. Datta, *Alivardi and His Times*, (Calcutta, 1938), p. 67.

৯৭. K. N., Chaudhuri, *TheTrading World of Asia and the English East India Company*, 1669-1760, (Cambridge, 1978), pp. 311, 545.

৯৮. J. N Sammadar, 'Maratha Invasion of Bengal, bihar and Orissa', *JIH,* 1926. pp. 85-90.

৯৯. Hossain, *The Company...,* p. 4.

১০০. J. N Sammadar, 'Maratha Invasion of Bengal, bihar and Orissa', *op.cit.*, p. 92.

১০১. Hossain, *The Company...*, p. 86.

১০২. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal, The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813*, Delhi, p., (Source: IRS, *Fort William*, vol. II., 1757-59, P. xix).

১০৩. Hossain*, The Company.....,* p. 11.

১০৪. Sir Georgw Champbell, *Extracys from the Records of the India Office Relating to Famines in Bengal, 1769-78,* London, p.61.

১০৫. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, (Calcutta, 1956), Vol. I, p. 149.

১০৬. N. K. Sinha, 'The Famine of 1769-70', *BPP*, Vol. 77, Part. II, July-Dec., 1944, p.122.

১০৭. Hossain*, The Company.....*, p. 12.

১০৮. Hossain, p.12-13. (IOR, Home Misc. 393, a Report of Commercial Occurences, Complies the reports from all its agencies, p.65).

১০৯. Hossain*, The Company.....,* p. 13.

১১০. Hossain, *The Company...*, p. 13. (IOR, Home Misc. 393, a *Report of Commercial Occurences*, *Complies the reports from all its agencies*, p.117).

১১১. Mazhurul Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784*, (Dacca, 1964), p.191.

১১২. Hossain*, The Company.....,* p. 16.

১১৩. Sir Georgw Champbell, *Extracys from the Records of the India Office Relating to Famines in Bengal, 1769-78,* pp. 28,34, and 36.

১১৪. Hossain*, The Company.....,* p. 19.

১১৫. WW Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, (New York, 1868), p. 351.

১১৬. Hossain, *The Company Weavers of Bengal,* Oxford University Press, (Delhi,1988)*, p.19.*

১১৭ WW Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, (New York, 1868), p. 351.

১১৮. স্বদেশী আন্দোলন: The swadeshi movement was the part of Indian independence movement and the developing Indian Nationalism, was an economic strategy aimed at removing. The British Empire from power and improving economic conditions in India by the some principle of swadeshi which had some success.

১১৯. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, পেশা: ফোকলের গবেষক, বয়স: ৭৭, গ্রাম: বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী-২০১৬।

১২০. J. A. L Swan, “Report on the Industrial development of Bengal”, (Calcutta, 1915).

১২১. G. Evans, Report on Director of Agricutral in Bengal: “A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal”, 1921, Vol. 1, Bulletin p.7.

১২২. সাক্ষাৎকার: মো: মোমেন সরকার, সাবেক পরিচালক, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বয়স:৫০, পেশা:ব্যবসা, গ্রাম: শিলমান্দী, উপজেলা+জেলা:নরসিংদী, ২০১৭।

১২৩. সাক্ষাৎকার: আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন মোল্লা, সাবেক সদস্য, (তাঁতি প্রতিনিধি), বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, পেশা: ব্যবসায়ী, বয়স:৭০ ,২০১৬।

১২৪. মোহাম্মদ আবদুল লতীফ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা: ১৯৪৭-১৯৮৭, সংবাদ, ৭ মে, ১৯৯০, পৃ. ৬।

১২৫. সাক্ষাৎকার: মো: হারুন মিয়া, পেশা: তাঁত কারখানার মালিক, বয়স:৬৫, গ্রাম:নিলক্ষা, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

১২৬. সাক্ষাৎকার: মো: সোলায়মান মৃধা (মুক্তিযোদ্ধা), পেশা: ব্যবসায়ী,বয়স: ৬২, গ্রাম: করিমগঞ্জ, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী, ২০১৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ

২.১ ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্বভাবতই বাংলায় ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ ১৯০ বছরের বৃটিশ শাসন উত্তর ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ দীর্ঘ ২৩ বৎসর অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। সুদীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার নতুন দেশ, নতুন জাতি তার জরুরি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৭২ সালের শুরুতেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যার পেছনে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism[১]) কাজ করেছিল। জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সকলের জন্য পরিধেয় বস্ত্র নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সহজাত তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিতে গ্রহণ করতে হয় নানা পদক্ষেপে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি এক ধরনের রাজনৈতিক চেতনা নির্ভর অর্থাৎ এখানে Political Economy[২] এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করেছিল যেখানে বাঙালি জাতি অর্থনীতি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর যুদ্ধবিধস্ত রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে দেশের মানুষের জন্য নিজের মত করে অন্তত: মোটা সুতি বস্ত্রের (মৌলিক অধিকারসমূহের একটি) ব্যবস্থা করার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে যা অদ্যাবধি বিরাজমান।

২.২ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তাঁত শিল্পের সূচনাকাল: সমস্যা ও সম্ভাবনা

যুদ্ধবিধস্ত দেশে বস্ত্রশিল্প বিশেষ করে সহজলভ্য হস্তচালিত তাঁত শিল্প উন্নয়নের পথে প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বড় যে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়, তা ছিল তুলার অভাব। পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের তাঁত শিল্প কাঁচামালের জন্য অনেকটা পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর তুলা আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে এই সংকট মোকাবেলার জন্য অলিখিতভাবে ভারতের সাথে সীমান্ত এলাকায় শিথিলতা অবলম্বন করা হয় যাতে ক্ষুদ্র ও পাইকারী সুতা ব্যবসায়ীরা সহজে তুলা আমদানি করতে পারে। পাশাপাশি জরাজীর্ণ যুদ্ধবিধস্ত পুরাতন স্পিনিং মিলগুলো চালু এবং নতুন মিল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সত্তর দশকে ব্যাপক সরকারি উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সদ্য স্বাধীন দেশে সুলভ মূল্যে কাপড় তৈরি করা এবং দেশীয় শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পে মনোনিবেশ করে। বিদ্যমান তন্তবায় সমবায় সমিতিসমূহ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার মাধ্যমে ঋণ, সুতা সরবরাহ করে তাঁত শিল্পকে সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৭

সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার জাতীয় সমন্বয় সংস্থা গঠন করে। একই সময়ে কুটির শিল্পের উপর পাঁচ দিনের ওয়ার্কশপ করানো হয়। নিউইয়র্কভিত্তিক 'পরিকল্পনা সহকারী' সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকার রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে দেশের ৬৫টি সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা যোগ দেন।[৩] ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্যে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার সহযোগিতার জন্যে ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই স্কিমের আওতায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই কর্মসূচির অধীনে ঋণ বিতরণের সুবিধার্থে ও বিভিন্ন জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশে প্রতি জেলায় একটি ব্যাংককে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।[৪] কিন্তু এসব প্রচেষ্টার পরেও এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রধান কারণ ছিল অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুতার উচ্চমূল্য বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সুতা ও মূলধন সরবরাহের অনুপস্থিতি। বস্ত্র মিলগুলোতে ১৯৭৮-৭৯ সালে ২১ কোটি ১২ লাখ ৩০ হাজার টাকার উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়। বিদ্যুতের অভাবে সংস্থার মিলগুলোতে মোট ২৪ লাখ বেল সুতা ও ৬২ কোটি গজ কাপড় উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।[৫] আরো মনে করা হয় যে, তাঁত শিল্পের প্রধান সমস্যা হচ্ছে গরীব তাঁতীরা মহাজনদের দ্বারা শোষণের শিকার হয়।[৬] ব্যর্থতার অন্য প্রধান কারণ হলো দফায় দফায় সুতার দাম বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর মোট ৬ বার সুতার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।[৭] তবে তুলার জন্য বাংলাদেশ আশির দশক থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পুরোপুরি আমদানির ওপর নির্ভরশীল। যেমন, ১৯৮১ সালে এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত নয় মাসে প্রায় এক কোটি বেল্ট সুতা আমদানি করা হয়েছে। তারপরও ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ৮৬-৮৭ সময়কালে কাপড় উৎপাদন ৮৫% বেড়েছে।[৮]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পাওয়ার লুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব পড়েছিল হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ওপর। সত্তর ও আশির দশকেরও মিলের কাপড় ও হস্তচালিত তাঁতের কাপড়-উভয়েরই বাজার ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে পাওয়ার লুমের প্রভাব এবং পাওয়ার লুমের উৎপাদিত পণ্যের সাথে টিকতে না পেরে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই হস্তচালিত তাঁতের কাপড় উৎপাদন ব্যাপক হ্রাস পায়। এর ফলে উল্লেখ সংখ্যক তাঁতি কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়। তবে এর মধ্যে কিছু সংখ্যক তাঁত মালিক নিজেদের অল্প পুঁজির সাথে যুক্ত করে নতুন করে ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করে। পাওয়ার লুমে শুরুতে এক রং এর পলিয়েস্টার কাপড় বেশি তৈরি হতো। অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়ার লুমে ডিজাইনসহ লুঙ্গি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হলে অনেক তাঁত কারখানার মালিক পাওয়ার লুমে বিনিয়োগ করেন। অনেক তাঁত মালিক হস্তচালিত তাঁতের পাশাপাশি পাওয়ার লুম স্থাপন করে সমাজে শিল্পপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশেষ করে নরসিংদীর বাবুরহাট, মাধবদী, ভেলানগর, কারারচর, শেখেরচর, ভুলতা, গাউছিয়া, রূপসী ইত্যাদি এলাকার অনেক শিল্পপতি অতীতে তাঁতমালিক (হস্তচালিত তাঁত মালিক) ছিলেন।[৯]

তবে বাংলাদেশ পর্বে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি ঘটেছে, সেটা হলো বাঙালি সংস্কৃতি ও চেতনার উপর ভিত্তি করে শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাঝে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও এলিট শ্রেণি এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বেশ কিছুসংখ্যক বিদেশি এই বাজারের মূল ক্রেতা। সত্তরের দশকে এই বাজার শুরু হলেও আশি ও নব্বইয়ের দশকে তা বিকশিত হয় এবং বর্তমানে নগরের এই নতুন বাজার এ দেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে। অনেক বন্ধ তাঁত চালু হয়েছে আবার অনেক নতুন কারখানা সৃষ্টি হয়েছে শহরের নতুন বাজারকে কেন্দ্র করে। নগরের এই বাজার তৈরিতে শহরের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এই নগর কেন্দ্রিক এলিট ও মধ্যবিত্ত নির্ভর বাজারই মুখ্য নয়, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার হচ্ছে শহর ও গ্রামের অগণিত সাধারণ মানুষ। প্রধানতঃ সস্তা লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা, চাঁদর ইত্যাদি হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মূল পণ্য। ছোট-বড় বিভিন্ন হাটে পাইকার ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এসব পণ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

২.৩ স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের বিভিন্ন জরিপ ও শুমারী

তাঁত শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে বিভিন্ন সময়ে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকবার জরিপ এবং শুমারি পরিচালিত হয়েছে। ১৯৮৬-৮৭ সালে তাঁত শিল্প জরিপ (বিআইডিএস ১৯৮৭) অনুযায়ী বাংলাদেশে চালু তাঁতের শতকরা হিসাব ৭৩%।[১০]

সারণি-২.১: স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে তুলাজাতীয় এবং অতুলাজাতীয় কাপড় উৎপাদনের তুলনামূলক হিসাব

সময়কাল	বাৎসরিক গড় উৎপাদন (লক্ষ মিটার)		
	তুলাজাত	অতুলাজাত	মোট
১৯৭০/৭১-৭৪/৭৫	৩২৪৬ (৯৭.৩)	৯০ (২.৭)	৩৩৩৬ (১০০)
১৯৭৫/৭৬-৭৯/৮০	৪৭০৭ (৯৭.৮)	১০৫ (২.২)	৪৮১২ (১০০)
১৯৮০/৮১-৯৪/৮৫	৫১৬২ (৯৫.৪)	২৪৯ (৪.৬)	৫৪১১ (১০০)
১৯৮৫/৮৬-৮৭/৮৮	৫৭৪১ (৯২.৪)	৪৭৩ (৭.৬)	৫৯৭৬ (১০০)

উৎসঃ নমুনা জরিপ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৭ম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা-১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০।

সারণি-২.১ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০-৭৫ সময় পর্যন্ত তুলার বাৎসরিক গড় উৎপাদন ছিল ৯৭.৩%, অতুলাজাত ২.৭%, ১৯৭৫-৮০ সময় পর্যন্ত তুলার বাৎসরিক উৎপন্ন ছিল ৯৭.৮% এবং অতুলাজাত ২.২%, ১৯৮০-৮৫ পর্যন্ত তুলার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৯৫.৪% এবং অতুলাজাত ৪.৬% এবং ১৯৮৫-৮৮ পর্যন্ত তুলার বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৯২.৪% এবং অতুলাজাত উৎপাদন ছিল ৭.৬%। সবচেয়ে বেশি তুলাজাত কাপড় উৎপাদনের সময়কাল ছিল ১৯৭০-৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তাঁত শিল্পকে যুগোপযোগী এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে অনেক সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এ বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করেছেন। নিম্নের সারণিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখানো হলো:[১১]

সারণি-২.২: বিভিন্ন সময় জরিপ ও শুমারী অনুযায়ী (প্রতিষ্ঠিত তাঁতের সংখ্যা)

Year	Census/Survey	Organisation	Establishments	Looms	Looms per unit
1978	Census	BHB	1,97,280	4,37,015	2.2
1987	Survey	BIDS	1,62,000	4,25,310	2.6
1990	Census	BBS	2,12,421	5,14,456	2.4
2003	Census	BBS	1,83,512	5,05,556	2.8

Source: BHB-Bangladesh Handloom Board, BIDS-Bangladesh Institute of Development Studies, BBS-Bangladesh Bureau of Statistics.

সারণি-২.২ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ডের প্রথম শুমারি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত তাঁতের সংখ্যা ছিল মোট ৪,৩৭,০১৫টি এবং ২০০৩ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত শুমারিতে তাঁত সংখ্যা বেড়ে ৫,০৫,৫৫৬টি দাঁড়িয়েছে।

২.৪ তাঁতশিল্প নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার থেকে আরম্ভ করে এখনও পর্যন্ত তাঁত শিল্পের প্রতি সরকারসমূহের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় সমবায় সংস্থার মাধ্যমে তাঁতশিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। তাঁতশিল্পের অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে Bangladesh Handloom Board of 1977 (Ordinance No.LXIII of 1977) জারী করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত তাঁতশিল্প বিষয়ক নতুন আইন ২৭ নভেম্বর-২০১৩ খ্রী: (১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ) তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রী: বাংলাদেশ গ্যাজেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত অতিরিক্ত সংখ্যায় আইনটি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প।[১২] জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৭১ পরবর্তী সরকার শুরুতেই এ শিল্পের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ও বিদ্যমান তন্তুবায় সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার বিশ্বাস করতেন জনগণের মৌলিক চাহিদার অগ্রাধিকারে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। কিন্তু এই বস্ত্র উৎপাদনে আমাদের পরনির্ভরতা অত্যন্ত দুঃখজনক। বস্ত্র-উৎপাদনের কাঁচামাল তুলা দেশের মোট চাহিদার পুরোটাই প্রায় বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। অথচ এক সময় বাংলায় যে পরিমাণ তুলা উৎপাদন হতো তাতে বস্ত্র

শিল্পের চাহিদা পূরণ হত। পরবর্তীতে উল্লেখিত সরকারি উদ্যোগসমূহের কারণে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হস্তচালিত তাঁত শিল্প পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

২.৫ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বাংলাদেশে তাঁত বোর্ড

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। অবশ্য তখন সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তেমন সফল না হওয়ায় অক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-বাতাঁবো) গঠিত হয়।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিত করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

২.৬ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে উৎপাদন সংগঠন এবং তার পরিবর্তিত দিক

তাঁত শিল্পের উৎপাদন কর্মকাণ্ডকে সাংগঠনিক দিক থেকে প্রধানত: দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: পারিবারিক ইউনিট (household unit) এবং কারখানা ইউনিট (Karkhana or manufactory unit)। পারিবারিক ইউনিটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আয়তনে এগুলি ছোট হয়, অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-কর্মকান্ডের জন্য আলাদা কোন কর্মশালা থাকেনা- বসতঘরের বারান্দা বা অন্য কোন স্থানে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালানো হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করা হয় এবং শিল্পোদ্যোক্তা নিজে সাধারণত: উৎপাদন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ শ্রম দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে কারখানা ইউনিটগুলি আয়তনে বড় হয়, উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য আলাদা কর্মশালা থাকে, ভাড়া-শ্রমিক (hired labourer) ব্যবহারের আধিক্য থাকে, শিল্পদ্যোক্তা নিজের সাধারণত: উৎপাদন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ শ্রম দেন না, তিনি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত ব্যবস্থাপকও (hired manager) নিয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে সঠিক সীমারেখা টানা কষ্টকর। অনেক সময়, বিশেষ করে মাঝারি আয়তনের, ইউনিটগুলি একটি অপরটির সাথে অধিক্রমণ (overlap) করে।

উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণত এক থেকে পাঁচ (১-৫) টি তাঁতওয়ালা ইউনিটগুলোকে পারিবারিক ইউনিটের আওতায় এবং ৬ বা তার বেশি তাঁতওয়ালা ইউনিটগুলোকে কারখানা ইউনিটের আওতায় ফেলা যায়। তাঁত সংখ্যার ভিত্তিতে এ' দু'শ্রেণির উৎপাদন ইউনিটকে আবার নিম্নলিখিতভাবে পুনঃবিভাজন করা যেতে পারে।[১৩]

১-২ তাঁতঃ ক্ষুদ্র পারিবারিক ইউনিট
৩-৫ তাঁতঃ বৃহৎ পারিবারিক ইউনিট
৬-১৯ তাঁতঃ ক্ষুদ্র কারখানা ইউনিট
২০ এর অধিক বৃহৎ কারখানা ইউনিট

উক্ত বিভাজন অনুযায়ী দুটি নমুনা জরিপের ফলাফল সারণি ২.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি-২.৩: নমুনা জরিপ অনুযায়ী শিল্প ইউনিটগুলোর বণ্টন

জরিপ/শিল্প ইউনিটগুলোর আকার বিন্যাস (তাঁত সংখ্যা অনুসারে)	ইউনিটের সংখ্যা	ইউনিটের শতকরা হিসাব	ইউনিট প্রতি গড় তাঁত সংখ্যা	মোট তাঁত সংখ্যা
ক. গ্রামীণ শিল্প সমীক্ষা, ১৯৭৯/৮০				
১-২ তাঁত	১০০	৬১.৭৩%	১.৩১	১৩১
৩-৫ তাঁত	৪০	২৬.৫৪%	৩.৭৭	১৬২
৬-১৯ তাঁত	১৯	১১.৭৩%	৭.৩২	১৩৯
২০+তাঁত	০%	০%	০%	%
মোট	১৬২	১০০%	২.৬৭	৪৩২
খ. তাঁত শিল্প সমীক্ষা, ১৯৮৬/৮৭				
১-২ তাঁত	৩১৬	৫৫.৪৪%	১.৩৮	৪৩৬
৩-৫ তাঁত	১২৭	২২.২৮%	৩.৯১	৪৯৭
৬-১৯ তাঁত	১০৫	১৮.৪২%	১০.১৫	১০৬৬
২০+তাঁত	২২	৩.৮৬%	৩৭.৪২	৮৩২
মোট	৪৭০	১০০%	৪.৯৭	২৮৩১

উৎসঃ নমুনা জরিপ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৭ম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০।

সারণি-২.৩ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭৮/৮০ সাল পর্যন্ত দেশে ক্ষুদ্র পারিবারিক (১-২ তাঁত) ইউনিটের শতকরা হার ছিল ৬.১৭৩% এবং (৬-১৯ তাঁত) ক্ষুদ্র কারখানা ইউনিটের শতকরা হার ছিল ১১.৭৩%। পাশাপাশি পরবর্তী সমীক্ষায় অর্থাৎ ১৯৮৬/৮৭ সাল পর্যন্ত (১-২ তাঁত) ইউনিটের শতকরা হার ছিল ৫৫.৪৪% এবং (৬-১৯ তাঁত) পর্যন্ত ক্ষুদ্র কারখানা ইউনিটের শতকরা হার ছিল ১৮.৪২%। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৮৬/৮৭ সালে বৃহৎ কারখানা ইউনিট এর সংখ্যা ছিল ৩.৮৬% যা ১৯৭৯/৮০ সালে ছিল শূন্যের কোঠায়। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত জরিপ ও শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় যা নিচের সারণিতে দেয়া হলোঃ

সারণি-২.৪: **Domestic cloth production, 1989-90 to 2002-03**

Year	Mills		Powerlooms		Handlooms		Total	
	Quantity	Percent	Quantity	Percent	Quantity	Percent	Quantity	Percent
1989-90	231.8	18.1%	220.0	17.2%	826.8	64.7%	1278.6	100%
1990-91	238.6	19.1%	195.0	15.6%	815.1	65.3%	1248.7	100%
1991-92	258.3	20.6%	190.0	15.2%	803.6	64.2%	1251.9	100%
1992-93	290.0	22.9%	185.0	14.6%	792.2	62.5%	1267.2	100%
1993-94	288.0	23.1%	180.0	14.4%	781.0	62.5%	1249.0	100%
1994-95	354.2	27.4%	170.0	13.1%	769.9	59.5%	1294.1	100%
1995-96	502.4	35.2%	165.0	11.6%	759.1	53.2%	1426.5	100%
1996-97	584.1	39.1%	161.0	10.8%	748.3	50.1%	1493.4	100%
1997-98	677.5	43.1%	155.0	9.9%	737.7	47.0%	1570.2	100%
1998-99	827.9	48.7%	145.0	8.5%	727.3	42.8%	1700.2	100%
1999-00	954.6	52.7%	141.0	7.8%	717.0	39.6%	1812.6	100%
2000-01	1207.4	59.1%	130.0	6.4%	706.9	34.6%	2044.3	100%
2001-02	1425.7	63.0%	142.0	6.3%	696.9	30.8%	2264.6	100%
2002-03	1590.0	65.0%	170.	6.9%	687.0	28.1%	2447.0	100%

Source: Ministry of Textile (MOT) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning-2003, p.13.

সারণি-২.৪ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯-৯০ সাল পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে টেক্সটাইল মিল কর্তৃক প্রাপ্ত কাপড়ের শতকরা হার ছিল ১৮.১%, পাওয়ারলুম থেকে উৎপাদিত কাপড়ের শতকরা হার ১৭.২% এবং হ্যান্ডলুম কর্তৃক উৎপাদিত কাপড়ের শতকরা হার ছিল ৬৪.৭%। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত শুমারি অনুযায়ী ২০০২-০৩ সালে টেক্সটাইল মিল কর্তৃক উৎপাদিত কাপড়ের শতকরা হার ৬৫.%, পাওয়ারলুম থেকে উৎপাদিত কাপড়ের শতকরা হার ৬.৯% এবং হ্যান্ডলুম থেকে উৎপাদিত কাপড়ের শতকরা হার ছিল ২৮.১%। এ থেকে দেখা যায় যে, হ্যান্ডলুম এবং পাওয়ারলুম থেকে মিল কর্তৃক কাপড় উৎপাদনের শতকরা হার বেড়েছে। পাশাপাশি এ তথ্যও রয়েছে যে বর্তমান টেক্সটাইল মালিক ও শ্রমিকের বেশিরভাগই পূর্বে তাঁত শিল্পের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল ব্যবসায়ীরা প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে টেক্সটাইল মিলে যুক্ত হয়েছেন এবং বেশিরভাগই কটন সুতা দিয়ে মিলগুলোতে সুতি কাপড় উৎপাদন করছেন। বিশিষ্ট টেক্সটাইল ব্যবসায়ী আবেদ টেক্সটাইলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নরসিংদী চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন[১৪] এক সাক্ষাতকারে এই তথ্য দিয়েছেন।

২.৭ সংসদে তাঁত শিল্প বিষয়ক আলোচনা

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে জানান, দেশে আবার তুলা উৎপাদনে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সরকারের লক্ষ্য। পরীক্ষামূলকভাবে তুলা উৎপাদন ইতিমধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং ব্যাপক তুলা চাষের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র বস্ত্র-

উৎপাদনে কৃত্রিম আঁশের ব্যাপক ব্যবহার চলছে। তুলার সঙ্গে কৃত্রিম আঁশের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্ত্র অনেক বেশি টেকসই হয় এবং এর উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়ে। প্রাকৃতিক গ্যাস এই কৃত্রিম আঁশ তৈরীর প্রধান উপাদান, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের মাটির নিচে বিপুল পরিমাণে গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে। আমরা তাই আমাদের এই বস্ত্রখাতে প্রাকৃতিক সম্পদকে কৃত্রিম আশ তৈরির কাজে লাগানোর উদ্দেশে পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভর হয়ে উঠব। বস্ত্র মিলগুলির উৎপাদন ও পরিচালনা ব্যবস্থার উপর সার্বক্ষণিক ও সার্বিক দৃষ্টি রাখার জন্য সরকার ১৯৭৭ সালে একটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত্র-মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। হস্তচালিত তাঁত শিল্প দেশের বস্ত্র-চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগ সরবরাহ করে বলে সরকার বাংলাদেশ তাঁত শিল্প বোর্ড গঠন করেছেন। আমাদের রেশম-শিল্পের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ। রেশম-শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার তাই বাংলাদেশ রেশম বোর্ডও গঠন করেছেন।[১৫]

উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সঠিক তথ্য উপাত্ত আবশ্যক। তাই সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে জরিপ ও শুমারি করা হয়েছে যেমন: ১৯৮৭ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশের মোট কাপড় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগ তৈরি করছে তাঁত শিল্প এবং মোট কাপড় সরবরাহের প্রায় ৭৩ ভাগ যোগান দিচ্ছে (১৯৮৬-৮৭ সনের অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী)। হস্তচালিত তাঁত শিল্প দেশের শিল্পখাতের জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৯ ভাগ অবদান রাখছে।[১৬]

২.৮ জাতীয় বাজেটে তাঁত শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১৯৮৭ সালের বাজেটে বস্ত্রখাতে দেশকে স্বনির্ভর করা ও বস্ত্রের চোরাচালান নিরোধের লক্ষ্যে সরকার বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালে ব্যাপক শুল্ক হ্রাস করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে এ শিল্পে গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এ বছরেও একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত বছরের প্রদত্ত শুল্ক সুবিধে অব্যাহত রেখে কাঁচামালের আমদানি শুল্ক আরোও হ্রাসের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এতে দেশে প্রস্তুত হয় এমন বস্ত্রের উৎপাদন ব্যয় কমবে এবং পণ্যমূল্যের উপর এর সুফল বর্তাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃত্রিম সুতা মিশ্রিত বস্ত্রের আমদানি শুল্কহার অপরিবর্তিত থাকবে তবে ট্যারিফ মূল্যকে যথাসম্ভব আন্তর্জাতিক মূল্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

(ক) এক তার সুতা, পাকানো ও টুইস্টেড সুতা ও সেলাই সুতার বর্তমানে প্রদেয় ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রস্তাব ১লা জুলাই, ১৯৮৭ ইং থেকে কার্যকরী করা হবে।

(খ) স্টেচ নাইলন সুতা ও লুমিলুরেক্স কৃত্রিম জরি সুতার আমদানি শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ২০ ভাগে ধার্য করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিক্রয়কর শতকরা ২০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকবে। ধাতব জরির শুল্কহার শতকরা ১০০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৫০ ভাগে ধার্য করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।

(গ) টেক্সটাইল ডাইজে বর্তমানে প্রযোজ্য বিক্রয়কর হার শতকরা ২০ ভাগ থেকে হ্রাস করে শতকরা ১০ ভাগে ধার্য করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। শুল্কায়ন ও পণ্য খালাসের সুবিধার্থে একই শুল্ক শিরোনামের অধীন অন্যান্য ডাইজেও একই শুল্কহার ও বিক্রয় কর হার প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) পশমী বস্ত্রে আমদানি শুল্কহার সুষম করে শতকরা ১৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ১০০ ভাগ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। কৃত্রিম সুতা মিশ্রিত বস্ত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য ৯ শতকরা ১০০ ভাগ) আমদানি শুল্ক ও বিক্রয়কর মওকুফের বিধান অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল এসিটেট্যাসিডেট আইটেমে বর্তমানে প্রযোজ্য শুল্কহার হ্রাস করে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ৩০ ভাগে ধার্য করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে।[১৭]

২.৯ সরকার কর্তৃক পরিচালিত শুমারি এবং এর ইতিবাচক দিক

২০০৩ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০% তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। এ শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৬৮.৭০ কোটি মিটার। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁতশিল্প খাতের অবদান ১,২২৭.০০ কোটি টাকারও বেশি। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় স্থানে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরে এর স্থান। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০০৩ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,৮২,৫১২টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬টি। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ৩,১১,৮৫১টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫টি। ২০০৩ সালের পর আর কোন শুমারি অনুষ্ঠিত না হলেও বাংলাদেশে তাঁত বোর্ড থেকে প্রকাশিত বার্ষিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদনে তাঁত শিল্পের তথ্য, এ শিল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীনে পরিচালিত প্রকল্প এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ভবিষ্যত কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে যা এই অধ্যায়ে পরবর্তীতে আলোচনায় এসেছে।

২.১০ বিভাগভিত্তিক তাঁত শিল্পের স্থাপনা

২০০৩ সালের তাঁতশুমারি হস্তচালিত তাঁতশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ২০০৩ সালের তাঁতশুমারি অনুযায়ী তাঁতের পরিমাণ নিম্নে সারণির মাধ্যমে দেখানো হল:

সারণি-২.৫: ২০০৩ সালের তাঁতশুমারি অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁত শিল্প

Division	Total units	Total looms	Percent	Currently			
				Operational	Percent	Non-operational	Percent
Barisal	2311	4741	100.0	1589	33.5	3152	66.5
Chittagong	92095	156829	100.0	73988	47.2	82841	52.8
Dhaka	30558	105467	100.0	71015	67.3	34452	32.7
Khulna	22379	37855	100.0	26038	68.8	11817	31.2
Rajshahi	32968	195749	100.0	135668	69.3	60081	30.7
Sylhet	3201	4915	100.0	3553	72.3	1362	27.7
Bangladesh	183512	505556	100.0	311851	61.7	193705	38.3

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Report on Bangladesh Handloom Census, 2003, Ministry of Planning, 2005, Chapter-4, p. 23.

সারণি ২.৫ থেকে দেখা যায় যে, বরিশাল বিভাগে চালু তাঁতের সংখ্যা ৪৭৪১ (৩৩.৫%), চট্টগ্রাম বিভাগে তাঁতের সংখ্যা ১৫৬৮২৯ (৪৭.২%), ঢাকা বিভাগে চালু তাঁতের সংখ্যা ১০৫৪৬৭ (৬৭.৩%), খুলনা বিভাগের চালু তাঁতের সংখ্যা ৩৭৪৫৫ (৬৮.৮%), রাজশাহী বিভাগে চালু তাঁতের সংখ্যা ১৩৫৬৬৮ (৬৯.৩%) এবং সিলেট বিভাগে চালু তাঁতের সংখ্যা ৪৯১৫ (৭২.৩%) শতাংশ। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি চালু তাঁত রয়েছে রাজশাহী বিভাগে এবং সবচেয়ে কম চালু তাঁত রয়েছে বরিশাল বিভাগে।

২.১১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নেটওয়ার্কসমূহ[১৮]

দেশব্যাপী তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের রয়েছে ৩২টি বেসিক সেন্টার; ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নরসিংদী); ১টি তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র (বেড়া, পাবনা); ২টি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (সিলেট ও রংপুর); বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী, ৩টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ স্টোর (শোভারামপুর-কুমিল্লা, কাউনিয়া-বরিশাল, শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ); ২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (কুমারখালী-কুষ্টিয়া, বাঞ্ছারামপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া); ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নরসিংদী, ৩টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র (কালিহাতী-টাঙ্গাইল, বেলকুচি-সিরাজগঞ্জ, কমলগঞ্জ-মৌলভীবাজার)।

২.১২ সরকার ঘোষিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ভিশনঃ শক্তিশালী তাঁত খাত

তাঁতিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধন যোগান, গুণগতমান সম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার তাঁত বোর্ডের ভিশন ঘোষণা করেছেন যা পরবর্তী সরকারী উদ্যোগুলো আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে।

২.১২.১ তাঁত শিল্প খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ; খ. মানব সম্পদ উন্নয়ন; গ. তাঁতবস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা; ঘ. উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;

২.১২.২ সরকার ঘোষিত তাঁত শিল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলসমূহ

দেশের তাত অধ্যুষিত এলাকায় বেসিক সেন্টার স্থাপন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ, উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করণসহ তাঁত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ভোক্তার চাহিদানুযায়ী ডিজাইন তৈরি এবং তা হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রে প্রয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট, বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

তাঁত শিল্প খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

সুতা, রং ও রাসায়নিক আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান।

তাঁত শিল্পের উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা।

তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণের জন্য দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে তাঁত বস্ত্র মেলার আয়োজন করা হয়।

২.১২.৩ তাঁত বোর্ডের কার্যাবলী[১৯]

ক) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা বা যৌক্তিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ।

খ) হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

গ) হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনা।

ঘ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ইউনিটসমূহের উন্নয়ন ও উপদেশমূলক সেবা প্রদান।

ঙ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য ঋণ সুবিধাদি সৃষ্টি।

চ) তাঁতি সমিতিসমূহের সহায়তায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন।

ছ) তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতিগণকে বস্ত্রে ব্যবহৃত ক্যামিক্যাল, খুচরা যন্ত্রাংশ, সুতা ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) তাঁতি সমিতিসমূহের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁত শিল্পসমূহকে কাঁচামাল সরবরাহ ও তাঁদের নিকট হতে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়পূর্বক গুদামজাতকরণের উদ্দেশে গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং

সকলের জন্য নকশা, সুতা তৈরি, ব্লিচিং, রংকরণ, ইস্ত্রি, ছাপা ও ফিনিশিং এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঝ) দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানির নিমিত্ত হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সুযোগ-সুবিধা এবং দ্রব্যাদির গুণগতমান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান;

ঞ) দেশে ও বিদেশে তাঁতপণ্য জনপ্রিয় করার উদ্দেশে প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

ট) তাঁতি সমিতিসহূহের মাধ্যমে তাঁতজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ:

ঠ) তাঁতি ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং তাঁদের উন্নয়ন;

ড) তাঁতিদের বয়নপূর্ব এবং বয়নোত্তর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; এবং

ঢ) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত কোন কার্যসম্পাদন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

২.১৩ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত জনবল

১৯৯০ এবং ২০০৩ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি-২.৬: ১৯৯০ এবং ২০০৩ সালের তাঁতশুমারি অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা

Type	1990						2003					
	Full time	%	Part time	%	Total	%	Full time	%	Part time	%	Total	%
1.Family members	3,97,607	69.0	1,78,419	31.0	5,76,026	100	2,09,636	51.2	2,00033	48.8	4,09,669	100
Adult	3,23,574	71.6	1,28,382	28.4	4,51,966	100	1,88,488	57.9	1,36,687	42.1	3,25,175	100
Child	74,033	59.7	50,037	40.3	1,24,070	100	21,148	25.0	63.346	75.0	84,494	100
2. Hired labour	3,16,536	70.1	1,34,845	29.9	4,51,381	100	2,63,235	55.0	2,15,211	45.0	4,78,446	100
Adult	2,80,191	74.1	90.002	25.9	3,78,193	100	2,50,070	59.1	1,72,786	40.9	4,22,856	100
Child	36,345	49.7	36,843	50.3	73.188	100	13,165	23.7	42,425	76.3	55.590	100
Total=(1+2)	7,14,143	69.5	3.13,264	30.5	10,27,407	100	4,72,871	53.2	4,15,244	46.8	8,88,115	100

Source: Report on Bangladesh Handloom Census, 2003. p. 59.

সারণি-২.৬ থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে তাঁতশুমারি অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে পারিবারিক শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭৬০২৬ জন এবং নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মোট ৪৫১৩৮১ জন এবং ২০০৩ তাঁতশুমারি অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে পারিবারিক নিজস্ব শ্রমিকের সংখ্যা ৪০৯৬৬৯ জন এবং বেতনভুক্ত ৪৭৮৪৪৬ জন। এ থেকে দেখা যায় যায় যে ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০০৩ সালে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে পেশাদার বেতনভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে।

সারণি ২.৭: লিঙ্গভেদে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা: ১৯৮৬-২০০৩

Sex	1986	%	1987	%	1990	%	2003	%
Male	6,48,865	73	4,43,135	55	4,71,765	56	4,72,367	53
Female	2,44,169	27	3,62,565	45	4,55,642	44	4,15,748	47
Total	8,93,034	100	8,05,700	100	10,27,407	100	8,88,115	100

Source: Report on Bangladesh Handloom Census, 2003. p. 49.

সারণি ২.৭ থেকে দেখা যায় যে, লিঙ্গভেদে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৮৬ সালে ৭৩% এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ২৭%। ১৯৮৭ সালে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৫৫% এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৪৫%, ১৯৯০ সালে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৫৬% এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৪৪%, ২০০৩ সালে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ৫৩% এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭%। অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের তুলনায় ২০০৩ সালে লিঙ্গভেদে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২০% বেড়েছে।

সারণি-২.৮: ২০০২-২০০৩ সালে বিভাগ ওয়ারী ও লিঙ্গভেদে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত জনসংখ্যা

Divisions	Total	%	Male	%	Female	%
Barisal	5212	100.0	2156	41.4	3056	58.6
Chittagong	115041	100.0	28672	24.9	86369	75.1
Dhaka	249749	100.0	142906	57.2	106843	42.8
Khulna	104182	100.0	51738	49.7	524444	50.3
Rajshahi	402954	100.0	243840	60.5	159114	39.5
Sylhet	10977	100.0	3055	27.8	7922	72.2
Bangladesh	888115	100.0	472367	53.2	415748	46.8

Source: Report on Bangladesh Handloom Census, 2003. p. 67.

সারণি-২.৮ থেকে দেখা যায় যে, ২০০২-২০০৩ সালে তাঁতশুমারি অনুযায়ী পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৬০.৫%) রাজশাহী বিভাগে এবং নারী শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৭৫.১%) চট্টগ্রাম বিভাগে।

২.১৪ সরকারি বরাদ্দ

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া এ সকল প্রকল্পগুলোর জন্য ১৮৪৮ (এক হাজার আটশত আটচল্লিশ) কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

> The government has taken a number of projects worth Tk 1,848 crore for modernising the handloom industry to meet the growing domestic demand and compete globally.Official documents show that the government is going to set up a handloom village on the capital's outskirts by December 2018, spending Tk 146,370 lakh.
>
> Besides, the government has taken a project involving Tk 26,160 lakh to provide running capital, resume production in closed handloom factories and modernise handlooms for improving the socioeconomic condition of the people involved, to be implemented by June 2020. Ten training and two market promotion centres will be constructed at Basic Centres of Bangladesh Handloom Board at an estimated cost of Tk 6,664 lakh, scheduled to be completed by December, 2018.
>
> Another project for modernising the diploma course and expansion of necessary infrastructure of Bangladesh Handloom Education and Training Institute situated in Narsingdi involving Tk 3,081 lakh will be completed by Decmber 2018. To bring back the lost glory of "muslin" cloth, a project titled "Research for Regaining Technology of Muslin Thread and Cloths" has been taken with an estimated cost of Tk 718 lakh, to be implemented by December, 2018.
>
> A senior official at the textiles and jute ministry told the news agency that distribution of microcredit among weavers is also underway. As of March, Tk 6,471.39 lakh has been distributed among 41.324 weavers against their 56,625 handlooms.[২০]

২.১৫ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীনে বেসিক সেন্টারের কার্যক্রম

তাঁত শিল্পীদের সেবা প্রদানের জন্য দেশব্যাপী ৩২টি বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে তাঁতি সমিতি বিধিমালা-১৯৯১ মোতাবেক তাঁতি সমিতির সদস্যদেরকে সংগঠিত করা, তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ, গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাঁতিদেরকে ঋণ প্রদান, তাঁতিদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা এবং তাঁত শিল্পের বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান করা বেসিক সেন্টারের কাজ। একজন লিয়াজোঁ অফিসারের অধীনে ফিল্ড সুপারভাইজারগণ কাজগুলো সম্পাদন করে থাকেন।

২.১৫.১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বেসিক সেন্টারভিত্তিক নিবন্ধিত তাঁত কারখানার সংখ্যা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৩২টি বেসিক সেন্টারের কার্যকরী এলাকায় মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরেজমিন যাচাই বাছাই করে ২৭২টি কারখানা নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।

২.১৬ তাঁত শিল্প বিকাশে অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বর্তমান পলিসি অনুযায়ী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড তাঁত শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁতী ও নতুন উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

২.১৬.১ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

নরসিংদী বৃহত্তর ঢাকা এলাকার একটি তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাঁত শিল্প ও প্রশিক্ষণের সুযোগ। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনন, রংকরণ, নকশা এবং প্রিন্টিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, তাঁত প্রযুক্তি ও রংকরণের প্রায়োগিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ এবং অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। মার্চ ২০১৮ মাসে এ কেন্দ্র হতে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে "সুতা রংকরণ" শীর্ষক বিষয়ে ১৪ দিন মেয়াদি একটি ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু (০১.০৪.১৯৮৪ খ্রিঃ) থেকে মার্চ, ২০১৮ মাস পর্যন্ত সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং টাই এন্ড ডাই, সুতা রংকরণ, ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁতে বুনন এবং ব্যয় নিরূপণ ও বাজারজাতকরণ কোর্সে "হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)ঃ হতে ২০৭৪ জন, একই ক্যাম্পাসে অবস্থিত "প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন (টিপিআইটি)", নরসিংদী হতে ৩,৩৭৪ জন, Strengthening and Expansion of Technical and Vocational Education and Training (SETVET)", কর্মসূচির আওতায় ১,৭৩৯ জন, সিএইচপিইডি- এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩০০ জনসহ সর্বমোট ৭,৪৭১ জন তাঁতিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.২ ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্স

বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর হতে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কোর্স চালু করা হয়।

২.১৬.৩ তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা

এ উপকেন্দ্রের মাধ্যমেও তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বুনন, রংকরণ, নকশা এবং প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ; তাঁত প্রযুক্তি ও রংকরণের প্রায়োগিক গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নির্ধারণ এবং অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বমোট ১২০ জন

প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য লক্ষ্যমাত্র নির্ধারিত রয়েছে। মার্চ ২০১৮ মাসে এ উপকেন্দ্র হতে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে "সুতা রংকরণ ও বুনন" শীর্ষক বিষয়ে ০১ (এক) মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু (১৯.০১.১৯৮৯ খ্রিঃ) থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩,৯০৬ জন তাঁতিকে "সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন" এবং সুতা রংকরণ ও টেক্সটাইল প্রিন্টিং" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.৪ তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর

এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তাঁতিসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংযুক্ত বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান ও তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

২.১৬.৫ তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিমনগর, সিলেট

সিলেট এবং মৌলভীবাজার জেলাধীন মনিপুরি তাঁতিদেরকে অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সেমি অটোমেটিক তাঁতে বুনন, উন্নত রংকরণ এবং নকশা প্রণালীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুরু (১৯.১১২০১৮) থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ১২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৬.৬ সার্ভিসিং কার্যক্রম

তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধীন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬টি কারিগরি সেবা দান কেন্দ্র আছে। এ ৬টি কেন্দ্র হলো: ০১টি বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সিপিসি, মাধবদী, নরসিংদী; ০৩টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার শোভারামপুর-কুমিল্লা, কাউনিয়া-বরিশাল, শাহজাদপুর-সিরাজগঞ্জ); ০২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (কুমারখালী-কুষ্টিয়া, বাঞ্ছারামপুর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। ০৬টি কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে মাধবদী, শাহজাদপুর ও কুমারখালীতে ৩টি কেন্দ্র চালু আছে। সিপিসি, মাধবদী কেন্দ্রে সিনজিং, ওয়াশিং এন্ড ডাইং, প্রিন্টিং, স্টেনটারিং ও

ক্যালেন্ডারিং; টিএফসি, শাহজাদপুর কেন্দ্রে টুইস্টিং ও ক্যালেন্ডারিং এবং এসএফসি কুমারখালী কেন্দ্রে টুইস্টিং, ইউভিং, প্রিন্টিং ও ক্যালেন্ডারিং কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।[২১]

২.১৬.৭ ফ্যাশন ডিজাইন কার্যক্রম

নরসিংদী জেলার সাহেপ্রতাপে স্থাপিত ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফ্রাশন ডিজাইন টেক্সটাইল টেকনোলজি কোর্স চালু করার নিমিত্তে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ০৭.০৯.২০১৭ তারিখে চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রসমূহের আওতায় ১০৫টি জনবলের পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.১৭ তাঁতিদের ঋণ গ্রহণ ও বিতরণ সংক্রান্ত আর্থিক সহযোগিতা (সরকারি ও বেসরকারি)

বিভিন্ন সময়ে তাঁতিগণ সরকারি বেসরকারি, ব্যক্তিগত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। তার একটি নমুনা নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো:

সারণি-২.৯: তাঁতিদের ঋণ গ্রহণ ও বিতরণ সংক্রান্ত আর্থিক সহযোগিতা[২৪]

Loom size	Total	Bank	All cooperative	Relatives	Mahajan/Paiker	Handloom Board
1	100.0	21.7	14.1	6.1	46.3	11.8
2	100.0	21.4	12.4	8.9	43.0	13.6
3	100.0	20.2	1.0	11.4	47.0	11.0
4	100.0	20.0	7.7	11.2	51.4	9.7
5	100.0	17.7	7.0	11.4	56.5	7.4
6-9	100.0	14.7	6.5	9.8	62.7	6.4
10-15	100.0	12.3	6.0	10.8	65.4	5.5
16-19	100.0	13.1	4.6	11.2	65.8	5.4
20+	100.0	11.3	3.7	14.3	66.9	3.7
Total	100.0	17.6	6.8	6.4	61.8	7.4

Source: Report on Bangladesh Handloom Census, 2003. p.88

সারণি ২.৯ থেকে দেখা যায় য, বড় কারখানাগুলো অর্থাৎ ২০টির বেশি লুমের মালিকরাও ৬৬.৯% ঋণ নিয়ে থাকে মহাজন/পাইকারদের কাছ থেকে। ১ থেকে ৩টি লুমের মালিকরাও ব্যাংকিং অথবা প্রাতিষ্ঠানিক খাতের চাইতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত অর্থাৎ মহাজন/পাইকারদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন ৪০% এর বেশি তাঁতি। সার্বিক চিত্র হলো শিক্ষা, সচেতনতার অভাব অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার অভাব যে কারণেই হোক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত অর্থাৎ মহাজন/পাইকারদের কাছ থেকে তাঁতিদের ঋণ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রবণতা অনেক বেশি।

সরকারি পর্যায়ে তাঁতিদের বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্ত চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০.১৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে “তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (সংশোধিত)” শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৮ থেকে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ

হলেও আদায়কৃত লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে ঋণ বিতরণ পরবর্তী সরকারসমূহ ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। নতুন করে এ কর্মসূচির আওতায় মার্চ ২০১৮ মাসে ৮৮ জন তাঁতিকে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও উক্ত মাসে কোনো তাঁতিকে ঋণ প্রদান করা হয়নি। আলোচ্য মাসে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০.৮৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত আদায় হয়েছে ২৭.৯৮ লক্ষ টাকা। আদায়ের গড় হার ১৩৪.৩৩%।

তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় সমাপ্ত প্রকল্পটির অনুকূলে ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা সরকারের নিকট হতে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ০২/১০/২০১২ তারিখে ২,৬৩৮.৫২ লক্ষ টাকা, ২৫/১০/২০১৫ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ৯/৭/২০১৩ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ্য টাকা, ২৬/০৬/২০১৬ তারিখে ২০০.০০ লক্ষ টাকা, ০৪/১০/২০১৫ তারিখে ২৭৫.০০ লক্ষ, ১৯/১০/২০১৫ তারিখে ২৭০.৩০ লক্ষ টাকা, ২৬.০৬.২০১৬ তারিখে ১০০.০০ লক্ষ টাকা, ১৬.১১.২০১৬ তারিখে ২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ০২.০৩.২০১৭ তারিখে ১০০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪,০০৮.৮২ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়েছে।

২.১৮ তাঁত বস্ত্রের "কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র" ইস্যুকরণ (তাঁত শিল্পের প্রতি সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি)

হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তথা হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিয়োজিত প্রান্তিক তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে রপ্তানিকারদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানির সুবিধার্থে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে হস্তচালিত তাঁত শিল্প জাত বস্ত্রে 'কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র' প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র মার্চ ২০১৮ মাসে ৮টি রপ্তানিকারণ প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫,৬২,৩৯১.০০ মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৪টি 'কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র' প্রদান করা হয়েছে।[২২]

সারণি ২.১০: তাঁত বস্ত্রের "কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র" ইস্যুকরণ

মাসের নাম	রপ্তানিকৃত দেশের নাম	পণ্যের নাম	পণ্যের পরিমাণ	মূল্যমান (ইউএস ডলার)
মার্চ ২০১৮	ভারত	টাঙ্গাইল তাঁত কটন শাড়ি	২,১০,৬৪৪ পিস	৬,৩১,৯৩২.০০
		তাঁত কটন শাড়ি	২,৫২,৩০০ পিস	৭,৫৬,৯০০.০০
		তাঁত লুঙ্গি	১,০৫,০০০ পিস	১,৫৭,৫০০.০০
		তাঁতজাত পণ্য (স্কার্ফ)	৩৬,৩৬০ পিস	১৬,০৫৯.০০
			সর্বমোট	১৫,৬২,৩৯১.০০

উৎস: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন, মার্চ, ২০১৮।

সারণি ২.১০ থেকে দেখা যায় যে, তাঁত বস্ত্রের "কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র" নিয়ে রপ্তানিকারকগণ বেশিরভাগ শাড়ি, লুঙ্গি বিদেশে রপ্তানি করছেন যা থেকে ২০১৮ সালে বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে ১৫,৬২৩৯১ মার্কিন ডলার। মাসিক হিসেবে বিবেচনায় যার পরিমাণ মোটেও কম নয়।

২.১৯ তাঁতি সমিতি গঠন ও অডিটকরণ এবং তাঁত কারখানার অনুমোদন

তাঁতি সমিতি বিধিমালা ১৯৯১ এ বর্ণিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১,৩২৬টি প্রাথমিক, ৫৬টি মাধ্যমিক এবং ০১টি জাতীয় তাঁতি সমিতি নিবন্ধন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩১টি বেসিক সেন্টারের আওতাধীন ২৫০টি তাঁতি সমিতি অডিট করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৮ মাসে ০৯টি বেসিক সেন্টারের আওতায় মোট ২৭টি প্রাথমিক তাঁতি সমিতির অডিট সম্পন্নসহ সর্বমোট ২১৫টি তাঁতি সমিতির অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তাঁতি সমিতির তথ্যাদি, প্রাথমিক তাঁতি সমিতি অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি এ প্রতিবেদনের সারণি-৫ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত তাঁত কারখানার (বিশ ও বিশোর্ধ্ব তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত) সংখ্যা ২৭২টি।

২.২০ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রকল্পসমূহ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চলতি প্রকল্প হলোঃ (ক) ব্যালেন্সিং মর্ডানাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশান (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী (১ম সংশোধিত) ; (খ) এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (১ম সংশোধিত) প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ব্যালেন্সিং মর্ডানাইজেশন প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এডিপি'তে ৩,৮০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত "ব্যালেন্সিং মডার্নাইজেশন রিনোভেশন এন্ড এক্সপানশন (বিএমআরই) অব দ্যা এক্সিসটিং ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার এ্যাট মাধবদী, নরসিংদী" শীর্ষক ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বিএমআরইকরণের

মাধ্যমে তাঁতিদের স্বল্প মূল্যে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ সেবা যথাঃ কাপড় রংকরণ, মার্সেরাইজিং, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

২. প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ৪১৫৮.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৩. ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আরএডিপি'তে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে থেকে ১ম কিস্তি বাবদ ১০৭.২৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অনকূলে ৫০.৬৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের অগ্রগতি ১১.৮১%। প্রকল্পের শুরু থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৬৭.৪৫২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০.০০%।

৪. প্রকল্পের আওতায় কার্যাদেশ প্রদানকৃত অংশের বাউন্ডারি ওয়াল এবং পুরাতন ফ্যাক্টরি ভবনের মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অফিস ভবন (ভূমি উন্নয়নসহ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফ্যাক্টরি ভবনের নির্মাণ কাজ গড়ে প্রায় ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ১টি স্ট্যান্টার মেশিন ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট মেশিনারিজ ক্রয়/সংগ্রহের নিমিত্ত PSI সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ জুন ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ আগামী জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধিপূর্বক মোট ৪৪৫৮.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধনের প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটিয়ে মোট ৪৫৫৮.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০১.০৩.২০১৮ তারিখে প্রকল্প প্রস্তাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.২০.১ এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া (১ম সংশোধিত)

দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতিদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সুতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁতনিবিড় এলাকায় "এস্টাবলিশমেন্ট অব থ্রি হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টারস ইন ডিফারেন্ট লুম ইনটেনসিভ এরিয়া" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ ৩টি সার্ভিস সেন্টার হলোঃ- (১) কালিহাতি, টাঙ্গাইল; (২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং (৩) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোট ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এডিপি'তে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে থেকে ১ম কিস্তি বাবদ ১৩২.৯৬ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ১১০.২৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের অগ্রগতি ২৯.৭১%। প্রকল্প শুরু থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৩৪.৪২৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪২.০০%।

প্রকল্পের আওতায় কালিহাতি সার্ভিস সেন্টারের পূর্ত নির্মাণ কাজ গড়ে প্রায় ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। শাহজাদপুর ও কুমারখালী সার্ভিস সেন্টারের ফ্যাক্টরি শেডের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ ২টি সেন্টারের অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ গড়ে প্রায় ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কালিহাতি কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি সরবরাহের নিমিত্ত PSI সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই যন্ত্রপাতিসমূহ কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করা হবে। প্রকল্পে স্থাপিতব্য কালিহাতি, শাহজাদপুর ও কুমারখালী কেন্দ্রের ETP এর পূর্ত নির্মাণ কাজ প্রায় ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের শাহজাদপুর ও কুমারখালি কেন্দ্রের যন্ত্রপাতিসমূহ ইউরোপ বেইজড নির্ধারণ করায় এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৯ এ নির্ধারণপূর্বক মোট ৮৮৫০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী প্রস্তাব ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে; উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে।

২.২১ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ

তাঁত বোর্ডের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো হলো: (১) বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়), (২) শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন, (৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ০২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন, (৪) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে বিদ্যমান ডিপ্লোমা কোর্সের যুগোপযোগীকরণ এবং এর অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ, (৫) দেশের তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, বন্ধ তাঁত চালু করা এবং তাঁতের আধুনিকায়ন, (৬) তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং (৭) মিরপুরের সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পগুলো বরাদ্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছ।

২.২১.১ বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিনের সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (১ম পর্যায়)

মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, মসলিন কাপড়ের নমুনা সংগ্রহ এবং নমুনা হতে মসলিন সুতার DNA সিকোয়েন্স সনাক্তকরণ, মসলিনের সুতা তৈরির "ফুটি কার্পাস" (বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আছে কিনা তা) অনুসন্ধান করা, "ফুটি কার্পাস" উদ্ভিদের DNA এর সাথে মসলিন কাপড়ের DNA বিশ্লেষণ করে কাঙ্ক্ষিত বহুমুখী উপযোগীতা সনাক্তকরণ এবং মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী "ফুটি কার্পাস" তুলার জাত পাওয়া না গেলে সমজাতীয় তুলার জার্ম-প্লাজম সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিপি'টি মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে গত ২০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট ১২১০.০০ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।[২৩]

২.২১.২ শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপন

দরিদ্র ও প্রান্তিক তাঁতিদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাঁতি পরিবারকে আবাস-কাম-কারখানা স্থাপনের জন্য জমির প্লট বরাদ্দ করা, তাঁতবস্ত্রকে জনপ্রিয় এবং তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্র বিপণনের সুবিধার্থে প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা, উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেখানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তা খেলার মাঠসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা, তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে মোট ১,৫৮,০৯০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে Development Project Proposal (DPP) প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.২১.৩ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন

দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকাসমূহের তাঁতিদেরকে উন্নত বয়ন ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, বছরে ৩০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাঁত বস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতিদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় ৫টি বেসিক সেন্টারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং ০২টি মার্কেট প্রমোশন কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্প ৬১১৯.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে

গত ১৯ মে, ২০১৬ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি এডিপিতে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.২১.৪ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে বিদ্যমান ডিপ্লোমা কোর্সের যুগোপযোগীকরণ এবং এর অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পরিচালনাধীন বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ২০০৯-২০১০ সেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি (এইচএসটিস ভোকেশনাল) কারিকুলামে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১১ সেশন থেকে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল কারিকুলাম চালু হয়। ফলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও আবশ্যকতা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামনে রেখে বর্তমানে একাডেমিক কার্যক্রম চালুর ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জরুরি হয়ে পড়ে।

নরসিংদীতে অবস্থিত বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট বিদ্যমান ডিপ্লোমা কোর্সের আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ডিপ্লোমা কোর্সের আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণ" শীর্ষক ৩৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.২১.৫ দেশের তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ, অচল তাঁত চালু করা এবং তাঁতের আধুনিকায়ন

দেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক তাঁতিদেরকে চলতি মূলধন সরবরাহ করা, অচল তাঁতকে সচল করা, যা তাঁতিদের উৎপাদন ও আয়কে বর্ধন করে, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, তাঁতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে গুণগত মানসম্পন্ন তাঁত বস্ত্র উৎপাদন করা যা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে মোট ১৫৯০৫.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটির ডিপিপি গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি এডিপিতে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.২১.৬ তাঁতজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ

ক্রেতাগণের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈচিত্র্যময় তাঁতজাত পণ্য উৎপাদন করা, আধুনিক ডিজাইন ও ফ্যাশন হাল ফ্যাশন চালু করে বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁতগুলো চালু করা, উন্নত ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ করা, তাঁতজাত পণ্য বহুমুখীকরণে লাগসই প্রযুক্তির প্রবর্তন করা এবং গ্রামীণ বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের

সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ১,৭৪০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৭ এডিপি'তে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২.২১.৭ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ, বোর্ডের কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আবাসিক ভবন নির্মাণ, উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট নির্মাণসহ তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ১৫৪০০.০০ লক্ষ্য টাকার পূর্ত নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন (Estimate) প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় উক্ত স্থাপনাসমূহের পাশাপাশি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি মোট ১২৩৯০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে পুনর্গঠনকৃত গত ০৭ মে, ২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে উক্ত ডিপিপি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ০১. এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি এডিপিতে নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

বিগত ১২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন: "মিরপুরের জমি তাঁত বোর্ডের অফিস ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে"ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী মিরপুরস্থ ৩.০০ একর জমিতে ডিজিটাল সার্ভে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাতাঁবো থেকে "বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপন, মিরপুর, ঢাকা" শিরোনামে প্রেরিত পূর্ত কাজের প্রাক্কলন (Estimate) গণপূর্ণ উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ভেটিং করে নেয়া হয়েছে এবং ১২৩৯০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়নকরতঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১১ জুন, ২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্প যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটিয়ে মোট ১১৮৩০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনবল নির্ধারণের প্রস্তাবসহ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকালীন জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা গত ১৬ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটিয়ে মোট ১১৫৫০.০০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে উক্ত ডিপিপি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ০১. এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।[২৫]

২.২২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে তাঁত শিল্প বিকাশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বিকাশে বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যা নিম্নের উপস্থাপন করা হলো:

কেন্দ্রের নাম	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ক্ষ্যমাত্রা (জন	নতি কোর্সে সংখ্যা	চলতি কোর্স শুরুর তারিখ	চলতি কোর্স সমাপ্তির তারিখ	চলতি কোর্সে শিক্ষণার্থীর সংখ (জন)	মাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	বিএইচটিআই হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		সর্বমোট	মন্তব্য
									পুরুষ	মহিলা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক) হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি)	বুনন ও বাজার জাতকরণ	১ মাস	২০	-	-	-	-	৩২টি	৫৭১	১৬১	৭৩২	
	বুনন ও বাজার জাতকরণ	২ মাস	২০	-	-	-	-	৬৯টি	৭০৫	৫১২	১২১৭	
	রংকরণ ও বুনন	২ মাস	২০	-	-	-	-	০৭টি	৬৬	৫৯	১২৫	
	মোট =								১৩৪২	৭৩২	২০৭৪	
খ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তি উন্নয় (টিপিআইটি), নরসিংদী	১) বুনন ও রংকরণ	৪ মাস	১০	-	-	-	-	০৬টি	৫৯	০৮	৬৭	
	২) সুতা রংকরণ	৪ মাস	১০	-	-	-	-	০১টি	০৮	-	০৮	
	৩) সুতা রংকরণ	২ মাস	২০	-	-	-	-	২৯টি	৩০৯	১৮৬	৪৯৩	
	৪) ডবি ও জ্যাকার্ড ডিজাইনে বুনন	২ মাস	২০	-	-	-	-	১৬টি	২১৩	৬০	২৭৩	
	৫) এস.এ তাঁতে বুনন	১ মাস	২০	-	-	-	-	০৩টি	-	৫৪	৫৪	
	৬) টাই এন্ড ডাই	১ মাস	২০	-	-	-	-	০২টি	-	৪০	৪০	
	৭) ব্লক ও বাটিক	১ মাস	২০	-	-	-	-	০৩টি	-	৫৪	৫৪	
	৮) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং	২ মাস	২০	-	-	-	-	৩৩টি	৩১	৫৯৯	৬৩০	
	৯) টাই এন্ড ডাই	২ মাস	২০	-	-	-	-	৩০টি	২৬২	২৮৪	৫৪৬	
	১০) এস এ তাঁতে বুনন	২ মাস	২০	-	-	-	-	২২টি	২৪২	১৩০	৩৭২	
	১১) স্ক্রিন প্রিন্টিং	২ মাস	২০	-	-	-	-	২০টি	২৬৪	১০৯	৩৭৩	
	১২) ব্যয় নিরূপণ ও বাজারজাতকরণ	২ মাস	২০	-	-	-	-	১৩টি	১৮৬	৪৮	২৩৪	
	১৩) টেক্সটাইল প্রিন্টিং	২ মাস	২০	-	-	-	-	০৭টি	-	১৩১	৩১৩	
	১৪) তাঁত বস্ত্রের বাজারজাতকরণ	২ মাস	২০	-	-	-	-	০৫টি	৪৫	৩৮	৩৮	
	মোট =								১৬১৯	১৭৩৯	৩৩৫৮	
(গ) SETVET কর্মসূচির আওতায় (২০০৯-১০ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে)										১৭৩৯	১৭৩৯	

উৎস: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন , মার্চ, ২০১৮।

তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএইচটিআই), নরসিংদীর একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলি

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা (জন)	কোর্স নম্বর	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জন)	সমাপ্ত কোর্সের সংখ্যা	বিএইচটিআই হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১-২০১১	৪০	১	-	০৩ টি	৩৯
২	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১১-২০১২	৪০	২	-		৪৯
৩	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১২-২০১৩	৮০	৩	-		৭৯
৪	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৩-২০১৪	৮০	৪	৮৪	-	মোট= ১৬৭ জন
৫	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৪-২০১৫	৮০	৫	৭০	-	শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৬	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৫-২০১৬	৮০	৬	৮২	-	
৭	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৬-২০১৭	১০০	৭	৭৬	-	
৮	ডিপ্লোমা - ইন - টেক্সটাইল	৪ বৎসর	২০১৭-২০১৮	১০০	৮	৯৫	-	
	মোট=					৪০৭		

উৎস: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, মার্চ, ২০১৮।

তাঁতি সমিতি : বেসিক সেন্টারওয়ারী নিবন্ধিনকৃত তাঁতী সমিতির তথ্যাবলি, ২০১৮

ক্রঃ নং	বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলাসমূহ	তাঁত সংখ্যা (তাঁত শুমারি ২০০৩ অনুসারে)	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তাঁত সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তাঁত কারখানার সংখ্যা
					প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	আড়াইহাজার	আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ	রূপগঞ্জ ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ জেলা	৯৩৪৮	৫১	২	১০		৫
২	বান্দরবান	বালাঘাটা, বান্দরবান	বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলা।	১৯৬৯৬	২৭	-	৫		১
৩	বাঞ্ছারামপুর	এস.এফ,সি বাঞ্ছারামপুর বি.বাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	১০৫০৫	৪৭	১	২		২
৪	ভাঙ্গা	ভাঙ্গা, ফরিদপুর	ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা	২৭০২	১৮	-	১০		১
৫	চিরিরবন্দর	রানীর বন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলা।	৩৩৮৯	২৬	২	১৮		৩
৬	কক্সবাজার	ঝিলংজা, কক্সবাজার	কক্সবাজার জেলা	৬৪৭	১৫	-	-		-
৭	দোহার	জয়পাড়া, দোহার	দোহার, নবাবগঞ্জ, উপজেলা এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা।	৭৭৬৯	৪৪	৩	৫		৪
৮	গৌরনদী	গৌরনদী, বরিশাল	বরিশাল ও ভোলা জেলা।	৩৩৮৯	৩৯	৩	২০		-
৯	হোমনা	রামকৃষ্ণপুর, হোমনা কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী এবং লক্ষীপুর জেলা।	৫৬১৬	৫৬	২	২২		৪
১০	যশোর	পালপাড়া, বিহারী কলোনী, যশোর	যশোর ও নড়াইল জেলা	৪০৪৫	৫১	৪	৩		৩
১১	কাহালু	কাহালু, বগুড়া	বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও গাইবান্ধা জেলা।	৮০০২	৬৪	২	৫		-
১২	কালিগঞ্জ	নলতা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা।	২০৫৫	১৬	১	১		৩

ক্রঃ নং	বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলাসমূহ	তাঁত সংখ্যা (তাঁত শুমারি ২০০৩ অনুসারে)	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তাঁত সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তাঁত কারখানার সংখ্যা
					প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	
১৩	কালিহাতী	বল্লাবাজার, কালিহাতি, টাঙ্গাইল	কালিহাতি, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর ও ভুয়াপুর উপজেলা।	১৮৭৪৯	১৭	১	৫		১৩
১৪	কমলগঞ্জ	পাত্রখোলা, কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার	সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা।	৪৯১৫	২২	-	২		১
১৫	খুলনা	উপজেলা চত্বর ফুলতলা, খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা।	১৫৯৩	২৭	২	৪		১
১৬	কুষ্টিয়া	এস.এফ.সি কুমারখালী, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাজবাড়ী জেলা।	২৭৭৪৩	১০৩	৫	৮		২২
১৭	মিরপুর	প্লট নং-৩, ব্লক-এফ, সাংবাদিক আবাসিক এলাকা, মিরপুর ঢাকা।	ঢাকা শহর, সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা।	১২৩৭৭	২৬	২	১		১০
১৮	ময়মনসিংহ	জেলা পরিষদ ভবন, ময়মনসিংহ।	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর জেলা।	১৪৬৩	৭৮	৪	১১		১
১৯	নরসিংদী	তাঁত প্রশিক্ষণকেন্দ্র, সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী	নরসিংদী জেলা	২৬৬৯৩	১৫৯	৪	১৩		১৪
২০	পটুয়াখালী	রুস্তম মৃধার কালভার্ট, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী।	পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলা	১৩২৪	২৬	-	৪		-
২১	রাজশাহী	কাদিরগঞ্জ, গ্রেটাররোড, রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা	৫৩৮৫	৩৯	২	২		৬
২২	রাঙ্গামাটি	দক্ষিণকালিন্দীপুর, নিউমার্কেট বিল্ডিং এলাকা রাঙ্গামাটি।	রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা	১২০৩৬৫	১৫	-	-		১
২৩	রূপগঞ্জ	ভুলতা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	রূপগঞ্জ উপজেলা	৫৩৯৫	২২	১	২		৩৮
২৪	সাথিয়া	সাথিয়া, পাবনা	পাবনা জেলা	৩৫১১৯	১০৪	৫	৪		৮

ক্রঃ নং	বেসিক সেন্টারের নাম	বেসিক সেন্টারের ঠিকানা	বেসিক সেন্টারের আওতাধীন জেলাসমূহ	তাঁত সংখ্যা (তাঁত শুমারি ২০০৩ অনুসারে)	সমিতির সংখ্যা		প্রাথমিক তাঁত সমিতির অডিটকরণ সংক্রান্ত তথ্য		নিবন্ধিত তাঁত কারখানার সংখ্যা
					প্রাথমিক	মাধ্যমিক	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	
২৫	সাতক্ষীরা	ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা, কলারোয়া ও তালা উপজেলা	৩৬৬	১৮	১	১৪		১
২৬	শাহজাদপুর	টি.এফ.সি, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা।	৫৪৩২১	৩৮	১	৪		২৭
২৭	শৈলকুপা	শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।	ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা	৪৫৭৯	৪৯	২	২		৯
২৮	সিরাজগঞ্জ	স্টেশন রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ, বেলকুচি, কামারখন্দ, কাজিপুর ও তারাশ উপজেলা।	৬৯১০৭	৬৯	২	৯		৮০
২৯	টাঙ্গাইল	এস.এফ.সি বাজিদপুর, টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল, নাগরপুর, শখিপুর দেলদুয়ার, মির্জাপুর ও বাসাইল উপজেলা।	১৮৪৭৩	৪০	৩	২৪		১১
৩০	উল্লাপাড়া	উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলা।	২০৪২৬	২০	১	৫		৩
৩১	রংপুর	সাতমাথা, খাসবাগ, রংপুর সদর, রংপুর	কার্যক্রম শুরু হয়নি	-	-	-			-
মোট =				৫০৫৫৫৬	১৩২৬	৫৬	২১৫		২৭২

সারণির মাধ্যমে দেখা যায় যে, সরকারি বেসিক সেন্টারওয়ারি দেশব্যাপী নিবন্ধনকৃত ২০০৩ সালের তাঁত শুমারি অনুসারে তাঁতির সংখ্যা ৫০৫৫৫৬ জন। বর্তমান সরকার কর্তৃক বেসিক সেন্টারওয়ারি নিবন্ধনকৃত তাঁতি সমিতিগুলো নিয়মিত অডিটকরণের মাধ্যমে তাদের সর্বশেষ তথ্য, কার্যক্রম, লোকবল, সুবিধা-অসুবিধা জানা যাচ্ছে। যার ফলে তাঁতি সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁতিদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণসমূহের কার্যক্রম থেকে বুঝা যায় স্বাধীনতোত্তর বিভিন্ন সরকার বিশেষ করে বর্তমান দেশ পরিচালনাকারী সরকার বাস্তবভিত্তিক যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন যেমন প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রগুলোতে সুতা রংকরণ, বুনন, টাই এন ডাই, ব্লক ও বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং, ব্যয়নিরূপণ, টেক্সটাইল প্রিন্টিং, তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউগুলোতে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স কার্যক্রম চালু করেছেন যা থেকে তাঁতি, তাঁত শিল্প উদ্যোক্তা, ডিজাইনার, ফ্যাশনহাউজ মালিকগণ ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসায়ীরা উপকৃত হচ্ছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো মানবসম্পদ উন্নয়ন, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ফ্যাশন ডিজাইন, মার্কেট প্রমোশন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক তাঁতীদের আবাসন ব্যবস্থা, তাঁতীদের মূলধন সরবরাহ করা, তাঁত পণ্যের বহুমুখী করণ, ঐতিহ্যবাহী মসলিনের প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার, তাঁত সংগঠন তৈরী করে দেয়া, তাঁত সমিতিগুলোকে অডিটের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনা, তাঁতপল্লী স্থাপন সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায় বাংলাদেশের তাঁতবোর্ড কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ সরকারের তাঁতশিল্পে উন্নয়ন ব্যাপক উদ্যোগেরই অংশ।

২.২৩ বাংলাদেশে সুতা শিল্পের বিকাশ

সুতা শিল্প তাঁত শিল্পের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নারায়ণগঞ্জ শহরের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত টানবাজার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাইকারী সুতার বাজার। এখানকার বর্তমান সুতা ব্যবসায়ীরা এখনও তাদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার শেষার্ধে নারায়ণগঞ্জে উৎপাদিত সুতা ও কাপড়ের খ্যাতি সারা বিশ্বে এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যে, তৎকালীন নারায়ণগঞ্জকে ম্যানচেষ্টার অফ এশিয়া বলা হতো। রাজা সুকুমার বোস ১৯২৭ সালে প্রথম কটন মিল (লক্ষী নারায়ন কটন মিল) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা কটনমিল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে তার অনুসরণে বাবু রমেশ চন্দ্র রায় ১৯৪২ সালে চিত্তরঞ্জন কটন মিল প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে শুধু একটি গৌরাবান্বিত ইতিহাস। নারায়ণগঞ্জের সুতার ব্যবসায়ীরা স্থানীয় স্পিনিং মিলের এজেন্ট। তারা সাধারনত স্পিনিং মিলের সাথে বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক বা ত্রিবার্ষিক চুক্তি করে থাকে। চুক্তি মোতাবেক স্পিনিং মিলের উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত সুতার ব্যবসায়ীদের কাছে যায় এবং তারা গুদামজাত করে। সুতা ব্যবসায়ীরা তাদের উক্ত গুদাম থেকে সাধারণত খুচরা বিক্রেতা বা টেক্সটাইল মিলের নিকট সুতা বিক্রয় করে থাকে।

২.২৪ সুতা ব্যবসায়ীদের সঙ্কট

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে বিশেষ করে নরসিংদীর বাবুরহাট, সিরাজগঞ্জের সোহাগপুর, এনায়েতপুর এবং শাহজাদপুর, কুষ্টিয়ার বসুরখালী ও টাঙ্গাইলের তাঁতীদের সুতার উৎস নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের সুতার বাজার। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সুতার বাজার নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের সুতা খাতে বর্তমানে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের সুতার কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি দ্রুত সুতা খাতকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বৈষম্যমূলক শুল্ক ও মুদ্রা নীতি, কাঁচামালের অপ্রতুলতা, মূলধন বা পুঁজির অভাব, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব, ব্যাংকগুলোর চড়া সুদের হার, অপর্যাপ্ত বিদ্যুত সরবরাহ, পরিবহন সমস্যা, সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অতিরিক্ত করারোপ, স্পিনিং মিলগুলোর চুক্তি ভঙ্গের প্রথা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নীরবতা সুতার শিল্পের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করছে। আরও সমস্যা হলো ৩০ কাউন্টের নিচে এবং ৮০ কাউন্টের উপরের সুতা আমদানি ব্যবসা বান্ধব নয় এবং রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের মালিকরা বিদেশ থেকে শুল্কমুক্ত যে সুতা আমদানী করে তা স্বল্প দামে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে যা সুতা খাতের জন্য মোটেও সুখকর নয়।

অপরিসীম সম্ভাবনাময় এ খাতকে উজ্জীবিত করতে হলে সরকারকে অবশ্যই তুলা চাষীদের ভর্তুকি দিতে হবে, উন্নতমানের তুলা বীজ সরবরাহ করতে হবে, অনাবাদী জমিতে তুলা চাষ করতে হবে (যা তুলা উন্নয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে শুরু করেছে) অর্থাৎ সুতার কাঁচামালের সহজলভ্যতা সৃষ্টি করতে হবে এবং ব্যবসা বান্ধব শুল্ক ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন, রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের মালিকদের সুতা আমদানিতে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে, ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমাতে হবে, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং ইনসেনটিভ প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.২৫ সুতা সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগ

এই সংকট নিরসনে বর্তমান সরকার ভবিষ্যতে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি সংস্থা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বর্তমান তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৫টি ইউনিট কার্যালয়, ১৩টি জোনাল কার্যালয় এবং ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এর মাধ্যমে তুলা চাষ সম্প্রসারণসহ তুলা উৎপাদন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। রিজিয়ন পর্যায়ে উপ-পরিচালক, জোনাল পর্যায়ে প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ইউনিট পর্যায়ে কটন ইউনিট অফিসার তুলা চাষ সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত আছেন। সদর দপ্তরের নির্বাহী পরিচালক এবং উপ-পরিচালকসহ সহযোগী কর্মকর্তাগণ সার্বিক কর্মকাণ্ড তদারকি করেন। গত তুলা চাষ মৌসুমে দেশে ৪২০০০ হেঃ জমিতে তুলা চাষ করে প্রায় ১৫২০০০ বেল তুলা উৎপাদিত হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় খামারে এবং ইউনিট পর্যায়ে তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, চাষী র‍্যালি ও মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একটি সারণির মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২৬ সুতা ব্যবসায়ীদের সমিতি বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন গঠন

বাংলাদেশের সুতা ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত সমিতি হলো বাংলাদেশ ইয়ার্ন মার্চেন্টস এসোসিয়েশন। সারা দেশে দুটি ক্যাটাগরিতে (এসোসিয়েশন গ্রুপ ও জেনারেল গ্রুপ) তাদের প্রায় ১,৫০০ জন সদস্য রয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি এফবিসিসিআই-এর তালিকাভুক্ত সদস্য বাংলাদেশ ইর্য়ান মার্চেন্টস এসোসিয়েশন সুতা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি প্লাটফরম যেখানে সুতা ব্যবসায়ীরা তাদের অধিকার রক্ষা, সুবিধা সংরক্ষণ ও অসুবিধা দুরীকরণে চেষ্টা করে থাকে।

অবকাঠামো, সহায়ক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি এবং তুলনামূলক সুবিধাজনক শ্রমনির্ভর শিল্পের উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ আজ বিনিয়োগের জন্য চমৎকার সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একক বা যৌথভাবে সুতা শিল্পখাতে বিনিয়োগ করবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় সুতা শিল্প পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে এই প্রত্যাশা সকলের।

২.২৭ পণ্যভিত্তিক উন্নয়ন

২.২৭.১ ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারে কার্যক্রম

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে যে নির্দেশনা দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, "বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশে সোনালি ঐতিহ্য রয়েছে। কোন কোন এলাকায় মসলিনের সুতা তৈরি হতো তা জেনে সে প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন"[২৬]

উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১টি পিপিএবি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্প আকারে নির্ধারিত ফরমেটে প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোট ৭১৮.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বমোট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে "Reviving the Technology of Muslin Yarn and Muslin Fabrics, The Golden Heritang of Bangladesh (1st phase)" শীর্ষক ডিপিপিটি পুনর্গঠন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে গত ২০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মোট ১২১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে।[২৭]

২.২৭.২ মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মসলিন তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের উক্ত নির্দেশনা বস্তবায়ন ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৬ সালে ২৪.০০.০০০০.১১৬.১৮.০৮৭.১৫.০৭ নং প্রজ্ঞাপণমূলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটিকে ১২ মাসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়।

২.২৮ সরকার গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন[২৮]

ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ সালে মার্চ মাসের প্রতিবেদন থেকে নিম্নের বিষয়গুলো জানা যায়।

ক) "ফুটি কার্পাস" গাছের Morphological Sketch তৈরি করা হয়েছে;

খ) সম্ভাব্য ফুটি কার্পাস তুলার সন্ধান পাওয়া গেছে;

গ) সম্ভাব্য ফুটি কার্পাস তুলার ফিজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে;

ঘ) ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট (V & A) মিউজিয়াম থেকে গবেষণা কাজে প্রয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;

ঙ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মসলিনের কাপড় তৈরির উপযোগী হ্যান্ড স্পিনার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মসলিনের কাপড় তৈরির উপযোগী তাঁতি/কারিগর তৈরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ছ) সম্ভাব্য ফুটি কার্পাস তুলার টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা গাছ উৎপাদন করা হয়েছে;

জ) সম্ভাব্য ফুটি কার্পাস তুলার চাষাবাদ শুরু করা হয়েছে;

ঝ) গবেষণা কাজের জন্য ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রথমবার উত্থাপনের পর অনুমোদিত হয়নি। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো) হতে ২০১৭ সালে পুনরায় গবেষণার স্বার্থে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়। ডিপিপিটি অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত গবেষণা কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় এবং "মসলিন" তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির দাপ্তরিক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে।

২.২৯ বিসিকের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী জামদানী শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার সরকারের কার্যকরী উদ্যোগ

১৯৮২ সাল থেকে ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পকে আরো উন্নত ও মুনাফামুখী করার জন্য Bangladesh Small Industries Corporation (BSIC) নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে।[২৯] অধিক জামদানি শিল্পসমৃদ্ধ রূপগঞ্জের তারাবো ইউনিয়নে বিসিক ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে দুটি জরিপ চালায়। এই জরিপে যথাক্রমে ১৪৬৬টি ও ১১৭৩টি জামদানি শিল্প ইউনিটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিসিক ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালে রূপগঞ্জের তারাবো ইউনিয়নের ১৪টি, সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নের ১টি সহ মোট ১৫টি গ্রামে ২টি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। উক্ত গ্রামসমূহে ১৯৯৩ সালে তাঁতির সংখ্যা ছিল ১১১৯ জন ও ১৯৯৯ সালে ৭৫৩ জন। ১৯৯৯ সালে তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৮৪৫টি। পরবর্তীকালে ২০০২ সালের জরিপে ইউনিট সংখ্যা ছিল ১৫২৮টি, চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৫১৯টি, কর্মরত জনশক্তি ৫,৬৬৯ জন।[৩০]

জামদানি শিল্প বিকাশের জন্য ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার এ খাতের কারুশিল্পীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান, জামদানি উদ্যোক্তাদের পুনর্বাসন, দক্ষ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কারুশিল্পীদের অন্য পেশায় চলে যাওয়া রোধ, নতুন প্রজন্মের কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদান, বাজার চাহিদা অনুযায়ী নকশা ও নমুনা সরবরাহ করা, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জামদানি পণ্যের গুণগতমান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপণনের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জামদানি শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন জন্য বিসিককে দায়িত্ব প্রদান করে। সে প্রেক্ষিতে বিসিক জুলাই ১৯৯৩ থেকে জুন ১৯৯৯ মেয়াদে ৫৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে। জামদানি শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা (২০১০) মোট জমির পরিমাণ ২০ একর তন্মধ্যে শিল্প প্লটের জন্য জমির পরিমাণ ১৪.৩৯ একর, অফিস ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫.৬১ একর, মোট প্লট সংখ্যা ৪১২টি (প্রতিটি ১২০০ থেকে ২০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট), মোট বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট ৩৯৯টি, উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৯০টি, নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিট ১০৪টি এবং নির্মাণের অপেক্ষায় শিল্প ইউনিট ৬০টি।

> The government of Bangladesh undertook many initiatives in several times to protect and promote this heritage including establishment of a Jamdani Industrial Estate & Research Centre and most recently achieving of Geographical Indication (GI) certificate. For its subtle contexture, Jamdani has huge demand mostly in India, Italy, USA, Canada and the Middle Eastern countries.[৩১]

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাবার পরে ঢাকার ডেমরায় জামদানি পল্লীর তাঁতিদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। তবে মেধা ও পারিশ্রমিকের অভাবের কারণে তাঁতীরা আর এ পেশায় আসতে চাইতেন না। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর

উপজেলার অচল তাঁতগুলো প্রাচীন গৌরবগাঁথার নীরব সাক্ষি হয়ে রয়েছে। কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িরও একই দশা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৯২ সালে সরকার রূপগঞ্জের তারাবো এলাকার নোয়া পাড়াতে একটি জামদানি পল্লী স্থাপন করেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জামদানির চাহিদা এখনও রয়েছে। বর্তমান বাজারে জামদানির উচ্চমূল্য ও বিপুল চাহিদার কারণে বাংলাদেশের এই শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের জামদানিকে জিআই পণ্য[৩২] হিসেবে নির্ধারিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে The Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT) কাছে আবেদন করে। দুই মাস পর অক্টোবর মাসে জিআই পণ্য হিসাবে টেগ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। এ বিষয়ে The Daily Star এর প্রতিবেদনে বলা হয়,

> Jamdani, a traditional fabric of the country, has been recognised as a Geographical Indication (GI) product of Bangladesh, a move that is expected to facilitate its weavers to brand the indigenous cloth in a better way at home and abroad. The Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT) yesterday registered Jamdani as the country's first GI product and handed over a certificate to the chairman of the Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) during a ceremony.[৩৩]

২.৩০ বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, ঢাকা অঞ্চল

বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি প্রাচীন জনপদ। এর বয়স চারশ বছর (কিংবা তারও বেশি) আমাদের আলোচ্য অঞ্চল হচ্ছে বর্তমানের নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও ঢাকা জেলা। যদিও এগুলোর প্রতিটিই বর্তমানে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তবে আলোচনার সুবিধার্থে এখানে এগুলোকে একই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রধান নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনা ইত্যাদি। ঢাকা অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। বর্তমানে এই অঞ্চলে তাঁতির সংখ্যা লক্ষাধিক।

২.৩১ ঢাকা অঞ্চলের ঐতিহ্য তাঁত শিল্প

সুপ্রাচীন কাল থেকে মূলত ঢাকা অঞ্চল বিখ্যাত ছিল সূক্ষ্ম মসলিনের জন্য। এই বস্ত্র বয়নের সুতা হাতেই কাটা হতো এবং এজন্য প্রয়োজনীয় তুলা ঢাকা অঞ্চলেই উৎপাদিত হতো। কিংবদন্তির ঢাকাই মসলিন কিংবা এর তুলা প্রসঙ্গে মূল লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঢাকা জিলার তাঁত শিল্প উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে জেম্স্ টেলর নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে ঢাকা জেলার প্রত্যেক গ্রামেই কম-বেশী তাঁতের কাজ চলত, কিন্তু উৎকৃষ্ট ধরনের মসলিন তৈরির জন্য কয়েকটি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলি হচ্ছে- ঢাকা, সোনারগাঁও,

ধামরাই, তিতাবাদি, জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর। এদের মধ্যে প্রথম চারটি স্থান ঢাকা জেলাতেই অবস্থিত, বাকি দুটি বর্তমান ময়মনসিংহ জেলায়।

১৯০৭-০৮-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, হাতে কাটা সুতায় তৈরি মিহি ঢাকাই মসলিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকাই শাড়ি ও ধুতি তৈরি হতো তখন বিলেতের সুতা দিয়ে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই সময়ে এখানকার তাঁতিরা আমদানি করা সুতায় অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের মসলিন বয়ন করত। বিশ শতকের শুরুতেও মসলিন বোনার কাজে দক্ষ তাঁতি পাওয়া যেত কিন্তু হাতে কাটা সুতা পাওয়া যেত না। খুব সম্ভবত এ সময়ে প্রকৃত মসলিন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মসলিনের একটি ধরন জামদানি। সীমিত পর্যায়ে জামদানি শাড়ি, ধুতি ও উড়নী বয়ন হতো ঢাকা শহরের নবাবপুর, তাঁতিবাজার ও কলতাবাজারে। ব্যাপক মাত্রায় জামদানি বস্ত্র বয়ন হতো ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ, কাঁচপুর, তারাব, নোয়াপাড়া, ধামরাই প্রভৃতি গ্রামে। স্থানীয় উপকরণে তৈরি তাঁতে হাতে মাকু ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁতিরা জামদানি বয়ন করত।

সূক্ষ্ম নকশার কারুকাজ করা ঢাকাই শাড়ি তৈরি হতো ঢাকার নবাবপুর, ট্যাকেরহাট, মহাজনপুর, কাওলিপাড়া, গোয়াইলারা, লালচাঁদ মুকিম লেন, বনগ্রাম, ওয়ারী, কলকাতাবাজার ও তাঁতিবাজারে। সাধারণ শাড়ি, ধুতি, চাদর, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি বয়ন হতো ঢাকা সদর সাব ডিভিশনের রোহিতপুর, শিবরামপুর, রাজাপুর, ধামরাই, মুকসুদপুর, দোহার, সুতারপাাড়, জয়পাড়া, রাইপাড়া, বরাহ, গালিমপুর, বকশিনগর, বর্ধনপাড়া, পাড়াগ্রাম, ফতেপুর ও কুন্ডা গ্রামে; মুন্সীগঞ্জ সাব ডিভিশনের আব্দুল্লাহপুর, মীরেশ্বর, কুমারভোগ, কাজীরপাগলা, মেদিনীমাদল, দক্ষিণ পাইকশা, হলদিয়া, মিশুলিয়া গ্রামে; নারায়ণগঞ্জ সাব ডিভিশনের ডেমরা, সিদ্ধিরগঞ্জ, নোয়াপাড়া, রূপসী, আলগি, ঘোড়াশাল, মূলপাড়া, হারিহরদি, শানমানদি, সুলতানসদি গ্রামে এবং মানিকগঞ্জ সাব ডিভিশনের ভাটারা, জগন্নাথপুর, গর্জনা, বালিয়াটি রাজারকালটা গ্রামে। এসব গ্রামের জোলা ও যুগীরা সুতিবস্ত্র বয়নের সাথে যুক্ত ছিল। ঢাকা সদর সাব ডিভিশনে দুই হাজার, মানিকগঞ্জ সাব ডিভিশনে এক হাজার দুইশত এবং মুন্সীগঞ্জ সাব ডিভিশনে তেরো হাজার তাঁতি বস্ত্র বয়নের কাজে জড়িত ছিল বলে জানা যায়।[৩৪]

২.৩২ সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা অঞ্চলে উৎপাদিত বহুল প্রচলিত সুতি ও জামদানী

সনাতন গর্ত তাঁতে জামদানি বয়ন করা হয়। স্থানীয়ভাবে এই তাঁতকে ‘পিড়ি’ বলা হয়। স্থানীয়ভাবে এই তাঁতকে ‘পিড়ি’ বলা হয়। অতীতের মতো এখনো তাঁতিরা স্থানীয় উপকরণে তৈরি সনাতনী গর্ত তাঁতে হাতে মাকু ছুঁড়ে ছুঁড়ে বস্ত্র বয়নের কাজ করে। এই এলাকায় তেরো হাজার থেকে পনেরো হাজার তাঁতি জামদানি বয়নের কাজ করছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার নোয়াপাড়া, রূপসী, দক্ষিণ রূপসী, কাজীপাড়া, মৈকুলী, খাদুন, পবনকুল, মুগরাকুল বা মুরাগাকুল, বরাব, দীঘিবরাব, খালপাড়, যাত্রামুড়া, কাহিনা, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, মোগলখালি, ভুলতা, কোলাকোন্দা, বাইল্যাপাড়া, ডরগাঁও; সোনারগাঁ থানার ভরগাঁও, ভাটপাড়া, কাপীপাড়া, বান্দাপাড়া, চৌরপাড়া, নদীপুর, কুমারপাড়া, শিবপুর, গঙ্গাপুর, বেহাকুর, বাঁশঠেঙ্গী, রাইগাঁও, মালিপাড়া,

যুগীপাড়া, প্যাচাইন বা ব্যাচাইন, ঐরাপাড়া, সিংড়াব, দেবগ্রাম, দেওভোগ, আন্ধারমানিক, কালীয়াবিগ, গাবতলী, শিবপুর, চ্যাংগাইন, সুখেরটেক, শেওরাপাড়া, তালতলা, বাজবাড়ী, বড়গাঁও, আদমপুর, তিংগিলা, হরিহরদি, কলকাতপাড়া, মৈচর, দক্ষিণপাড়া, বেইলর, লস্করবাড়ি, সাদীপুর, বড় চেংগাইন; মজমপুর থানার তালতলা, পরাবর্দি, কোপগা, মজমপুর, বস্তুল, পিঙ্গিলা, গাবতলী ইত্যাদি গ্রামে জামদানি বয়নের কাজ হয়। এই গ্রামগুলোতে কখনো ফুলসিল্ক কিংবা হাফস্লিক অথবা ফুল কটন জামদানি শাড়ি বয়ন করা হয়। তবে এই অঞ্চলে এখন সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় হাফ সিল্ক শাড়ি। জামদানি শাড়ির ক্ষেত্রে নকশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁতিরা তাঁতেই পাইড় এবং জমিনের নকশা করে থাকে কাভুলের সাহায্যে। এ কারণে জামদানি শাড়ি বুনতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রধানত মুসলমান তাঁতিরা জামদানি বয়ন করে। তবে স্থানীয় তাঁতিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সোনারগাঁ থানার সিংড়াব, দেবগ্রাম, দেওভোগ, আন্ধারমানিক গ্রামগুলোতে হিন্দু তাঁতিদের বসতি ছিল, যারা জামদানি বয়নের সাথে জড়িত ছিল। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে তারা ভারতে চলে গেছে।[৩৫]

জামদানি শাড়ির জন্য প্রাচীন ও বিখ্যাত হাট ডেমরা। এই হাট বসে সপ্তাহে এক দিন-শুক্রবার ভোরে। এই হাট ছাড়াও বর্তমানে নোয়াপাড়ায় নতুন জামদানির হাট শুরু হয়েছে। জামদানিশিল্পের উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪০০ প্লট আবেদনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। জামদানি তাঁতিদের একটি করে প্লট দেয়ার কথা থাকলেও নানা অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায় স্থানীয় তাঁতিদের কাছ থেকে শোনা যায় যে অনেকে তাঁতি না হয়েও প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন।[৩৬]

জামদানিবস্ত্র শুধু শাড়ি হিসেবে নয়, বরং টু পিস, পাঞ্জাবি, জানালার পর্দা, টেবিল কভার, ওয়াল কভার হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। শাড়ি এবং এই পণ্যগুলো বর্তমানে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ভিয়েতনাম, চীন, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যানুসারে, জামদানিবস্ত্র রপ্তানির এই ধারা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। বিভিন্ন বড় বড় মহাজন বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে জামদানিশিল্পের বিশ্বায়নে ভূমিকা রাখছে।

২.৩৩ সাম্প্রতিক সময়ে নারায়ণগঞ্জে আধুনিক বস্ত্র উৎপাদন

হস্তচালিত তাঁত ছাড়াও বস্ত্র সম্পর্কিত প্রায় সব ধরনের শিল্প কারখানা এখানে রয়েছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, তাঁতবস্ত্র বয়ন ইত্যাদি নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বৃহত্তর ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র শিল্পকারখানার সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. গার্মেন্টস	৩৬০টি
২. টেক্সটাইল	১৭৫টি
৩. নিটিং ফ্যাক্টরি	১৮৯৫টি
৪. ডাইং	১৮৮টি
৫. হোসিয়ারি	২০৭৫টি

উৎস: বাংলাদেশ তাঁত বোড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, ২০১৮ পৃ. ১৯।

২.৩৬ বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের তাঁত বোর্ড কর্তৃক ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে (১) শেখ হাসিনা নকশি পল্লী স্থাপন (২) তাঁতজাত পণ্যের গুদামঘর স্থাপন, (৩) তাঁত বস্ত্রের প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন/তাঁত হাট স্থাপন, (৪) সিলেট, বেড়া (পাবনা) ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স চালুকরণ, (৫) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন- ২য় পর্যায় (2^{nd} phase) এবং (৬) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলোঃ

২.৩৭ প্রকল্পের নামঃ শেখ হাসিনা নকশি পল্লী, জামালপুর

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকাঃ জামালপুর

প্রকল্পের প্রভাব/ ফলাফলঃ দেশি ঐতিহ্য নকশি কাঁথা এবং তাঁত শিল্প রক্ষা পাবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোগক্তারা পুনর্বাসিত হবে। উৎপাদন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২.৩৭.১ প্রকল্পের নাম: তাঁতজাত পণ্যের গুদামঘর স্থাপন

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের সকল তাঁত অধ্যুষিত এলাকা।

প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল: তাঁতিদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের গুদামজাতকরণ ও নিরাপত্তা প্রদান।

২.৩৭.২ প্রকল্পের নাম: তাঁত বস্ত্রের প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের সকল তাঁত অধ্যুষিত এলাকা।

প্রকল্পের প্রভাব/ ফলাফল: উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের বিপণন সুবিধা প্রদান এবং আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩৭.৩ প্রকল্পের নাম: সিলেট, বেড়া (পাবনা) ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স চালুকরণ।

২.৩৮ উদ্দেশ্য

ক) সিলেট, বেড়া (পাবনা) ও রংপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিপ্লোমা-ইন-ফ্যাশন ডিজাইন কোর্স চালু করা;

খ) প্রতি ব্যাচে ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ০৪ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা;

গ) তাঁত খাতে দক্ষ মানব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁত শিল্প ও এ সংক্রান্ত খাতে কারিগরি সুবিধা সৃষ্টি করা।

প্রকল্প এলাকা: (১) খাদিম নগর, সিলেট, (২) বেড়া, পাবনা (৩) সাতমাথা, রংপুর

২.৩৮.১ প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টারসমূহে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) ভোক্তার রুচি ও পছন্দ এবং পরিবর্তিত বাজার চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন;

খ) দেশে দক্ষ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরি এবং তাঁতিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;

প্রকল্প এলাকা: বেসিক সেন্টর ময়মনসিংহ, দোহার, রূপগঞ্জ, ভাঙ্গা, কক্সবাজার, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, যশোর, খুলনা, শৈলকুপা, সাতক্ষীরা, কালিগঞ্জ, গৌরনদী, পটুয়াখালী, চিরিরবন্দর, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রাজশাহী ও সাঁথিয়া এর কার্যকরী এলাকা।

২.৩৮.২ প্রকল্পের নাম ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

২.৩৯ বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও অভীষ্ট লক্ষ্য (Sustainable Development Goals (SDGs)

বর্তমান সরকারের ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) তৈরি করা হয়েছে।

২.৩৯.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

গত ১৪.০৬.২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের (বাতাঁবো) এবং ১৯.০৬.২০১৭ তারিখে বাতাঁবো'র মাঠ পর্যায়ের কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠানের সাথে বাতাঁবো'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ০৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যথাঃ (১) তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ, ২) মানব সম্পদ উন্নয়ন, ৩) তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতা এবং ৪) উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ।

২.৩৯.২ তাঁত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ

১. বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর কার্যক্রমে সহায়তা: তাঁত বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বয়নপূর্ব সেবা (টুইস্টিং) এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১৭,০০০ কেজি সুতা। মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত প্রকৃত উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ২৮,৫৫৯ কেজি। শতকরা হিসেবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন ১৬৭.৯৯%। এছাড়া বয়নোত্তর সেবার মাধ্যমে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৩.২৯ কোটি মিটারের বিপরীতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত প্রকৃত উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের পরিমাণ ৩.১৩২২ কোটি মিটার। শতকরা হিসেবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন ৯৫.২০%।

২. ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায়: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক চলমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ বিতরণে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৯০০ জন ঋণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী পুরুষ তাঁতির বিপরীতে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৫০৬ জন তাঁতিকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে পুরুষ ঋণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্জন ১০৯.৩৩%। এছাড়া আদায়কৃত ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ২৫০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ২৫২.০১ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জন শতকরা ৯৬.৮০%।

২.৪০ তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন

১. নির্বাচিত তাঁতিদের প্রশিক্ষণঃ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়মিত প্রতিবছর বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে নির্বাচিত তাঁতিদের বিভিন্ন কোর্সে পুরুষ তাঁতি প্রশিক্ষণ প্রদানের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নারী ও পুরুষদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২. কারিগরি শিক্ষা (ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং): বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ অনুযায়ী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয় এবং সফলভাবে এগিয়ে চলেছে।

৩. বাতাঁবোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ: বাতাবো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক প্রশিক্ষণ নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে।

২.৪১ তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণের সহযোগিতা

১. **তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি সনদ প্রদান:** তাঁত বস্ত্রের রপ্তানি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১০০%। মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ২৫৩টি আবেদনপত্রের চাহিদার বিপরীতে ২৫৩টি সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

২. **স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভার মাধ্যমে বস্ত্র ব্যবসার সহযোগিতা:** বস্ত্র ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদানের অংশ ১২টি সভার বিপরীতে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ২৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. **তাঁত বস্ত্র মেলা আয়োজন:** তাঁত বস্ত্রের বাজার বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁত বস্ত্র মেলার আয়োজন করা হয়।

৪. **রপ্তানিকারকদের সাথে মতবিনিময় সভা:** তাঁত বস্ত্র রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাঁতাবো কর্তৃক সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২.৪২ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ[৩৭]

১. চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

২. কার্যকরী প্রাথমিক তাঁত সমিতি অডিটকরণ: বাতাঁবো'র নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক তাঁতি সমিতিগুলোতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ২৫০টি তাঁতি সমিতি অডিট করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ২১৫টি প্রাথমিক সমিতির অডিট সম্পন্ন হয়েছে।[৩৮]

দেশের তাঁত শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে তাঁতিদের সেবা প্রদানের নিমিত্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁতি ও তাঁতজাত পণ্য রপ্তানিকারক এবং তাঁত শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

১) হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে কান্ট্রি অব অরিজিন সনদপত্র প্রদান;
২) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত তাঁতি সমিতিসমূহের সদস্যবৃন্দকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
৩) তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম;
৪) প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম;
৫) বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা প্রদান এবং
৬) তাঁতি ও তাঁত সম্পর্কিত তথ্য।

২.৪৪ উপসংহার

বাংলার বস্ত্র শিল্পের কিংবদন্তির মসলিন বিলুপ্ত হয়ে গেছে বহু আগে। তাঁত শিল্পের সোনালি সুদিন, বিশ্বব্যাপী বস্ত্র রপ্তানি বাণিজ্য অতীত দিনের গল্প, শেষ হয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি শাসনের অবসান হয়েছে- সেটাও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। স্বাধীন বাংলাদেশে কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। একুশ শতকে এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবলে অনেকখানি আশাবাদী হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

গত ১০০ বছরের তাঁত শিল্পের ইতিহাস পুনর্নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় খুব বেশি আশাহত হওয়ার কিছু নেই। গত শতকে বাংলাদেশের তাঁত শিল্প নানা রকম পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে তাঁত শিল্প টিকে আছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে তুলা এখন তাঁতিগণ ব্যবহার করেন তা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় না। যে সুতা ব্যবহার করা হয় তার একটা বড় অংশ আসে দেশের বাইরে থেকে। যদিও বর্তমান সরকার তুলা উৎপাদন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেশ কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে যার কারণে তুলার চাষ ও উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর যে সুতা দেশে তৈরি হয়ে থাকে তার প্রযুক্তি আমদানি করা অন্য দেশ থেকে। যে রং দিয়ে দেশে সুতা বা কাপড়গুলো বিচিত্র বর্ণে রঙ হয় তা অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। যে তাঁত যন্ত্র দেশে ব্যবহার করা হয় তাও দেশি প্রযুক্তি নয়; যদিও তা এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশের যা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি, আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি তাহলো এ দেশের তাঁতি সম্প্রদায়। নানা রকম

পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েও বাংলাদেশের তাঁতিরাই বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। তারা বারবার নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল আত্মস্থ করেছে এবং টিকিয়ে রেখেছে বাংলদেশের তাঁত শিল্প। ফলে যতদিন এদেশের তাঁতি সম্প্রদায় আছে, ততদিন খুব বেশি আশাহত হওয়ারও কিছু নেই। তাঁতিরাই এ দেশের তাঁত শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে তাঁতি ও তাঁত শিল্প থাকবে, সরকারি উদ্যোগ বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো যেমন: বেশ কয়েকটি নতুন তাঁতশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন, ডিপ্লোম ইন টেক্সটাইল কোর্স চালু, ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপন, নক্সী পল্লী স্থাপন, মসলিন প্রযুক্তি পুন:রুদ্ধার প্রকল্প চালুকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) ঘোষণা, তাঁত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণে সরকারি সহযোগিতা এবং সর্বোপরি তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁতী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সকল বিবেচনায় ভবিষ্যতে তাঁত শিল্প হবে আরও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং উন্নত।

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন হাউজগুলোয় পোষাক তৈরীতে তাঁত শিল্পে পণ্যের অধিক ব্যবহার শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুতি তাঁতবস্ত্রের প্রতি আগ্রহ দেশের তাঁত শিল্পকে আরও সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হস্তচালিত তাঁত শিল্প (Handloom Industry) একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এই অধ্যায় আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পস্ট প্রতীয়মান হয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকার এবং অন্যান্য সব সরকারের আমলেই এই তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁতশিল্পে উৎপাদিত সুতীবস্ত্র সুলভ মূল্য হওয়ায় নিম্নবিত্ত, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাজে যেমন সমাদৃত তেমনি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সচেতন মহলে তাঁতশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। বর্তমান সরকার এবং বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এই শিল্পের উন্নয়নে। পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তারাও এগিয়ে এসেছেন। পরিবেশ বান্ধব ও পরিধানে অনেক আরামদায়ক বিধায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই বলা যায় ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ এবং তাঁতীদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে পারলে এ শিল্প অনেকদূর এগিয়ে যাবে। তাঁত বোর্ডের গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে বিপুল পরিমাণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

তথ্যনির্দেশিকা

---

১. *Economic Nationalism* refers to an ideology that favours state intervention over the market mechanisms with policies such an domestic on the economic systems. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_nationalism

২. *Political Economy* is the study and use of how economic theory and methods influences political ideology. https://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp

৩. *দৈনিক সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭৭, শনিবার, কলাম ৬-৭, পৃ. ১।

৪. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৫, ২রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১।

৫. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৬-৭, ২৩ জুলাই ১৯৭৯, পৃ. ১।

৬. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৩-৪, ১৬ জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৩।

৭. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ১, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮১, পৃ. ১।

৮. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৭, মে, ১৯৯০, পৃ. ২।

৯. সাক্ষাৎকার: মোঃ মোমেন সরকার, সাবেক পরিচালক, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বয়স: ৫০, পেশা-ব্যবসা, গ্রাম:শিলমান্দী, উপজেলা+জেলা:নরসিংদী, ২০১৭।

১০. Mohammad Abdul Latif, *Towards an Estimation of cloth supply in Bangladesh 1955-56-1986-87*, BIDS special Issue Vol. xvii, p. 192.

১১. *Bangladesh Handloom Census-2003* (Bangladesh Burea of Statistics), Ministry of Planning, Dhaka, Published-2005, p. 17.

১২. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) এর সংজ্ঞানুযায়ী যে শিল্প কারখানা একই পরিবারের সদস্য দ্বারা বা আংশিকভাবে পরিচালিত এবং পারিবারিক কারিগরদের খণ্ডকালীন বা পূর্ণ সময়ের জন্য উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং যে শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলে ১০ জনের বেশি এবং শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার না হলে ২০জনের বেশি কারিগর উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে না তাকে কুটির শিল্প বলে। এই অর্থে তাঁতশিল্প একটি কুটির শিল্প।

১৩ Mohammad Abdul Latif, *Towards an Estimation of cloth supply in Bangladesh 1955-56-1986-87*, BIDS special Issue Vol. xvii, p. ...

১৪. সাক্ষাতকার: আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৪৮, ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ২০১৬।

১৫. Sunil Gupta, *Honorable Minister for Textile*, Parliament Budget Session, 21 June1979.

১৬. বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, ১৯৮৬-১৯৮৭, পৃ. ৬।

১৭. মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ১৯৮৭।

১৮. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, *ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন*, ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ১।

১৯. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, *ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন*, মার্চ, ২০১৮, পৃ....।

২০. The Daily Star, Online Report, May 10, 2016

২১. বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড, ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন, ঢাকা, ২০১৮।

২২. Country of Origin Certificate issued by the concern government agency, approved authority or organization of the exporting country must be submitted along with the import document to the customs authority at the time of release of goods.

২৩ . ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা, ২০১৮।

২৪. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ।

২৫. "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন" (ঢাকা, ২০১৮)।

২৬. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৩ অক্টোরব, ঢাকা, ২০১৮, পৃ ১২।

২৭ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৮)।

২৮. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৮)।

২৯. Bangladesh small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) provides support services to small, rural, and cottage industry in Bangladesh in the small and cottage industries sector. It was created through an Act of Parliament in 1957 which was later amended in 1992. BSCIC has country-wide institution network to provide door step services for entrepreneurs. Head Office of BSCIC is located entrepreneurs. Head Office of BASCIC is located at 137-138, Motijheel, Dhaka, Bangladesh.

৩০. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৬-১৭)।

৩১. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৮)।

৩২. GI is a name or sign used on certain products to certify that they possess certain qualities because they are made as per traditional methods or enjoy a certain reputation due to their geographical origin.As per rules, an association of producers or a government organisation that works to safeguard producers' interests can apply for GI tag of a product. More details, https://www.thedailystar.net/frontpage/jamdani-finally-gets-recognition-1316581

৩৩. Daily Star, November 18, 2016. https://www.thedailystar.net/frontpage/jamdani-finally-gets-recognition-1316581, citation date and time: 7 May, 2018 at 7:17 pm.

৩৪. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, তথ্য প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০০৭-০৮)।

৩৫. সাক্ষাৎকার: মোঃ সাইদুল ইসলাম, পেশাঃ জামদানি ব্যবসায়ী, বয়সঃ ৪০, নোয়াপাড়া জামদানি পল্লী, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ, ২০১৭।'

৩৬. সাক্ষাৎকার: মোঃ মুক্তার হোসেন, পেশা:জামদানী তাঁত মালিক (প্লট গ্রহীতা, নোয়াপাড়া বিসিক জামদানি পল্লী), বয়স:৩৫ রূপসী, নারায়ণগঞ্জ-২০১৭।

৩৭. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৮)।

৩৮. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন, (ঢাকা, ২০১৮)।

তৃতীয় অধ্যায়

তাঁত শিল্পের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ

তৃতীয় অধ্যায়
তাঁত শিল্পের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ

৩.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে তাঁত শিল্প। শহর এবং গ্রাম অঞ্চলে পরিধেয় ও ব্যবহার্য কাপড় হিসেবে তাঁতের লুঙ্গি-গামছা ও সুনিপুণ কারুকার্যের জামদানিসহ নানারঙ্গের শাড়ী বহুল প্রচলিত। এসকল পণ্যই তাঁত যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদিত। তাঁত শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বহির্বিশ্বের বাজারেও একটি প্রশংসনীয় স্থান দখল করে আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে মতামত দেয়া হয়েছে যে, 'Handloom is no longer a secondary activity of the rural Bangladesh. Traditionaly it is the largest industry in the country.'[১] সুতরাং বলা যায় তাঁত শিল্প বাংলাদেশের গ্রামীণ বস্ত্র শিল্পের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশের যোগানদার। এই অধ্যায়ে তাঁত শিল্পের প্রকারভেদ যেমন: তাঁত যন্ত্র থেকে কোন ধরনের কাপড় উৎপাদন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের তাঁত যন্ত্র নিয়ে বিশেষ করে যেগুলো বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত তা আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুঘল আমল ও বৃটিশ আমলে মসলিন উৎপাদনশীল এলাকা ও তাঁতসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কারণ, মুঘল আমল ও কোম্পানির আমলে বৃহত্তর ঢাকার তাঁতশিল্প কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। অধ্যায়টিতে আরো আলোচনায় এসেছে বুনন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধানত কার্পাস চাষ, তুলা উৎপাদন, সুতাকাটা এবং সেই সুতা দিয়ে সুক্ষবস্ত্র তৈরি প্রসঙ্গ। পাশাপাশি তাঁত শিল্পে মোঘল রাজদরবার ও নওয়াবদের ভূমিকা এবং বৃটিশ আমলে কোম্পানির কর্মকর্তাদের তাঁতশিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও আলোচনায় উঠে এসেছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে ঐ সময়গুলোতে ঢাকার মিহি সুতি কাপড় ও মসলিন সংগ্রহের জন্য মোঘল রাজ দরবারের প্রতিনিধি ও কোম্পানি আমলে কোম্পানির প্রতিনিধি ঢাকায় অবস্থান করে কিভাবে তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় উৎপাদনের তদারকি করতেন তা নিয়ে। বর্তমানে তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকম তাঁত যন্ত্রের বিষয় উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় (step) ও যন্ত্রাংশ এই অধ্যায়ে আলোচনায় এসেছে। বৃহত্তর ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জামদানী বস্ত্রের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ এই অধ্যায়ে আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। শুরুতে তাঁত শিল্প এবং তাঁত সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য এলাকাসমূহ বিশেষ করে বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৩.২.১ তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের অতি প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী এবং সমধিক পরিচিত শিল্প এটি। এই শিল্পকে কুটির শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত বলা যায়।[২] উল্লেখ্য যে, কুটির শিল্পগুলো[৩] অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত এবং

পরিবারকেন্দ্রিক। বিশিষ্ট লেখক গবেষক রুমা চ্যাটার্জির ভাষায়,

> "After agriculture the cotton handloom industry was the most important source of employment in Bengal in the eighteenth century. Handloom weavers were scattered in the rural areas as well as the urban centres in almost all the districts of Bengal under the impetus of increased demand from European companies, in general and the East India Company, in particular, weaving of specialised clothes became more organised in the urban centres. One may recall the importance of Dhaka, for the instance, whose weaver supplied the English and the European markets with fine Muslins-a specialised type of cotton piecegoods."[8]

৩.২.২ তাঁত

যে যন্ত্রের মাধ্যমে তুলা থেকে উৎপন্ন সুতার দ্বারা বস্ত্র তৈরি করা হয় তাকে তাঁত বলা হয়। তাঁত যন্ত্রে উৎপাদিত ব্যবহার উপযোগী অধিকাংশ কাপড়ই সুতি। তাঁত যন্ত্র বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও সহজেই স্থানান্তরযোগ্য এবং বড় উভয় আকৃতির স্থির তাঁত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

উৎপাদনের শুরুতে তাঁত যন্ত্রের একটি অংশ অর্থাৎ ভীমে সুতা কুন্ডলী আকারে টান টান করে পেচানো হয়ে থাকে। তাঁত যন্ত্রটি যখন চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট নকশা অনুসারে সুতা টেনে নেয়া হয় এবং বুনন করা হয়।

তাঁত বোনা শব্দটি এসেছে তন্তবায় থেকে। তাঁত যারা বুনন করেন বা যারা এ পেশায় জড়িত তাদের তন্তুবায় বা তাঁতী বলা হয়।

৩.২.৩ তাঁতসমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ

বাংলাদেশের তাঁতসমৃদ্ধ এলাকাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর জেলার ঢাকার নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁও, রূপসী, তারাব, নোয়াপাড়া, ঢাকার মিরপুর, ধামরাই,নরসিংদী, রায়পুরা, বাবুরহাট, মাধবদী ডাঙ্গা, আড়াইহাজার, কেরানীগঞ্জের রুহিতপুর উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, পাবনা, শাহ্‌জাদপুর, টাঙ্গাইলের করটিয়া, দেলদুয়ার, নাসিরনগর, রাজশাহী প্রভৃতি বিশেষভাবে পরিচিতি।

এলাকা ভিত্তিক তৈরী কাপড়ের উৎপাদন ও গুণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যেমন- বৃহত্তর ঢাকা ও তৎসংলগ্ন তাঁত সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর মধ্যে নরসিংদীর লুঙ্গি, গামছা ও সুতি শাড়ী, মিরপুরে বেনারশী, কাতান, ডেমরা ও রূপগঞ্জে জামদানি, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং টাঙ্গাইলের সুতীকাপড় বিশেষ করে শাড়ির খ্যাতি রয়েছে।

৩.২.৪ বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের কাপড় বুনন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ

বাংলার তাঁত শিল্প বিকাশ প্রক্রিয়ার মূল উপাদান তুলা যার উপর এই বস্ত্র শিল্প পুরোপুরি নির্ভরশীল। বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বুনন প্রক্রিয়া আলোচনায় তুলা উৎপাদন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু বর্ণনা আব্যশক। আমরা জানি তুলা থেকে সূতা উৎপন্ন হয় এবং সূতা থেকে কাপড় তৈরী করা হয়। সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করা দরকার।

৩.২.৪.১ তুলা উৎপাদন ও সংগ্রহ

বস্ত্র বয়নের প্রথম এবং প্রধান ধাপটি ছিল তুলা উৎপাদন ও সংগ্রহ। তুলা এবং বস্ত্র উৎপাদনে অত্র ভূখন্ডের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। মধ্য যুগে বাংলা সুক্ষ সুতা দিয়ে তৈরী মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। মসলিন কাপড় তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তুলা চাষ করা হতো ঢাকার আশেপাশের উঁচু জমিতে যেখানে বেশিরভাগ তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছিল।

তুলা ছিল বাংলার কৃষকদের মৌসুমী ফসল। বহু বছর যাবৎ তুলা ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন ত্রিপুরার এমন একজন ব্যাপারী বাংলার উচু এলাকাগুলোতে এর চাষাবাদের একটি সুন্দর পদ্ধতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন যা তাঁত শিল্প বিষয়ে রচিত ড. হামিদা হোসেনের গ্রন্থে পাওয়া যায়,

> “In the month of Phalgon, they cut down the hill bamboo, which they burn during the month of Cheyte, and when the showers come in Bysack, they begin to cultivate the jhoom in the following manner: they mix the seeds of cotton and paddy in a Kaharrah or wicket basket which they sling over their shoulders and then scraping the ground with an iron instrument called a Pakezeel which resembles the Bengal Coordially they sow the seeds of the paddy and cotton in the same cavity alongside there off and in the same month are also sown other articles.... Each of the above articles comes to perfection in their own season. In the month of Cartick and Agrahayon, the season of cultivation is at an end. They weed and clean the bamboo leaves which have fallen.... In the month of Asin the pods of the cotton appear and in Cartick and Agrahayon they gather them. Cotton ripens from Cartick to Pous and yields small revenue to the Raja which is collected in the manner of a mathole upon the actual produce. When ten or twelve families are collected they are called Pharwah and such Pharwah is superintended by a Chowdhury who is responsible for the business of a Pharwah

immediately under him to the Roy or Auruna Chuppeah, or Sarker Dakkuah or Mohur who presides."[৫]

বস্ত্র উৎপাদনে তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁত বস্ত্রের ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন গতিশীলতা আসে তেমনি আবার জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মুদ্রা পদ্ধতি বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছিল। তুলা উৎপাদনে চাষীদের লাভের পরিমাণটি নির্ভর করতো কাঁচা এবং পরিশোধিত তুলার উপর। বেঙ্গল এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের একটি রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে,

"This old and formerly famous cotton was described by Dr. Roxburgh many years ago as Gossypium herbaceum but Sir George Watt refers to it as Gopssypium arboreum (Linn.) Var. Neglecta (Watt). It differs from ordinary Bengal cotton, (such as is still grown to a limited extent in the hilly parts of Bankura and Midnapore) in being more erect, having fewer branches and in the lobes of the leaves being more pointed. The whole plant is tinged with red even the petioles and nerves of the leaves. This red colour and the deeply indented leaves together with the fine silky fibre are distinguishing features".[৬]

বাংলাদেশে বর্তমানে তুলা উৎপাদন কমে গেলেও এক সময় কৃষক নিজে প্রক্রিয়াজাত তুলা বিক্রি করলে ভাল মুনাফা আশা করতে পারতো। তাছাড়া সে যদি পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ সংরক্ষণ করতে পারতো তার লাভ আরো বেশি হতো। উল্লেখ্য, এক মৌসুমের জন্য তুলা ধরে রাখতে পারলে তুলার ভাল দাম পাওয়া যেতো। বৃটিশ ভারতে দেশি তুলার পাশাপাশি বাংলার প্রধান ব্যবসায়ী ও এজেন্সী হাউজগুলো কলকাতা, ভাগনগোল এবং মির্জাপুর এই তিনটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পশ্চিম ভারত (সুরাট এবং সেরুনজি), দক্ষিণ ভারত (দক্ষিণাত্য এবং নাগপুর) এবং বিহার হতে রুই তুলা আমদানি করতো। সেখানে তারা প্রতিটি জেলার বাণিজ্য বিপণীগুলোতে সরবরাহ করতো। মিঃ টেইলর তার গ্রন্থে বলেন,

"when the industry had already become moribund, mentions that formerly, when cotton was more extensively cultivated, there were three shades of quality observable in the staple. They were known by the names of 'phootee', 'nurmah' and 'bairati'. He goes on to mention that the cotton of his day was affirmed by the cultivators to be inferior, the crops were less abundant and the fibre although equily fine was shorter than it used to be.[৭]

তুলা উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধি এবং মান নিয়ে বৃটিশ Director of Agriculture, Bengalএর ১৯২১

সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়,

> The industry suffered severely from the competition of cheaper imported goods manufactured by power looms in other countries. To-day the industry is a very small and struggling one. The cloths made are of somewhat inferior quality and all the yarn is imported from other parts of India and no cotton is grown locally.
>
> In the days when the industry was in its prime, however, there seems to be no doubt whatever that all the cotton required was grown locally. Thus Luillier writing in 1726 (Nouv. voyages grandes Ind.) speaks of large quantities of cotton being grown in Bengal and that the plants grew to a height of three feet. Mr. Bebb, Commercial Resident of Dacca, in a report to the East India Company, dated 1788 speaks of the staple as "the finest cotton in the werid and producing cotton of astonishing beauty and fineness."[৮]

সুতার যথাযথ সরবরাহ না থাকার কারণে তাঁতিদের উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি হলেও কোম্পানির কর্মকর্তাগণ উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নয়নের কোন পরামর্শ দেয়নি। কোন বিশেষ যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারেও কোম্পানি গুরুত্ব দেয়নি। "although they had not hesitate to introduce the filature system of reeling in the silk winding sector."[৯] ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য এলাকা হতে আমদানির মাধ্যমে বাংলার স্থানীয় পণ্য দ্রব্যের বাড়তি চাহিদা পূরণ করা হচ্ছিল। ল্যাঙ্কাশায়ার এবং চীনে কাঁচা তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ছিল বাংলায় উৎপাদিত তুলার মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের চাহিদা মিটবেনা। কারণ একই সময়ে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমানে তুলা পাওয়া যেত। তবে আমেরিকার তুলার চেয়ে ভারতীয় তুলার দাম কম ছিল। সেজন্যে এ অঞ্চল থেকে বৃটেন এবং চীন তুলা আমদানী করত।[১০]

১৭৮৫ সালে যেখানে চীনে তুলা আমদানির পরিমান ছিল ৬ মিলিয়ন বেইল ১৭৯৫ সালে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়ন বেইলে। একইভাবে এ অঞ্চল থেকে ইউরোপে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল। যার প্রমাণ তৎকালীন Director of Agriculture, Bengal G. Evans এর রিপোর্টে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন "The decline of the industry appears to have set in about 1789. Thus in that year the exports from Dacca to Europe alone amounted to 22 lacs of rupees worth. In the year 1813 they did not exceed 31 lacs and in 1817 they ceased altogether."[১১] পাশাপাশি ইংল্যান্ডেও তুলা আমদানির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এর ফলে কাঁচা তুলার দাম বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লিভারপুলে সুরাটের তুলার দাম ছয়গুণ বেশি দামে বিক্রি হতো। তুলার দামের এই উর্ধ্বগতি অবশ্যই ইংরেজ কোম্পানি বিশেষ করে ব্যবসায়ী এবং আড়ৎদারদের বাংলা হতে তুলা সরবরাহে উৎসাহিত করেছিল। বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোম্পানি শেষ পর্যন্ত তুলা চাষের জন্য বীজ বিতরনের সুপারিশ করেছিল। পরবর্তীতে বৃটিশ আমলের শেষ ধাপে মসলিন উৎপাদন কম হয়ে গেলেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সাধারণ সুতিবস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তুলা ও কাঁচামালের জন্য বর্তমান বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিলো। পাকিস্তান শাসনামলে এ দেশে তুলা উৎপাদনের প্রচেষ্টা খুব সীমিত ছিল। স্বাধীনতার আগে স্থানীয় বস্ত্র কলের জন্য কাঁচামালের যোগান দেয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দিলে স্থানীয়ভাবে তুলার উৎপাদনের গুরুত্ব অনুভূত হয়েছিল। এসময় আমাদের বস্ত্র শিল্পগুলো কাঁচামালের অভাবে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এই অবস্থায় ১৯৭২ সালে দেশে তুলার চাষ সম্প্রসারণ করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭৪-৭৫ সালে মাঠ পর্যায়ে আমেরিকান আপল্যান্ড তুলা দিয়ে পরীক্ষামূলক তুলার চাষ শুরু করে। ১৯৯১ সালে তুলা গবেষণার দায়িত্ব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিকট স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাজ তুলা উন্নয়ন বোর্ড সম্পাদন করছে।[১২]

৩.২.৪.২(ক) দেশে বর্তমান সময়ে সরকারী উদ্যোগে তুলা উৎপাদন কর্মসূচী

বর্তমান বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৫টি ইউনিট কার্যালয়, ১৩টি জোনাল কার্যালয় এবং ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় এর মাধ্যমে তুলা চাষ সম্প্রসারণসহ তুলা উৎপাদন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। রিজিয়ন পর্যায়ে উপ-পরিচালক, জোনাল পর্যায়ে প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ইউনিট পর্যায়ে কটন ইউনিট অফিসার তুলা চাষ সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত আছেন। সদর দপ্তরের নির্বাহী পরিচালক এবং উপ-পরিচালকসহ সহযোগী কর্মকর্তাগণ সার্বিক কর্মকান্ড তদারকি করেন। ২০১৫-১৬ সালে তুলা চাষ মৌসুমে দেশে ৪২০০০ হেঃ জমিতে তুলাচাষ করে প্রায় ১৫২০০০ বেল তুলা উৎপাদিত হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় খামারে এবং ইউনিট পর্যায়ে তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, চাষী র‌্যালী ও মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে।[১৩]

৩.২.৪.২(খ) তুলা গবেষণা

তুলা উৎপাদন সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯১ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তুলা গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো কাংখিত গুণাবলীর আঁশ সম্বলিত স্বল্প-মেয়াদি উচ্চ ফলনশীল

ও হাইব্রিড জাতের উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জৈব ও অজৈব সারের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৃত্তিকা উর্বরতার উন্নয়ন, তুলার ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে জৈব কীটনাশক নিরূপন এবং তুলার রোগবালাই ব্যবস্থাপনা। তাছাড়াও, পার্বত্য অঞ্চল, চর, লবণাক্ত ও খরাপ্রধান এলাকায় তুলার আবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গতানুগতিক জ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তির সমন্বয়ে প্রতিকুলতা সহনশীল বিষয়ক গবেষণা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হচ্ছে।

৩.২.৪.২(গ) বাংলাদেশের বর্তমানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তুলা গবেষণা এলাকা[১৪]

ক্র. নং	আঞ্চলিক কার্যালয়	জোনাল কার্যালয়	জেলাসমূহ	ইউনিট সংখ্যা
১	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ	১৪
		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল	১৫
২	যশোর	যশোর	যশোর, ঝালকাঠি, ঝিনাইদহ ও খুলনা	১৯
		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, মেহেরপুর	১৬
		ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর	২১
		চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর	১৭
৩	*রংপুর*	রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম	১৬
		ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর	১২
		বগুড়া	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, পাবনা	১৪
		রাজশাহী	রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ	১৮
৪	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান	০৯
		রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	১০

৩.২.৪.৩ বাংলাদেশে সুতার বণ্টন ব্যবস্থা

ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি দিক হতে আরম্ভ করে সত্তর দশকের শেষ নাগাদ সুতা সরবরাহের প্রায় সবটাই আসত দেশীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মিল থেকে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মিলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তিমালিকানায়। সুতা ব্যবসাও নিয়ন্ত্রিত হত ব্যক্তিমালিকানাধীনে। সুতাকলগুলি তাদের নিজস্ব বিতরণকারী (distributor) নিয়োগ করত। তারা পাইকারী বিক্রেতা হিসেবে কাজ করত। এভাবে প্রায় ২০০ পাইকারী ব্যবসায়ী বাংলাদেশের পুরো সুতার বাজার নিয়ন্ত্রণ করত। সুতা ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিন্দু ছিল নারায়ণগঞ্জ। অন্যান্য স্থানে যেমন নরসিংদী, রামচন্দ্রপুর, চট্টগ্রাম এবং কুমারখালীতেও সুতার পাইকারী ব্যবসা চলত। এ সমস্ত পাইকারী ব্যবসায়ীরা খুচরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে সুতা বিক্রি করত। তাঁতীরা খুচরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে সুতা কিনত। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় তাঁতীরা খুচরা ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে সরাসরি সুতা কিনত।

সুতার বাজার ছিল প্রতিযোগিতামূলক। প্রত্যেক ব্যবসায়ী বড় অংকের সুতা কেনা-বেচা করত। তাঁরা খুব কম লাভেই বাজারে সুতা ছেড়ে দিতেন। লাভের হার অনেক সময় ১% থেকে ১.৫% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকত।[১৫]

এক সাক্ষাৎকারে নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর পরিচালক ও বাংলাদেশ কটন এসোসিয়েশেনের এক্সিকিউটিভ সদস্য জনাব মো: মোমেন সরকার জানান, বর্তমানে তুলার উৎস হলো মূলত আমদানি। তুলা ব্যবসায়ীগণ ও স্পিনিং মিলের মালিকগণ ভারত, রাশিয়া, মিশর এবং আমেরিকা থেকে তুলা আমদানি করে থাকে। দেশীয় স্পিনিং মিলগুলো এসকল তুলা থেকেই সুতা উৎপাদন করে থাকে। তাতে ব্যবহৃত সুতা মূলত দেশীয় স্পিনিং মিলগুলোতেই তৈরি হয়। তবে জামদানি শাড়ি এখন টাঙ্গাইল হাফ সিল্ক শাড়ি তৈরিতে টানা (তানা) তে বিদেশী সিল্ক সুতা ব্যবহৃত হয়। আর বুননে ব্যবহৃত হয় দেশীয় স্পিনিং মিলে তৈরি কটন সুতা।[১৬]

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত ব্যবসায়ীরা দেশীয় মিল থেকে সুতা উত্তোলনের পাশাপাশি পাকিস্তান (পশ্চিম) থেকেও সরাসরি সুতা আমদানী করতো। পাকিস্তানী মিল মালিকরাও অনেক সময় সরাসরি নারায়ণগঞ্জে সুতা পৌঁছে দিতো।[১৭] স্বাধীনতার পরে সরকারী নীতির ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭২ সনে সমস্ত সুতা ও কাপড়ের মিল রাষ্ট্রীয়করণ করে এর ব্যবস্থাপনার ভার দেয়া হয় বিটিএমসি (বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন) এর হাতে। ঐ সময় বিদেশ থেকে সুতা আমদানীর দায়িত্ব দেয়া হয় সম্পূর্ণভাবে বিটিসিবিকে।[১৮] তবে মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি উভয় খাতে সূতা আমদানি করা হয়ে থাকে।

৩.৩ বাংলাদেশে তাঁত যন্ত্রের প্রকারভেদ

তাঁত শিল্পের নিরিখে সুতার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাঁত যন্ত্র। প্রধানত বিভিন্ন ধরনের সুতা দিয়ে বিবিধ রং ও ডিজাইনের যেসব বস্ত্র বয়ন করা হয়, সেই ঘটনাটি ঘটে তাঁত যন্ত্রে। তাঁত যন্ত্রের গুরুত্বের কারণেই এই বয়ন শিল্পের আরেকটি নাম হয়েছে 'তাঁতশিল্প'। তবে তাঁত যন্ত্রেরও বহু রকমফের আছে। প্রতিটি তাঁত যন্ত্রের আছে নানা রকম সুবিধা-অসুবিধা। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁত যন্ত্র ঠিক একই রকমভাবে বিকশিত হয়নি। তাঁত যন্ত্রের বিবর্তনের রূপরেখা নিয়ে একটু ঐতিহাসিক আলোচনা করা যায়:

১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন কি (John Key)[১৯] নামে জনৈক ইংরেজ, দক্তি (Sley) এবং তার দুই পাশে দুটি বাক্স (Shuttle box) প্রস্তুত করে তাতে মেড়া (Picker) বসিয়ে একটি হাতল ও দড়ির সাহায্যে এক বাক্স হতে অপর বাক্সে খুব দ্রুত বেগে মাক্কু (Flying Shuttle) চলাচলের কৌশল আবিষ্কারের পর হতে হস্ত তাঁতের যে পর্যায়গুলো এসেছে তারই একটি পর্যায়ে আমাদের এই অঞ্চলের তাঁতীরা বয়ন প্রণালী সম্পন্ন করে থাকে। হস্তচালিত তাঁত মেশিনের যে পর্যায়গুলো এসেছে সেগুলো হলো:

(১) প্রিমিটিভ লুম (Primitive Loom);

(২) শ্রীরামপুরী ফ্লাই সাটেল লুব বা ঠক্ঠকি তাঁত (Fly Shuttle Loom);

(৩) গর্ত তাঁত (Pit Loom);

(৪) ফ্রেম তাঁত (Frame loom) দক্তি উপরে ঝুলানো (Over hung Sley), দক্তি নিচে ঝুলানো (Under hung Sley);

(৭) কলের ঠক্‌ঠকি তাঁত (Automatic Shuttle loom);

(৮) হ্যাটার্সলি সল্‌ভেসন আর্মি (Hattersly Salvation Army);

(৯) চিত্তরঞ্জন বা জাপানি;

(১০) ডবি তাঁত (Dobby loom): দেশি ডবি (Bangla Dobby), বিলাতী ডবি (English Dobby);

(১১) জ্যাকার্ড তাঁত (Jacquard loom).

৩.৩.১ বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সর্বাধিক প্রচলিত তাঁত যন্ত্রসমূহ

৩.৩.১(ক) গর্ত তাঁত (Pit Loom)

প্রাচীন অথচ অদ্যাবধি সর্বাধিক প্রচলিত তাঁত হলো গর্ত তাঁত। বৃহত্তর ঢাকা তথা নরসিংদী, মাধবদী, বাবুরহাট, রায়পুরা, পলাশ, শিবপুর, আড়াইহাজার এলাকায়, শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা তৈরিতে এই তাঁত সর্বাধিক প্রচলিত। গর্ত তাঁতের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ভূমিতে সমান্তরাল তাঁতের সম্পর্ক আছে মনে করা হয়। ভূমিতে সমান্তরাল তাঁতে কাজ করার কিছু ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। যেমন-যেভাবে এবং যে ভঙ্গিতে বসে এই তাঁতে কাজ করা হয়, তা মোটেই আরামদায়ক নয়, বরং কখনো কখনো পীড়াদায়ক। ফলে বয়নকাজে তাঁতীর কাজের সুবিধার জন্য গর্ত তাঁতের উদ্ভব ঘটে।

এ ধরনের তাঁতের আরেকটা সুবিধা যে, মাটিতে গর্ত করে বসানোর ফলে টানা সুতা বেশ ঠাণ্ডা থাকে এবং সহজে ছিড়ে যায় না। মিহি সুতার কাজের জন্য এই তাঁত খুব উপযোগী।

আদিকাল থেকে বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় তাঁত হলো গর্ত তাঁত। এ ধরনের তাঁতে মাকু হাতে ছুঁড়ে টানা সুতার ওপর ও নিচ দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে পোড়েনের সুতা এপাশ-ওপাশ করানো হয়।

এ ধরনের তাঁতের প্রচলন বাংলাদেশে এখন আগের তুলনায় কম। উনিশ শতক পর্যন্ত এ ধরনের তাঁতের সংখ্যাই বাংলাদেশে বেশি ছিল। উল্লেখ্য, কিংবদন্তির ঢাকাই মসলিন এই সনাতনী গর্ত তাঁতেই তৈরি হতো। এখনো ঢাকাই জামাদানি হাতে মাকু ছোঁড়া গর্ত তাঁতে তৈরি হয়ে থাকে। বিষয়টা পরিষ্কার করে বোঝার জন্য রূপগঞ্জ– তারাব এলাকায় জামদানি বয়নের জন্য প্রচলিত গর্ত তাঁত সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে জামদানি তৈরিতে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় এই গর্ত তাঁত। জামদানি কাপড় তৈরিতে ব্যবহৃত তাঁত প্রধানত বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে তৈরি হয়। তবে প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের দড়ি বা সুতলি এবং অল্প বিস্তর লোহাও ব্যবহার করা হয়। জামদানি তাঁতের

বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম এবং সংখ্যা (একটি তাঁতে কয়টি করে লাগে) সেই বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

নরদ ২টি, (কোলনরদ ও বাইরের নরদ/ভিম), বিশ রকম খুঁটা ২টি, উপি ৪টি, দক্তি ১টি, নাচনিকাঠি ৭টি, বও ২টি, সানা/হানা ১টি, বাবারি ২টি, চৌচালা ১টি, ফান্দি ২টি, তলপাওর ২টি, মুতিকামানি ১টি, মনি ১টি, গোড়ার কাঠি ২টি, খিলি ১টি, ছাটা প্রয়োজন অনুসারে, কাড়ুল ২টি, মাকু ২টি, মালসি ১১টি, বাইটের কাঠি ২টি, নলি ১টি থেকে ৫টি পর্যন্ত, ব্যাডন ১টি, পাটি ৪টি, বাঁশের ডালি ১টি।

জামদানি ছাড়াও কোথাও কোথাও গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদি তৈরি করা হয় সনাতনী গর্ত তাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে তুলনামূলক বেশি ব্যবহৃত হয় ঠকঠকি তাঁত বা ফ্লাই সাটল লুম।

৩.৩.১(খ) ঠকঠকি তাঁত (Fly-Shuttle Loom)

বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল ও বৃহত্তর পাবনা জেলায় প্রচলিত এই তাঁত। আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে হাতে মাকু ছুঁড়েই সমস্ত তাঁতের কাজ করা হতো। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন কী (John Key) নামে একজন বৃটিশ ব্যক্তি দক্তি (Sley) এবং তাঁর দুই পাশে দুটি বাক্স (Shuttle Box) প্রস্তুত করে তাতে মেড়া (Picker) বসিয়ে একটি হাতল ও দড়ির সাহায্যে একদিক হতে অন্যদিকে খুব দ্রুতবেগে মাকু চলাচলের একটা কৌশল আবিষ্কার করেন।[২০]

ঠকঠকি তাঁত প্রথমে শ্রীরামপুরে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয়, বিশ শতকের শুরুতেই ঠকঠকি তাঁত বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। তবে শুরুতে তা তেমন একটা সফলতা লাভ করেনি। A Survey of the industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908 গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হচ্ছে, "... only from three districts have reports reached me of the adoption of fly-shuttle looms by professional weavers to a very limited extent."[২১]

এই জেলাগুলোর বিবরণও দেয়া হয়েছে এই প্রতিবেদনে,

> "in Barisal, the Serampur fly-shuttle looms are said to have been adopted about ten years ago, and are now being used by nearly 200 families of weavers. A certain Maulvi of Hasthisunda of Gounadi thana, in Barisal, prepares fly-suttle sley, at a cheap rate of Rs. 10 to Rs. 15 each. In some parts of Faridpur, the Serampur looms are reported to have been adopted from the neighbouring town of Kushtea, where such looms are in use. There are 20 such looms are in Sadardi village in Banga, district Faridpur, In china, by the exertions of one Mehendra Nath Nandy, about 20 weavers are reported to be using fly-suttle looms."[২২]

উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে সরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদনে সনাতন তাঁতের চেয়ে উন্নত ঠকঠকি তাঁতের প্রচলনের পক্ষে নানা সুপারিশ করা হয়েছে বলে দেখা যায়। এর ফলস্বরূপ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম ছিল Serampore Weaving Institute।[২৩] বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাসে এই বয়ন বিদ্যালয়টির বিশেষ ভূমিকা আছে।

পাবনা জেলার ইতিহাস (১৯২৬) গ্রন্থের বিবরণ, 'সনাতন প্রথায় হস্তচালিত মাকুতে তন্তুবায় ও কারিকরগণ পূর্বে যে রূপ তাঁতের কাজ করিত এখনও তাহাই বিদ্যমান আছে। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর হইতে দেশিয় তাঁতের সহিত সূত্র সংযোগে ফ্লাইসাটল নামক একপ্রকার ঠকঠকি তাঁতের প্রচলন হইয়াছে।[২৪] বিশ শতকের গোড়ায় (১৯০৫-এর পর) সূত্রপাত হলেও এটি বিস্তার লাভ করতে আরো কিছু সময় লেগেছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। পাবনা জেলার ইতিহাস (১৯২৬) গ্রন্থে বলা হচ্ছে, 'সরকারি বিবরণী হইতে মোটামুটি জানা যায় এই জেলায় প্রায় সাড়ে নয় হাজার তাঁত আছে, তাহার মধ্যে তিন হাজার পরিমাণ ফ্লাইসাটল তাঁত।'[২৫]

শুধু তাই নয়, এর পেছনে স্থানীয় বয়ন বিদ্যালয়ের ভূমিকার কথাও বলা হয়েছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের বিবরণ, 'সম্প্রতি এখানে যে একটি বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে,তাহাতেও অনেক কাপড় তৈয়ারি হইতেছে। ইহাতে অনেক উপকার হইবে আশা করা যায়।[২৬] তবে কিছুদিন পরের, করুণা দাস গুহের লেখা (১৯৩৪) থেকে পাবনা জেলার তাঁতশিল্প এবং তাতে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের কথা আরো স্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছেন, 'গত দেড় বছরের মধ্যে শিল্প-সংক্রান্ত কাজে আমাকে অনেকবার পাবনা জেলায় যেতে হয়েছিল।... কিছুদিন আগে থেকেই দুটি ভ্রাম্যমান বয়ন-বিদ্যালয় উক্ত জেলায় কাজ করছিল। তাদের সাফল্য অভূতপূর্ব। বর্তমানে সমস্ত জেলায় প্রায় বিশ হাজার তাঁত চলছে। কেউ কৃষিকার্যের অবসরে তাঁত চালায়, কারও বা তাঁতের কাজই একমাত্র অবলম্বন। এই বিশ হাজার তাঁতের মধ্যে উন্নত ধরনের তাঁত (Flyshuttle এবং Jacquard) প্রায় পাঁচ হাজার এবং তার সবগুলিই শিল্প-বিভাগের চেষ্টায় প্রবর্তিত হয়েছে।[২৭] শুধু পাবনায় নয়, অন্তত ত্রিশ দশকের মধ্যেই বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের চেষ্টায় বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও ফ্লাই সাটল লুম বা ঠকঠকি তাঁত বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গীয় কুটির শিল্পবিষয়ক জরিপে টাঙ্গাইল অঞ্চল সম্পর্কে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, "In many places in the interior of Tangail subdivision fly-shuttl looms have been introduced by the peripatetic weaving instructor there."[২৮]

৩.৩.১(গ) চিত্তরঞ্জন বা জাপানি তাঁত

এটা লোহা ও কাঠ দ্বারা নির্মিত। এটাকে সেমি-অটোমেটিক তাঁত বলা যেতে পারে। এই তাঁতের বয়ন প্রক্রিয়া অন্যান্য সাধারণ তাঁতের মতোই। তবে পার্থক্য এই যে, চিত্তরঞ্জন তাঁতে কাপড় বোনার সময় টানা-ছাড়া (Let off) এবং কাপড় জড়ানোর (Take off) কাজ এক সাথে হতে থাকে। অর্থাৎ বাইরের

নরদের টানা সুতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজন মতো ছাড়তে থাকে এবং বোনা কাপড় কোলনরদের সাথে জড়াতে থাকে। এর জন্য আলাদা করে তাঁতীকে কিছু করতে হয় না। সাধারণত তাঁতে (ফ্রেম তাঁতে বা গর্ত তাঁতে) এই কাজটি করতে হয় তাঁতীকে নিজে হাতে। চিত্তরঞ্জন তাঁতের এটাই সুবিধার দিক। যেকোনো ধরনের মোটা বা মিহি কাপড় এই তাঁতে বেশি পরিমাণে বয়ন করা যায়। বাংলাদেশে এই চিত্তরঞ্জন তাঁতই 'জাপানি তাঁত' নামে পরিচিত। কেন এই তাঁতকে জাপানি তাঁত বলা হয়, এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। (খুব সম্ভবত কারিগরি বিষয়ের সঙ্গে জাপানিদের সম্পৃক্ততার যে ধারণা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তা থেকে এটা হতে পারে।) প্রকৃত পক্ষে জাপানের সাথে এই তাঁতের কোনো সম্পর্ক আছে, এমন কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। এই তাঁতেরও উদ্ভব ঘটেছে শ্রীরামপুরে। এবং সেখান থেকে এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁত বিশেষ জনপ্রিয়।

বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন তাঁতের সূত্রপাত হয়েছে মোটামুটি দেশ ভাগের কিছুকাল আগে থেকে। এই তাঁত নির্মাণের ব্যয় গর্ত তাঁত বা ফ্রেম তাঁতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে উৎপাদনের পরিমাণও অন্যান্য তাঁতের চেয়ে বেশি বলে ক্রমশ এটা জনপ্রিয় হয়েছে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে চিত্তরঞ্জন তাঁতে বেশিরভাগ কাপড় তৈরি হয়ে থাকে।

৩.৩.১(ঘ) হ্যার্টসলি তাঁত

এছাড়াও আরেক ধরনের তাঁত আছে, যেটা চিত্তরঞ্জন তাঁতের চেয়েও বেশি স্বয়ংক্রিয়, এটা হ্যার্টসলি তাঁত নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বিশ শতকের প্রথমার্ধেই হ্যার্টসলি তাঁতের সূত্রপাত হয়েছে।১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই তাঁত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারকের নাম অনুসারেই নামকরণ করা হয় এই তাঁতের। এটা প্রায় পুরোটাই লোহা ও স্টিল দিয়ে তৈরি। আশির দশক থেকে বাংলাদেশের বেশিরভাগ হ্যার্টসলি তাঁত বিদ্যুত ব্যবহার করে পাওয়ার লুমে পরিবর্তিত করা হয়েছে। বর্তমানে এই তাঁত দেখা যায় না বললেই চলে।

৩.৩.১(ঙ) বিদ্যুৎ চালিত তাঁত বা পাওয়ার লুম

বিদ্যুৎচালিত তাঁত বা পাওয়ার লুমের (Power loom)[২৯] উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছে ইউরোপে। শুরুতে এটা জলীয়বাষ্পের শক্তি বা স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে চালানো হতো। পরে বিদ্যুত ব্যবহার শুরু হয়। এটিকে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে আশির দশকে এই তাঁতের তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচলন হয়। প্রথমে পলিস্টার কাপড় বেশিতৈরি হলেও এখন পাওয়ার লুমে সুতি কাপড়ই বেশি উৎপাদন হয়। এই তাঁতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা চালাতে প্রতিটি তাঁতের জন্য একজন বা দুজন ব্যক্তি লাগে না, একজন ব্যক্তিই একাধিক তাঁত চালাতে পারে। প্রধানত বিদ্যুতের শক্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এটা

চালিত হয়। তবে কারেন্টের তাঁতে একজন পর্যবেক্ষক তাঁতী থাকে, যার অধীনে একাধিক তাঁতে একই সাথে কাজ চলতে পারে। সেই তাঁতী প্রয়োজনে বা কোনো সমস্যা হলে তা সমাধান করে দেয় এবং যথাযথভাবে বয়ন কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এই তাঁতে উৎপাদনের পরিমাণ হাতে চালিত যেকোনো তাঁতের চেয়ে বেশি। তবে এই তাঁতে খুব সূক্ষ্ম সুতায় কাজ করা মুশকিল। সাধারণ মানের কাপড়ের জন্য এই তাঁত বহুল ব্যবহৃত হয়। এই তাঁতের একটা অসুবিধা এই যে, তা বিদ্যুতের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বিদ্যুত না থাকলে এই তাঁতে কাপড় বোনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই তাঁতে অন্যান্য তাঁতের চেয়ে অনেক বেশি শব্দদূষণও ঘটে। তারপরও সময় অনুযায়ী কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এই তাঁতের ভাল চাহিদা রয়েছে। তবে বর্তমানে লুঙ্গি কারিগররা হস্তচালিত যন্ত্রচালিত দুটি তাঁতেই অভ্যস্ত। অনেক সচ্ছল তাঁত মালিকরা হস্তচালিত তাঁতের পাশাপাশি এই তাঁত স্থাপন করেছেন।

৩.৩.১(চ) ফ্রেম তাঁত

বাংলাদেশে ফ্রেম তাঁত গর্ত তাঁতের মতই প্রচলিত। শুধু একটি ফ্রেমের উপর বসানো থাকে বলে একে ফ্রেম তাঁত (Frame fly Shuttle loom) বলে। এই তাঁতের সন্ধান মেলে নরসিংদী সদর উপজেলাধীন মহিষাশুরা এলাকায়। এই তাঁতে মাটিতে বসে কাপড় বুনতে হয় না। নানা প্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনতে পূর্ব বর্ণিত গর্ত তাঁত অপেক্ষা এই তাঁতে অধিক সুবিধা। এই তাঁতে ক্লথ বীম এবং ওয়ার্প বীম একই লেভেলে বসানো আছে বলে বড় বড় টানা বুনতে অসুবিধা হয় : কারণ বুনতে বুনতে ক্লথ বীমের ডায়ামিটার মোটা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ওয়ার্প বীমের ডায়ামিটার কমে যায় ফলে টানার লেভেল রাইট পজিশনে রেখে লম্বা কাপড় নিখুঁতভাবে বুনতে সুবিধা হয় না। সুতরাং এই ফ্রেম তাঁতে ওয়ার্প বীম ব্যাক রেস্টের নিচে এবং ক্লথ বীম ফ্রন্ট রেস্টের নিচে স্থাপন করে কাপড় বুনলে বড় টানা বুনতে অসুবিধা হয় না। কাপড়ে Reed Marks-ও দেখা যায় না। যে ফ্রেম তাঁতে এমন ব্যবস্থা তাকে মান্দ্রাজী তাঁত বলে। এই ফ্রেম তাঁত আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-দক্তি উপরে ঝুলানো এবং দক্তি নিচে ঝুলানো। এই দুই প্রকার ফ্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপরে ঝুলানো দক্তি ইচ্ছামতো এদিক-ওদিক সরানো যায় এবং এই তাঁতে মিহি ও মোটা যেকোন কাপড় বোনা চলে। কিন্তু নিচে ঝুলান দক্তি এক অবস্থায় আটকানো থাকে। সুতরাং এই তাঁতে মিহি কাপড় বোনা যায় না। উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় বুনন সম্পন্ন করে শ্রমিকরা কাপড় ভাঁজ করে সপ্তাহে এক-দুই দিন স্থানীয় বাজারে নিয়ে যায়। রায়পুরা এলাকার তাঁতীরা হাটুভাঙ্গা বাজার এবং মহিষাশুরা এলাকার তাঁতীরা মাধবদী বাজারে এই পণ্য সরবরাহ করে থাকে। পাইকাররা তাঁতীদের এই লুঙ্গি সংগ্রহ করে ক্যালেন্ডারিং কারখানায় সরবরাহ করে থাকে। সেখান থেকে ক্যালেন্ডারিং ও প্যাকেটজাত হয়ে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়।

৩.৩.১(ছ) ঢাকা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত তাঁত

মাঠ পর্যায়ে আমরা দুই প্রকারের ঠক্‌ঠকি তাঁত প্রক্রিয়াকরণ দেখা যায়। বৃহত্তর ঢাকার নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাধীন হাইরমারা, হাটুভাঙ্গা, নিলক্ষা এলাকাটি বর্তমানে গর্ত তাঁতের জন্য বিখ্যাত। সমতল ভূমিতে চার কোণে চারটি বাঁশ বা কাঠের খুঁটি পুতে মান্ধাতার আমলের তাঁতের মত মাটিতে গর্ত করে বসানো হয়। কিন্তু এই তাঁতে ফ্রেম তাঁতের মত দক্তি এবং তার দুই পাশে দুটি সাটেল বক্স রেখে পিকার, হ্যান্ডেল ও পিকিং ব্যান্ডের সাহায্যে এক বাক্স হতে অপর বাক্সে দ্রুত বেগে মাক্কু চলাচলের কৌশলও বর্তমান আছে। একমাত্র মাটিতে গর্ত করে বসানো হয় বলে একে গর্ত তাঁত বলে। বয়ন প্রণালী ফ্রেম তাঁত ও গর্ত তাঁতের প্রায় একই। মাটির মেঝে ঠাণ্ডা থাকে বলে গর্ত করে তাঁত বসালে সুতা সর্বদা নরম থাকে। ফলে সুতা সহজে ছেঁড়ে না। Texture ভাল হয়। মিহি সুতার তন্তুবায়কগণ এ কারণেই ঠক্‌ঠকি গর্ত তাঁত বেশি পছন্দ করেন। এছাড়া এতে খরচও কম হয়। অধিকাংশ গ্রাম্য তন্তুবায়কগণ, যারা সাধারণ কাপড় বুনে থাকেন, তারা Warp beam ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ টানাকে প্রয়োজন মত ভাঁজ করে এক একটি ভাঁজ (Under High Tension) রেখে কাপড় বুনে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একজন শ্রমিক ঝাঁপ তোলা (Shedding) মাক্কু ছেঁড়া (Picking), গাতনি দেয়া (Beating), কাপড় জড়ানো (Take up) ও টানা ছাড়া (Let off) ইত্যাদি কাজগুলো পায়ে প্যাডেল টিপিয়ে দক্তি সামনে পেছনে টানলে আপনা আপনি হতে থাকে বলে এই তাঁতকে অটোমেটিক হস্ত তাঁতও বলা হয়ে থাকে। উক্ত এলাকার একজন শ্রমিক এভাবে ৮-১০ ঘণ্টা হাত-পা সঞ্চালন করে তিনটি লুঙ্গি বুনতে পারে।

৩.৪ তাঁত শিল্পের প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ তাঁত বস্ত্র বুননের বিভিন্ন পর্যায়

বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ তাঁত বুননের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কারিগরী দিকের পর্যায়গুলো আলোচনা করা প্রয়োজন।

৩.৪.১(ক) সুতা সংগ্রহ মাড়-প্রকরণ

একজন তাঁত মালিক প্রথমে সুতা সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাপড় তৈরী করেন। কার্পাস তন্তুও আঁশ নলের মত গোলাকার অথচ একটু চ্যাপটা ধরনের। কিনারগুলি করাতের দাঁতের মত, গোড়ার দিক ফাঁপা, মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হয়ে মুখটি বন্ধ (Blunt), তাই নমনীয় (Flexible) নয় ; ফলে সুতা পাকাবার পর আঁশের মাথাগুলি বাহিরে দেখতে পাওয়া যায়। সুতায় মাড় দিলে ফাঁপা স্থানগুলি পূর্ণ হয়ে জমাট বেঁধে সুতা শক্ত হয় এবং আঙ্গুলের টিপের ভেতর দিয়ে সুতা ববিন বা নাটাইয়ে জড়াবার সময় বাহিরের আঁশগুলি সুতার গায়ে বসে সুতাকে মোলায়েম করে।

সুতায় মাড় দেওয়াকে কোন কোন স্থানে “ভাতান”, “তাসন”, ‘পড়ি করা’ ইত্যাদি বলে। সুতার শক্তি ও

কমনীয়তা এবং ওজন বৃদ্ধি করা-ই মাড় দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। মাড় দিয়ে একতার (Single) সুতার শক্তি বৃদ্ধি না করলে বুনবার টানার সুতা শানা, মাকু ও বয়ের ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে না। সুতরাং মিল, ফ্যাক্টরি বা কুটির শিল্পে এই মাড়-প্রকরণের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মাড় ভাল-মন্দের উপর কারখানার উন্নতি ও অবনতি অনেকটা নির্ভর করে থাকে। ভাল সুতার খারাপ মাড় Bad Sizing হলে যেমন কাপড় বুনতে অসুবিধা, তেমন খারাপ সুতায় ভাল মাড় (Good Sizing) হলে কাপড় বুনতে সুবিধা।

মাড়ের উপকরণ

১। শ্বেতসারযুক্ত উপাদান

২। সুতা কোমল রাখিবার উপাদান

৩। ওজন বৃদ্ধির উপাদান

৪। প্রতিষেধক উপাদান এবং

৫। রঞ্জন উপাদান।

৩.৪.১(খ) টানা-প্রকরণ (Warping)

হ্যান্ডলুম ফ্যাক্টরি ও কুটির-শিল্পীদের প্রথায় টানা প্রণালী

১। এক-খেই টানা

২। ক্রিলের টানা

৩। পেগ্ টানা

৪। পাথালি ড্রামে টানা

৫। খাড়া ড্রামে টানা বা বল ওয়ার্পিং

৩.৪.১(গ) বীম বা নরোজ (Beam or Roller)

নরোজ সাধারণত ঃ দুই প্রকার, যথা (Warp Beam or Back Beam or Weavers Beam) এবং কোল নরোজ (Cloth Beam or Front Beam)। টানার নরোজ গোল অপেক্ষা ৮ পল (Eight Sided) এবং কোর নরোজ গোল হওয়াই ভাল। টানা নরোজে জড়াবার সময় পাড় সমান টেনে রেখে জড়াতে নরোজের দুই পার্শ্বে দুটি ঢাকা ব্যবহার হয়, ইহাকে ইংরেজিতে বলে ফ্লেঞ্জ (Flange)। টানার যতটা চওড়া (width) হবে, ফ্লেঞ্জ দুইখানি ততটা ব্যবধানে ফিট করে টানা জড়াতে হয়। এই নরোজ সাধারণতঃ ৪৪ কাঠের হলেই কাজের পক্ষে সুবিধা।

৩.৪.১(ঘ) শানা-গাঁথা ও বীম করা (Denting and Beaming)

পূর্ববর্ণিত যে কোন দেশি প্রথায় সুদীর্ঘ টানা প্রস্তুত হইলে একটি ড্রইং হুক (Drawing Hook)- এর সাহায্যে টানার সমস্ত সুতা শানার প্রতি ঘরে সাধারণতঃ দুইটি করে টেনে নিতে হয়, একে শানা-গাঁথা বা ডেন্টিং বলে। তারপর উক্ত Beaming Frame টি যথাস্থানে ফিট করে তাতে নরোজ ও বহরের মধ্যস্থল ঠিক রেখে বেশ টানের উপর টানটি জড়াতে হয়। ইহাকে বলে বীম-করা।

৩.৪.১(ঙ) ড্রাফটিং (Drafting)

উমি করা সমাপ্ত হলে শানা হতে সমস্ত টানা সুতার মাথাগুলি টেনে বাহির করে একটি একটি করে বীমের সুতা ডিজাইন অনুযায়ী ঝাঁপের "ব" চক্ষুর ভিতর দিয়ে উক্ত ড্রইং হুকের সাহায্যে টানতে হয় এবং ইহাকেই বলে ড্রাফটিং বা "বা"-গাঁথা (Drafting or Drawing in or Twisting in or Healding)। ড্রাফটিং নিম্নোক্ত ধরনের হয়ে থাকে।

৩.৪.১(চ) ঝাঁপ-তোলা (Shedding)

টানার সুতা ২ ভাগ করিয়া মাকু-যাতায়াতের রাস্তা করাকে ঝাঁপ- তোলা বা Shedding বলে। ঝাঁপ-তোলা Shedding সাধারণতঃ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা- (১) পজিটিভ ও (২) নেগেটিভ। তিন প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে ঝাঁপ তোলা হয়। যথা ঃ-

(১) পায়দল বা পেডেল
(২) ডবি বা ডাঙ্গি
(৩) জ্যাকার্ড

৩.৪.১(ছ) মাকু ও নলি (Shuttle & Pirn)

রেশম, কৃত্রিম রেশম, উল, জুট, কার্পেট, সুইভেল, পাওয়ার লুম প্রভৃতি বুনবার জন্য পৃথক পৃথক মাকু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডাল, শক্ত, মোটা, মধ্যম ও স্থিতিস্থাপক সুতার জন্য বড় মাকু, কিন্তু মিহি ও নরম সুতা এবং মাড় খারাপ হলে ছোট মাকু ব্যবহার করতে হয়।

টেক্সটাইল সম্বন্ধীয় কার্যক্রম: নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে, যথা ঃ

১। সুতার নম্বর নির্ণয়
২। টুইস্ট অথবা পাকেয়ান সুতার নম্বর নির্ণয়
৩। শানার ব্যবহার, হিসাব প্রকারভেদ ও পরিচয়
৪। পরিমাণ নির্ণয়
৫। "ব" এর হিসাব

৬। শানার সঙ্গে “ব” এর সম্বন্ধ
৭। হিল্ড নিটিং।

এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর তাঁত যন্ত্রটি বুননের জন্য প্রস্তুত হয় এবং তাঁতী মাকু চালনার মাধ্যমে তাঁত বস্ত্র বয়ন শুরু করেন। বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ায় তাঁত যন্ত্রগুলোতে শাড়ী (সাধারণ সূতি শাড়ী, ঢাকাই বেনারশি শাড়ী, টাঙ্গাইল শাড়ী, পাবনা শাড়ী, রেশমী শাড়ী, কাতান শাড়ী, হাফ সিল্ক শাড়ী ও ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই জামদানী শাড়ী) বিভিন্নরকম লুঙ্গী, গামছা, পর্দার কাপড়, সোফার কাপড়, শার্টিং কাপড়, থ্রি-পিছ এর জন্য কাপড়, পাঞ্জাবী-পায়জামার কাপড়সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজগুলোর চাহিদা মাফিক বস্ত্র উৎপাদিত হয়।

৩.৪.২ বৃহত্তর ঢাকার ঐতিহ্য জামদানি

৩.৪.২(ক) জামদানির পরিচয়

জামদানির নামকরণ নিয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে জামদানি শব্দটি যে ফারসি ভাষা থেকে উদ্ভূত সে বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেছেন তবে এর বাংলা অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। মোহাম্মদ সাইদুর রহমান তাঁর ‘জামদানি’ গ্রন্থে এর অর্থ প্রকাশ করে এভাবে-“জামদানি’ শব্দটি প্রধানত ফারসি শব্দ। এর অর্থ জাম হচ্ছে পারস্য দেশীয় এক শ্রেণির উৎকৃষ্ট সূরা, আর দানি হচ্ছে বাটি বা পেয়ালা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সূরা ধারণকারী পাত্র। সুতরাং এর নাম থেকেই ধারনা করা যায় যে এককালে বর্তমানের জামদানি নামেয় বস্ত্র পারস্যে প্রচুর রপ্তানি হতো ও এর ব্যবহারের প্রচলন ছিল।”[৩০] লেখক গবেষক এর মতে, ফারর্সি শব্দ জামা মানে কাপড়, দানা অর্থ বুটি; অর্থাৎ জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়।[৩১] In 2013 the traditional art of weaving Jamdani was declared a UNESCO intangible cultural heritage of humanity. In 2016, Bangladesh received Geographical Indication (GI) Status for Jamdani Sari.[৩২] জামদানি শাড়ি আন্তর্জাতিকভাবে Geographical Indication পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। “বিচিত্র কারুকার্য খচিত মসলিনের নাম জামদানি। আজও জামদানির প্রচলন আছে বলে অল্প-বিস্তর আমরা এ বস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত”.[৩৩] Textile Today News-এর মতে জামদানি শব্দটি ফারসি শব্দ ‘জামা’ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ পোশাক আর ‘জামেদান’ শব্দের অর্থ পোশাক রাখার আলমারি।[৩৪] বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রধানত জামদানি বলতে বাঙালি নারীর প্রিয় শাড়িকেই বোঝানো হয়।

জামদানি নানা প্রকারের ছিল। দাম অত্যন্ত বেশি থাকা সত্ত্বেও দেশী বিদেশী ধনীদের কাছে জামদানির বেশ চাহিদা ছিল। রাজদরবারের অধিকাংশ পোশাকের চাহিদা জামদানি দ্বারাই পূরণ করা হতো।[৩৫] তবে সেকালের জামদানির তুলনায় বর্তমানে তৈরি জামদানি কিছুটা নিম্নমানের।

৩.৪.২(খ) জামদানি বস্ত্রের প্রক্রিয়াকরণ

জামদানি শাড়ি উৎপাদন প্রধানত ঢাকা কেন্দ্রিক। বাংলাদেশে অতীত বাংলার মসলিনের গৌরবদীপ্ত আংশিক রেশ নিয়ে আজও রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের এ শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আসছে। রঙ-বেরঙের সুতা আর প্রধানত প্রকৃতি নির্ভর গ্রামীণ নকশায় কারুশিল্পীদের সুণিপুন হাতে নান্দনিক রুপ ও বৈচিত্র্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি জামদানি। অতি সাধারণ উপাদানে আমাদের কারুশিল্পীদের মনের মাধুরী মেশানো রঙের বহুবিধ ব্যবহার ও কারুকাজের সমন্বয় ঘটছে জামদানি তৈরিতে। কালের আবর্তে আমাদের অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও ঐতিহ্যবাহী মসলিনের উত্তরাধিকার জামদানি শিল্প স্বকীয়তার মাঝে আজও বিকশিত হচ্ছে।

> Jamdani is most possibly derived from the Persian word jama(e), which means clothes. Jamedan in Persian means a closer or wardrobe. In the textile history of Bangladesh jamdani generally refers to the sharee, most popular garment of Bengali women. Here are the three authoritative definitions of Jamdani, (i). A kind of cloth in which the flowers are woven and not worked (generally Muslin) Hunter 1808:539). (ii). A Dacca Muslin woven with figures of flowers and other ornaments (Knight 1881) and(iii.) A type of brocaded Dacca Muslin, usually flowered (Cannon and Kaye, 2001). Jamdani has got registration as the First Geographical Indication (GI) product of Bangladesh November 2016. Now Jamdani has its our identity it will remain if the artisans survived.[৩৬]

(এখন দেশের বাজারে জামদানি পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ববাজারে জামদানি পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ববাজারও প্রসারিত হচ্ছে। একান্তভাবে দেশীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ব্যবহারে শিল্পীদের মৌলিক শিল্পবোধ ও ধ্যান-ধারণায় সৃষ্টি জামদানি। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোন দেশের কারিগরদের পক্ষে জামদানি তৈরি সম্ভব হয়নি। এ পণ্যের আলাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর শিল্পীরা সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। আদিকাল থেকেই রাজধানী ঢাকা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রাম, সোনারগাঁ ও সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার কিছু এলাকায় জামদানি কারুশিল্পীদের বংশানুক্রমিক বসবাস। জামদানি শিল্পীদের অন্যত্র নিয়ে গিয়ে এটি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কারণ এ শিল্প বংশানুক্রমিক পারিবারিক পরিমণ্ডলে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে শিল্পভবন তৈরি করেছে, তা বিশ্বের আর কোথাও নেই। তাছাড়া শীতলক্ষ্যা নদীর পানি থেকে ভস্মিত বাষ্প জামদানি সুতা প্রস্তুত ও কাপড় বুননের জন্য অনুকূল। প্রয়োজন ও সময়ের বাস্তবতায় এ শিল্পের বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে

জামদানি তাঁতিদের স্বর্ণযুগের পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের সচেতনতার দায়িত্ব আমাদের সবার।

যেসব মসলিন তাঁতে নক্সা করা হতো, তাকে জামদানি বলা হতো। তাই তাঁতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য হলো জামদানি।[৩৭] এক সময় সারাবিশ্ব বাংলাকে যে নামে চিনতো তাহলো বাংলার জামদানি। বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে এসেছেন রাষ্ট্রীয় অতিথিরা। তারা উপহার হিসেবে পেতেন বাংলার জামদানি। এ উপমহাদেশ থেকে কেউ দুরপ্রাচ্যে বেড়াতে গেলেও বাংলার জামদানি উপহার হিসেবে নিয়ে যেতেন। বাংলার এই বিখ্যাত শিল্পটিও গড়ে উঠেছে নদী তীরবর্তী তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁকে কেন্দ্র করে। যা বর্তমানে বৃহত্তর ঢাকার অংশ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁ উপজেলা বিস্তৃত।[৩৮]

জামদানি সম্পর্কে উক্ত এলাকায় এখনো একটি কথা প্রচলিত আছে, আর তা হলোঃ-

"ভাল কাপড় বুনতে জানি
চিরুন কোটা শালের বোটা ঢাকাই জামদানি
তার ঢের কানি তা বুঝে দেয় কেটা
কুবির চরণ ভেবে বলে
এবার এ দফাতে নাই খোঁটা"

এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও রপ্তানি পণ্যের অন্যতম হিসেবে ঢাকার মসলিন ও জামদানি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো এবং তার অনেক সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যায়।[৩৯] 'Periplus of the Erythrean Sea,[৪০] প্লিনি'র[৪১] বর্ণনা, চর্যাগীতি[৪২], মার্কোপোলো'র[৪৩] বর্ণনা, মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার[৪৪] বর্ণনায় মসলিন-জামদানির প্রশংসার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন উৎসে মসলিনের বিভিন্ন ধরন এবং দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশে তার চাহিদার প্রমাণও পাওয়া যায়।[৪৫] চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং মসলিনকে তুলনা করেছিলেন 'ভোরের কুয়াশা'র সঙ্গে। সতের শতকের ফরাসি ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক জাঁ-বাপতিস্ত তার্ভেনিয়ে মসলিনকে 'মাকড়সার জাল' হিসেবে তুলনা করেছিলেন।তাঁর কথায়- এটা 'এতই সুক্ষ্ম যে হাতে ধরলে বোঝাই যায় না যে কি ধরেছি হাতে'। ১৯ শতকে লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত কার্যালয়ের প্রতিবেদক জন পোর্বস ওয়াটসন (১৮২১-৯২) লিখেছিলেন যে, 'স্বীকার করতে হয় ঢাকার "বোনা বাতাস" সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।'[৪৬] মসলিনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে প্রধানতঃ মুঘল শাসনামলে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে মসলিনের কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭] শুধু মোঘল বাদশাহরাই নন মসলিন পছন্দ করতেন তাঁদের বেগম ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। এমনকি বাদ পড়তেন না দরবারের সংগীতজ্ঞ বা নৃত্যশিল্পীরাও। মসলিনের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সম্রাজ্ঞী নুরজাহান এবং তিনি এটিকে হেরেমের পোশাক হিসাবে নির্ধারিত করেছিলেন। বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদ কুলি খান নিয়মিত মসলিন পাঠাতেন মুঘল দরবারে। ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ সাল পর্যন্ত যতদিন তিনি নবাব ছিলেন, সে আমলে

প্রতিবছর লাখ খানেক টাকার মসলিন তিনি মুঘল বাদশাহকে পাঠাতেন।[৪৮] পরবর্তীতে এটি বিভিন্ন রাজা-বাদশা ও সুলতানদের প্রাধান্যে ধীরে ধীরে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।[৪৯] সূক্ষ্ম ও আরামদায়ক কাপড় বলে গ্রীষ্মে এর কদর বেড়ে যেত। ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ বলা হয় মুঘল আমলকে।

১৭৪৭ সালের হিসাব অনুযায়ী দিল্লির বাদশাহ, বাংলার নবাব ও জগৎ শেঠের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকার জামদানি কেনা হয়। এছাড়া ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ প্রায় নয় লাখ টাকার মসলিন কেনে। তবে আঠারো শতাব্দির শেষের দিকে মসলিন রপ্তানি অনেকাংশে হ্রাস পায়। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। এদের নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের স্বার্থে তাঁতিদের উপর নির্যাতন শুরু করে। তাঁতীরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে রাজি না হলে তাদের মারধর করা হতো। অবশ্য তাঁতীদের উপর অত্যাচার ঠেকাতে কোম্পানি আইন প্রণয়ন করেছিল বলে জানা যায়। বিলুপ্ত মসলিনের একটি অংশ আজকের বাংলাদেশের জামদানি।আজ আমরা যে জামদানি দেখি এটিও ছিল এক ধরনের নকশাধার মসলিন। এখনকার জামদানির গায়ে যেমন নানা নকশা বোনা হয় তেমনি আগেকার জামদানি মসলিনেও অনেক নকশা ছিল। তাঁতেই এই নকশা করা হত। দুই জামদানির মধ্যে তফাত হলো এখনকার তুলনায় তখনকার জামদানি অনেক সুক্ষ্ম ছিল। নকশাদার বলে এটি বেশ জনপ্রিয় ছিল, রপ্তানিও হত বেশ। হস্তচালিত যন্ত্রে তৈরি এসব পণ্যের দামও ছিল অধিক।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন বর্ণনা এবং তথ্য বিবরণীতে বাংলাদেশে উৎপাদিত যে সুক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে তা মসলিন নামে পরিচিত ছিল।[৫০] নকশা, সূক্ষ্মতা ও গুণের বিভেদ অনুযায়ী এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতো। যেমন- শবনম, তানজেব, সরবন্দ, আলিবালি, নয়ন সুখ, জঙ্গল ঘাস, হানান, নিরাভরণ, ধবল, ডোরা, সরকার-ই-আলী, মবলুস খাস, আব-ই-রওয়ান, সরবতী, জামদানি ও চরখানা জামদানি ইত্যাদি। তাই জামদানিকে এক ধরনের মসলিন বস্ত্র হিসেবে অভিহিত করা যায়। উল্লেখ্য,মসলিন থেকে জামদানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর পাড় ও জমিনে বিভিন্ন রঙের অপেক্ষাকৃত মোটা সুতায় বুননের মাধ্যমে অসংখ্য দৃশ্য ও নকশার কারুকাজ। এছাড়া এর জমিন তৈরিতেও নানা রঙের সুতার ব্যবহার হতো। অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণির মসলিনগুলো হতো যেমনি সুক্ষ্ম তেমনি শুভ্র। সূক্ষ্ম ও শুভ্র বস্ত্রের উপরই নানা ধরনের ছাপ মারা ও সুঁই সুতায় হাতে নকশার কারু কাজ করা হতো।[৫১]

৩.৪.২(গ) জামদানি সুতার রঞ্জন প্রক্রিয়া

জামদানি কাপড়ে নকশা তৈরিতে বিভিন্ন রঙের ব্যাবহার করা হয় তবে বস্ত্রের মূল জমিন সাধারণত নিম্নবর্ণিত রঙের সুতায় তৈরি হয়।

পূর্বে মসলিন বস্ত্র ও জামদানি বস্ত্র বয়নের সুতা রঞ্জন করার জন্যে জামদানি পল্লীর আশে-পাশেই রংরাজ

ও নীলগর নামে এক শ্রেণির কারিগর বসবাস করতো। এ কারিগর সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় পূর্বপুরুষ থেকে লব্ধ জ্ঞান বা কৌশল থেকে দেশীয় গাছ গাছড়ার পাতা ছাল বাকল ক্ষারমাটি, বিভিন্ন ফুল ফলের রস থেকে অতি সহজেই বয়ন করা কাপড় সহ জামদানি বয়নের সুতা রঞ্জন করতে পারতেনা। এরা প্রধানত: তাঁতী সম্প্রদায়-এর পাশাপাশি বসবাস করলেও কাপড় ও সুতা রঞ্জনের কাজটি ছিল এদের একচেটিয়া সম্প্রদায়গত ও পরিবারকেন্দ্রিক। অর্থাৎ রঞ্জন প্রক্রিয়ার কলা-কৌশল রংরাজরা তাদের নিজেদের পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কাউকে শেখাতো না। এমন কি তাদের পরিবারের অবিবাহিত মেয়েদেরকেও এ বিদ্যাটি জানতে দিত না। মেয়েদের না শেখানোর কারণ ছিল মেয়েটি তো বিয়ের পর অন্য পরিবারভুক্ত হয়ে যাবে এবং বিয়ের পর মেয়েটি হয়তো তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে অর্জন করা রঞ্জনবিদ্যার কলাকৌশলটি ছড়িয়ে দেবে। এ ছিল এক সময়কার রংরাজ ও নীলগরদের কথা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বয়নশিল্পে নানা পরিবর্তন বিবর্তন সেই সঙ্গে বিদেশে প্রস্তুতকৃত উন্নতমানের রং এবং রঞ্জন করা সুতা সরাসরি এ দেশে আমদানি করার ফলে রংরাজ ও ও নীলগর শ্রেণির প্রয়োজন অনেকাংশে কমে যায়। এ পরিস্থিতিতে রঞ্জনশিল্পীরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিলুপ্তির মধ্যেও মূল জামদানি এলাকা তারাবো, রুপসী, নোয়াপাড়া, মোড়াপাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় এখনো কয়েকজন রঞ্জনশিল্পী এ কাজে নিয়োজিত আছেন।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বস্ত্র ও সুতা রঞ্জনে প্রায় তেরোটি প্রক্রিয়া চালু থাকলেও উল্লিখিত এলাকার রঞ্জন শিল্পীরা পুরাতন ও আধুনিক রঞ্জন দ্রব্য মিলিয়ে মোট পাঁচটি পদ্ধতিতে জামদানি বয়নের সুতা রঞ্জনের কাজ করে থাকে। যথা-

(১) ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ জাতীয় রং;

(২) ভ্যাট জাতীয় রং;

(৩) ক্ষার জাতীয় রং;

(৪) সরাসরি প্রয়োগকৃত রং;

(৫) ধাতব জাতীয় রং।

জামদানি বয়নের সুতার রঞ্জন এবং ধোলাই করতে সব সময়ই পরিষ্কার ও বিশেষ ধরনের পানির প্রয়োজন হয়। জামদানি বয়ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদী, স্থানে স্থানে পুকুর ডোবা ইত্যাদিতে এ পানি প্রচুর পাওয়া যায়। যার ফলে এলাকার রঞ্জনশিল্পীদের পানিজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

৩.৪.৩ সুতার প্রসেসিং

হাট থেকে 'র' সুতা কিনে আনার পর বিশেষ করে র-সিল্ক ও সুতি সুতাকে কাপড় বয়নের জন্য বিশেষ পদ্ধতিগতভাবে ভাতের মাড়ে ভিজিয়ে চরকায় পেঁচিয়ে একটি থেকে আর একটি আলাদা করা হয়। এটিই আবার রৌদ্রে শুকিয়ে আলাদা চরকায় স্থানান্তর করে সুতার কাউন্ট অনুযায়ী 'নলীতে' ভরা হয়।

আবার নকশার জন্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর মূল কারিগর বয়নের জন্য তাঁতে সুতা টানা দেন। টানার কাজ সমাপ্ত হলেই শুরু হয় বুনট ও নকশার কাজ। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, জামদানি প্রধানত: মসলিনেরই একটি প্রজাতি এবং প্রাচীন কাল থেকেই এ প্রজাতির বস্ত্র তৈরিতে বর্তমান শীতলক্ষা নদীর পাড় বরাবর পুরাতন সোনারগাঁও অঞ্চলটিই ছিল ব্যাপক উৎপাদন কেন্দ্র। তাছাড়া জামদানি বয়নে একমাত্র মুসলিম কারিগররাই ছিল বিশেষ পারদর্শী। বর্তমানেও এ জামদানি বস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে শতকরা একশত ভাগ কারিগরই মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক। পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের কারিগররা এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও বর্তমানে এ শিল্পে সম্পৃক্ত কোন হিন্দু কারিগরের সংখ্যা নেই বললেই চলে। জেমস টেলরের মতে, "সম্ভবতঃ মুসলমানরাই জামদানির বুনন প্রচলিত করেন এবং এখনও (১৮৪০) তাঁদের হাতেই এ শিল্প একচেটিয়াভাবে সীমাবদ্ধ আছে।"[৫২]

৩.৪.৪ কারিগরদের সম্প্রদায়গত এবং কর্মভিত্তিক পদবী

(ক) উস্তাদ ও সাগরেদ

একটি জামদানি বস্ত্র বয়নের জন্যে প্রতিটি তাঁতে দু'জন করে কারিগর থাকেন। এদের একজন দক্ষ কারিগর, তার পদবী 'মূল কারিগর' অর্থাৎ উস্তাদ। অপর একজন মূল কারিগরের সহায়তাকারী শিক্ষানবিশ বা "সাগরেদ"। অধিকাংশ তাঁতেই সাগরেদ বা শিক্ষানবিশদের বয়স নিচে ১০ থেকে উপরে ১৪ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাশাপাশি ১৬-১৭ বছর থেকে ৫০-৫৫ বছর থেকে বয়সের মূল কারিগর রয়েছে। শিক্ষানবিশ কারিগরদের প্রথমদিকে তেমন কোন বেতন দেয়া হয় না। তবে এ সময়ে তাদের খাওয়া-দাওয়াসহ ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় তাঁতের মহাজন বহন করেন। আবার তাঁতের মহাজন মূল কারিগরের সঙ্গে দু-ভাবে চুক্তি করেন এর একটি হচ্ছে মাসিক বেতন অথবা উৎপাদিত মালামাল বিক্রয়ের লভ্যাংশের শেয়ার। মূল কারিগরদের দক্ষতা অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হয়। তাদের বেতন সপ্তাহে ১৫০০ থেকে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার শেয়ার চুক্তিতে লভ্যাংশের ছআনা-দশ আনা অর্থাৎ' মহাজনের দশ আনা আর কারিগরের ছয় আনা। এ হিসাবে বাৎসরিক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ চুক্তি অর্ধেক-অর্ধেক হারেও সম্পাদিত হয়। এখানে মহাজনের কাজ হলো তাঁতসহ বস্ত্র বয়নের যাবতীয় ব্যয় ও উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় করা, পাইকারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আর প্রধান কারিগরের দায়িত্ব হচ্ছে তাঁতশালার রক্ষণাবেক্ষণ ও বস্ত্র বয়ন।

(খ) মহিলা কারিগর

এককালে জামদানি বস্ত্র বয়নে সুতা কাটা ও সুঁই সুতার কাজ ছাড়া বাকি সব কাজই পুরুষ কারিগররা করতেন। কিন্তু বর্তমানে জামদানি উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ দেখা গেছে অনেক মহিলা কারিগরই দক্ষতার সঙ্গে প্রধান কারিগরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরাও কারিগরের সহকারী হিসেবে

কাজ শিখছে রূপগঞ্জ জামদানী পল্লী নিকটবর্তী কাজী পাড়া, বেহাকুড় বারগাঁও, রূপসী গ্রামে দেখা গেছে অনেক নারী কারিগররা পুরো তাঁত পরিচালনা করছেন।

(গ) কারিগরদের ভূমিকা

জামদানি বা মসলিন বস্ত্র বয়নে মূল কারিগর তাঁতের ডান পাশে বসেন আর শিক্ষানবিশ বা সাগরিদ বাম পাশে। মূল কারিগর বস্ত্রটির মূল নকশা প্রণয়ন করেন এবং সে অনুযায়ী হাত ও পায়ে তাঁত চালান আর শিক্ষানবিশ মূল কারিগরের সাহায্যকারী হিসেবে মাকু মারেন এবং নকশানুযায়ী সুতা এগিয়ে দেন। প্রধানত তাঁতীর কাজটি হচ্ছে হাত ও পায়ে।

এ সম্পর্কে একটি প্রবাদও প্রচলিত রয়েছে:

'আতে যোগী
গাতে পাউ
কুল্লে যোগী
হিয়ালের ছাউ।'

অর্থাৎ হাত ও পায়ের কাজের উপরই যোগী বা তাঁতীর পেশার উৎকর্ষতা নির্ভর করে।

(ঘ) কারিগরদের সম্প্রদায়গত এবং কর্মগত পদবী

১২শ শতাব্দিতে বল্লাল সেন এর সময়ে বাঙালি সমাজে যে গোত্রীয় ভাগ ছিল তাকে বলা হতো 'নবশুভ্র'। এর মধ্যে তাঁতীরা ছিল সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির। তারা প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। তাঁতীরা ছিল প্রথম শ্রেণির এবং যোগীরা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির। মুসলিম গোত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণিভুক্ত ছিল জামদানিতাঁতী এবং নিম্ন শ্রেণির লোকদের বলা হতো জোলা। কিন্তু এদেরকে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিবিভক্ত করা সহজ নয়। তবে শ্রেণিগত বিভক্তি দিয়ে একটি সীমারেখা টানা যায়। সাধারণত যোগীরা স্থানীয় চাহিদা মেটাতো এবং অন্যরা (মলমল জাতীয়) রপ্তানির জন্য বস্ত্র তৈরির কাজ করত। পূর্ববাংলার যোগীরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল 'মাহিষ্য সম্প্রদায়'। তারা সাধারণত দক্ষিণ বিক্রমপুর, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালীর অধিবাসী। 'একদেশীরা' ছিল সাধারণত উত্তর বিক্রমপুর এবং বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের। বঙ্গ তাঁতীরা যারা নিজেদেরকে আদি তাঁতী বলে দাবি করত তারা ধামরাইয়ে বসতি স্থাপন করে। তারা ডুরিয়া, নৌবুঁটী, মলমল ইত্যাদি বস্ত্র তৈরি করে কারু কাজের জন্য ঢাকায় পাঠাতো।

ঢাকার তাঁতীরা দুটি উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। একটি বড় বাগিয়া। তাদের উপাধি বসাক। দ্বিতীয়টি ছোট বাগিয়া। তারা প্রধানত কায়স্থ (নবশুদ্রেরই একটি শাখা)। কিন্তু কাজের ধারা পরিবর্তনের জন্য তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হয়। মুসলিম জামদানি তাঁতীরা জোলাদের থেকে পৃথক ছিল। শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী ডেমরা, নবীগঞ্জ এবং অন্যান্য অঞ্চলে এদের বসতি ছিল। এই তাঁতীরা সাধারণত জামদানি কাপড় বুনতো এবং নকশাও কাটত। তাদের ঘরের মেয়েরাও সুক্ষ্ম কারুকার্যে পটু ছিল।

মসলিন বস্ত্র বয়নে এককালে ঢাকাসহ স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত “তন্তুবায়” ও পুর্বোক্ত “বসাক” সম্প্রদায় বা পদবীধারীরাই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে মসলিনের সুতা কাটা থেকে বস্ত্রবয়ন, শুভ্র ও ধৌতকরণ পর্যন্ত ছিল তাদের কাজ। এরপর সে বস্ত্রখণ্ডের রিফুকরণ, নকশার অলঙ্করণ, বিভিন্ন নকশা বুনন, নক্‌শার ছাপমারা, বুটি তোলা ও মসলিনের উপর সোনা রূপা বা জরির কাজ করণে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কারিগর ও শিল্পীরাই ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। মসলিন বস্ত্রের পর্যায়ক্রমিক কাজ ও কাজের শ্রেণি অনুযায়ী এদের বিভিন্ন পদ ও পদবীতে চিহ্নিত করা হতো।

যেমন,

১।	তুলাধুনী	ঃ	যাঁরা মসলিন বস্ত্র বয়নের সুতা তৈরির জন্যে তুলা ভাঁজ করতেন।
২।	সুতা কাটনী	ঃ	মসলিন বস্ত্র বয়নের জন্যে যাঁরা তুলা থেকে সুতা কাটতেন।
৩।	সুতা পাকানি	ঃ	সুতা কাটার প্রাথমিক পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁরা সুতাকে মাড়ে ভিজিয়ে শক্ত করতেন।
৪।	সুতা বলনী	ঃ	মাড়ে ভিজানো সুতা শুকানোর পর চরকা থেকে যাঁরা নাটাইয়ে বলতেন।
৫।	নলিদার	ঃ	নাটাই থেকে যাঁরা নলিতে সুতা ভরতেন।
৬।	তাঁতী	ঃ	তাঁতে টানা দিয়ে যাঁরা বস্ত্র বয়ন করতেন।
৭।	শানদার	ঃ	তাঁতীর তাঁত বয়নকালে যাঁরা তাঁতীকে সহযোগিতা করতেন।
৮।	ধোবা	ঃ	বস্ত্র তৈরি হয়ে যাওয়ার পর যাঁরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ধৌতকরণের মাধ্যমে মসলিনটির ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতা আনয়ন করতেন।
৯।	নর্দীয়া কারিগর	ঃ	মসলিনের এলোমেলো সুতা সংযোগকারী।
১০।	রিফুগর	ঃ	মসলিনের খণ্ডিত অংশ সংযোগকারী।
১১।	চিকন দার্জী	ঃ	মসলিন বস্ত্রে যাঁরা “বুটি” তোলার কাজ করতেন।
১২।	সিবনী	ঃ	সুঁই সুতায় যাঁরা মসলিনের গায়ে নকশার কাজ করতেন।
১৩।	ছিপিগর	ঃ	সুঁই সুতায় মসলিন বস্ত্রে পাড়ের কাজ যাঁরা করতেন।
১৪।	ছাপাদার	ঃ	ধৌত মসলিন বস্ত্রের উপর যাঁরা নক্‌শার দাগ কাটতেন।
১৫।	রংরাজ	ঃ	বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাঁরা মসলিন বস্ত্রখন্ড রং করতেন।
১৬।	মুরগর্জী	ঃ	মসলিন বস্ত্রের আঁচলে যাঁরা সুঁই সুতায় নক্‌শার কাজ করতেন।
১৭।	জরদর্জী	ঃ	মসলিন বস্ত্রে সোনা, রূপা বা জরির সুতায় যাঁরা নক্‌শার কাজ করতেন।
১৮।	নীলগর	ঃ	সাদা মসলিনকে ঔজ্জ্বল্য দানের জন্যে যাঁরা নীল ও অন্যান্য রঞ্জিত পানিতে মসলিন বস্ত্র ধৌত করতেন।

১৯।	পালিশকর	ঃ	মসলিন বস্ত্রখণ্ড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর যাঁরা শঙ্খ বা অন্যান্য দ্রব্যাদির সাহায্যে বস্ত্রখণ্ডটি সমান করতেন।
২০।	ভাঁজগর	ঃ	বস্ত্রখণ্ডটি সমান হয়ে যাওয়ার পর যাঁরা কাপড়টি ভাঁজ করতেন।
২১।	যাচনদার	ঃ	মসলিন বস্ত্রের তারতম্য ও গুণাগুন পরীক্ষাকারী।
২২।	ফড়িয়া	ঃ	তাঁতীদের তাঁতশলা থেকে পাইকারি দরে জামদানি ক্রয়কারী ইত্যাদি।

মসলিন বস্ত্র বয়নে কাজের বিভাগ অনুযায়ী উল্লিখিত নানা পেশা ও পদবীভুক্ত অসংখ্য দক্ষশিল্পী এ শিল্পটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাদের অধিকাংশেরই নিবাস ছিল আজকের পুরাতন ঢাকা, জিঞ্জিরা, নারায়ণগঞ্জ ও ডেমরায়।

৩.৪.৫ জামদানি তৈরির বিভিন্ন পর্যায়

প্রকৃতপক্ষে একজন জামদানি তৈরির কারিগর একজন বড় মাপের শিল্পী। দেশের সীমা ছাড়িয়ে সুদুর দেশে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়া এই পণ্যটি তৈরিতে শ্রমও সময় দিতে হয় অনেক। কয়েকটি পর্যায় পেড়িয়ে একটি জামদানি দ্রব্য হাটে ক্রয় বিক্রয় হয়। একটি জামদানি পণ্য তৈরিতে যেসব কারিগর কাজ করেন এবং তাদের কি কি কাজের মাধ্যমে জামদানি দ্রব্য তৈরি হয় তাহলো-

(ক) তাঁত মালিক

- তাঁত মালিকের কাজ বাজার থেকে সুতা ক্রয় করে পারিওয়ালীর কাছে সরবরাহ করা।

(খ) পারিওয়ালী

- সুতায় মাড় দেয়। (ভাতের মারে সুতা ভেজায় নমশুদ্র আর খইয়ের মাড়ে সুতা ভেজাতো সংশুদ্র)। উল্লেখ্য চারটা শাড়ি তৈরিতে যে সুতা লাগে তা ভেজাতে দুই কেজি ভাতের মাড়ের প্রয়োজন হয়।
- পরবর্তী ধাপ হলো ছোট চরকির সাথে নাটাই করা। নাটাই তৈরির জন্য যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়- (১) নাটাই, (২) চরকি বড় একটি, (৩) নাটাই করার জন্য পিচ্ছিল বাসন, (৪) পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে নাটাই ঘুরিয়ে সুতা ঠিক রাখার জন্য পাত্রভর্তি পানি ও (৫) বসবার জন্য একটি মোড়া। পারওয়ালী তখন বড় নলিতে সুতা ভরে দেয়।

(গ) হজাইনা

- পারিওয়ালীর পর হজাইনার কাজ। তিনি ছোট নলিতে সুতা পেঁচাবেন আর তানা করবেন। এজন্য যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়- (১) চরকা ছোট একটি, (২)নলি কয়েকটি, (৩)

চরকা বড় একটি, (৪) টাওক্কা একটি, (৫) তেশাইটা ডালা দুটি, (৬) মধ্যের টাইকা ঠিক রাখার জন্য একটি খুটা, (৭), চরকির জন্য ছোট খুটি একটি। হজাইনারাই সুতা ছিলটির মাধ্যমে নলিতে পেচায়। এতে ৫০টি কাঠি থাকে। এই ছিলটিও বাশেঁর তৈরি।

- এর পর হজাইনারা 'ব' ভরে। 'ব' কাঠের তৈরি এমন একটি যন্ত্র যার ভেতর দিয়ে সুতা উপর-নিচ দিয়ে যাতায়াত করে।

(ঘ) সানাবেজি কারিগর

এই পর্যায়ের কাজ সানা দেয়া। সানা হচ্ছে বাঁশের তৈরি চিরুনি বিশেষ। যার ভেতর দিয়ে প্রতিটি সুতা টানা থাকে। এর মধ্য দিয়ে সুতা বাঁধানো হয়।

(ঙ) তাঁতী (কারিগর)

এসব কাজের পর মূল তাঁতী তাঁতে বসেন।

- প্রথম বয়নে আসে হজগীতি। এর অর্থ হলো প্রথমে যে সুতা ও যন্ত্রপাতি নেয়া হলো তা সজ্জিত করা।
- হজগীতির পর গুড়িচাপী। এর মানে হচ্ছে কাপড়ের একটা অংশ বয়ন করা। এটা মূলত অনুশীলনের মত।
- এরপর কল কালাত। এই পর্যায়ে কাপড়ের নকশা শুরু।
- কালাতের পর রোখ। আঁচলের নিচু অংশটি তৈরি করা হয়।
- তারপর আইস্যা। আঁচলের নিচু অংশটি হলো আইস্যা।
- পরের কাজ হলো পাইট্যামারা। এঁটা হল কাপড় যেখানে শেষ তার তার আগের অংশটুকু। সাধারণত তিন আঙ্গুলের সমান হয়।
- কাপড় বয়নের শেষ কাজমালসী দেয়া।

বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় জামদানির বুনন পদ্ধতি দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ-সাধারণত সুতা কাটার ওপর নির্ভর করত জামদানি মসলিনের সুক্ষ্মতা। সুতা কাটার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। কেননা তখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। সুতা কাটার জন্য তাঁতিদের প্রয়োজন হতো টাকু, বাঁশের ঝুড়ি, শঙ্খ ও পাথরের বাটি। মাড় হিসেবে সাধারণত খই, ভাত বা বার্লি ব্যবহার করা হতো। জামদানি তৈরির আগে তাঁতিরা সুতায় মাড় ও রং করে নিতেন। রং হিসেবে বনজ ফলফুল-লতা-পাতার রং ব্যবহার করা হতো। ভাল জামদানির জন্য ২০০ থেকে ২৫০ নম্বরের সুতা ব্যবহৃত হতো। অবশ্য আজকাল তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে জামদানি তৈরি করেন এবং প্রাকৃতিক

রঙের পাশাপাশি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে থাকেন। জামদানি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি তাঁতে দুজন তাঁতি পাশাপাশি বসে কাজ করেন। দুটি সুচাকৃতি বাঁশের কাঠিতে নকশার সুতা জড়ানো থাকে। প্রয়োজনীয় স্থানে সুচ দুটি দিয়ে পরিমিত টানায় সুতার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রঙিন সুতা চালিয়ে দেয় হয়। এরপর পাশের সুতার মাকু একজন তাঁতি পাশ থেকে অন্য তাঁতির কাছে দিলে তা সেদিক থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁতে রেখে জামদানি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। জমিনের সুতার তুলনায় নকশার সুতা মোটা হওয়ায় নকশাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জামদানি তৈরির প্রথমদিকে ধূসর জমিনে জাম নকশা করা হতো। পরবর্তীকালে ধূসর রং ছাড়াও অন্য রঙের জমিনে নকশা তোলা হতো। ষাটের দশকে জমিনে লাল সুতার নকশা করা জামদানি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সাদা জমিনে সাদা সুতার কাজের সুন্দর জামদানি রক্ষিত আছে।

৩.৪.৬ জামদানী শাড়ীর প্রকারভেদ

জামদানি শাড়ি অনেক প্রকার হয়। তবে প্রাথমিক ভাবে জামদানি শাড়ির উপাদান অনুযায়ী এটি দুই প্রকার।

১. হাফ সিল্ক জামদানি- যার আড়াআড়ি সুতাগুলো হয় রেশমের আর লম্বালম্বি সুতাগুলো হয় তুলার।

২. ফুল কটন জামদানি- যা সম্পূর্ণ তুলার সুতা তৈরি।

জামদানির নকশা হয় দু রকমের তা হলো পাড়ের নকশা ও জমিনের নকশা।

- **পাড়ের নকশা**

১. কইডুগা পাইড়
২. করলা পাইড়
৩. করলা বিচি পাইড়
৪. ডালিম পাইড়
৫. কচু পাতা পাইড়
৬. লতা পাইড়
৭. ইন্দি পাইড়
৮. চান্দর কান্দি পাইড়
৯. ফুল পাইড়
১০. বাঘনালি পুর পাইড়
১১. কলকা পাইড়
১২. কলকা লতা পাইড়
১৩. পান পাতা পাইড়
১৪. কাজল লতা পাইড়
১৫. মুখলেস পাইড়
১৬. জাম্বুরা পাইড়
১৭. কচিঁ পাইড়
১৮. বেলপাতা পাইড়
১৯. টাঙ্গাইল্যা পাইড়
২০. গোলাপচর পাইড়
২১. পোনা পাইড়
২২. শিক পাই পাইড়
২৩. ময়ুর প্যাঁচ পাইড়
২৪. ময়ুর পেখম পাইড়
২৫. আনারস পাইড়
২৬. দোকলা পাইড়

২৭. ডুরিং পাইড়
২৮. আম পাইড়
২৯. ডালা পাইড়
৩০. সেন্টু পাইড়
৩১. কনরাম পাইড়
৩২. পানকি পাইড়
৩৩. ঝুড়ি পাইড়
৩৪. উইদ্যা পাইড়
৩৫. চিনি বাসন ভাঙ্গা পাইড়
৩৬. আংটি পাইড়
৩৭. আওলা আংটি পাইড়
৩৮. রিং পাইড়
৩৯. তাজেল পাইড়
৪০. পুঁটিমাছ পাইড়
৪১. চাঁন পাইড়
৪২. শামুক পাইড়
৪৩. আদার পানা পাইড়
৪৪. কলার পানা পাইড়
৪৫. ঘুড্ডি পাইড়
৪৬. তেয়রি পাইড়
৪৭. আংটি বেড় পাইড়
৪৮. সজনী পাইড়
৪৯. হাজার পান্না পাইড়
৫০. হাজার মোতি পাইড়
৫১. খশুর পাইড়
৫২. কচুলতা পাইড়
৫৩. শামুক তেয়রি পাইড়
৫৪. ইঞ্চি পাইড়
৫৫. সন্দেশ পাইড়
৫৬. ডালিম মুরান পাইড়
৫৭. পেনা ফুল পাইড়
৫৮. মাকরের ঘর পাইড়
৫৯. গাছ পাইড়
৬০. গাচ্যুয়া লতা পাইড়

➢ **জমিনের নকশা**

১. আঁস ফুল
২. জাম্বুরা ফুল
৩. কদম ফুল
৪. কদম বাহার
৫. জুঁই ফুল
৬. জুঁই লতা
৭. তারা ফুল
৮. তারা বাহার
৯. জীবন তারা
১০. সন্দেশ ফুল
১১. ফটকা ফুল
১২. ভেট ফুল
১৩. পৌদ ফুল
১৪. পৌদ বাহার
১৫. গাজীর আশা
১৬. তরুম তারা
১৭. চোর চুরি
১৮. টসর মতি
১৯. টসর বাহার
২০. টসর জুঁই
২১. টাস চিড়া
২২. আমির্তি ফুল
২৩. টাস পাতা
২৪. গুটুর পা
২৫. উস্তা ফুল
২৬. করলা ফুল
২৭. পান পাতা
২৮. পান তারা
২৯. পান বাহার

৩০. শুপারি ছড়া
৩১. শুপারি পাতা
৩২. ফাটা জুঁই
৩৩. ছিট ফুল
৩৪. ঘিট ফুল
৩৫. শাপলা বাহার
৩৬. শাপলা ফুল
৩৭. ময়ুর পেখম
৩৮. ময়ুরী
৩৯. মইরা মইফুল
৪০. তেছরি বাইন
৪১. জালি বাইন
৪২. ছিড়া জাল
৪৩. চিনি বাসন ভাঙ্গা
৪৪. পান তেছরি
৪৫. কচু পাতা
৪৬. মাকড়ের ঘর
৪৭. বাইমা তেছরি
৪৮. করাত তেছরি
৪৯. উড়ি ফুল
৫০. ঝিঙ্গা ফুল
৫১. গজমোতি
৫২. কাঁচি তেছরি
৫৩. ক্ষিরাই
৫৪. পাড়ি বাইন
৫৫. কেটঁলি
৫৬. মটর ছিফা
৫৭. মটর দানা
৫৮. মটর
৫৯. কলসী
৬০. কলমী ফুল
৬১. কলমী বাহার
৬২. কলমী ডুগা
৬৩. বেল ফুল
৬৪. মেড্ডা ফুল
৬৫. হাফাই মাদলী
৬৬. কলমী মাদলী
৬৭. কুচ্ছি
৬৮. চঙ্গা
৬৯. বাঁশ পাতা
৭০. ধানশীষ
৭১. মাকড়ের জাল
৭২. ময়ুর জোড়া
৭৩. ময়ুর পেখম
৭৪. কইতর জোড়া
৭৫. কইতর খুফি
৭৬. আসমান তারা
৭৭. নয়ন সুখ
৭৮. নয়ন বাহার
৭৯. গজমোতি
৮০. শঙ্খমতি
৮১. হাজার তারা
৮২. বুটি তোলা
৮৩. চক মতি
৮৪. চমক বাহার
৮৫. রুপ মতি
৮৬. কঞ্চি বাহার
৮৭. কীলক পাটি
৮৮. কীলক বাহার
৮৯. কনক তারা
৯০. তোড়াদার
৯১. তেছদা করলা
৯২. দুবলি জাল
৯৩. সাবুর গা
৯৪. পুরিয়া
৯৫. ছাইয়াল
৯৬. বালেয়ার গেদা
৯৭. ডালিম বিচি
৯৮. কড়ির ঘর
৯৯. বেল পাতা

৩.৪.৭ জামদানী শাড়ীর ও অন্যান্য তাঁতবস্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

জামদানি তৈরির উপকরণ লুঙ্গি ও গামছা তৈরির উপকরণের মত প্রায় একই। পার্থক্য হলো সুতার, শ্রমিক ও শ্রমের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি এবং উৎপাদন সময়ের তারতম্য। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন রূপসী, নোয়াপাড়া, কাজীপাড়া, রেহাকুড়, বরগাঁও কাহিনা এলাকাগুলোতে পরিদর্শনে দেখা যায় সেখানে মেশিন প্রতি একজন করে কারিগর ও সাগরেদকে (সাহায্যকারী) যথাক্রমে ১,০০০০০ (এক লক্ষ) এবং ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অগ্রিম দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি করতে হয়। মেয়াদান্তে এই চুক্তি উভয়পক্ষের (তাঁত মালিক ও কারিগর/সাগরেদ) সম্মতিতে নবায়নযোগ্য। তারপর তাদের ডিজাইনের ধরনভেদে শাড়ী প্রতি কারিগরকে নির্দিষ্ট হারে মজুরি দিতে হয়, যা কোন কোন সময় অগ্রিম থেকে কর্তন যোগ্য হয়ে থাকে।

৩.৪.৮ ঐতিহ্যবাহী মসলিন বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দেশীয় তুলা থেকে হাতে কাটা সুতা দিয়ে মসলিন তৈরি হতো। প্রয়োজনীয় সুতা সংগ্রহ করার পরও বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে মসলিন বস্ত্র বোনা হতো। এর বিভিন্ন পর্যায়কে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলোঃ

১. সুতা নাটান (Winding and Preparing the yarn)
২. টানা হোতান (Warping),
৩. সানা বাঁধা (Applying the Reed to the warp),
৪. নরদ বাঁধা (Beaming or Applying the warp to the End Roll of the loom),
৫. বু (বা বও) বাঁধা (Preparing the Heddles or Harness) ও
৬. কাপড় বোনা (Weaving)।

আবদুল করিম তাঁর ঢাকাই মসলিন গ্রন্থে মসলিন বয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।[৫৩] এখানে সংক্ষেপে তাঁর বিবরণ অনুসারে মসলিন বয়নের সেই পর্যায়গুলো সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া হলো,

মসলিন বয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুতা সংগ্রহ করার পর প্রথম কাজ ছিল, সুক্ষ্মতার প্রেক্ষিতে সুতাগুলোকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলা। সুক্ষ্মতম সুতাগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হতো। সুক্ষ্মতার পরিপ্রেক্ষিতে সুতাগুলোকে ভাগ করে প্রথম অংশ বানায় এবং দ্বিতীয় অংশ টানায় ব্যবহার করা হতো। সুতা টানা ও বানার জন্য প্রস্তুত হলে সেগুলোকে তাঁতে ব্যবহারের উপযোগী করে বিন্যস্ত করার জন্য টানা হোতান (তানা হাটা) দিতে হতো। সাধারণত তাঁতীর বসতবাড়ির কাছেই কোনো খোলা জায়গায় টানা হোতানের কাজ করা হতো। কাপড়ের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে মাটিতে আড়াআড়ি করে দুই সারি খুঁটি পোতা হতো। এরপর তাঁতী কাচের গুঁড়াসহ সুতা হাতে নিয়ে খুঁটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত

এমনভাবে আস্তে আস্তে হাঁটত যেন খুঁটিতে তাঁতীর হাতের সুতার নাল লেগে থাকে (কাচের গুঁড়া হলো বিশেষ ধরনের যন্ত্র, অনেকটা নাটাইয়ের মতো। এর মধ্যে কাঁচের একটা আংটি থাকে, যার ভেতর নিয়ে অনায়াসে সুতার নাল বের হয়ে আসে)। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত টানা দেয়া শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁতী হাঁটতে থাকে। ডোরাকাটা বা ছককাটা কাপড় তৈরি করতে হলে তাঁতীকে একসাথে দুইটা কাঁচের গুঁড়া নিয়ে হাঁটতে হত। কিন্তু একটা কাঁচের গুঁড়ায় এক নাল সুতা এবং অন্য কাঁচের গুঁড়ায় দুটি বা চারটি সুতার নাল একসঙ্গে পাক দেয়া থাকত।

টানা হোতান বা তানা হাটার পর সানা বাঁধার কাজ শুরু হত। অবশ্য কোনো কোনো সময় নরদ বাঁধার পরেও সানা বাঁধা হতে পারে। বাঁশের ফলা বা ছোট ছোট কঞ্চির তৈরি চাটাইয়ের মতো জিনিসকে সানা বলে (বর্তমানে অবশ্য লোহার সানাও ব্যবহৃত হয়)। বাঁশের ফলাকে অত্যন্ত ছোট ছোট করে কেটে ঢাকার তাঁতীরা খুব সুন্দরভাবে সানা তৈরি করে নিত। জেমস টেইলর বলেন যে, ঢাকার উৎকৃষ্টতম সানাগুলো এত ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চি দ্বারা তৈরি হতো যে ৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ সানায় ২,৮০০ কঞ্চি থাকত। তৈরি হওয়ার পর টানা সুতা ভাঁজ করে তাঁতীর ঘরের ছাদে অথবা যে ঘরে তাঁত বসানো হয়, তার ছাদে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যেন নিচের দিকটা মাটির ওপর হাতখানেক ঝুলে থাকে। অনুরূপভাবে সানাও টানার সুতাসমূহ বেঁধে ফেলত। সানা বাঁধা হয়ে গেল তাঁতে বাঁধা হতো। তাঁতের পেছনের নরদ বা বাইরের নরদের (End Roll) সাথে টানা সুতা বাঁধা হতো।

এরপর বু বাঁধার পালা। বু বা বও হলো একপ্রকার লাল রঙের পাতলা দড়ি বা সুতা, যার সাহায্যে টানা সুতা বাঁধা হতো। টানা সুতার ভাঁজ অল্প খুলে সেটাকে আনুভূমিকভাবে বিছিয়ে দেয়া হতো, ঠিক যেমনটি তাঁতে বিস্তৃত থাকে। তারপর এক টুকরা বাঁশের ফলা টানা সুতা ও সানার মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়া হতো, যেন তাঁতী বাঁশের ফলার মাঝখানে রেখে বু বাঁধতে পারে। বু সুতা একটি নাটাইয়ের মতো চাকায় পাশে রাখা হতো এবং তাঁতীর হাতের সাহায্যে বিম্বাকৃতির একটি ছোট কাঠের টুকরার ভিতর দিয়ে আসত। টানা সুতার ওপরে বেত রাখা হতো। অতঃপর তাঁতী হাতের আঙুলের তলায় টানা সুতা তুলে নেয় এবং বু দ্বারা বাঁধে। এভাবে বু বাঁধা চলতে থাকে যতক্ষণ না কাজ শেষ হয় টানার একদিকে বু বাঁধা হলে টানা পাল্টে নেয়া হতো এবং অপরদিকে অনুরূপভাবে বু বাঁধা হতো।

বু বাঁধা হয়ে গেলে সানা ও বু-সমেত টানা সুতা এনে তাঁতের সামনের নরদের সাথে বাঁধা হতো। সামনের এবং পেছনের নরদ দুটি হয় খুঁটির খাঁজে ভাঁজ করে রাখা হতো কিংবা খুঁটির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। ঐ দড়িকে জুতদড়ি বলত। নরদগুলো এমনভাবে রাখা হতো, যেন পেছনে বা উল্টোদিকে না ঘোরে। এজন্য একটা কঞ্চির সাহায্য নেয়া হতো। কঞ্চিটি একদিকে যেমন নরদের খাঁজে বা ছিদ্রে আটকানো থাকত, তেমনি অপরদিকে মাটিতে পোতা থাকত। এগুলো কাঠের সমতল তক্তার সাথে খাঁজ

কেটে লাগিয়ে দেয়া হতো এবং মাটিতে পোতা লোহার বা কাঠের পেরেকের সাথে আটকে দেয়া হতো। পদচালিত যন্ত্র দুটিও (Treadles)বাঁশের তৈরি হতো এবং এগুলো তিন ফুট লম্বা, দুই ফুট প্রস্থ ও দেড় ফুট গভীর গর্তে রাখা হতো। সুপারি গাছের তক্তা দিয়ে মাকু তৈরি হতো। মাকু দৈর্ঘ্যে দশ থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি এবং প্রস্থে তিন-চার ইঞ্চি ছিল। মাকুর দুই দিন বর্শার মতো সরু হতো এবং ঠিক মাঝখানে সামান্য খালি খায়গা থাকত। যার ভেতরে একটি লোহার তার লাগানো থাকত। এই তাঁরের ভেতর দিয়ে বানা সুতা চলাচল করত।

এভাবে সব যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও প্রস্তুত হলে তাঁতী কাপড় বুনতে বসত। আগেই বলা হয়েছে, মসলিনের জন্য সনাতনী গর্ত তাঁত ব্যবহৃত হতো। ডান পা একটু হেলান দিয়ে একটা তক্তা বা মাদুরের ওপর তাঁতী ঠিক গর্তের কিনারে বসত। বাম পায়ের ডগা দিয়ে একটা প্যাডেল (Treadle) চাপ দিলে টানা সুতার ভেতরে যে শূন্যস্থান তৈরি হতো, তার ভেতর দিয়ে তাঁতী খুব জোরে মাকু টান দিয়ে এক হাত দেয়া অন্য হাতে বদল করে নিত। এভাবে কাপড় বোনা শুরু হতো এবং চলত যতক্ষণ না কাপড় বোনা শেষ হয়। মোটামুটি এই প্রক্রিয়ায় কিংবদন্তির মসলিন কাপড় বোনা হতো বাংলাদেশে।

তবে শুধু কাপড় বোনা হলেই চলত না, আরো কিছু আনুষঙ্গিক কারিগরি বিষয় ছিল, যেগুলো সম্পৃক্ত ছিল মসলিন রপ্তানির সঙ্গে। বিভিন্ন স্তরে এই আনুষঙ্গিক কারিগরি বিষয় ছিল, যেগুলো সম্পৃক্ত ছিল মসলিন রপ্তানির সঙ্গে। বিভিন্ন স্তরে এই আনুষঙ্গিক কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ করা হতো এবং এগুলোর প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারিগর ছিল।

এসব স্তর হচ্ছে:

ধোয়া
সুতা সুবিন্যস্তকরণ
রিপু করা
ইস্ত্রি করা, রং করা ও সুচের কাজ করা

সবশেষে মসলিনের গাইট বাঁধা হতো। যারা গাইট বাঁধত, তাদেরকে ‘বস্তাবন্দ’ বলা হতো। দুই তক্তার মাঝে কাপড়গুলো রেখে তক্তা দুখানা ভালো করে এঁটে বেঁধে কাপড়ের গাইট তৈরি করা হতো। আর সুক্ষ্মতম মসলিন একেকটি বাঁশের দুই গিরার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় রেখে প্যাকেট করা হতো। এভাবে প্যাকেট করার পর সেগুলো বাজারে বা অন্যান্য গন্তব্যস্থানে পাঠানো হতো।[৫৪] এসব স্তর অতিক্রম করে মসলিন রপ্তানির উপযোগী হতো।

৩.৪.৯ রেশম বস্ত্র উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়

কৌশল ও প্রয়োগ

ধাপ ১: রেশমি গুটি থেকে প্রস্তুত সুতা মূল শাড়ি প্রস্তুতের জন্য তাঁতে সাজানো হয়

ধাপ ২: গুটি থেকে প্রস্তুত সুতা রঙ করা হয়

ধাপ ৩: রঙ করা সুতা বোনার জন্য প্রস্তুত করা হয়

ধাপ ৪: সুতাকে শক্ত করার জন্য কয়েক ধাপে ভাতের মাড়ে দিয়ে শুকানো হয়। শাড়ির অতিরিক্ত সুতাগুলো কেটে পরিচ্ছন্ন করা হয়, শাড়ি ভাজ করা হয় এবং বাজারে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

ধাপ ৫: রোদে শুকানো সুতা তাঁতে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়

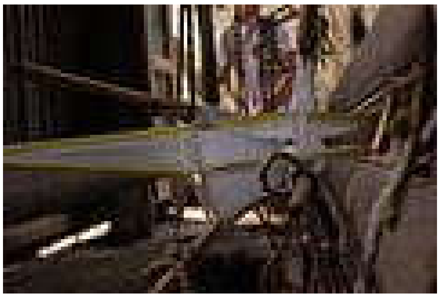

ধাপ ৬: সাধারণ হাত-তাঁতে মূল শাড়ি রেখে তাতে রঙিন সুতা দিয়ে নকশা করা হয়

ধাপ ৭: নকশা করার সময় আরো একবার ভাতের মাড়ে দেয়া হয়

ধাপ ৮: তারপর শাড়িতে নকশা তোলা শুরু হয়

ধাপ ৯: রকমারি রঙের সুতা আর নকশায় শাড়ি সাজানো হয় এবং ভাঁজ করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

৩.৪.১০ এলাকাভিত্তিক ঐতিহ্যবাহি কয়েকটি তাঁত বস্ত্র

(ক) ঢাকাই বেনারসি

বাংলাদেশে রেশমের যেসব বস্ত্র তৈরি হয়, তার মধ্যে বেনারসিই প্রধান। ঢাকার মিরপুর বেনারসি শিল্পের মূল কেন্দ্র। সেখানে যে বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল ব্যবহৃত হয়, তা টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতীরা যেসব কৃৎকৌশল অবলম্বন করে, অনেকটা তার মতোই। গর্ত তাঁতে জ্যাকার্ড মেশিন ব্যবহার করে বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়।

বেনারসি বয়নে রেশম ছাড়া পলেস্টার সুতাও ব্যবহার করা হয়। সুতা সাধারণত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনানুসারে এসব সুতা রং করে নেয়া হয়। সুতা রং করতে কৃত্রিম রঞ্জন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তবে রেশম সুতা পারি বা মারি করা লাগে না। রং করার পর সুতা টানা দেয়া হয়। টানার কাজে এখানে ড্রাম ব্যবহার করা হয়, তবে এগুলো সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের মতো বড় নয়, অপেক্ষাকৃত ছোট। আর ড্রাম করতেও অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গা লাগে। ড্রাম করার পর সুতা নরদে তোলা হয়। নরদকে এখানে বলে 'তরিয়া'। মিরপুর অঞ্চলে বেনারসি বয়নে লোহার জালের সানা ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ১০০, ১১০, ১২০ সানা ব্যবহৃত হয়। সানাকে এখানে বলা হয় 'ফান্নি'। শাড়িতে নকশা করার কাজে একাধিক জ্যাকার্ড ব্যবহৃত হতে পারে। জামদানির মতো এখানেও হাতে মাকু ছুঁড়ে কাজ করা হয়। প্রয়োজনে একাধিক মাকু ব্যবহৃত হয়। এখানে ব্যবহৃত মাকু হচ্ছে কাঠ ও লোহার তৈরি। হাতে ছোড়া গর্ত তাঁত হলেও জ্যাকার্ড মেশিনের সাহায্য নেয়া হয় বলে জামদানির মতো এখানে নকশার জন্য তাঁতীর ওপরে কিছু নির্ভর করে না। বস্ত্র বয়ন হয়ে গেলে সেটা পাঠানো হয় ক্যালেন্ডার করতে। তারপর সেটা বাজারে পাঠানো হয় বিক্রির উদ্দেশে।[৫৫]

(খ) টাঙ্গাইল শাড়ি

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত বস্ত্রের মধ্যে টাঙ্গাইল শাড়ি অন্যতম। অত্র এলাকার শাড়ী ও অন্যান্য সূতি তাঁত বস্ত্র বেচা-কেনার সবচেয়ে বড় হাট করটিয়া। সেখানকার কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আনসারী বলেন, টাঙ্গাইল শাড়ির প্রাথমিক খ্যাতি এর সূক্ষ্ম বুনন এবং মিহি বস্ত্রের কারণে এবং এ জন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে বসাক তাঁতীরা। টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতীরা আসলে ঢাকা থেকে বসত স্থাপন করা তাঁতী। তাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে তারা ঢাকা-প্রধানত ধামরাই ও চৌহাট নামক স্থান থেকে টাঙ্গাইলে এসে নিবাস গড়ে তুলেছিল। জনাব শাহজাহান আনসারী বলেন, টাঙ্গাইলের তাঁতসমূহের দ্বারা উৎপাদিত শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, থ্রিপিস এর কদর সারাদেশে। বিশেষ করে ঢাকা, ইসলামপুর, বাবুরহাট, সিলেট, করটিয়া হাটে সারাদেশের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা আসেন তাদের পছন্দমতো সুলভমূল্যে বাছাই করা কাপড় কিনত। কলকাতা, লন্ডনেও অনেকে টাঙ্গাইলের উৎপাদিত কাপড় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করে থাকেন।[৫৬] এই কথার সমর্থন মেলে বিশ শতকের

প্রথমার্ধে ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিক হাকিম হাবিবুর রহমানের প্রদত্ত বিবরণ থেকেও। তিনি সূক্ষ্ম কাপড় উৎপাদনের সঙ্গে এর পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, কাগমারি পরগনা, যা পশ্চিম ময়মনসিংহের টাংগাইল মহকুমার প্রসিদ্ধ জায়গা, সূক্ষ্ম কাপড় তৈরির ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ঢাকা শহর থেকে ছয় মাইল পশ্চিমে তুরাগ নামে এক নদী প্রবাহিত রয়েছে, যা ময়মনসিংহ জেলার আল্প্সিং পরগনার যমুনা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ঢাকার বুড়িগঙ্গায় এসে মিলিত হয়েছে। এই নদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তীর বরাবর বাংলার বড় বড় জমিদার, মুসলিম নেতাদের এবং কিছু হিন্দু ধনী পরিবারের অধিবাস রয়েছে। কাশিমপুরের রায়সাহেবরা, তালেবাবাদের সিদ্দিকী সাহেবগণ, সফরতলীর খান সাহেবরা (সম্ভবত শ্রীফলতলী), পাক আল্লাহ (পাকুল্লা) এবং দেলদুয়ারের সৈয়দ ও গযনবী বংশীয়রা, করটীয়ার পন্নীরা, যাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ওখানে পৌঁছেছে।[৫৭]

বিশিষ্ট গবেষক জোলেখা হক লিখেছেন,

> "As mentioned before, the homespum muslin thread was the domain of Hindu weavers of tantis, who, after the fall in the trade of fine muslin, gradually migrated from Dhaka to present-day Tangail and neighburing Bajitpur, which also became famous as a centre of fine cotton saris."[৫৮]

এই দুই বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায়, টাঙ্গাইলের তাঁতীদের উৎস হলো ঢাকার তাঁতী সম্প্রদায়। সে হিসেবে বলা যেতে পারে, টাঙ্গাইলের তাঁতীরা ইতিপূর্বে মসলিন বয়নের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে, অনেকটা সে রকমভাবেই বস্ত্র বয়ন করত। তবে কালের প্রবাহে নানা রকম পরিবর্তনও এসেছে তাতে। যেমন অতীতে সনাতনী গর্ত তাঁত ব্যবহার করে বস্ত্র বয়ন করা হতো, যেখানে মাকু ছোঁড়া হতো হাতে। কালক্রমে সনাতনী গর্ত তাঁতের সংখ্যা কমে গেছে (এখন নাই বললেই চলে) এবং এর বিকল্প হিসেবে বর্তমানে খটখটি বা ঠকঠকি তাঁত, ফ্রেম তাঁত- এমনকি চিত্তরঞ্জন তাঁত পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে। আগে শুধু ঝাঁপের সাহায্যে হাতে নকশা বুটি তোলা হতো। এখন জ্যাকার্ড ও ডবি ব্যবহার করে নানা ধরনের ডিজাইন করা হচ্ছে। বোধগম্য কারণে, টাঙ্গাইলের বসাক তাঁতীদের বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশলে নানা রকম পরিবর্তন এসেছে।

(গ) ঐতিহ্যবাহী পাবনা শাড়ি

বৃহত্তর পাবনা অঞ্চল অনেক দিন থেকেই তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে চওড়া পাড়যুক্ত শাড়ি এবং ধুতির জন্য পাবনার তাঁতশিল্পীদের খ্যাতি আছে। এ অঞ্চলে যারা তাঁতের কাজ করত, তাদের মধ্যে হিন্দু তন্তুবায় ও মুসলমান জোলা উভয় সম্প্রদায়ই ছিল। এছাড়া যোগী এবং কাপলিরাও বস্ত্র বয়নের সঙ্গে

যুক্ত ছিল। তবে পাবনা জেলায় এখন তাঁতের সংখ্যা কম বরং সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে তাঁতের কাজ বেশি হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে মুসলমান জোলার সংখ্যাই বেশি। পাবনা বা সিরাজগেঞ্জর তাঁতীরা বিশেষ আলাদা কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে–এমনটা বলা যাবে না। তবে কালক্রমে তাদের বয়ন পদ্ধতি এবং কৃৎ কৌশলের মধ্যেও নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগে টানা সুতা তৈরি করা হতো হেঁটে হেঁটে। কিন্তু এখন সনাতন পদ্ধতিতে তানা হাঁটা ছাড়াও ড্রামের সাহায্যে তানা হাটা করা হয়। তবে সুতা রং করা, সুতা প্যাঁচানো, ড্রামও তৈরি করে তাঁতে ফিট করা হয়। একজন তাঁতী অন্তত ২টি মেশিন চালাতে পারে।এর উৎস সম্পর্কে পাবনা জেলার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক জানিয়েছেন, পাবনা শহরতলির শিবরামপুর নিবাসী মহম্মদ আজগর আলী নামক জনৈক কারিগরের সন্তান বহু পরিশ্রমে ও যত্নে ১৯২৬ সালে কাষ্ঠনির্মিত তানা হাটা (Warping Drum) নামে একটা কল আবিষ্কার করেছিলেন। যার সাহায্যে ঘরের মধ্যেই রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে টানা সুতা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে তাঁতীদের দৈনিক চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মাইল পায়ে হাঁটার মতো শারীরিক পরিশ্রম না করে সহজেই টানা সুতা ড্রামের সাহায্যে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। তৎকালীন সময়ে এর দাম ঠিক হয়েছিল পনেরো থেকে বিশ টাকা। শুধু তানা হাটা নয়, আগে ব্যবহৃত হতো সনাতনী গর্ত তাঁত, এখন ব্যবহৃত হয় ঠকঠকি থেকে শুরু করে ফ্রেম তাঁত ও চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত। এমনকি জ্যাকার্ড বা ডবি ব্যবহারও শুরু হয়েছে প্রায় আশি-নব্বই বছর হলো। আগে সুতা রং করা হতো প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে, বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই এখানে রাসায়নিক রঙের সূত্রপাত হয়েছে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখন এখানে তাঁতীরা সুতা সংগ্রহ করে স্থানীয় হাট থেকে। সেটা প্রথমে প্রসেস মিলে পাঠানো হয়। পরে সেগুলো রং করে আনা হয় স্থানীয় রং কারিগরদের দ্বারা। সুতা নাটান বা সুতা পারি করার পদ্ধতি একই। তবে এখানকার তাঁতশিল্পীরা (মুসলমান জোলারাই এখানে সংখ্যাধিক্য) সুতা পারি করতে ভাতের মাড়ই ব্যবহার করে। বু বা বও করা, সানা করা ইত্যাদি পর্যায়ও তেমন একটা আলাদা নয়। তবে আগে বাঁশের সানা ব্যবহৃত হলেও এখন লোহার সানা ব্যবহার করা হয়। এখানে মাকু হলো প্রধানত কাঠের। তবে টাঙ্গাইলের মতো এখানেও মাকুর দুই পাশে লোহার ব্যবহার আছে।

টাঙ্গাইল ও পাবনা-সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের তাঁতশিল্পের বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সুতি বস্ত্র বয়নে প্রায় একই ধরনের করণকৌশল অবলম্বন করা হয়। বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশলের দিক থেকে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে বেশিরভাগ লুঙ্গি উৎপাদিত হচ্ছে বিদ্যুত চালিত তাতে। তাঁতীরা দুই রকম তাঁতই চালাতে পারে যেমন-হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত। টাঙ্গাইলের করটিয়া বাজারে সিরাজগঞ্জ ও পাবনার উৎপাদিত তাঁতপণ্যও কেনাবেচা হয়।

(ঘ) আদিবাসী তাঁতবস্ত্র

বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভেতর প্রচলিত বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎকৌশল খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। মোটামুটি সব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বস্ত্র বয়নের জন্য কোমর তাঁত ব্যবহার করে থাকে। তবে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন মান্দিদের তাঁত হলো ভূমিতে সমান্তরাল তাঁত। আবার, কোথাও কোথাও বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে গর্ত তাঁত, ফ্রেম লুম এবং চিত্তরঞ্জনব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন ও সিলেট অঞ্চলের মনিপুরি সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। তবে সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে কোমর তাঁতই এখনো পর্যন্ত আদিবাসীদের ভেতরে সর্বোচ্চ ব্যবহৃত তাঁত। অন্যান্য তাঁত ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের ঘটনা। পূর্বে তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক রঞ্জনপ্রক্রিয়া চালু থাকলেও এখন রাসায়নিক রংই ব্যবহৃত হয় বেশি।[৫৯]

পার্বত্য এলাকায় যেসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে, তাদের সবার কাজের ধরণ বলতে গেলে একই। যদিও তাদের নিজেদের ভাষায় প্রতিটি তাঁতযন্ত্র (মানে কোমর তাঁত) ও তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন স্বকীয় ডিজাইনের নিজস্ব নাম রয়েছে। কিন্তু বয়ন পদ্ধতি ও কৃৎ কৌশলের দিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্যনেই। পূর্বে সাধারণত জুমচাষের মাধ্যমে তুলা উৎপাদন করে সেই তুলা থেকে চরকার সাহায্যে সুতা কাটা হয়। অতঃপর সেগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙে রাঙানো হতো। ইদানীং বাজারের সুতা ব্যবহৃত হতো। তা ছাড়া সুতির বদলে রেয়নের ব্যবহারও ব্যাপক হারে বেড়েছে। তুলা থেকে যে সুতা কাটা হয়, তা ভাতের মাড়ের সাহায্যে পারি করা হতো।

তারপর সেটা টানা সুতা হিসেবে তৈরি করা হতো। সাধারণত ঘরের মধ্যে, বারান্দায় বা যেকোনো জায়গায় কোমর তাঁতে কাজ করা যায়। বুনন শুরুর আগে এই তাঁতে বও করা হয়। বওয়ের সুতা হয় ভিন্ন রঙের। তবে কোমর তাঁতে কোনো সানা ব্যবহার করা হয় না। এর বিকল্প হিসেবে বও-এর কাঠি ওপরে টেনে ধরে একটা কাঠের চওড়া খণ্ড খাড়াখাড়ি ব্যবহার করে টানা সুতার মাঝে শূন্যস্থান তৈরি করে নেয়া হয়, প্রতিবার মাকু চলাচলের জন্য। আর প্রতিবার মাকু চলাচলের পর এই কাঠের খণ্ডটা দিয়ে বুনন শক্ত ও মজবুত করার জন্য কাপড়ের বোনা অংশে ধাক্কা দেয়া হয়। ডিজাইন নির্ভর করে ঝাপের ওপর। ঝাপ তোলা হয় হাতের সাহায্যে। টানা সুতার এক প্রান্ত কোনো একটা খুঁটিতে বাঁধা থাকে, আর অপর প্রান্ত আটকানো থাকে তাঁতীর কোমরে। আদিবাসী তাঁতী মানে বুঝতে হবে কোনো না কোনো বয়সের নারী। নারীটি কোমরের সাথে তাঁত লাগিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বাঁশ-কাঠের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করে তাঁতের কাজ করে থাকে। বুননের সময় সুতা জড়িয়ে গেলে ঠিক করার কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে সজারুর কাটা ব্যবহার করা হয়। সাধারণত দুটি কাপড় একসাথে বোনা হয় কোমর তাঁতে। উত্তরবঙ্গের নারীরা পাট থেকে সুতা তৈরি করে তা দিয়ে কোমর তাঁতের সাহায্যে ধোকড়া বা চট বা চটি বোনে প্রায় একই পদ্ধতিতে।

রাখাইনদের মধ্যে অতীতে কোমর তাঁতের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে এর প্রচলন অত্যন্ত কম। বরং তাঁতের বিভিন্ন আধুনিক সংরক্ষণ সেখানে প্রচলিত হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। এর বয়নকৌশল পাবনা বা নরসিংদীর থেকে আলাদা কিছু নয়। মনিপুরিরাও কোমর তাঁতই ব্যবহার করত সুপ্রাচীনকাল থেকে। তবে তাদের মধ্যেও বেশ কিছুদিন হলো ফ্রেম তাঁত প্রচলিত হয়েছে। মান্দিদের তাঁত অবশ্য কিছুটা আলাদা। মান্দিরা ব্যবহার করে ভূমিতে সমান্তরাল তাঁত। তবে মান্দিদের মাঝেও গর্ত তাঁতের প্রচলন রয়েছে বলে জানা গেছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মান্দি বর্তমানে তাঁতের সাথে জড়িত।

৩.৪.১১ তাঁত শিল্পের স্থানীয়করণ

অর্থনীতির ভাষায় শিল্পের আঞ্চলিক বিশেষীকরণকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলে। যখন কোন একটি শিল্পের অধিক সংখ্যক কারখানা বা প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে গড়ে ওঠে, এই কেন্দ্রীভুত হওয়াকে শিল্পের স্থানীয়করণ (Localization of Industry) বলে। শিল্পের স্থানীয়করণ সাধারণত কোন বিশেষ এলাকায় বিশেষ সুবিধাসমূহের কারণে সমজাতীয় বহুসংখ্যক শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। বিভিন্ন কারণে শিল্পের স্থানীয়করণ হয়ে থাকে, যেমন: কাঁচামালের সহজলভ্যতা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, দক্ষ শ্রমিকের সহজলভ্যতা, বাজারজাতকরণের সুবিধা, সরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা, যাতায়াতের সুবিধা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে আগ্রহী ও উদ্যোক্তা গোষ্ঠী ইত্যাদি। বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে তাঁত শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণে উপরোক্ত বেশিরভাগ সুবিধাগুলো উপস্থিতি ছিল।

প্রথমত: বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষ করা হতো মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর অববাহিকায় মি: টেইলর তার A sketch of the Topography & statistics of Dacca (Calcutta, 1840) গ্রন্থে তুলা সম্পর্কে বলেছেন, “Two crops are raised in the district; they are gathed in April and September, but the first yields the finest produce and is the one that is chiefly cultivated.”[৬০] কার্পাস থেকে উৎকৃষ্টমানের তুলা হতো। সে তুলা থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা উৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরিতে পারদর্শী ছিলো। যার কারণে বৃহত্তর ঢাকার তাঁতীরা পণ্যের যথাযথ মান বজায় রাখতে পারতো। বর্তমান সময়ে অত্র বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকাংশে লক্ষ্যণীয়।

দ্বিতীয়ত: উৎপাদন খরচের ছিল স্বল্পতা। স্বল্প হবার কারণ ছিল স্থানীয় কৃষকরা নিজেদের জমিতে কার্পাস চাষ করত, সেই তুলার সুতা কাটতো গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি বাড়ীর বৌ, ঝিরা অর্থাৎ স্ত্রী-কন্যা, সন্তানগণ। আরেকটি বিষয় হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করার জন্য স্থানীয় তাঁতীগণ এর আলাদা কোন ঘর তৈরি করতে হতো না। তারা যে ঘরে বাস করতো সে ঘরেই তাঁত স্থাপন করতো। যেটি অদ্যাবধি লক্ষ্যণীয়। সেকারণে তাদের উৎপাদন খরচ ছিল বরাবরই কম।ফলশ্রুতিতে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে ব্যবসায়ীরা পণ্য ক্রয় করতে পারতো। উৎকৃষ্ট পণ্য এবং স্বল্প মূল্যের কারণে ঢাকার তাঁত বস্ত্রের খ্যাতি দেশীয় আন্তর্জাতিক

বাজারে ছড়িয়ে পড়েছিলো। উৎপাদন খরচের স্বল্পতার একটি দিক নিম্নে আলোচনা করা হলো।

> যে কোন বস্ত্র বয়নের তিনটি স্তর আছে-কার্পাস সংগ্রহ, সুতা কাটা এবং কাপড় বয়ন। ঢাকার তাঁতীদের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, কার্পাস উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে কাপড় তৈরি হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরেই ঢাকা স্বয়ং- সম্পূর্ণ ছিল, বিদেশের উপর নির্ভরশীল ছিলনা। ঢাকার মাটিতেই কার্পাস জন্মাত, ঢাকার তাঁতীরাই সুতা কাটত এবং বস্ত্র বয়ন করত। অনেক ক্ষেত্রে চাষী নিজেই তাঁতীর কাজ করত এবং তাঁতী নিজেই ছুতার মিস্ত্রির কাজ করে নিজের তাঁত তৈরি করত। তাঁত তৈরির জন্য ও কোন বিদেশি জিনিসের প্রয়োজন ছিলনা, কারণ তাঁতে ব্যবহারোপযোগী কাঠ বাঁশও ঢাকার বুকেই জন্মাত। সামান্য লোহার প্রয়োজন হলেও দেশজ লোহা তার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম ছিল, তবে ঢাকার তাঁত এত সাধারণভাবে নির্মিত হত যে কাঠ এবং বাঁশ এবং ছোট এক টুকরা লোহা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁতের জন্য কোন দালান কোঠারও দরকার ছিলনা, কারণ বছরের অর্ধেক কাল খোলা আঙ্গিনাতেই তাঁতের কাজ চলত, প্রয়োজন অনুভূত হলে তাঁতীর নিজ বাসগৃহে তাঁত সারিয়ে নেওয়া বিশেষ দুরূহ কাজ ছিলনা।[৬১]

তৃতীয়তঃ নদীমাতৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বৃহত্তর ঢাকার তাঁত প্রধান এলাকাগুলোর সাথে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর সংযোগের কারণে দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীরা সহজে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহন করতে পারেন।

চতুর্থতঃ বয়নকারী (বিশেষভাবে দক্ষ শ্রমিক)

> মসলিনের যখন স্বর্ণযুগ, তখন প্রয়োজনের তাগিদেই মসলিন বুননের আনুষঙ্গিক সকল কাজ বিভিন্ন শ্রেণীর নিপুণ কারিগরদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। মসলিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের জন্য নিপুণ তাঁতীরা একমাত্র বয়ন কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে যোগ দিতে অসমর্থ ছিল। সুতরাং একদল লোক উত্তরোত্তর বেশি কার্পাস উৎপাদনে মনযোগ দেয়, অন্যদের কেউ হয়তঃ সুতা কাটা বা তাঁত নির্মাণে বা কাপড় বয়নে আত্মনিয়োগ করে। ফলে কার্পাস থেকে আরম্ভ করে কাটা সুতা বা তাঁত ইত্যাদি সকল কিছুই বাজারে বেচাকেনার জন্য মজুত থাকত। যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে ঢাকাই মসলিন পুরোপুরি দেশজ শিল্প, একমাত্র রপ্তানী ছাড়া আর কিছুর জন্য ঢাকাই মসলিন বাইরের জগতের উপর নির্ভরশীল ছিল না।[৬২]

৩.৪.১২ ক্রেতা ও ভোক্তার চাহিদাভিত্তিক বস্ত্র উৎপাদন

তাঁতীগণ সাধারণত ভোক্তার চাহিদামাফিক কাপড় উৎপাদন করে থাকেন। যেমনঃ- বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদন হয়ে থাকে বস্ত্র (১) সাধারণ ক্রেতাদের জন্য (২) ফ্যাশন হাউজগুলোর কার্যাদেশ (Work order) মাফিক এবং (৩) শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জন্য রাজধানীর শপিংমলগুলোর শো-রুমে বিক্রয়ের

জন্য। পূর্বে বিশেষ করে মোগল আমল, কোম্পানি আমলে ও কোম্পানী আমলে ভোক্তাদের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি হতো যেমনঃ (১) স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য মোটা বস্ত্র; (২) রাজদরবারের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের জন্য বিলাসবহুল এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন রকম উন্নতমানের বস্ত্র (৩) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো দ্বারা পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য স্বীকৃত মান, মধ্যম মান এবং বিলাসবহুল বিভিন্ন ধরনের কাপড় উৎপাদন করা হতো।

৩.৪.১৩ অভিজাত শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে বস্ত্র উৎপাদন

ইতোপূর্বে রাজদরবার, অভিজাত শ্রেণী এবং উত্তর-ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিলাস-বহুল বস্ত্র পণ্যের চাহিদা ছিল অধিক।রাজকীয় কারখানায় সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে তৈরি বস্ত্রের মাধ্যমে এ চাহিদার কিছুটা পূরণ হতো। যেসব এলাকায় উন্নত মানের তুলা উৎপাদিত হতো সেসব এলাকার বাজার হতে ভাল মানের সুতা ক্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদনের স্বীকৃত মান রক্ষা করা হতো। অভিজ্ঞ ও পারদর্শী কারিগর নিয়োগ করা হতো; আর এসব কারখানা পরিচালিত হতো গভর্নর এবং তাদের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। ঢাকা, সোনারগাঁ এবং জঙ্গল-বাড়ীতে *মলবুস খাস*নামে এক ধরনের কাপড়ের কারখানা গড়ে উঠেছিল। মুঘল বাদশাহদের জন্য তৈরি কাপড় মলবুস খাস আর বাংলার নবাবদের জন্য যে মসলিন তৈরি ও সংগ্রহ করা হতো তার নাম ছিল সরকার-ই-আলি। দারোগাদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত তাঁতিরা রাজদরবারের চাহিদানুসারে এসব কারখানায় কাজ করতো। কুঠিগুলোতে বিশেষ ঘর নির্মিত হয়েছিল, যেখানে অভিজ্ঞ কারিগরদের বাছাই করা হতো। ফরমায়েশকৃত কাপড় তৈরি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এসব কারিগররা কুঠিতে হাজিরা দিতে বাধ্য থাকতো।

আঠার শতকের ইংরেজ কোম্পানির দলিলে দেখা যায় মলবুস খাস ও সরকার-ই-আলি সংগ্রহ করার জন্য যে রাজকর্মচারী দারোগা নিযুক্ত ছিলেন তার উপাধি ছিল "দারোগা-ই-মলবুস খাস ও তাঁত খানা। কোন কোন সময় দারোগার একজন সহকারী ও ডেপুটিও থাকতেন। আঠারো শতকে এরূপ দুজন দারোগার নাম পাওয়া গিয়েছে। প্রথমতঃ শ্রীনাথ। তিনি ১৭২৩-১৭৩৮ খ্রী. পর্যন্ত দারোগা ছিলেন ও ২য় সিরাজ-উদ-দীন মোহাম্মদ খান, তিনি ১৭৩৬-১৭৫৭ পর্যন্ত দারোগা ছিলেন। তাঁর সময় ছালেহ মোহাম্মদ সহকারী বা ডেপুটি দারোগা ছিলেন। এসব দারোগাদের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক আড়ং-এ একটি করে মলবুস খাস কুঠি বা তাঁতখানা পরিচালিত হতো। প্রত্যেক কুঠি বা তাঁতখানায় একটি করে দপ্তর ছিল এবং সেখানে আড়ং এর অত্যন্ত নিপুণ তাঁতী নারদিয়া, রিফুকার ইত্যাদি কবি গায়কদের নামে তালিকাভুক্ত থাকত। এসব তাঁত খানায় যারা কাজ করতো এসব তাঁতীদের কোন নির্ধারিত বেতন ছিল না এবং তারা যতখানি মসলিন তৈরি করতো তার বাজার মূল্য দেওয়ার নিয়ম ছিল।[৬৩] কোম্পানি আমলের কাপড় প্রস্তুতের সময় তদারকির প্রমাণ পাওয়া যায় যেমন, "Mokeem on the part darogha daily inspected the thread which the weavers bought for their looms and none was permitted to be used until compared with the established muslins and approved of"[৬৪]

ব্যবসায়ীরাও ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু উৎপাদন স্থান এবং স্থলপথের বাজারগুলোর মধ্যে দূরত্বের কারণেতাদের প্রকৃতিতে প্রতিনিধিরা ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্য ক্রয় করতো।দালালদের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ (দাদন) বিতরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কাজ কর্ম চলছিল।ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত বৈদেশিক বাজারসমূহ বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের বৃহৎ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। রাজদরবারের জন্য আব-ই-রাওয়ান অথবা শবনম নামের বিলাস বহুল পণ্যের উৎপাদনে হাতের পারদর্শীতা ও নিপুনতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। বিভিন্ন ধরনের বাজারে এ ধরনের উন্নত মানের শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু শর্ত ছিল উৎপাদনের খরচ যেন কম রাখা হয়। "this charge in emphasis generated pressure for a significant change in technique and organization."বেশ কিছুকাল আগে বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সুতা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কিছু কারিগরী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের কারণে অন্যান্য জায়গায়ও সুতা প্রস্তুতে পরিবর্তন এসেছিল। চীনে সুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে তিন টাকু বিশিষ্ট চাকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু সেটি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও খরচ ছিল বেশি।[৬৫] বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বে ইংল্যান্ডেও সুতা তৈরির ক্ষেত্রে এক নতুন প্রযুক্তি চালু হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশের কুটির শিল্প প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় কৃষির পরেই অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো বস্ত্র বা বয়ন শিল্প। অবশ্য এই দেশের বস্ত্র শিল্প পূর্ব থেকেই ঐতিহ্যমন্ডিত, দেশ-বিদেশে সুনামও কুড়িয়েছে অনেক। সাধারণত তখন দুরকম পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপন্ন হত- কুটির (Domestic system of production) ও ফ্যাক্টরি(Factory system of production)।[৬৬] কোম্পানি, বিদেশী বণিক ও এদেশি বণিকরা নিজেদের মূলধনে ও পরিচালনায়, নিজেদের কারখানায় শ্রমিক রেখে বস্ত্র উৎপাদন করতেন। আর বণিকদের কাছ থেকে আগাম মূলধন নিয়ে এদেশি তাঁতিরা নিজেদের বাড়িতে পরিবারের সকলে মিলে বস্ত্র উৎপাদন করতেন।[৬৭] তবে কেউ কেউ উনিশ শতকে বাংলার শিল্প উৎপাদনের সাথে যুক্ত কারিগরদের তিনভাগে ভাগ করেছেন। (ক) অল্প পুঁজির কারিগর যিনি পরিবারের সকলকেই নিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন এবং নিজে বিক্রি করেন। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কারিগর যিনি উৎপাদনের জন্য আগাম নেন এবং নির্দিষ্ট মানের পণ্য পূর্ব নির্ধারিত দামে সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরকম উৎপাদন ব্যবস্থায় দালাল বা পাইকারের হাতে কারিগরের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হত। (গ) পুঁজিপতি উৎপাদক যিনি কারখানা করে কারিগর রেখে বিভিন্ন পন্য উৎপাদন করেন। সাধারণভাবে বলা যায় এ যুগে বাংলাদেশে কুটির শিল্প হিসেবেই বস্ত্রবয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপন্ন হত। শারীরিক শ্রমে হস্তচালিত তাঁতে এদেশের তাঁতী ও জোলারা বস্ত্র উৎপাদন করত।[৬৮]

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসকল ফ্যাশন হাউজ ও অভিজাত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁতীদের অগ্রীম অর্থ, মালামাল ও ডিজাইন সরবরাহ করে এবং তাদের অফিসের নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ উৎপাদন মান ও সময়মত মালামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন সেইগুলো নিম্নরূপ: (১) টাঙ্গাইল শাড়ী কুটির, বেইলী রোড, ঢাকা, (২) আড়ং, (৩)

বিবি রাসেল প্রোডাক্টসশনস, (৪) গ্রামীণ উদ্যোগ, (৫) রঙ, (৬) বিবিয়ানা, (৭) বাংলার মেলা, (৮) দর্জি বাড়ী, (৯) অঞ্জনস, (১০) নিপুণ, (১১) সাদা কালো, (১২) সৃষ্টি অন্যতম। তাঁত মালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে কার্যাদেশের সময় (work order) প্রাপ্তির সময় নগদ অর্থ পেয়ে থাকেন এবং কার্যাদেশের শর্তানুযায়ী উৎপাদিত মালামাল সরবরাহ করে থাকে। অভিজাত ফ্যাশন হাউজগুলো মূলত রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরকেন্দ্রিক।

৩.৫ উপসংহার

তাঁত শিল্পের ধরন, প্রক্রিয়াকরণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে এ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁতপ্রধান এলাকাসমূহ আলোচনায় এসেছে। বৃহত্তর ঢাকায় তাঁত শিল্পের স্থানীয়করণ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাজদরবার অভিজাত শ্রেণি এবং ইংরেজ সাহেবদের চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র তৈরির বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। বাজারজাতকরণের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। আবার বর্তমান সময়ের ফ্যাশন হাউজগুলোর পছন্দমাফিক কার্যাদেশ নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কাপড় বুনন প্রক্রিয়া বিশেষ করে তুলা উৎপাদন ও সংগ্রহ নিয়ে বলা হয়েছে। তাঁতশিল্পের বিভিন্ন ধরণ অর্থাৎ কাপড়ের ধরণ ও তাঁতযন্ত্রের ধরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁত শিল্পের প্রক্রিয়াকরণের ধারাগুলো আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এই শিল্পের স্থানীয়করণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্তমান চাহিদাও এখানে আলোচনায় স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের তাঁতের প্রযুক্তিগত দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এলাকা ভেদে এসব তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র, শাড়ি, লুঙ্গি, জামদানি ও মসলিনের বিশেষত্ব আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সবশেষে বৃহত্তর ঢাকা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ তাঁত অঞ্চলসমূহ যেমন- পাবনা, টাঙ্গাইল ও আদিবাসী তাঁত ও তাঁতীদের কথা এসেছে।

তথ্যনির্দেশিকা

---

১. *Bangladesh Handlom Census 2003*, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, (Dhaka-2005), p. 11.

২. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, (২১ এপ্রিল, ২০১৮), পৃ. ৪।

৩. সাধারণত বিক্রয়ের জন্য উৎপাদিত কারুশিল্পকে কুটির শিল্প বলা হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) এর সংজ্ঞানুযায়ী- যে শিল্প কারখানা একই পরিবারের সদস্য দ্বারা বা আংশিকভাবে পরিচালিত এবং পারিবারিক কারিগরদের খন্ডকালীন বা পূর্ণ সময়ের জন্য উৎপাদন করতে নিয়োজিত থাকেন এবং যে শিল্পে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হলে ১০জনের বেশি এবং শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার না হলে ২০জনের বেশি কারিগর উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত থাকে না তাকে কুটির শিল্প বলে। এই অর্থে তাঁত শিল্প একটি কুটির শিল্প।

৪. Ruma Chatterjee, 'Cotton Handloom Manufactures of Bengal, 1870-1921', *Economic and Political Weekly*, Vol. XXII, No. 25, (New Delhi, 1987), p. 988.

৫. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal*, Oxford University Press, 1988, New Delhi, p. 23. (এখন থেকে গ্রন্থটি Hossain, *The Company...,* এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৬. G. Evans, *A Brief History of in Bengal* (Director of Agriculture, in Bengal- Report) p. 7. Calcutta 1921) (এখন থেকে গ্রন্থটি Evans, *A Brief History...,* এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৭. James Taylor, *A Sketch of the topography and statistics of Dacca*, Calcutta-1840, p. 113.

৮. G. Evans, A brief History of Cotton Cultivation in Bengal (Director of Agriculture Report Calcutta-1921, p. 9.

৯. Hossain, *The Company...,* p. 40.

১০. Royle. F. Forbes, *on the culture and commerce of cotton India and elswhere, (*London,1851), p. 66.

১১. Evans, *A Brief History...*, p. 7.

১২. বার্ষিক তথ্য প্রতিবেদন: "বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোড", ঢাকা, ২০১৬। (www.cdv.gov.bd)

১৩. বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড: কার্যক্রম প্রতিবেদন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬। পৃ. ৪।

১৪. তথ্য প্রতিবেদন: "বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোড", ঢাকা, ২০১৮। (www.cdv.gov.bd)

১৫. Monwar Hossain and Abdul Hye Mondal, "*Distribution of Year in the Handloom Sector, A Review of Problems and Prospects*", BIDS, Dhaka-1983 1983, p.11.

১৬. সাক্ষাৎকার: মো: মোমেন সরকার, পরিচালক, নরসিংদী চেম্বর অব কমার্স, পেশা-ব্যবসা, বয়স, ৫২, শিলমান্দী, নরসিংদী, ২০১৬।

১৭. সাক্ষাৎকার:মোঃ নূরুল ইসলাম, সভাপতি, হাসনাবাদ বাজার ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতি, পেশাঃ ব্যবসা, বয়স ৭০, মোকাম হাসনাবাদ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

১৮. সাক্ষাৎকার: মোঃ সেলিম রেজা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ডৌকারচর ইউনিয়ন পরিষদ, পেশাঃ সুতা ব্যবসায়ী, বয়সঃ ৫১, মোকাম: হাসনাবাদ বাজার, হাসনাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

১৯. John Key*, (1704-1779) Was an English Inventor whose most important creation was the* Flying Shuttle, and it was the important prime contribution to the industrial Revolution.

২০. Edard Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain, London 1835, P. 116 ত্রৈলোক্যনাথ বসু, তাঁত ও রং, দ্য নিউ বুক স্টল, (কলিকাতা, ১৯৮৯) (প্র. প্র. ১৯৩৯), পৃ. ১।

২১. G. N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908*, (Shillong, 1908), P. 14.

২২. Gupta, *A Survey...*, p.14. (এখন থেকে গ্রন্থটিতে Gupta, *A Survey* পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

২৩. Department of Agricultrue and Industries, Government of Bengal, File no. 1-W-2, Serial Nos. 1-2, Progs no 1-2, February 1939.

২৪. রাধারমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস (অখণ্ড),কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪ (প্র. প্র. ১ম-২য় খণ্ড ১৩৩০ এবং ৩য়-৬ষ্ঠ খন্ড ১৩৩৩), পৃ. ৩১০

২৫. সাহা, *পাবনা জেলা ...*, পৃ. ৩১৬ (এখন থেকে গ্রন্থটি সাহা, *পাবনা জেলা ...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।)

২৬. সাহা, *পাবনা জেলা ...*, পৃ. ৩১১।

২৭. শ্রীকরুণাদাস গুহ, 'কুটিরশিল্প ও বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ', বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, মিহির ভট্টাচার্য ও দীপঙ্কর ঘোষ সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, (কলকাতা, ২০০৪), পৃ. ১১১

২৮. Government of Bengal, Department of Industries, Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, (Calcutta, Second Edition: 1929), P. 80

২৯. Power loom is a methanized loom and was on of the development of weaving during the early industrial revolution which was design (1784) and built (1785) by Edmund Cartwright (1743-1823) who was born in England.

৩০. সাইদুর, *জামদানি...*, পৃ. ১২।

৩১. জিনাত মাহরুখ বানু এবং মাসুদ রেজা, 'জামদানি', সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, http://en.banglapedia.org/index.php?title=Jamdani, citation date 3 May 2018 at 11:07 PM.

৩২ *The Daily Star*, 17th November, 2016.

৩৩. তোফায়েল আহমদ, 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৪৯।

৩৪. Rahbar Hossain, Sadik Azam and Zunaed Tanvir, *'Historic 'Jamdani' Could be the name of new hope'* Textile Today, 20 January 2017.

৩৫. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৬০।

৩৬ Textile Today, 20 January 2017 (www.textiletoday.com.bd>historic.)

৩৭. মোহাম্মদ সাইদুর, *জামদানি*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ১২।

৩৮. GI পণ্য হিসেবে জামদান'র স্বীকৃতি সম্পর্কে The Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT)-এর উক্তি।

৩৯. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পৃ. ১৮৮।

৪০. খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভাষায় রচিত বাণিজ্য এবং নাবিকবিদ্যার নির্দেশমূলক একটি গ্রন্থ, (নিউইয়র্ক, ১৯১২)।

৪১. রোমান লেখক প্লিনি'র গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ঢাকার মসলিনের প্রতি পাচীন রোমের মেয়েরা খুবই অনুরাগী ছিলেন।

৪২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। চর্যাপদের ১০ নং পদে উল্লেখ আছে যে, এক ডোমিনী নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করতেন। এই সাহিত্যকর্মের অন্যতম পদকর্তা ঢেণ্ডনপা পেশায় ছিলেন একজন তাঁতী। বিস্তারিত দেখুন, ড. সৌমিত্র শেখর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, অগ্নি পাবলিকেশনস, (ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ. ২০০-২০৮। চর্যাপদে কাঁপড় বুননের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার ইংরেজি বর্ণনা-

In the loom pure cloth can be woven

I am the weaver

The yarn is any own yet I do not know how to describe it.

The world is three and a half arms long

This earn is enough to weave for the whole world.

'Anahata' looms prepare the static cloth

Two place have been broken and joined again stronger than ever.

Seated, I hear everything

I have Forsaken weaving and taken up the vajru instead.

৪৩. ইতালিয়ান বণিক এবং লেখক।

৪৪. মরক্কোর পর্যটক। ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতকে সোনারগাঁওয়ে উৎপাদিত ছয় প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রশংসা করেছেন।

৪৫. জানা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দিতে ফরাসি রাষ্ট্রদূত ক্রুসি ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের প্রেয়সী মাদাম দ্য পম্পোদ-এর জন্য উপহার হিসেবে বাংলা থেকে এক ডজন মসলিনের কামিজ ফরাসি দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৪৬. প্রণব ভৌমিক, *মসলিনের গল্প শোনো*, সংবাদ, (ঢাকা, ২০১৮), পৃ. ১৫।

৪৭. ভৌমিক, *মসলিনের গল্প...*, পৃ. ১১। (এখন থেকে গ্রন্থটি ভৌমিক, মসলিনের গল্প..., এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৪৮. ভৌমিক, *মসলিনের গল্প...*, পৃ. ১৩।

৪৯. উত্তরাধিকার, ১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৫।

৫০. মোহাম্মদ সাইদুর, *জামদানি*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৯৩), পৃ. ১২।

৫১. সাইদুর, *জামদানি...*, পৃ. ১২। (এখন থেকে গ্রন্থটি সাইদুর, *জামদানি...*,এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে।)

৫২. সাইদুর, *জামদানি...*, পৃ. ১৬।

৫৩. করিম, *ঢাকাই...*, পৃ. ৩১-৪৫।

৫৪. করিম, *মসলিন...*, পৃপৃ. ৩১-৪৪।

৫৫. ফিল্ড নোট: মিরপুর বেনারসী পল্লী, ঢাকা, ১৯-২১ জুলাই ২০০৯ এবং ১৭ আগস্ট ২০১০।

৫৬. সাক্ষাৎকার: মো: শাহজাহান আনসারী, সাধারণ সম্পাদক, পেশা: ব্যবসায়ী, বয়স-৫৮, করটিয়া বাজার কাপড় ব্যবসায়ী সমিতি, করটিয়া, টাঙ্গাইল, ২০১৬।

৫৭. হাকিম হাবিবুর রহমান ও ড. মোহম্মদ রেজাউল করিম (অনুবাদ), "পঞ্চাশ বছর আগে" প্যাপিরাস, (ঢাকা, ২০০৫), (প্র. প্র. ১৯৪৯), পৃ. ২৮।

৫৮. Zulekha Haque, 'Sari: Cotton andSilk', Textile Traditions of Bangladesh, National Craft Council of Bangladesh, (Dhaka, 2006), p. 68.

৫৯. শাওন আকন্দ: *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.১৭.।

৬০. G. Evans, "A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal, Department of Agriculture, Bengal" *Bulletin No-1, 1921, (Calcutta, 1921)*, p.10.

৬১. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ১৮।

৬২. করিম, *মসলিন*, পৃ. ১৮-১৯। (এখন থেকে গ্রন্থটি করিম, *মসলিন...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৬৩. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৭১-৭২।

৬৪. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal*, Oxford University Press, 1988, p. 23.

৬৫. C. Dietrich, 'Cotton Culture and Manufacture in Early Ching China', in W. E. Wilmot, (ed.), *EconomicOrganization in the Chinese Society*, (Stanford, 1972), pp. 123-4

৬৬. H. R. Ghosal, *The Economic Tracsaction in The Bengal Presedency, (1793-1833), Calcutta-1966,* পৃ. ১৫।

৬৭. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস: উনবিংশ শতাব্দী* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৬৯।

৬৮. মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস...*, পৃ. ৬৯।

চতুর্থ অধ্যায়

তাঁতশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্য

চতুর্থ অধ্যায়
তাঁতশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্য

৪.১ ভূমিকা

যে কোন উৎপাদিত পণ্য দীর্ঘসময় ভোক্তার আগ্রহ ও চাহিদা নিয়ে টিকে থাকা নির্ভর করে সে পণ্যের বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থার উপর। পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্যটিকে একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্রেতা এবং ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে সেটি ছিল আরো কষ্টসাধ্য। তবুও তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্য তৎকালীন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজারজাতকরণ (Marketing) ছিল লক্ষ্যণীয়। আধুনিক যুগের নিরিখে উৎপাদনকারী হতে ব্যবহারকারী পর্যন্ত পণ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার যাবতীয় ব্যবসায়িক কার্যকলাপকে বাজারজাতকরণ বলা হয়। পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন- নির্ধারিত বাজার নির্বাচন ও বিশ্লেষণ করা এবং নির্ধারিত বাজারকে (ক্রেতাগোষ্ঠী) সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন ও চাহিদার নিরিখে মূল্য নির্ধারণ এবং পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। আধুনিক মার্কেটিং ব্যবস্থার জনক Philip Kotler[১] বাজারজাতকরণ বা মার্কেটিং এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, Satisfying needs and wants through on exchange process. বাণিজ্য বা Trade বলতে বুঝায়, Trade is a basic economic concept involving the buying and selling goods and services, with compensation paid Buayer to a seller or the enchase of goods & services between parties. Trade contact place within an economy between producers & consumers[২] আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা International Trade বলতে একটি দেশের সংগে অন্য এক বা একাধিক দেশের দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান বা আমদানী রপ্তানীকে বুঝায়। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে চিত্রিত করা হয় এইভাবে, International trade is the exchange of capital, goods, and services across international borders or territories. In most countries, such trade represents a significant share of gross domestic product[৩]

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, অন্তত দুই হাজার বছর আগে থেকে বাংলার জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত ছিল। যারা উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ে কাজ করত এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও রপ্তানি হতো। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ ও বিবরণ পাওয়া যায় বৃটিশ আমলের সরকারি নথিপত্র থেকে। ১৯২১ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়,

> A study of old and authentic records shows that, in the past, any marked rise in the price of cotton goods in Bengal has universally been accompanied by a demand for cotton seed with a view to the extension of cotton cultivation, although the

demand was probably never so insistent as it was during the closing periods of the last war. Similarly a careful study of the records available shows that many and detailed experiments have been made during the past hundred years to introduce cotton on a field scale into Bengal.[8]

বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ এবং বৃটিশ আমলের সরকারি প্রতিবেদন কিংবা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাংলার খুব কম জেলা ছিল, যেখানে তাঁতের কাজ হতো না। সারাদেশে যেসব তাঁতপণ্য উৎপন্ন হতো, তা ছিল বিভিন্ন মানের এবং সেগুলো দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হতো। রমেশ চন্দ্র মজুমদার তার বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন মসলিন ও জামদানির ইতিহাস খুবই প্রাচীন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দিতে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সুক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো।[৫] কিন্তু সেসব তাঁত পণ্য বিক্রয় ও বিপণন হতো কোথায় এবং কীভাবে? সে সময় ব্যবসার ধরনটা ঠিক কী রকম ছিল। এই অধ্যায়ে অতীত কাল থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেমন এসকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ তাঁতপণ্য বাজারজাতকরণের মাধ্যমসমূহ

যে কোন উৎপাদন ও বাণিজ্য পরিচালনায় সংগঠন ও পুঁজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাঁত পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণেও তেমনি জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়েও বাজার ব্যবস্থার সাংগঠনিক কাঠামো, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও পুঁজি কোনো না কোনোভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান সময়ে যদিও শহরে হস্তচালিত তাঁতপণ্যের নতুন বাজার তৈরি হয়েছে এবং সেখানে তাঁত শিল্পের উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তথাপি এখনো বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের মূল বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত বিভিন্ন হাটের মাধ্যমে। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বাজার ও বিপণনের সামগ্রিক চিত্রটা বুঝতে হলে এই হাটগুলোর ভূমিকা আলোচনা করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতবস্ত্রের হাট গড়ে উঠেছে এবং সেগুলোর বেশ কটি প্রাচীন ও বিখ্যাত। বৃহত্তর ঢাকায় নরসিংদীর শেখেরচর, মাধবদী ও বাবুর হাট, নারায়ণগঞ্জে ভুলতা-গাউছিয়া ও রূপগঞ্জের নওয়াপাড়ার জামদানির হাট, ঢাকার ডেমরার বাওয়ানী জুটমিল সংলগ্ন জামদানির হাট, টাঙ্গাইলের করোটিয়া ও বাজিতপুরের হাট, কুষ্টিয়ার কুমারখালী ও পোড়াদহের হাট, সিরাজগঞ্জের শাহ্জাদপুর ও সোহাগপুরের হাট, খুলনার ফুলতলার হাট, বগুড়ার শাওয়াইলের হাট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি

হাটের নাম। এছাড়াও বাংলাদেশে আরো অনেক হাট আছে এবং এসব ছোটবড় হাট বা বাজারে চলছে তাঁতবস্ত্র বিক্রয় ও বিপণন। তবে ওপরে উল্লিখিত হাটগুলো তাঁতবস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল থেকে পাইকার ও ব্যবসায়ীরা তাদের প্রয়োজনানুসারে তাঁতপণ্য কেনার জন্য এসব হাটে উপস্থিত হয়। বড় হাটগুলো থেকে পণ্য কিনে স্থানীয় অন্যান্য ছোট হাটে সেগুলো বিক্রি করা হয়। শুধু তাঁতপণ্য নয়, তাঁত সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সুতা, রং ইত্যাদি বিপণনেরও কেন্দ্র এই হাটগুলো। তাঁতিরা বস্ত্র বিক্রির পাশাপাশি হাটগুলো থেকে তাদের প্রয়োজনমাফিক এসব দ্রব্য সংগহ করে থাকেন।

সাধারণত খুব ভোরে এই হাটগুলো শুরু হয়ে সকাল দশটা এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো হাট অবশ্য সারা দিন ধরে চলে বা দুপুরের পর শুরু হয়ে সন্ধ্যায় বা রাতে শেষ হয়। তবে প্রতিটি হাটের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় ধার্য করা আছে এবং সেই অনুসারে তাঁতি, মহাজন, পাইকার প্রমুখ তাঁতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয় ও কেনাবেচা করে। সপ্তাহে এক বা একাধিক দিন এ ধরনের হাট বসে।

সাধারণত প্রতিটি হাটে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হয় দ্রব্যাদি বেচাবিক্রির জন্য। এটা বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। প্রতিটি হাট সাধারণত একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই খাজনা আদায় করে হাট কমিটির লোকেরা। এই বিনিময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ক্রেতা বিক্রেতাদের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার দিকে নজর রাখে এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক উদ্যোগ নেয় এই কমিটি।

তবে যেকোনো স্থানে হাট গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হলো, সেই স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা। পূর্বে সাধারণত নদীপথের কাছাকাছি স্থানগুলোতে হাটগুলো গড়ে উঠত। সেটা মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই। যেমন- বাবুরহাট বা ডেমরার হাট। পরবর্তীকালে রেলপথ ও সড়কপথের উন্নতি ঘটলে রেল ও সড়কপথের কাছাকাছি স্থানে হাটগুলো গড়ে ওঠে।যেমন- কুমারখালী হাট বা করোটিয়ার হাট। দূরবর্তী লের তাঁতিরা সাধারণত বাসে, ট্রাকে, রেলগাড়িতে এবং কাছাকাছি অঞ্চলের তাঁতিরা রিকশায়, ভ্যানে, নৌকায় কিংবা সাইকেলে করে তাঁতপণ্য হাটে আনা নেয়া করে।

হাটগুলোতে যেসব পণ্য বিক্রি হয়, তা সাধারণত কাছাকাছি অঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবে কখনো অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থান থেকেও তাঁতি বা মহাজনরা কাপড় নিয়ে হাটে উপস্থিত হতে পারে। যেসব এলাকায় কোনো হাট নেই, সেখানকার মানুষ তাঁতপণ্য নিয়ে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে বিক্রি করে থাকে। তবে ক্রেতা বা পাইকাররা শুধু নিকটবর্তী নয়, বরং খুব দূরবর্তী স্থান থেকেও এসে থাকে। হাট থেকে পণ্য কিনে নিয়ে গিয়ে ক্রেতাদের একটা অংশ নিজেরাই তা সাধারণ বাজারে বিক্রি করে। আবার কখনো কখনো তারা খুচরা বিক্রেতাদর কাছে তা বিক্রি করে দিয়ে থাকে। যেসব স্থানে খুব ভোরে হাট বসে,

সেখানে দূরের তাঁতি, ব্যবসায়ী ও পাইকাররা হাটের আগের দিন রাতে আসে। কাছাকাছি হোটেলে বা আত্মীয়বাড়ি রাত যাপন করে এবং খুব ভোরে হাট করে বেলা বাড়লে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হয়। কাছাকাছি অঞ্চলের পাইকাররা রাত থাকতে রওনা দিয়ে ভোরের হাট ধরে। তবে বিকেলের হাটের ক্ষেত্রে দুপুর থেকে জনসমাগম বাড়ে এবং সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে হাট ভাঙে।

হাটগুলোর প্রতিটির আবার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত প্রাপ্ত পণ্যের ওপর নির্ভর করে এই বৈশিষ্ট গড়ে ওঠে। যেমনঃ নরসিংদীর শেখের চর, বাবুর হাট সুতী শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা, থ্রীপিসের জন্য বিখ্যাত। ডেমরার হাটের খ্যাতি জামদানির জন্য। শতাধিক বছর ধরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ডেমরার হাটে জামদানি ক্রয় বিক্রয় হয়ে আসছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ জামদানি সংগ্রহের উদ্দেশ্য ডেমরার হাটে এসে থাকে। আবার টাঙ্গাইলের বাজিতপুরের হাটের প্রধান খ্যাতি টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য। কুমারখালীর হাটের খ্যাতি এখানকার উৎপাদিত উন্নত শ্রেণির লুঙ্গি, গামছা ও বিছানার চাঁদরের জন্য। প্রতিটি হাটেরই কোনো না কোনে বৈশিষ্ট্য আছে- সেটা নির্ভর করে সেখানে কী ধরনের পণ্য ক্রয়- বিক্রয় হয়, তার ওপর।

এসব হাটে পণ্যের দাম সাধারণত স্থির থাকে বা খুব বেশি ওঠা নামা করে না। এটা প্রধানত নির্ভর করে কাঁচামালের আমদানি রপ্তানি ও দাম ওঠানামা করার ওপর। যেমন- সুতার দাম বাড়লে কাপড়ের দাম বাড়তে পারে। কিন্তু বিশেষ মৌসুমে যেমন ঈদের আগে রমজান মাসে হাটে তাঁতপণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

এসব হাটে শুধু হস্তচালিত তাঁত নয়, মিলের কাপড়ও বিক্রি হয়। তবে কোথাও এর পরিমান কম, কোথাও বেশি। বেশীরভাগ তাঁতী পাইকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধার্থে হাটেই তাঁতবস্ত্র ও তাঁতসংশ্লিষ্ট দ্রব্য ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় আরো নানা দ্রব্য বিক্রি হয়।

৪.৩ বাংলাদেশের ম্যানচেষ্টার খ্যাত বাবুরহাট

তাঁত সমৃদ্ধ বৃহত্তর ঢাকা জেলার তাঁতের কাপড় বেচাকেনার সবচেয়ে বড় বাজার হলো শেখেরচর বাবুর হাট। জানা যায় ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের আমলে ব্রহ্মপুত্র তীরে প্রথম গড়ে ওঠে বাবুরহাট বাজার। প্রায় তিন শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় এটি হয়ে উঠেছে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার। রাজধানী ঢাকার উত্তর-পূর্বে মাধবদীর বাবুরহাট সারাদেশের কাপড় বা বস্ত্র পাইকার-ব্যবসায়ীদের বিপণন তীর্থ। তিনশ বছরে কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এই কাপড়ের হাটের অলিগলিতে আলো-আঁধারিতে টিনের ছাউনি দেয়া হাজার হাজার দোকান। বর্তমানে প্রধান সড়কের গা ঘেঁষে কয়েকটি বহুতল বিশিষ্ট পাকা ভবন গড়ে উঠেছে। হাজারো ক্রেতার ভিড়ে পা ফেলা দায়। ব্যবসায়ীদের জন্য এখানে দিন-রাতের ফারাক থাকে না। নাওয়া-খাওয়া-ঘুমের ফুরসত মেলা দায়।

ছবিঃ নরসিংদীর মাধবদীতে অবস্থিত বাবুরহাটের দৃশ্য।

সেই হিসেব মেলাতে মেলাতেই ফিরে আসে নতুন সপ্তাহ হাঁটে দিন রাত চলতে থাকে তাঁত মালিক, ব্যাপারি, পাইকারদের সমাগম। দরদামের কোলাহল, কুলিদের ব্যস্ততা। দোকানের সামনে ভ্যানের দীর্ঘ সারি। হাটের গা-ঘেঁষে বড় সড়কে ট্রাকের বহর, শত শত ট্রাক। কাপড়ের বিশাল গাঁট উঠছে, নামছে। লোড নিয়ে ছুটে চলেছে দূর-অদূর গন্তব্যে।

সেই ১৭১৭ সাল থেকে তখন পর্যন্ত ব্যবসায়ের কৌলিণ্য এই হাটকে ইতিমধ্যে 'প্রাচের ম্যানচেস্টার' পরিচিতি দিয়েছে 'উইকিপিডিয়া'র পাতায়। বাবুরহাট মানে থান কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রঙের গন্ধ। বেশি ক্রেতা, বেশি বিক্রি। সন্নিহিত এলাকার তাঁতকল থেকে তৈরি হয়ে কাপড় আসছে আর বিক্রি হচ্ছে। এর বাইরে আর কোন দৃশ্য নেই। একসময় কেবল শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ও চাদরের জন্য যে বাবুরহাটের সুখ্যাতি ছিল তার ব্যাপ্তি এখন প্রশস্ত হয়েছে। বর্তমানে এই হাটটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় তাঁতবস্ত্র বিপণন কেন্দ্র। রুমাল থেকে জামদানি শাড়ি, মাথার টুপি থেকে পাঞ্জাবি সব মেলে এই হাটে। ছাপা কাপড়, থান কাপড়, সুতি শাড়ি, থ্রি-পিস, ওড়না, পপলিন, ভয়েল, বর্ণিল দেশীয় আরামদায়ক কাপড়, শার্ট-প্যান্ট এর থান কাপড়, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, গামছা, তোয়ালে সবই পাওয়া যায় এখানে। রমজানের ঈদে বাড়তি যোগ হয় জাকাতের কাপড়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, বগুড়া, জামালপুর, ভোলা, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জসহ দেশের সব প্রান্তের পাইকারী ক্রেতাদের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠে বাবুরহাট। এক হাটে সব ধরনের কাপড় পাওয়া যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাও

ভালো। এজন্য কাপড় ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দ বাবুরহাট। বাবুরহাটকে কেন্দ্র করে নরসিংদী ও তার সন্নিহিত নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলায় গড়ে উঠেছে হাজার হাজার তাঁতকল। তাঁতশিল্পকে ঘিরে জেলার বিভিন্নস্থানে গড়ে উঠেছে শতাধিক সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠান। এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে লাখ লাখ বেকার মানুষের।[৬]

৪.৩.১ 'প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার' হয়ে ওঠার কথা

সামন্ত যুগে স্থানীয় জমিদার হলধর সাহা'র বাবুরহাট সেই আঠারো শতকের পর থেকে ভাঙ্গা-গড়া চলতে চলতে আয়তনের প্রসার ঘটাতে ঘটাতে রূপ-জৌলুস নিয়ে এগিয়ে চলছে। কিংবদন্তী আছে ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে পানশী ভিড়িয়ে জমিদার বাবুরা শখ করে আসতেন এই হাটে সওদা করতে, সাথে থাকতো পাইক-পেয়াদা। দূর-দূরান্ত থেকে পালতোলা নৌকায় চলে আসতেন সওদাগরেরা। কালের যাত্রায় এমন কত হাট হারিয়ে গেছে, তার ইয়াত্তা নেই। কোন কোনটি ইতিহাসের পাতায় জীবন পেয়েছে। তবে বাবুরহাটের ইতিহাস অভূতপূর্ব। তিনশ' বছরের এক কিংবদন্তি মোকামের নাম এই বাবুরহাট। দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি কাপড়ের মোকাম। জমিদার হলধর সাহা ওরফে কালুসাহার বড় প্রিয় ছিল তাঁতের কাপড়। তাই তিনি তাঁতীদের প্রতিষ্ঠিত করতে লেগে যান। তাঁতীরাই বাবুরহাটে তাদের তৈরি তাঁতের কাপড় বিক্রি করা শুরু করে।

তারও আগে ১৭১৭ সালের বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদী সদর উপজেলার শেখেরচর ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠে বাবুরহাট বাজার। তবে এত আগে বাজারটি গড়ে উঠলেও ভালভাবে বিস্তৃতি ঘটে ১৮৫০ সালে। তবে উনিশ শতকের প্রথমদিকে মাধবদীতে স্থানীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায়, বলতে গেলে তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় প্রতি সোমবার হাট জমতে শুরু করে। জমিদার বাবুরা হাটের পৃষ্ঠপোষক থাকার কারণে স্থানীয় লোকজনের কাছে এই হাটটি 'বাবুর হাট' হিসেবে পরিচিতি পায়। মাধবদী এবং আশপাশের কয়েকটি গ্রাম যেমন, আলগী, বিরামপুর, আনন্দীতে কিছু লোক গর্ত তাঁতের মাধ্যমে কাপড় উৎপাদন করতো এবং মাধবদীর সাপ্তাহিক হাটে উৎপাদিত কাপড় বিক্রির জন্য নিয়ে আসতো। উল্লেখ্য বাবুরহাটের পাশাপাশি ১৯৪৭ পরবর্তী সালে পার্শ্ববর্তী এলাকা শেখেরচরে অনুরূপ বাজার গড়ে ওঠে। বর্তমানে মাধবদী, বাবুরহাট, শেখেরচর তিনটি এলাকা সম্প্রসারিত হয়ে গাঁঘেষে পাশাপাশি প্রায় একই বাজারে পরিণত। এই এলাকা বাবুর হাটের কাপড়ের সুখ্যাতি ক্রমান্বয়ে সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় মোহন দাস গান্ধীর ডাকে যখন বিদেশি বস্ত্র বর্জন শুরু হয় তখন যোগীদের পাশাপাশি এঅঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষ কাপড় বুননকাজে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই সময় এলাকার কিছু সজ্জন ব্যক্তি নিজস্ব প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জাপানি যান্ত্রিক বস্ত্রকলের প্রচলন শুরু করে। তারপর থেকেই বস্ত্র উৎপাদনে আসে গতিশীলতা, ফলে বাবুরহাটকে কেন্দ্র করে প্রচুর কাপড় আমদানি ও রপ্তানি শুরু হয়। কালক্রমে বাবুরহাটের সুখ্যাতি আঞ্চলিক গণ্ডি পেরিয়ে উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের

বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নৌপথে বাবুর হাটের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলে। মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীরা বাবুরহাট থেকে কাপড় কিনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে কাপড় চালান দিতে থাকে। সারা বিশ্বে মাধবদী হাটের কাপড়ের পরিচিতি ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশ একরেরও বেশি আয়তনজুড়ে গড়ে উঠা এই ঐতিহ্যবাহী শেখেরচর বাবুরহাটে রয়েছে ছোট-বড় সাত হাজারের বেশি পাইকারি কাপড়ের দোকান।

৪.৩.২ সপ্তাহে হাজার কোটি টাকার বিপণন

রাজধানীর কেন্দ্র হতে ৪০ কিলোমিটার দূরে মাধবদীর শেখেরচরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক থেকে ডানে নামলেই টিনের ছাউনি দেয়া ছোট-বড় ঘরের সারি। চারদিকে জমজমাট মানুষের ভিড়। কারো দিকে কারো ফিরে তাকানোর সময় নেই। বর্ষা মৌসুমে দিনের বেলাতেও আলো-আঁধারিতে জল-কাদা মাড়িয়ে চলতে হয়। হাট প্রাঙ্গণে আশ্চর্য পরিবেশ। লোকজন লাইন ধরে কাপড়ের স্তুপ নিয়ে বসে আছে। কেউ বা পসার নিয়ে সুরম্য দোকানে বসা। খুচরা ব্যবসায়ী ও তাঁতীরা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুই হাতে শাড়ি-লুঙ্গি নিয়ে উঁচু করে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমানে চলছে দামাদামি ও বিক্রয়।

শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার বিকাল পর্যন্ত তিনদিন বিরতিহীন বেচাকেনা চলে। রাজশাহী থেকে আসা মাসুদুর রহমান নামে এক পাইকারী কাপড় ক্রেতার সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, এই হাটে বস্ত্র পণ্যের দাম তুলনামূলকভাবে কম। সপ্তাহে হাজার কোটি টাকার উপরে এ হাটে লেনদেন হয়। লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে এই হাটে আসে একটু ভাল কাপড় কেনার জন্য। দূরের ক্রেতাদের হাটবারের আগের দিন চলে আসতে হয়। এখানকার সবচেয়ে ভাল দিক হচ্ছে বাজার পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ভাল। এছাড়া এখানে লাখ লাখ টাকা হাতে নিয়ে ঘুরলেও কোন সমস্যা হয় না। শেখেরচর বাবুরহাট বাজার বণিক সমিতির নেতা হাজী আবুল কাসেম জানান, সপ্তাহে আনুমানিক এক থেকে দুই হাজার কোটি টাকার কাপড় বেচাকেনা হয় এখানে। এ বছর (২০১৫) গতবারের তুলনায় সুতার দাম সহনীয় পর্যায়ে থাকার কারণে কাপড়ের দাম বাড়েনি। আর তাতেই খুশি ক্রেতারা।[৭]

৪.৩.৩ খাজনাবিহীন বেচাকেনা

দেশের প্রায় প্রতিটি হাট-বাজারে বেচাকেনার ক্ষেত্রে টোল বা খাজনা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে কাপড়ের সবচাইতে বড় এই পাইকারি এই হাটে ২৫ বছর ধরে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীদের কোনো টোল, জমা, খাজনা বা চাঁদা দিতে হয় না। বাবুরহাট বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বলেন, সরকারের কাছ থেকে প্রতিবছর ৩৫-৩০ লাখ টাকায় হাটটি ইজারা নেয়া হয়। তবে ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছ থেকে কোনোরকম টোল আদায় করা হয় না। বাজার ইজারা বাবদ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব, এখানকার ঘর মালিক সমিতির সদস্যরা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেন। এটা পাইকার টানার একটা কৌশল। দূরের পাইকাররা এতে খুব খুশি, যা বাংলাদেশে

পাইকারি হাটে বিরল ঘটনা। যশোরের রফিকুল ইসলাম কাপড় কিনতে এসেছেন বাবুরহাটে। তার সঙ্গে কথা হয় 'রকি-টেক্স শাড়ি ঘরে'। তিনি জানালেন, এ হাটে কেনাকাটায় অন্য হাটের তুলনায় সুবিধা একটু বেশি, ঝামেলা কম। টোল-চাঁদা দিতে হয় না। সব ধরনের কাপড় পাওয়া যায়। আর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো।[৮]

৪.৩.৪ হাটকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান ও কর্মমুখর পরিবেশ

বাবুরহাটকে ঘিরে গোটা নরসিংদী জেলা এবং নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জে গড়ে উঠেছে অসংখ্য তাঁতকল। আবার এই তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে গড়ে উঠেছে কয়েকশ সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাঁতসমৃদ্ধ মাধবদী, চৌয়ালা, ভগীরথপুরসহ এই এলাকার তাঁত মালিক ও শ্রমিকদের ব্যস্ততা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। হাজার হাজার দোকানে স্থানীয় তাঁতকল থেকে উৎপাদিত কাপড় আসছে। এসব কল-কারখানায় কাজ করছেন কয়েক লক্ষ নারী-পুরুষ। এই এলাকায় বেকার কোন মানুষ নেই বললে চলে। কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত আছেন। হাট থেকে কেনা কাপড় দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশাপাশি আবাসিক এলাকার সড়কেও মালবাহী ট্রাকের জট। বাবুরহাটের পাশে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে শত শত কাপড়ের গাঁট। মহাসড়কেই অপেক্ষামাণ ট্রাকে এসব গাঁট তোলা হচ্ছে। ট্রাকে কাপড়ের গাঁট তোলার কাজ করে শত শত কুলি। তাদেরই একজন অমিত কুমার জানায় ট্রাকে কাপড়ের গাঁট তুলে দিনে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা রোজগার হয়। ঈদ এবং দুর্গা পূজার কারণে কাজের চাপ বেশি থাকে। প্রতিদিন এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা রোজগার হয়ে থাকে। হাটে আছে আরো অসংখ্য কায়িক শ্রমিক।

৪.৩.৫ আশানুরূপ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব

এত খ্যাতির গর্ব থাকলেও বাবুরহাটের ভাগ্যে উন্নয়নের শিকে ছেঁড়ে না। বহু সমস্যার আবর্তে এখনও পড়ে আছে। এই হাটে আশানুরূপ অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, অপ্রশস্ত গলি, শৌচাগারের অভাব, স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপরে গাড়ি রেখে মালামাল উঠা-নামার কাজসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন আশানুরূপ হওয়ায় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।[৯] ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এসব দুর্ভোগ লাঘবে দীর্ঘদিনেও সরকারিভাবে নেয়া হয়নি তেমন কোন উদ্যোগ। ব্যবসায়ীরা জানান, গত পাঁচ বছরে ব্যক্তি উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবে বাজারটিতে গড়ে উঠেছে বেশকিছু কয়েকতলা ভবনের বিপণিবিতান, ফলে ঘিঞ্জি পরিবেশ আরো ঘন হয়েছে। বিকল্প সড়কের ব্যবস্থা না থাকায় ভিতরে তীব্র যানজট। মালামাল উঠা-নামা করার নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকায় দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ক্রেতারা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উপরে গাড়ি রেখে মাল উঠা-

নামার কাজ করে। এতে মহাসড়কে সৃষ্টি হয় যানজটের। বড় কাপড়ের হাটের জন্য অগ্নিনির্বাপণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পাইকারি ব্যবসায়ীরা সবসময় অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্কে থাকে। কোনভাবে যদি দুর্ঘটনাবশতঃ আগুন লাগে তাহলে নেভানোর কোন রাস্তা নেই।[১০] কোন পরিকল্পনা ছাড়াই দোকানগুলো গড়ে ওঠায় এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শেখেরচর-বাবুরহাট বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বলেন, সরকার আসে সরকার যায়। কোন সরকারই প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার খ্যাত এই বাজারের উন্নয়নে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।[১১] নরসিংদী জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রাক্তন সভাপতি আলহাজ মনজুর এলাহী বলেন, কয়েকটি ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন হলেও তাঁতবস্ত্র শিল্প এর সাথে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িত তাঁর গুরুত্ব বিবেচনা করে আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি এবং পণ্য বেঁচাকেনার পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়নি।[১২]

৪.৪ ভুলতা গাউছিয়া তাঁতের পাইকারী বাজার

১৯৮৮ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা নামক স্থানে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের উত্তর পাশে এই বাজার গড়ে উঠে। স্থানীয় উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী জনাব মজিবর রহমান ভূইয়া তার নিজস্ব চার একর জমিসহ স্থানীয় কৃষকদের সাথে মিলিয়ে প্রায় দশ একর জমিতে এই বাজারের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে খোলা আকাশের নিচে টিনের ছাউনি দিয়ে বাজার শুরু করা হয় এবং পরবর্তীতে বহুতল বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। শেখেরচর বাবুরহাট এর বাজার রবিবার এবং সোমবার আর ভুলতা গাউছিয়া বাজার সোমবার এবং মঙ্গলবার। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ব্যবসায়ীরা বাবুরহাটে কাপড় কিনতে ব্যর্থ হলে গাউছিয়াতে কেনাকাটা করে নিজস্ব মোকামে ফিরে যান।[১৩] ভুলতা, গাউছিয়া বাজারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ঢাকা মহানগরীর নিকটবর্তী। এছাড়া এই বাজারে পরিবেশ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত মানসম্পন্ন। এই হাটটি তাঁতশিল্প এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪.৫ জামদানী কাপড়ের হাট

জামদানীর হাট মূলত দুই জায়গায় বসে, রাজধানীর অদুরে শীতলক্ষা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে এই হাট বসে।

৪.৫.১ ডেমরা জামদানী হাট (বাওয়ানী জুট মিলস সংলগ্ন মাঠ)

প্রতি শুক্রবার ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত এই হাট বসে। ডেমরা জামদানী হাটে ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ির পাশাপাশি জামদানী কাপড়ের তৈরী One piece, Two piece, Three piece এবং পাঞ্জাবী সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়। এখান থেকে সর্বনিম্ন ২০০০ (দুই হাজার) টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা পর্যন্ত একটি শাড়ী বিক্রি হয়। ঢাকায় এসে অনেক কাপড় ব্যবসায়ী পাইকার

হোটেলে রাত্রি যাপন করেন, ভোরে হাট থেকে নিজেদের পছন্দমত শাড়ী, পাঞ্জাবী, থ্রি পিস সংগ্রহ করে থাকেন। বৃটিশ আমলে শুক্রবার সারারাত জামদানী হাটে শাড়ী বেচাকেনা হতো। বর্তমানে ভোর থেকে হাট শুরু এবং সকাল নয়টার মধ্যেই হাট শেষ হয়ে যায়। এই বাজারের সীমাবদ্ধতা হলো পাইকারদের এখন আর থাকার রেষ্টহাউজ নেই। এই হাটটি শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

৪.৫.২ জামদানী পল্লী নোয়াপাড়া হাট

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব পৌরসভার অধীনে নোয়াপাড়া বিসিক জামদানী পল্লী ছাড়াও পাশ্ববর্তী রূপসী, তারাব, কাজীপাড়া, বেহাকুর, বারগাঁও, সোনারগাঁও উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তাঁতীরা জামদানী কাপড় নিয়ে আসে। এই হাটও একই সময়ে ভোর ৫:৩০-৮:৩০ এর মধ্যে বসে। খুচরা তাঁতীরা হাতে হাতে জামদানী শাড়ী নিয়ে নির্দিষ্ট ছাওনীর নীচে হাক দেয়। পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসে। সাধারণ বাজারে বিক্রির জন্য মাত্র দুই/তিন ঘণ্টার হাট থেকে পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা মালামাল সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

৪.৫.৩ টাংগাইল করটিয়ার কাপড়ের হাট

ঐতিহ্যবাহী এই হাটে প্রতি মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত শাড়ী, থ্রিপিস বেচাকেনা হয়। দেলদুয়ার, কালিহাতি উপজেলা থেকে তাঁতীরা উৎপাদিত পণ্য নিয়ে কাকডাকা ভোরে পাইকারী ক্রেতাদের জন্য পসরা সাজিয়ে রাখে। জনশ্রুতি আছে প্রায় দুইশত বছর আগে করটিয়ার জমিদার সাদত আলী খান পন্নী এই হাট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিহাটে ২০০-৩০০ (দুইশত-তিনশত) কোটি টাকা বেচাকেনা হয়। রোজার ঈদে ও দুর্গা পূজায় বিক্রি আরো বেশী হয়। এই হাটে প্রায় ২০০০০ (বিশ হাজার) দোকান রয়েছে। ঢাকার কাছেই এর অবস্থান, জামদানী ও বেনারশি শাড়ীও এখানে উৎপাদিত হয়ে থাকে। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের পূর্বে এখানকার উৎপাদিত পণ্য কলকাতার বাজারে বিক্রি হতো। এখনও ভারতের ব্যবসায়ীরা এখানকার কাপড় সংগ্রহ করে থাকে।

৪.৫.৪ সিরাজগঞ্জ কাপড়ের হাট

তাঁত সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জ জেলার একটি বড় হাট শাহজাদপুর হাট বসে প্রতি শনিবার, রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর থেকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত চলে। এই হাটে শাড়ি, লুঙ্গি ও থ্রি পিস পাওয়া যায়। এই হাটে প্রতি সপ্তাহে ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা বিক্রি হয়। প্রায় ২৫ কোটি টাকার রং, সুতা ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি হয়। শাহজাদপুর পৌরসভা বাজার ইজারা দিয়ে আয় করে প্রায় কোটি টাকা। চৌহালী উপজেলার এনায়েতপুর প্রতি রবিবার ও বুধবার শাড়ীর হাট এবং প্রতি বৃহস্পতিবার লুঙ্গির হাট বসে। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকার শাড়ি, লুঙ্গি এবং প্রায় ১০ কোটি টাকার সুতা ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি হয়ে থাকে। ২০১৯ সালে সরকার রাজস্ব পায় ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এখানকার অবকাঠামো ভাল নয় বলে

একটু বৃষ্টি হলেই বাজারে পানি জমে।

তাছাড়া দেশের তাঁতসমৃদ্ধ এলাকাগুলোর ঐতিহ্যবাহী হাটগুলো যেমন- কুমারখালী ও কুষ্টিয়া হাটে প্রায় ৫ কোটি টাকা বেচাকেনা হয় প্রতি বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত। পোড়াদহ হাট ও কুষ্টিয়া হাটে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেচাকেনা হয়। শত বছরের ঐতিহ্য নিয়ে চলা এই হাটে সরকারের গত বছরের রাজস্ব ছিল ৪৮ লাখ টাকা। সিরাজগঞ্জের সোহাগপুর হাটে সপ্তাহের প্রায় ১৪ কোটি টাকার বেচাকেনা হয়। এতে করে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি পৌরসভা ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা রাজস্ব পেয়েছে।[১৪]

৪.৬ তাঁতপণ্যের ব্যবসা ও বিপণন

উপনিবেশিক আমলে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমুহের উৎপাদন কেন্দ্র: রবার্ট অর্মির[১৫] মতে, করমেন্ডল উপকূল এবং বাংলা প্রদেশের বড় রাস্তা বা প্রধান শহর থেকে একটু দূরে এমন কোন গ্রাম ছিল না যে, যেখানে প্রতিটি নারী-পুরুষ এবং শিশু বস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল না বস্তুত বাংলা প্রেসিডেন্সির[১৬] সবখানেই বস্ত্র উৎপাদন কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। প্রতিটি জেলা একটি বিশেষ ধরনের কাপড় তৈরির জন্য পরিচিত ছিল।[১৭] বস্ত্র শিল্পে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিটি কারখানার চারপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। উত্তর দিকে দিনাজপুর এবং দক্ষিণে ঢাকা ও নোয়াখালী এবং বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রামের তাঁত কেন্দ্রগুলোতে প্রবেশ করেছিল। যাহোক বিভিন্ন প্রকার সুঁতা বস্ত্র এবং উন্নতমানের মসলিন কাপড় উৎপাদনে ঢাকার অবস্থান ছিল শীর্ষে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ কে, কে দত্ত মন্তব্য করেন,

> Plain Muslins distinguished by various names according to fineness and to the closeness of their texture, as well as flowered, striped and chequed muslins, denominated from this patterns, are fabricated chiefly in the province of Dacca. The manufacture of the finest sorts of thin muslins is almost continued to that province.

তাঁত সমৃদ্ধ এলাকা ঢাকাতে দক্ষ তাঁতীদের বসবাসের কারণ ছিল ঢাকার আশে পাশের এলাকাগুলোতে উন্নতমানের তুলা চাষ হত। সোনারগাঁ, কাপাসিয়া এবং জঙ্গলবাড়ির মাটি উন্নতমানের তুলা চাষের জন্য উপযুক্ত ছিল। তাছাড়া ঢাকার পরিবেশ এবং আবহাওয়া ছিল মসলিন তৈরির উপযুক্ত। মসলিন কাপড়

বুনার উত্তম মৌসুম ছিল আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র এই তিনমাস। (১৩ মে হতে ১৪ আগস্ট) একটি ভাল মানের মসলিন তৈরির জন্য ছয় থেকে ১০ মাস সময় লাগাত।[১৮]

ঢাকা জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই তাঁতের কাজ চলত। তবে প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রগুলো ছিল ঢাকা শহর, সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতাবাদী এবং জঙ্গলবাড়ি-বাজিতপুর। সোনারগাঁও এক সময় সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ও তাঁর পুত্রের (১৩৩৮-১৩৫৩) রাজধানী ছিল আবার মুগল যুগে ঈসা খান এর রাজধানীও ছিল এই সোনারগাঁও।রাজধানী থাকা অবস্থাতেই ইব্ন বতুতা সোনারগাঁও সফর করেন এবং এর সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের প্রশংসা করেন। বিশিষ্ট বৃটিশ সার্জন ও লেখক জেমস টেইলরের সময় সোনারগাঁও-এর মসলিন শিল্প নষ্ট হয়ে গেলেও টেইলর প্রায় ৩০০ পরিবার দেখেছিলেন। ঢাকার বিশ মাইল পশ্চিমে বংশী নদীর তীরে অবস্থিত ধামরাইয়ে অনেক তাঁতী বসবাস করত। টেইলরের মতে, The inhabitants are principally Hindoos and are estimated at 6000 in number. The town furnishes the greater part of the fine thread used in Dacca looms. The number of weavers' houses is estimated at 400.[১৯]

শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত কাপাশিয়ার নিকটবর্তী তিতাবাদী গ্রামটি ছিল তাঁত শিল্পের জন্য বেশ সুপ্রসিদ্ধ। টেইলরের মতে, ১৮৩৩ সালে এই গ্রামে ২০০ পরিবার ছিল যারা তাঁতশিল্পের সাথে জড়িত ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী জঙ্গলবাড়ি ছিল একসময় উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদনের স্থান। টেইলরের মতে, ১৮৩৩ সালে জঙ্গলবাড়িতে তাঁতী পরিবারের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০০টিতে।[২০] তৎকালীন বিশিষ্ট মার্চেন্ট উইলিয়াম বল্টের মতে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে নবাবের কর্মকর্তাদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় ৭০০ তাঁতী পরিবার- বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে চলে যায়।[২১] এই জঙ্গলবাড়ি থেকে ১৫/২০ মাইল দূরে বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ি দীর্ঘদিন ধরে ঈসা খানের পরিবারের আবাসস্থল ছিল। সেখানে উন্নত মানের মসলিন বস্ত্র তৈরি হতো, কারণ ঐ স্থানটি ছিল মসলিন তৈরির উপযোগী তুলা উৎপাদনকারী স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। এতদঞ্চলের তাঁতিরা শাসক ও অভিজাত শ্রেণির আনুকূল্য ও উৎসাহ লাভ করত। পরবর্তীতে তারা আশপাশের এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজ নিজ বাড়িতেই এই শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা মেটায়। তখন থেকে শুরু হয় এ এলাকায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিস্তার। বাংলার সব রকমের হস্তশিল্পের মধ্যে কার্পাসশিল্প ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ইতিহাস অন্ততপক্ষে দু'হাজার বছর প্রাচীন। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে সবচাইতে বিত্তশালী রোমান মহিলাদের কাছে ভারতীয় মসলিন ছিল গভীর অনুরাগের বস্তু। দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকের রোমান লেখক প্লীনি অভিযোগ করেন যে, এমন কোন বছর যায় না যখন ভারত এই সাম্রাজ্য থেকে পাঁচশত পঞ্চাশ মিলিয়ন 'সেস্টারসেজ' (Sesterces) শুষে নেয় না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি

সময়ের হিসাব অনুযায়ী এ অঙ্কের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে ১,৪০০,০০০ পাউন্ড।[২২] প্রায় পুরো ঢাকা কেন্দ্রিক কিছু এলাকায় যেমন- নরসিংদীর বুক চিড়ে যাওয়া মেঘনা এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা হাটুভাঙ্গা, মনিপুরা বাজার, হাসনাবাদ বাজার, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে রূপসী এলাকা এবং ঢাকার মিরপুরে এই শিল্পের বিস্তার সীমাবদ্ধ রয়েছে। বৃহত্তর ঢাকা ছাড়াও অন্য এলাকাগুলোতে যেখানে শাসন কর্তাদের পদচারণা ছিল সেখানেই শিল্প ও বাণিজ্যের নগরী গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের সাথে তাল মিলিয়ে কাঁচামাল ও পণ্যের চাহিদা মেটানোর তাগিদে শুরু হয় যন্ত্র শিল্পের যুগ এবং সেটাও এ এলাকাগুলোতেই। ফলে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের চাহিদা কমতে থাকল। সেই সাথে বাড়তে থাকল যন্ত্র চালিত তাঁতশিল্পের চাহিদা। বর্তমান সময়ে হস্তচালিত তাঁত ও বিবর্তিত স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্র তাঁতের সমন্বয়ে মাধ্যমে তাঁতশিল্প বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে।[২৩]

ঢাকা কারখানায় প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে ১৭৯২ এবং ১৮০৬ সালের মধ্যকার ঢাকার আড়ংসমূহের উপর একটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ঢাকা এবং এর ব্যবসা বাণিজ্যের উত্থান ও বিকাশের সাথে বস্ত্র শিল্পের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের সন্ধানে বাংলার দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই ঢাকায় বস্ত্র শিল্পের উপস্থিতি ছিল। ঢাকাতে এ শিল্প গড়ে উঠার পেছনে যেসব কারণ ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং জলপথে যোগাযোগের পর্যাপ্ত সুবিধা। বস্তুত এ দুটোই ছিল ঢাকার অর্থনীতির দুটি মূল বৈশিষ্ট্য। তুলা উৎপাদন অঞ্চলসমূহের সান্নিধ্যতা স্থানীয়ভাবে কার্পাস এবং সুতার ব্যবসা গড়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিল। এসব সুতা বিভিন্ন তাঁত কেন্দ্রে সরবরাহ করা হতো। স্থানীয় তুলার মাধ্যমে সুতার ব্যাপক চাহিদা পূরণ সম্ভব না হলে তাঁতীরা স্থানীয় হাট-বাজার হতে তাদের প্রয়োজন মতো তুলা (রুই) ক্রয় করত এবং রুই তুলা হতে সুতা তৈরি করত। ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মেঘনা নদীর মিলিত প্রবাহ এমন একটি সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যার ফলে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোতে তাঁতশিল্পের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটেছিল। এই তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁতী এবং সুতা তৈরির কারিগর, ধোপা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ নিয়মিত কাজকর্ম করার সুবিধা পেতো। এসব তাঁতকেন্দ্রের মধ্যে কতগুলোতে দূরবর্তী বাজারে বিক্রির জন্য উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র উৎপন্ন হতো। তাঁতকেন্দ্রগুলো এক সময় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের আওতাধীনে চলে আসে।[২৪]

বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম আটটি আড়ং এলাকায় বিস্তার লাভ করেছিল। এ আড়ংসমূহ ঢাকা শহর, সোনারগাঁও, ধামরাই, চাঁদপুর, নারায়ণপুর, তিতাবাদী, শ্রীরামপুর এবং জঙ্গলবাড়ি বাজিতপুর এলাকায় অবস্থিত ছিল। ব্যবসার দ্রুত প্রসারের ফলে জেলাগুলোতে কোম্পানির

প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সোনারগাঁও, ঢাকা এবং জঙ্গলবাড়ি-বাজিতপুর এলাকা উৎকৃষ্টমানের মলমল কাপড় উৎপাদনের জন্য বেশ সুপরিচিত ছিল। অন্যদিকে শ্রীরামপুর, চাঁদপুর এবং নারায়ণপুরে মোটা বস্ত্র উৎপাদন হতো। এজন্যই এসব এলাকা কোম্পানির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। চাহিদা বাড়তে থাকায় আড়ং এর চারপাশের গ্রামগুলোতে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। রপ্তানি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে নিয়মিত বাজার গড়ে উঠে। প্রতিটি আড়ংকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে কোম্পানির বস্ত্র সংগ্রহ কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছিল। কোম্পানির ঢাকাস্থ কারখানা ছিল উৎপাদন কার্যাদেশ, পণ্য সংগ্রহ, পণ্য বাছাই এবং পন্য সংরক্ষণের প্রধান কেন্দ্র। ঢাকা হতে উৎপাদিত ও সংগৃহীত পণ্য পরে কলকাতায় পাঠানো হতো। বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার অবস্থান জলপথে কলকাতার সাথেযোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করে দিয়েছিল। ঢাকা শহরের বিস্তৃতি ও অবস্থান থেকে এটা সহজেই বুঝা যায় যে, ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কারণেই শহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারী দল তাদের বসতি ও আস্তানা গড়ে তুলেছিল।[২৫]

প্রতিটি বণিক সম্প্রদায় এক একটি আলাদা এলাকায় তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। ওলন্দাজ এবং ফরাসিদের কারখানা ছিল ইংরেজদের কাছাকাছি। ঢাকার ফরাশগঞ্জে ছিল ফরাসিদের কারখানা; ওলন্দাজদের কারখানা ছিল বুড়িগঙ্গার তীরে। আর্মেনিয়ান, গ্রীক এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আলাদা আলাদা এলাকায় বাস করতো। বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায় আলাদা এলাকায় বসবাস করত। বর্তমান তাতী বাজার ছিল 'বড়-বাগী' তাতীদের বসতি স্থান। রাফুগড় এবং কুট্টিরা আলাদা আলাদা পার্শ্ববর্তী এলাকাতে বসবাস করত। কারখানার কাপড় ধোয়ার মাঠ তেজগাঁও ও নারিন্দার খোলামেলা এলাকায় অবস্থিত ছিল।

বাংলাদেশের যে বিপুল পরিমাণ তাঁতপণ্য দেশি বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি হতো, সেটা এখানকার তাঁতিরা উৎপাদন করত। দেশি বিদেশি বণিকেরা সরাসরি তাদের কাছ থেকে এসব তাঁতবস্ত্র সংগ্রহ করত সে সময় ব্যবসার ধরন ও বিপণন ব্যবস্থাটা আলোচনা করা যাক। প্রফেসর এম, মোফাখখারুল ইসলাম তার গ্রন্থে মন্তব্য করেন,

> It is well-known that under British rule Bengal, more or less like other parts of India, remained backward in the field of modern industrial development. However, to the extent that some progress was achieved, the process had its origin early in the nineteenth century and, by coincidence, the first step was taken in the cotton textile sector, an area in which traditional production was experiencing a marked decline. The first steam-powered mill (Bwreah Cotton Mills) was set up at Howrah in

1818. This was followed by another one in 1830. However, none of these amounted to very much, nor did they trigger off progress. For while by 1890. Bombay had 70 cotton mills, Bengal had only 10, turning out woven goods to the extent of 7.02 million yards and employing 11,277 persons in 1904-05. Progress in the field of silk mills was more impressive, the number being 81 in 1892. These mills were exporting silk products to England, France and several other countries.[২৬]

আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মসলিন বিক্রয় ও বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় হাট বা আড়ং তৈরি হয়েছিল। এসব আড়ং তাঁতবস্ত্র বিক্রয় ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এগুলো প্রধানত মসলিন উৎপাদন কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। যেমন ঢাকা আড়ং, সোনারগাঁ আড়ং, বাজিতপুর আড়ং, জঙ্গলবাড়ি আড়ং ইত্যাদি। এসব আড়ঙে বিপুল পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হত। টেইলরের প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এসব আড়ং এ উৎপাদিত কাপড়েরমূল্য ছিল নিম্নরূপ:

আড়ঙের নাম	উৎপাদিত কাপড়ের মূল্য (আর্কট টাকা)
ঢাকা	৪৫০০০০
সোনারগাঁ	৩৫০০০০
নারায়ণপুর	২০০০০০
জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর	৪৫০০০০
চাঁদপুর	৫০০০০
শ্রীরামপুর	৫০০০০
ধামরাই	২৫০০০০
তিতাবাদি	২৫০০০০
মোট	১৯৫০০০০
দেশি লোকদের ব্যবহৃত কম দামি কাপড়	৪৫০০০০
হিসাবে হয়তো কমধরা হয়েছে	২০০০০০
সর্বমোট	২৬০০০০০

উৎস: আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৮৮।

এই হিসাব অনুযায়ী ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলের আড়ংগুলো বছরে ২৬-২৭ লক্ষ টাকারসুতিবস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম ছিল। এসব আড়ং থেকে দিল্লির বাদশাহের জন্য, বাংলার নবাব ও সুবেদারদের জন্য এবং অন্যান্য দেশি বিদেশি বণিকদের জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো। বাদশাহের জন্য যে কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো, তাঁর উপাধি ছিল দারোগা-ই-মলবুস খাস ও তাঁতখানা। তাদের অধীনে একজন সহকারী বা ডেপুটিও থাকত। এসব দারোগার তত্ত্বাবধানে প্রতিটি আড়ঙে একেকটি করে মলবুস খাস কুঠি বা তাঁতখানা পরিচালিত হত এবং সম্রাটের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহ ও উৎপাদন নিশ্চিত করা হত। তবে এর বাইরেও অসংখ্য তাঁতি ছিল। তাদের উৎপাদিত তাঁতপণ্যের বিপণন পদ্ধতি

ছিল ভিন্ন ও স্বাধীন।

দেশি-বিদেশি বণিকেরা তাঁতপণ্য, মোটা ও চিকন মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করত বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে। ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্রে মসলিন সংগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, কোম্পানির কাছ থেকে দালালরা টাকা নিয়ে সেটা দিত পাইকারদের। পাইকাররা টাকা নিয়ে আড়ঙে ঘুরে ঘুরে তাঁতিদের টাকা দিত। যথাসময়ে কাপড় উৎপাদন হলে তাঁতি কাপড় বুঝিয়ে দিত পাইকারকে, পাইকার দালাল কে এবং দালাল পৌঁছে দিত কোম্পানিকে। চারমাসের মধ্যে কাপড় দেয়ার কথা থাকলেও দালালরা সাধারণত ছয় মাসের মধ্যে কাপড় সরবরাহ করত। কখনো কখনো দালালরা সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় সগ্রহ করত। কখনো আবার দাদন (Advance) ছাড়াও, বাজারে বা আড়ং-এ নগদ অর্থমূল্যেও বস্ত্র বেচাকেনা হতো। এটাকে বলত 'খোশ খরিদ'। বলাই বাহুল্য, দালাল ও পাইকাররা তাদের কাজের বিনিময়ে কোম্পানির কাছ থেকে কমিশন পেত। তারা তাঁতিদের কাছ থেকেও কমিশন আদায় করত। অগ্রিম দিয়ে নিয়ে যে ব্যবসা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, সেটা পত্তন নামে পরিচিত হয়েছিল এবং দালালদের বলা হতো পত্তনী দালাল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে- মুঘল ও বৃটিশ আমলে তাঁতপণ্য বিক্রয় ও বিপণনে পাইকার ও দালালদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্রে বেশ কিছু দালাল ও পাইকারের নাম পাওয়া যায়, যারা কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল বস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ দালাল ও পাইকারদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১) রাম নারায়ণ দালাল
২) নিতু দালাল
৩) সোনাময়ী দালাল
৪) মুক্তাগোলাব পাইকার
৫) হাফিজুল্লাহ পাইকার
৬) বিষ্ণুদাস সামু পাইকার
৭) জয়কৃষ্ণ পাইকার
৮) কমুলনুনদেজাম

এই সংখ্যা আরো বেড়েছে বলে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের তালিকায় দেখা গিয়েছে। তখন দালাল ও পাইকারদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২২ জন।

[২৭] এই পাইকারদের নামের তালিকা অনুশীলন করে আবদুল করিম মন্তব্য করেছেন, ... তাদের মধ্যেবাঙালি ও অবাঙালি উভয় প্রকারের লোক ছিল।[২৮] তবে বাঙালি হোক বা অবাঙালি-এই সব দালাল ও পাইকার তাঁতপণ্যের বিপণনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারা ছিল মূলত কোম্পানি বা

বড় ব্যবসায়ী ও তাঁতিদের মধ্যে সংযোগ সেতুস্বরূপ। তাদের ব্যবসায় মূলধন কিছু লাগত না। কেননা, টাকায় চৌদ্দ আনা হিসাবে তারা অগ্রিম দিত। আর দালালদের আয় উপার্জনও বিশেষ খারাপ ছিল না। আবদুল করিম দেখিয়েছেন যে, দালালদের ভেতরের কারো কারো বাৎসরিক আয় ছিল চারশ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ মাসিক আয় ছিল আনুমানিক চল্লিশ টাকা। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সেটা পর্যাপ্ত না হলেও সন্তোষজনক ছিল বলে মন্তব্য করেছেন আবদুল করিম। আর যাদের বার্ষিক উপার্জন ছিল চার কিংবা আট হাজার টাকা, তারা রীতিমতো ধনিক শ্রেণিভুক্ত ছিল।[২৯]

৪.৭ তাঁতবস্ত্র বাণিজ্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিক

তাঁতবস্ত্র বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তৎকালীন ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন নীতি ও কৌশল অবলম্বন করতেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলোঃ

৪.৭.১ গোমস্তানীতি

কোম্পানি দালাল ও পাইকারদের মারফত কাপড় সংগ্রহ না করে কোম্পানির নিযুক্ত কর্মচারী বা গোমস্তা মারফত কাপড় সংগ্রহ করা শুরু করেছিল। এটাকে গোমস্তানীতি বলা হতো।৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে গোমস্তানীতি চালু হওয়ার পরও অত্যাচার না কমে বরং বেড়েছিল। সে কারণে ১৭৬৫ পর্যন্ত পত্তনি ও গোমস্তা- দুই পদ্ধতিতেই কাপড় সংগ্রহ করা হয়। ইংরেজ কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর গোমস্তানীতি পুরোপুরি চালু করে এবং এর ফলে তাঁতিদের ওপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। এসব গোমস্তা নিজেদের ইচ্ছেমতো কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করত এবং তাঁতিরা কম মূল্যে কাপড় বিক্রি করতে রাজি না হলে অকথ্য অত্যাচার করত। ইংরেজ কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রিচার্ড বারওয়েল ঢাকার বস্ত্রশিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ হিসেবে দালাল, পাইকার ও গোমস্তাদের অত্যাচারকে দায়ী করেছেন।[৩০]

৪.৭.২ সমবায় উদ্যোগে আইন করে সুরক্ষা দেবার চেষ্টা

তাঁতীদের উপর অত্যাচার কমানোর জন্য ১৭৮৭ সালে একটি আইন পাস করা হয় এবং কোম্পানির ব্যবসা দেখাশোনা করতে প্রতিটি বাণিজ্য কুঠির জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। তার নাম দেয়া পদবী ছিল 'কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট'। নতুন আইনে বলা হয়, কোনো তাঁতি কোনো গোমস্তার কাছে কাপড় বিক্রি করতে অসম্মত হলে গোমস্তা জোর করে কাপড় কিনতে পারবে না। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক গোমস্তা তাঁতিকে এই আইন পড়ে শোনাবে। জন টেইলর বলেন যে, ঢাকা আড়ঙে এমন অবস্থা করা হয়েছিল যে প্রত্যেক তাঁতির কাছে একখন্ড হিসাবের কাগজ থাকত। একে 'হাতচিঠি' বলা হতো। নিয়ম হয়েছিল, তাঁতি ও গোমস্তার চুক্তি হাতচিঠিতে লেখা থাকবে এবং অগ্রিম টাকা নিলে তাও লেখা থাকবে। বছর শেষে হাতচিঠির সাহায্যে সালতামামি হিসাব করা হতো এবং তাঁতি ও গোমস্তার মধ্যে চূড়ান্ত হিসাব করা হতো।

ফলে এই নিয়মের পরে তাঁতিকে ঠকানোর পথ বন্ধ হলো। আবদুল করিম এই হাতচিঠি সম্পর্কে লিখেছেন, 'এটা ইংরেজ কোম্পানির প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু হাতচিঠি নিরক্ষর তাঁতিদের কতটুকু নিরাপত্তা বিধান করতে পেরেছিল ঠিক করে বলার উপায় নাই। প্রকৃত অবস্থা যাই হোকনা কেন এ আইনের ফলে পূর্বের অবাধ অত্যাচার যে রোধ হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে এ সুযোগ তাঁতিরা বেশি দিন ভোগ করতে পারেনি, কারণ আইন যখন পাশ হয়, তখন মসলিন শিল্পের অবনতির প্রথম ধাপ শুরু হয়ে গেছে।[৩১]

৪.৭.৩ ব্যবসা বাণিজ্যে উদ্যম

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্র ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপক উদ্যম লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে যখন উৎপাদন কার্যাদেশ এবং অগ্রিম অর্থ প্রদান করার সময় পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হতো। ঢাকা ও মালদহের মতো বস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে বাজার ও শহর গড়ে উঠেছিল। আর্মেনীয় এবং ইউরোপীয় কোম্পানির ব্যবসায়ীরা এসব জায়গায় তাদের কারখানা গড়ে তুলেছিল। এসব শহরের অধিকাংশই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ফলে নদী পথে সহজে ভারতের বিভিন্ন বাজারে পণ্য পাঠানো সহজ ছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে রপ্তানি করাও সহজ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দিতে বাজার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মালদহ এবং উত্তরবঙ্গের সাথে উত্তর ভারত, কাবুল এবং ইস্পাহানের গভীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

৪.৭.৪ মেলা উৎসবের আয়োজন

বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত মেলা ও উৎসবের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি হতো। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে কোন মেলা মাসব্যাপী স্থায়ী হতো। বহুলোক এসব মেলায় আসত। উল্লেখ্য এসব মেলায় বস্ত্রপণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্য বিক্রি হলেও বস্ত্রপণ্য ছিল মূল আর্কষণীয় জিনিস। প্রতিবছর ৭ থেকে ১৭ এপ্রিল দিনাজপুরের বোয়ালিপুরে মেলা বসত। এসব মেলায়, ভুটান, পুর্নিয়া, নেপাল, পাবনা, মুর্শিদাবাদ এবং রংপুর হতে লোকজন আসত। যেসব ভারতীয় বণিক বিশেষ করে গুজরাটি এবং চেটিয় গোষ্ঠী সমুদ্র পথে এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার সাথে বাণিজ্য করত তারা হুগলি, ঢাকা, বালাশুর হতে তাদের বস্ত্র রপ্তানি পণ্য ক্রয় করত।[৩২]

৪.৭.৫ বাণিজ্যিক অব্যবস্থাপনা ও শোষণ

প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহের ফলে ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের প্রতিযোগিতা পূর্ণ রপ্তানি বাণিজ্যে এবং উৎপাদনকারীদের মধ্যে সম্ভাব্য স্থিতাবস্থা বিরাজ করছিল। এই স্থিতাবস্থা তাঁতীদেরকে পণ্য উৎপাদনে স্বাধীনতা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে উদার সুযোগ দান করেছিল। এই অবস্থা তাঁতীদের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে না আনলেও প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী দালালদের মাধ্যমে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা তাদেরকে

পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন বিকল্প রাস্তা প্রদান করেছিল।

প্রচলিত বাজার পদ্ধতি কোম্পানির পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের ধারণা ছিল যে, প্রচলিত এজেন্টগুলো কোম্পানির স্বার্থের বিরুদ্ধে পণ্যের দামও বিক্রয়ে সূক্ষ্ম কারচুপি করতে সক্ষম ছিল। তাদের মতে, এসব এজেন্টদের উপর নির্ভরশীলতাই কোম্পানিকে তাঁতীদের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এজন্য দরকার ছিল উৎপাদনকারীদের সাথে সরাসরি সম্পর্কের উন্নয়ন। এটা সম্ভব ছিল যারা তাঁতীদের সাথে ব্যবসা করে এবং তাদেরকে ঋণ দেয় সেসব মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা- প্রয়োজনে তাদেরকে ব্যবসা হতে অপসারিত করার মাধ্যমে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোম্পানি কতটা সফল হয়েছিল সেটা নির্ভর করছিল বিভিন্ন সময়ে কোম্পানি কর্তৃক গ্রহীত বিভিন্ন বাণিজ্যিক কৌশল এবং সেগুলো বাস্তবায়নের উপর।[৩৩]

সমগ্র আঠার শতক বাংলার সুতি পণ্য ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্নদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ১৭৭৬ সালের পর আমেরিকা এবং আফ্রিকা বস্ত্র পণ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের গ্রন্থ থেকে,

> America could continue its status as the second most important export partner, just next ot Britain down to 1870 among all western nations.[৩৪]

এসব বাণিজ্য যেসব মাধ্যমে পরিচালিত হতো সেগুলি ছিল ইউরোপীয়ান কোম্পানি (ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ) ইংলিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি; এবং গোপন বাণিজ্য (বিদেশি জাহাজের মাধ্যমে ইংরেজ ব্যবসা); প্রাইভেট ব্যবসা (ইংরেজ কোম্পানির সেনাপতি ও কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা); এবং বিশেষাধিকার ব্যবসা (ইংরেজ জাহাজের বৃটিশ বণিক)। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যে লন্ডন এবং আমস্টারডামে চা এর পরেই ছিল বাংলার বস্ত্র পণ্যের স্থান।[৩৫]

৪.৮ বস্ত্র বাণিজ্যে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব

১৭৫১ থেকে ১৭৫৫ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বছরে গড়ে ৩,৯০,৮১৪টি বস্ত্র ক্রয় করেছিল। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল গড়ে ৩৭৭,৩০২টি। এসব বস্ত্রের গড় মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪০১,৮৮৬ পাউন্ড এবং ২৫২,৯৮৭ পাউন্ড। ১৭৫৭ সালে হঠাৎ করে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ কমে এসে দাঁড়ায় ৬০,৯৯৮ পাউন্ডে। সম্ভবত বাংলার নবাবের সাথে ইংরেজ কোম্পানির যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে এরূপ হয়েছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হতে অবশ্য কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৬৬-৭০ সালে কোম্পানি বছরে গড়ে ৪৫৪,৭০০ পাউন্ড মূল্যের বস্ত্র পণ্য ক্রয় করে। দুর্ভিক্ষের সময় এই পরিমাণ বেশি একটা কমেনি। ১৭৭১ থেকে ১৭৮০ এই সময়ের মধ্যে কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ বছরে অর্ধমিলিয়ন

পাউন্ডে পৌঁছেছিল। ১৭৮৭ এবং ১৭৮৮ সালে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ উত্থান ঘটে। ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ সালের মধ্যে বছরে ক্রয়কৃত বস্ত্রপণ্যের মূল্য দাঁড়ায় ৮০২,৭২৩ পাউন্ডে।[৩৬]

দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত বস্ত্র শিল্প রপ্তানি বাণিজ্য আন্তঃসম্পর্কীয় বাজার কাঠামো সৃষ্টি করেছিল। রপ্তানিযোগ্য বস্ত্র পণ্য গ্রামের বাজার হতে মধ্যবর্তী শ্রেণির ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বাজারগুলোতে চলে যেতো। অধিকাংশ পণ্যই বিভিন্ন কোম্পানির নামে পাঠানো হতো। যেসব এলাকায় বহুসংখ্যক তাঁতী বসবাস করত, সেসব এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পণ্য সংগ্রহের জন্য গ্রামীণ বাজার বা আড়ং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাদন পদ্ধতিতে কাজ করানোর জন্য দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে তাঁতীদের সাথে যোগাযোগ করা হতো।[৩৭] এসব ব্যবস্থার ফলে পণ্য উৎপাদনের একটি নিয়মিত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

৪.৯ প্রাইভেট বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম

পণ্যের যথোপযুক্ত মূল্য এবং কাজের উপর পরিবেশ তাঁতীদেরকে অন্যান্য কোম্পানির জন্য কাজ করতে আগ্রহী করে তুলেছিল। কিন্তু যে বিষয়টি মূলতঃ বাংলার ইউরোপীয় বাণিজ্য টিকিয়ে রেখেছিল তা ছিল উল্লেখ সংখ্যক বৃটিশ ব্যবসায়ী যারা নিজ দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের উদ্দেশ্য বস্ত্র ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। অধিকন্তু কোম্পানির কর্মচারীরাও বহুল পরিমাণ পণ্য নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে সংগ্রহ করতো। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়েই চলছিল। ১৭৬০ এর দশকে বাংলায় প্রায় ৭০জন স্বাধীন ব্যবসায়ী ছিল বলে ধরে নেয়া হয়।[৩৮] ১৭৭৬ সালে দিনেমাররা পণ্য ক্রয়ের বিষয়ে তাদের সরকারের উপর একচেটিয়া অধিকার হারানোর পর তারা ইংরেজ বণিক জনক্রির (Jhon Cree) মতো দেশীয় ব্যবসায়ী বা দুর্গাচরন মিত্র এবং হাজী কার্বোলিন এর মতো ভারতীয় এবং আর্মেনীয় দালালদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।[৩৯]

১৭৮৬ সালে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড এক বাণিজ্য সম্মেলনে তাদের মধ্যকার বাণিজ্যিক বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করেছিল। এ সম্মেলনে ফরাসি নাগরিকদের ব্যবসা করার নিশ্চয়তা এবং স্থানীয় কর হতে মওকুফের কথা থাকলেও গ্রাম পর্যায়ে তাদের পণ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনে কোম্পানি কর্মকর্তাদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। একইভাবে আড়ংগুলোতে ইংরেজ আবাসিক প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৭৬৮ সালে চীনাবাদাম, লবণ এবং তামাক এই কয়টি পণ্যের উপর অভ্যন্তরিন বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা নিজ দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর প্রয়োজনে বস্ত্র ব্যবসার দিকে মনোযোগ দেয়। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। তারা গোপন ব্যবসার জন্য তাঁতীদেরকে মোটা ও মধ্যম মানের কাপড় উৎপাদনে নানাভাবে উৎসাহিত করে। ১৭৮০ এর দশকে প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। চট্টগ্রাম, মালদা এবং ঢাকার আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরাও এর বিরুদ্ধে

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আসছিল। প্রাইভেট ব্যবসায়ী, তাদের প্রতিনিধি এবং তাঁতীদের প্রতি কোম্পানির কোন কোন আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির স্বৈরাচারী আচরণ ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ সমর্থন করেনি। ১৭৭৬ সালে জন-ক্রি কোম্পানির আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধি নিকোলাস গ্রোয়েভার এবং তিতাবাদীতে কোম্পানির গোমস্তার বিরুদ্ধে অন্যায় কাজের অভিযোগ করে। বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ গ্রোয়েভারের কাজের নিন্দা করে এবং তার গোমস্তাকে প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ না করার জন্য উপদেশ দেয়। আবাসিক প্রতিনিধি ও প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের এরূপ দ্বন্দ্ব খোলাবাজারে লেনদেন থেকে তাঁতীদের বিরত রাখত।[৪০]

তাঁতীদের উপর নির্যাতনের একটু উদাহরণ যেমন-বাঞ্ছারাম মন্ডল এবং তার পুত্র দুজনেই তাঁতী ছিলেন। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের জন্য কাপড় উৎপাদন করার অপরাধে তাদেরকে কোম্পানির কুঠিতে নিয়ে চাবুক মারা হয়। তাদের মুখে সাদা-কালো রং মেখে সারা আড়ং এলাকা হাটানো হয় যাতে করে কেউ প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ করার দুঃসাহস না দেখায়। ভবানী শংকর দাবি করেছিলেন যে, ঐ ঘটনার পর বহু তাঁতী কাজ ছেড়ে পালিয়েছিল। জালালপুর দেওয়ানী আদালতে সোনারগাঁয়ের তাঁতী নিমদাস একই ধরনের বক্তব্য প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায়। তিনি স্বাক্ষ্য দিয়েছিলেন নিম্নরূপ,

> I received advances from Mr. Gardinar's gomastah on the 4th Magh (15/16 January). I put the wrap of a piece of cloth into the loom and was weaving it. The company's gomastah of Sonargaon Arong sent people, who came to my house, took away my loom, tied it and carried it to the Factory. I received Mr Gardina'rs advancess before the Company's for this year. At the time I had taken Mr. Gardinar's advances the gomastah had not mentioned anything about the Company's orders for the present year. I have received 12 annas advance on account of last year and have completed my deliberies. I afterwards received 4 annas more. I have liwise delivered the Kistbundee of these 4 annas in the month of Pous.[৪১]

প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা যেসব শর্তে কাপড় উৎপাদনের জন্য কার্যাদেশ গ্রহণ করতো, তাঁতীদের জন্য সেসব আদেশ পালন করা সহজ ছিল। প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণও ততটা কঠিন ছিলনা। তথাপি মাঝে মাঝে প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা তাঁতীদের মারধর করত, কুঠিতে আটকিয়ে রেখে কাজের জন্য বাধ্য করত এমন অভিযোগ পাওয়া যায়। জন-বেবের অভিযোগ হতে জানা যায় যে, ঢাকার একজন প্রাইভেট ব্যবসায়ী একজন তাঁতীকে তার উৎপাদন কার্যাদেশ সম্পন্ন না করার অজুহাতে পিটিয়ে মেরেছিল।[৪২]

৪.১০ বাংলায় বস্ত্র ব্যবসায়ে চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ হতে দেশের প্রতিরক্ষা, আফগান জেনারেলদের দমন এবং ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যুদ্ধের ফলে বাংলার রাজস্বের উপর মারাত্মক চাপ পড়ে। ১৭৩৮ হতে ১৭৬২ সাল সময়ের মধ্যে নবাবের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৬৩,৬১০ পাউন্ড হতে ১,৭১৬,৬৪০ পাউন্ডে দাঁড়ায়।[৪৩] এসব অর্থের অধিকাংশই হয় মারাঠারা নিয়ে যায় বা কোম্পানির সাথে যুদ্ধের ফলে নি:শেষ হয়ে গেছে। যেসব অর্থ ব্যবসায়ীরা পুঁজির যোগান দিত যুদ্ধের ফলে সেসব ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও সীমিত হয়ে পড়ে।[৪৪]

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ ও চলাচলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার ক্ষতিকর প্রভাব বাংলায়ও এসেছিল। বাংলায় যেখানে প্রতি বছরে ৭,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য আমদানি হতো সেখানে ১৭৬৬ থেকে ১৭৬৯ পর্যন্ত এই তিন বছরে ফরাসি, ওলন্দাজ এবং দিনেমাররা মাত্র ৫,৫০,০০০ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য আমদানি করেছিল।[৪৫] পাশাপাশি আঠারো শতকের শেষ ভাগে রপ্তানির ক্ষেত্রে পুনরুত্থান হয়েছিল তা সিরাজুল ইসলাম রচিত American Trade in Bengal গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

> The dictates of remittance trade and the pressure of private trade interests led to the liberalisation of the monopoly right of the East India Company under the Charter Act of 1793 and ultimate end of the monopoly under the Charter Act of 1813. Participation of foreign nations in the foreign trade of Bengal was also encouraged. Consequently export trade began to increase phenomenally from 1793. From 1795/6 began the system of keeping detailed records of foreign trade traffic. Formerly, our only recorded source on external commerce is the cargo accounts of the East India Company and 'privileged' trade of captains and shipmates. Another source is a journal of the licensed private traders, which give notional information about export and import through private channel. According to a report of this journal, Bengal textile industry was declining fast in the wake of the foundation of the colonial state, and it was due to the government policy of stifling the market forces.[৪৬]

১৭৫৭ সালের পূর্বে কোর্ট অব ডাইরেক্টর বছরে গড়ে প্রায় ৩৩,০০,০০০ রুপী মূল্যের সিলভার আমদানি করত। এখন তারা শুধু স্বর্ণ রৌপ্য আমদানির পরিমাণ কমিয়ে দেয়নি বরং বাংলায় বিদ্যমান মজুদ চীনে পাঠানোর নির্দেশনা দিচ্ছে। মুদ্রা চলাচলের বিভিন্নমুখী গতি পরিবর্তনের ফলে কোম্পানি উপলব্ধি করল

যে, তাদের বহুমুখী ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান অভ্যন্তরীণভাবেই দিতে হবে। কোম্পানির সামরিক সফলতার ফলে অবশ্য এটা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। ১৭৫৭ সালে কোম্পানি বিশাল অংকের অর্থ মীর জাফরের নিকট হতে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আদায় করে নিয়েছিল। ১৭৬০ সালে মীর জাফরের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সময় কোম্পানির সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে মীর কাশিম বর্ধমান, মদনপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব স্থায়ীভাবে কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেয়। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির অর্থের সরবরাহ পর্যাপ্ত হয়ে উঠে এবং কোম্পানি তার রাজস্ব আয় থেকে ব্যবসা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুরু করে।

১৭৬৬-৬৮ সালে চীনা বাণিজ্যের জন্য প্রায় ৮,০০,০০০ পাউন্ড খরচ করা হয়। কোম্পানির বিনিয়োগের পরিমাণও ১৭৬৮ সালে ৬৩ লাখ রুপী থেকে ১৭৭৮ সালে ১০০ লাখে এবং ১৭৮৫ সালে ১১৮ লাখ রুপীতে পৌঁছে।[৪৭] অর্থনৈতিক দায়িত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে কোম্পানির সম্পদের উপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৬৮-৯ সালে দুর্ভিক্ষের ঠিক আগে ১৭৬৫ সালের পর কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৩,৮,৩৬২ হতে ২,০৭৭,৬৮১ পাউন্ডে উন্নীত হয়। ১৭৮০-৮১ সালে দেওয়ানী এবং পরিত্যক্ত জেলাগুলো হতে কোম্পানির মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ চিল ২,৭৬৪,৭৮৬ পাউন্ড। এসব তহবিল হাতে অর্থ আসার ফলে কোম্পানির অর্থনৈতিক সংকট বেশ অনেকটা দূরীভূত হলেও কোম্পানির বস্ত্র ব্যবসায় কোন অগ্রগতি হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোর্ট অব ডিরেক্টর বিনিয়োগ লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব অব্যাহত রাখে এবং বাংলা হতে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর জন্য বস্ত্র ব্যবসাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এভাবে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য রাজস্ব তহবিলের অর্থের ব্যবহার একমুখী ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

১৭৭৫ সালে দিনাজপুর, বর্ধমান এবং ঢাকার রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তারা বোর্ড অব ট্রেডের নিকট পুরো অর্থ পাঠাতে অক্ষমতা প্রকাশ করে কারণ তাদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ মুদ্রা ছিলনা। ফলে অর্থ ঋণ নেয়া কোম্পানির জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। দেশি ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ঋণ নিয়ে কোম্পানি পুঁজির অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। জগৎ শেঠের মতো ব্যাংকাররা স্থানীয়ভাবে ঋণের মাধ্যমে পুঁজির যোগান দিত কিন্তু তাদের সুদের হার ছিল অনেক বেশি। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও বিভিন্নভাবে তাদের পুঁজি খাটাতে শুরু করেছিল; কারণ তাদের নিজেদের পক্ষে এখন আর ব্যবসা করা সম্ভব ছিলনা। তারা এখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি, স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ী বা কোম্পানির কর্মকর্তাদের অর্থের যোগান দিত। ১৭৮০ সালে ৮% হারে সুদে ঋণ প্রদান করা হতো। এছাড়াও বস্ত্র ব্যবসার জন্য বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের প্রচলন শুরু হয়েছিল।[৪৮] কোম্পানির এসব তৎপরতার মাধ্যমে আড়ংসমূহের পুঁজি সরবরাহে কিছুটা গতি আসলেও বস্ত্র ব্যবসায় বিনিয়োগ খরচ বেড়ে গিয়েছিল। কারণ কোম্পানিকে ঋণের উপর সুদ প্রদান করতে হতো।

৪.১১ মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ

আড়ংগুলোতে পুঁজির সীমিত প্রবাহের কারণে উৎপাদন এবং পণ্য মূল্যের উপর নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছিল। কেন্দ্র বা জেলা হতে আড়ং এবং গ্রামসমূহে অর্থ প্রেরণের জন্য একটি জটিল মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। আর এ জটিল অবস্থার চাপ পোহাতে হয়েছিল উৎপাদনকারীদের। আড়ং এবং তাঁতীদের নিকট অর্থ-প্রেরণের জন্য কোম্পানিকে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হতো।

যারা গ্রাম পর্যায়ে অগ্রিম ঋণ প্রদান করত তাদের পোদ্দার বা মুদ্রা বিনিময়কারী বলা হতো। যারা অর্থ ধার দিতো তাদের সাদু বলা হতো। তারা বাজারে ঋণ বিতরণ ও মুদ্রা বিনিময় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করত। সকল বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেনে এরা অনেক বেশি মুনাফা আদায় করত। হাটে-বাজারে তাঁতীদেরকে লেনদেনের সময় নির্দিষ্ট পোদ্দারের নিকট হতে সিলভার মুদ্রার পরিবর্তে 'কাউরি' গ্রহণ করতে হতো। এখানেও তাঁতীদের নিকট হতে অনেক কমিশন আদায় করা হতো। যদিও সকল বাজারে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁতীদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, তথাপি যে বাজারেই যাক না কেন তাদেরকে পোদ্দারদের জুলুমের শিকার হতে হতো। এসব লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন সাধারণ প্রচলিত বাণিজ্যিক লেনদেনের নিয়ম মানা হতো না, পোদ্দার ও তাদের লোকজন অনেক সময় তাঁতীদের মারপিট করত।[৪৯]

১৭৭৫-৭৬ সময়কালে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহৃত মুদ্রা

আড়ং	সুতি বস্ত্রে বিনিয়োগের জন্য	রাজস্বের জন্য	অন্যান্য ব্যবহৃত মুদ্রা
কলকাতা	আরকোট		
চট্টগ্রাম	আরকোট		
চন্দন নগর	সিক্কাস		
কাটোরা	সিক্কাস		
ঢাকা	আরকোট	সিক্কাস	
গোলাঘর	সিক্কাস		
বারানগর	আরকোট		
বারুন	সিক্কাস		
হরিয়াল	আরকোট		
হরিপাল	সিক্কাস		
খিরপাই	আরকোট		
লক্ষীপুর	আরকোট	সিক্কাস	
মালদাহ	সোনাউট		
মিদনাপুর	আরকোট এবং সিক্কাস		
পাটনা	সোনাউট		
রংপুর	ফ্রেঞ্চ আরকোট	সব ধরনের মুদ্রা	পুরনো নারায়নী রুপীস; সিক্কাস
শান্তিপুর	সিক্কাস		
সোনামুখী	সোনাউট		
প্রতি মুদ্রার মূল্য ১০০ সিক্কা রুপীস= ১১৬ কারেন্ট রুপীস ১০০ সিক্কা রুপীস= ১০৭.৬.৬ আরকোট রুপীস ১০০ সিক্কা রুপীস= ১০৫.৬.৬ দাসমাশা রুপীস ১০০ সিক্কা রুপীস= ১০৮ পুরনো নারায়নী রুপীস (শুধুমাত্র রংপুর)			

এ রকম পরিস্থিতিতে ১৭৮৯ সালে বোর্ড অব ট্রেড সিককা রূপীতে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু সেটা সব জেলার তাঁতীরা গ্রহন করতে রাজি হয়নি এই জন্য যে, যদি ভিন্ন মুদ্রায় রাজস্ব আদায় করা হয় তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাঁতীরা সিককা রূপী গ্রহণ করতে রাজি হলেও তারা দেখল যে, পোদ্দাররা সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে তাঁতীদেরকে যথাযথ বিনিময় মূল্য হতে বঞ্চিত করছে যাতে করে তারা তুলা বা সুতা ক্রয় করতে না পারে। ১৭৯৪ সালে কোম্পাানি গোল্ড মোহর চালু করলে মুদ্রা পদ্ধতি আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ বাণিজ্যিক এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম, বারুন, শান্তিপুর, সোনামুখী, রাজনগর, খিরপাই, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁতীরা উৎপাদন ক্ষেত্রে গোল্ড মোহরের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে। গোল্ড মোহরের উপর ৫% কমিশন ধরা হলেও বাজারে তা মানা হতো না। অধিকাংশ তাঁতী অভিযোগ করেছিল যে, একমাত্র শহর ছাড়া আর কোথাও গোল্ড মোহর ভাঙ্গানো যায় না। এগুলো বাজারে প্রচলিত মুদ্রা ছিলনা বলে গ্রামের পোদ্দাররাও এগুলো বিনিময় করতে রাজি ছিল না। ১৭৯৪ সালের ৩১ মার্চ খিরপাইয়ের আবাসিক প্রতিনিধির নিকট চান্দেরখানা আড়ং এর তাঁতীরা তাদের আবেদনে গোল্ড মোহরের সমস্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছিল:

> Formerly we took advance in rupees and gave cloths early. This year we got advances in mohurs. To sell these mohurs in the bazaar a batta of 10 or 12 annas is incurred on each. By selling the mohurs to a poddar we get rupees in 10 or 12 days after. In this way we cannot get in our monthly cloths: we must give the loss on mohurs and the cloths are required speedily. Thus how can we accomplish our business if we do not get silver rupees?[৫০]

গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে পোদ্দার ও সাহুদের বেশ গুরুত্ব ছিল। কিন্তু তাঁতীদের উপর তাদের অর্থনৈতিক দুর্ব্যবহারের ফলে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহে ভাটা পড়ে। কোম্পানি এবং অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য এসব পোদ্দার ও সাহুরা ছিল তাঁতীদের সাথে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থল। তাঁতীরাও তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানির কর্মকর্তাদেরও গ্রামের এ শ্রেণিটির উপর নির্ভর করতে হতো। এভাবে দেখা যায় যে, তাতীদের উপর দেশীয় ব্যাংকার এবং মুদ্রা ব্যবসায়ীদের অত্যাচার কম ছিলনা।

৪.১২ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বস্ত্র বাণিজ্যের কিছু নমুনা

বাংলার বস্ত্র ব্যবসার পরিমান, আর্থিক গতি উঠানামা করলেও অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এর তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। নিম্নোক্ত সারণিসমূহ হতে বস্ত্রশিল্পে লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, মালদা, হরিয়াল এবং হরিপালের গুরুত্ব ফুটে উঠে।[৫১]

১৭৫০-১৮০০: প্রতি আড়ং এ কোম্পানির বিনিয়োগের পরিমাণ (সিক্কা রূপীতে)[৫২]

আড়ং	১৭৫৪-৫৫	১৭৫৮-৫৯	১৭৬১-৬২	১৭৭১-৭২	১৭৯১-৯২	১৭৯৪-৯৫	১৭৯৯-১৮০০
চট্টগ্রাম	-	-	-	১,০০,০০০	১০২,৮৫০	১২১,১১৭	১৮,১৭৯
ঢাকা	১৬৮,০০০	১৩৪,০৬৭	৫৪৬,০০০	১১,৭৭,৬০৭	৯৬৬,০০০	৫৪৩,৩৮০	১৯৭,০০৯
হরিয়াল	১৭৩,৯২১	২৬২,০৫৫		৪০৭,২৩২	২৭৩,০০০	১৮০,৮৭৯	২৪০,২৪৪
হরিপাল	৭১,৭৭২	১২৯,৮৯৮		৩৬৪,২০০	৪৬৭,০৪০	৩৪৪,৫২৭	৫০,০৩৯
লক্ষীপুর	-	১৩৯,৫৯৬	১৬৮,০০০	৭০০,০০০	৮৯৮,৩৩৮	৫৪৫,১২৮	৫৬৭,৫৮৫
মালদাহ	১৯৪,৬২০	২৯৬,০৮৮		৩৬০,০০০	৫৩৮,৩২৬	৪৬৯,৬৯২	১৭৯,৫৯৫
শান্তিপুর	৯২,০১২	১৪১,৭০০		২৪৪,৮০০	৫১১,১৩২	৫৯৫,৪৭২	৩৩,১০৮

Drm: IRS, FortWilliam-india house coresspondance, vol. I, p.924; vol. II p. 1. 266, 338-41; Vol. III, p.361, IOR Home

প্রধান আড়ংসমূহে বার্ষিক গড় পুঁজি সরবরাহের পরিমাণ

কারখানা/আড়ং	প্রাইভেট ব্যবসা	কোম্পানি ব্যবসা	মোট
ঢাকা	৭০৯,৪৫২.০	৩৭০,১৯৪.০	১,০৭৯,৬৪৬.০
খিরপাই	প্রযোজ্য নয়	৪৬৯,৬৬৩.০	৪৬৯,৬৬৩.০
লক্ষীপুর	৯০৬,৪০১.০	৫৫৬,৩৫৬.০	১,৪৬২৭৫৭.০
মালদহ	১৬৯,৪৭৮.০	৩২৪,৭৭৮.০	৪৯৪,২৫৬.০
শান্তিপুর	প্রযোজ্য নয়	৩১৪,২৯০.০	৩১৪,২৯০.০
সোনামুখী	প্রযোজ্য নয়	৩৪৭,১৬২.০	৩৪৭,১৬২.০

৪.১৩ বস্ত্র বাণিজ্যে দাদন ব্যবসায়ী এবং দালাল নিয়োগ

১৭৫০ এর দশকে দাদন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের পুরনো পদ্ধতি বেশ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। দাদন ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বোর্ড অব ডিরেক্টরের নির্ধারিত বিনিয়োগ লক্ষ্য বিশেষ করে কাপড়ের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণের কোনটাই পূরণ হচ্ছিল না। এজন্য কোম্পানি কর্মকর্তারা মারাঠাদের দ্বারা সৃষ্ট অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করেছিল। উৎপাদনের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান করা ছিল অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। কোর্ট অব ডিরেক্টর তখন দাদন ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে নগদ টাকায় পণ্য ক্রয়ের জন্য কলকাতা পরিষদকে নির্দেশ করেছিল। দাদন ব্যবসায়ীরাও কোম্পানির জন্য পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী ছিল না। কারণ কোম্পানি যেসব কড়াকড়ি শর্তে পণ্য উৎপাদনের আদেশ করছিল তার সাথে ব্যবসায়ীদের শর্ত মিল ছিলনা। দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং সরবরাহ পদ্ধতি কঠিন হওয়াতে তারা এখন ৮৫% অর্থ অগ্রিম হিসেবে দাবি করে। কিন্তু কোম্পানি মোট কার্যাদেশের ৩০% অগ্রিম হিসেবে দিতে রাজি ছিল। এতে দাদন ব্যবসায়ীরা এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসা করতে রাজি না হয়ে কোম্পানির ব্যবসা হতে বিদায় নেয়। ১৭৫১ সালে বন্যাজনিত কারণে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব হলে কোম্পানি ১২% জরিমানা আরোপ করে। দালাল ও পাইকাররা জরিমানা প্রদানে অস্বীকার করে।

১৭৫৩ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টর কারখানাগুলোতে গোমস্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এভাবেই গোমস্তারা কোম্পানির বেতনভুক্ত নিয়মিত কর্মচারী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।দালালদের চেয়ে কম দামে পণ্য

সংগ্রহের জন্য গোমস্তাদের ধামরাই, তিতাবাদী, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় পাঠানো হতো। গোমস্তারা নগদ অর্থ এবং অগ্রিম এ দুভাবেই কাপড় ক্রয় করতো। দালাল পাইকার এবং গোমস্তাদের ক্রয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫:২:২[৫৩] ক্রমান্বয়ে গোমস্তরা দালালদের নিকট হতে পণ্য ক্রয়ের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। গোমস্তাদের বেতন ছিল প্রতিমাসে ৫০ রূপী; সেই সাথে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল। একজন গোমস্তার অধীনে একজন ক্যাশিয়ার, দু'জন কেরানি, চারজন পাইকার এবং চারজন পিওন ছিল। গোমস্তারা কারখানার আদেশ পূরনের লক্ষ্যে নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে তাঁতীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতো। প্রত্যেকটি আড়ং কোম্পানির কর্মকর্তাদের পদচারণা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। মুকীম (তাঁত ও সুতা তত্ত্বাবধানকারী), মোহরী (কেরানি), তাগাদির, দিহিদার, (গ্রাম তত্ত্বাবধায়ক), ক্যাশিয়ার, পিওন সবাই গোমস্তার অধীনে কাজ করত। প্রথমদিকে গোমস্তাদেরকে মাঝে মাঝে আড়ং এ পাঠানো হলেও পরে তাদেরকে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। গোমস্তারা কারখানার কর্তৃত্বাধীনে কাজ করলেও বাস্তবে তাঁতীদের সাথে তাদের লেনদেনের সময় তারা তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব খাটাতে আরো বেশি তৎপর ছিল।[৫৪]

৪.১৩.১ অনিয়ম এর অভিযোগ; গোমস্তা ও কোম্পানির কর্মচারীদের কমিশন বাণিজ্য

১৭৫৩ সালের পর পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসার ফলে কোম্পানির যেসব কর্মচারীরা বস্ত্র-ব্যবসা পরিচালনা করত তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের গন্যমান্য লোকদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান হয়ে উঠে। গোমস্তারা গ্রাম্য পাইকার বা তাঁতীদের নিকট থেকে সরাসরি কাপড় ক্রয় করত। উভয় ক্ষেত্রেই তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ সুবিধাজনকভাবে অর্জন করতে সক্ষম ছিল। আড়ংগুলোতে যারা চাকুরি করত তাদের নির্ধারিত বেতন থাকলেও প্রতিটি লেনদেনে তাঁতীদের নিকট থেকে একটা ফি আদায় করত। প্রথমদিকে এসব খরচ যেমন মোহরীর ফি, গোমস্তার কমিশন ইত্যাদি বৈধতার অনুমোদন পেলেও তারা মাঝে মাঝে তাঁতীদের নিকট হতে পণ্য বাছাইয়ের পূর্বে অবৈধ অর্থ-আদায় করত। "To protect his own interest in fulfilling the Facotry's orders, the gumashta's negotiations with the weavers became subject, not to market forces, but to the Company's authority."[৫৫] এসব অবৈধ খরচ প্রদানের ফলে তাঁতীদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। এভাবে কারখানা, আড়ং এবং গ্রামীণ তাঁতীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলেও পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানি তার সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। তাঁতীরা উভয়পক্ষ দ্বারাই চাপের মুখে ছিল। একদিকে কোম্পানির কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাপ অন্যদিকে কম খরচে পণ্য উৎপাদনের জন্য কোম্পানির অবাস্তব দাবি।

৪.১৪ কোম্পানীর বহির্ভূত ঢাকার তাঁত ব্যবসা

১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা জেলায় হিন্দু সাহা এবং অন্য গোত্রের ব্যবসায়ী ছিল ৬০,৫৩৭ জন।[৫৬] ঢাকা শহরের সাহা ব্যবসায়ীরা ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে বসাকরা ছিল তাঁতী। পরবর্তীতে তাদের অনেকে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। কোম্পানী আমলে এদের অনেকেই ইংরেজরা পাইকার,দালাল, যাচনদার এবং মুকিম অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করত। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় সুতিবস্ত্রের বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠে।

ঢাকা শহর ও আশে পাশের তাঁতীদের কাছ থেকে এরা ঢাকাই শাড়ি, ধুতি আর বাফতা বা মোটা কাপড় যা চাদর হিসেবে ব্যবহার করা হতো,কিনে মূলত কলকাতায় রপ্তানি করতো এদের অনেকেই ঢাকারতাঁতি ও সুচিশিল্প কর্মীদের টাকা লগ্নি দিত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করার জন্য সূচিকর্ম করা গুটি রেশমের মিশ্রিত বস্ত্রের জন্য। এধরনের কাপড়কে কাসিদা বলা হত। এই কাসিদার ব্যবসা ছিল বেশ লাভজনক এবং গোটা উনিশ শতক ধরেই এ ব্যবসা চালু ছিল। স্থানীয় কাপড় আর কাসিদার ব্যবসায়ে ঢাকার বসাকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন মদন মোহন বসাক। তিনি সরাসরি মধ্য প্রাচ্যে ও তার কাসিদা রপ্তানি করতেন।ব্যবসায় প্রচুর অর্থ-লাভ করে তিনি ঢাকা জেলায় জমিদারি কিনেন এবং ঢাকা শহরের অভ্যন্তরেও বিস্তর বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করেন। বিত্তবান হওয়ায় ঢাকায় তার সামাজিক অবস্থানের উত্তরণ ঘটে। তিনি অনাবারী ম্যাজিস্ট্যাট এবং মিউসিপিলিটির কমিশনার নিযুক্ত হন। ঢাকায় তার নামে একটি রাস্তার নামকরণ ও করা হয়। মদন মোহন বসাক রোড এখনও বিদ্যমান।[৫৭] Col, Davidson তার ঢাকার বিবরণীতে লেখেন “ঢাকার শহরতলীতে আগে হাজার হাজার তাঁতী পরিবার বাস করতো... তাঁতীদের অধিকাংশই অনেক আগে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে চাষাবাদের কাজের খোজে, এদের বাসভূমি ধীরে ধীরে জঙ্গলে ছেয়ে গেছে”।[৫৮]

৪.১৫ বিশ শতক এবং তারপর

উনিশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতহাসে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি হলো, বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে সুতিবস্ত্রের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু এই দেশটি এই প্রথম পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের বস্ত্রসামগ্রীর যে সুবিশাল আন্তর্জাতিক বাজার ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সেটার অবসান ঘটে। উনিশ শতকেই এই চিত্রও পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশকে ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বাজারে পরিণত করতে চাচ্ছে। একাধিকবার ইংল্যান্ডে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রীর ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে এবং ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডে উৎপাদিত বস্ত্রপণ্যের রপ্তানির ওপর নামমাত্র কর ধার্য করে তারা বাংলাদেশ তাঁতশিল্পকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এর বিপরীতে বিশ শতকের গোড়ায় ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতা

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। ইতিহাসে এটা 'স্বদেশি আন্দোলন' নামে পরিচিত।

আন্দোলনের সূত্র ধরে বাংলায় নিজস্ব তাঁতশিল্পের স্থানীয় বাজারটি আবার চাঙা হয়ে উঠেছিল। সে সময় এ দেশের মানুষ নিজেদের বস্ত্রশিল্পের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল এবং সাময়িকভাবে হলেও তা বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের বাজার তৈরিতে সাহায্য করেছে। যদিও তাঁতপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারটি আর সেভাবে কখনোই ফিরে আসেনি।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে শুধু চরকায় সুতাকাটা আর খাদির বস্ত্র পরিধান নয়, পাশাপাশি বিলেতি বস্ত্র বর্জনের আহ্বান এই আন্দোলনের ভেতর ছিল। এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই তাঁতশিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একাধিক বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছিল ঢাকায়। এর মধ্যে শুরুতে ঢাকার পাটুয়াটুলিতে "গুপ্ত অ্যান্ড কোং" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে। এখানে আমদানি করা বিদেশি সুতা ব্যবহার করা হতো। কারখানাতেই সুতা রং করার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দুই বছর লাভের মুখ না দেখলেও পরে এটা লাভ করতে আরম্ভ করে। এই কারখানার সাফল্য দেখে আরো কিছু বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠেছিল। ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের সরকারি প্রতিবেদনে মোট সাতটি বস্ত্রকারখানার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো: দাস ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, দে সরকার অ্যান্ড কোম্পানি, বেঙ্গল হোসিয়ারি সাপ্লাই অ্যান্ড কোম্পানি, স্বদেশি শিল্পালয়, গাঙ্গুলি অ্যান্ড কোম্পানি, বসু রায় চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি।[৫৯] প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করলেও এই বস্ত্র ব্যবসাপতিষ্ঠানগুলো অচিরেই বিলুপ্ত হয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার এই বস্ত্রকারখানাগুলোকে বাঁচাতে পারেনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কটন মিল তৈরি হতে থাকে। স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হলেও এসব কারখানায় বা মিলে যেসব প্রযুক্তি ও কৃৎকৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল বিদেশ থেকে ধার করা।

তবে এ কথা ঠিক যে স্বদেশি আন্দোলনের জের ধরেই খুব সীমিত পরিসরে হলেও চরকায় হাতে কাটা সুতার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে এর সীমিত বাজারও আছে। তবে যে কারণে স্বদেশি আন্দোলনকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে বারবার স্মরণ করা হয়, তাহলো, এটাই প্রথম দেশি বস্ত্রের উৎপাদন, বাজার ও বিপণনের ব্যাপারে প্রথম সচেতন রাজনৈতিক উদ্যোগ। যদিও বাস্তবতার নিরিখে এই উদ্যোগ কতটা সঠিক ও সময়োপযোগী ছিলতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সেই বিতর্কে না জড়িয়ে এবার দেখার চেষ্টা করাযাক, বিপণনের সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও পুঁজির সম্পর্কটা কী ও কতটুকু।

৪.১৬ চলমান ব্যবস্থাপনায় তাঁতীদের বস্ত্র উৎপাদনের কাঁচামাল ও সুতা সংগ্রহ

তাঁতিকে উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রেতার কাছে পণ্য পৌছানো পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সুতা সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত। একটি জরিপের কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন কার হলো:

সারণি-৪.১: তাঁতীদের সুতা সংগ্রহের উৎস ও ধরণ

বিবরণ	১৯৭৯/৮০	১৯৮৬/৮৭
ক. সুতা সংগ্রহের উৎস		
পাইকারী বিক্রেতা	৩৫.৫৫	৩৯.৯০
খুচরা বিক্রেতা	৫১.৬৪	৫৮.১৯
মহাজন	৪.৯১	১.৩৪
প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	৭.৯০	০.৫৭
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, 1997, Dhaka.

খ. সুতা সংগ্রহের ধরণ		
নগদ ক্রয়	৫৩.৪৭	৫৩.৭৬
বাকীতে ক্রয়	৪৯.৬২	৪৪.৯০
দাদন প্রথা (মহাজন)	৪.৯১	১.৩৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, 1997, Dhaka.

৪.১৭ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ

পূর্ব থেকেই উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের একটি অংশ রপ্তানি হত এবং একটা বড় অংশ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি হত যা দেশীয় বস্ত্রের চাহিদা প্রায় পুরোটাই মেটাত। বর্তমানেও দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে তাঁতপণ্য রপ্তানি হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি এবং এজেন্টদের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তাঁতশুমারি ২০০৩ এর তথ্য মোতাবেক উৎপাদিত পণ্যের Mode of Sales অনুযায়ী দুটি সারণি দেয়া হল:

Table-4.2: Mode of Sales by loom size

Loom size	Establishments reporting	Retails sale	Whole sale	Mahajan	Co-operative	Otherw
1	70847	26275	24218	6978	258	19688
2-3	45590	16023	17036	5437	203	10667
4-5	12559	3463	7497	1608	75	1243
6-9	8139	1258	6694	963	32	448
10-19	5836	679	5260	586	24	76
20+	1995	234	1839	140	13	40
Total	144866	47,932	62544	15,712	605	31962
Percent	100	33	43	11	-	23

It is observed from the above table 4.1 that a total of 62544 reporting establishments or 43 percent marketed their products through wholesale. The next major marketing channel is retail sale and nearly 33 percent of the

establishments marketed their products. Cooperative societies do not play any significant role in the disposal of handloom products.[৬০]

Table-4.3: Mode of sales in successive census and survey

Consuses/Surveys	Sale procedures (in percent)				Total
	Retail	Wholesale	Co-operative	Others	
Bangladesh Handloom Census, 2003	33.0	43.0	0.4	23.6	100.0
Bangladesh Handloom Census, 1990	20.5	67.5	0.2	11.8	100.0
Handloom Enterprises Survey, 1987	4.9	73.7	0.0	21.4	100.0
Rural Industry Survey Project, 1979-80	12.9	70.5	0.0	16.6	100.0
Handloom Census, 1978	11.7	82.8	1.8	3.7	100.0

Since 1978 handloom products through wholesale has been the dominant channel. However, its relative importance has been decreasing from 83% in 1978 in 2003. in 2003 only 0.4% are co-operative sales. Retail and other slaes are almost the4 same being 33.0% and 24% respectively.[৬১]

তাঁত বস্ত্র বাজারজাতকরণে মধ্যস্তত্বভোগী ব্যবসায়ীদের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। তাঁত ইউনিটের অবস্থান ও আয়তন, উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকার ও গুনগতমান, ভোক্তাদের অবস্থান, তাঁতীদের আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি অবস্থার উপর নির্ভর করে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি হয় এবং তা দূর-দূরান্তের বিভিন্ন স্থানের ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে যায়। নরসিংদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় তৈরি হয় মোটা থেকে মাঝারি ধরনের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, লুংক্লথ, টাওয়েল ও অন্যান্য থান কাপড়, ঢাকার কেরানীগঞ্জের রুহিতপুরে লুঙ্গি, কুমিল্লায় তৈরি বর্গাকৃতি নকশার লুঙ্গি, পাবনা ও কুষ্টিয়ায় তৈরি হয় মাঝারি থেকে মিহি শাড়ি ও লুঙ্গি, টাঙ্গাইলের দেল দুয়ারে তৈরি হয় সুতার নকশা করা শাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া ঢাকার রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও ও মিরপুরে তৈরি হয় যথাক্রমে কারুকার্যখচিত জামদানিও বেনারসী শাড়ি এবং রাজশাহীর শিবগঞ্জে তৈরি হয় নানা ধরনের রেশমী বস্ত্র। টাঙ্গাইল, জামদানি ও বেনারশী শাড়ির ক্রেতা হলো প্রধানত শহরের অভিজাত সম্প্রদায়। পাবনার শাড়ি ও কুমিল্লার লুঙ্গির ক্রেতা গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং নরসিংদী এলাকার তৈরির কাপড়ের ক্রেতা সারা দেশের সর্বস্তরের মানুষ। এসমস্ত তাঁতবহুল এলাকার কাপড় পাইকারী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

অপেক্ষাকৃত কম তাঁতঘন এলাকায় তাঁতীরা তাঁদের তৈরি কাপড় হাটের দিন সরাসরি ভোক্তাদের কাছে অথবা স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে থাকেন। আবার অপেক্ষাকৃত তাঁতবহুল এলাকায় কাপড় কেনাবেচার জন্য নির্দিষ্ট হাট থাকে। যা সপ্তাহে এক অথবা দু' দিন বসে। এ সমস্ত হাটকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমিক হাট ও প্রধান হাট।

সারা বাংলাদেশে তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের জন্য প্রাথমিক হাটের সংখ্যা অনেক। প্রায় প্রতিটি তাঁতবহুল এলাকায় এ ধরনের হাটের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত প্রাথমিক হাটে কাছাকাছি এলাকা অথাৎ নিকটবর্তী জেলা উপজেলা থেকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা কাপড় কিনতে আসেন। তবে এ হাটের প্রাধান ক্রেতা হলো পাইকার। পাইকাররা সরাসরি তাঁতীদের কাছ থেকে কাপড় কিনে নিয়ে প্রধান হাটে বিক্রয় করে থাকেন। এদের কোন স্থায়ী দোকান থাকে না। অন্যদিকে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের তাদের নিজ নিজ এলাকায় স্থায়ী কাপড়ের দোকান থাকে। উপর্যুক্ত তিন শ্রেণির ব্যবসায়ীরা তাঁতীদের কাছে বেপারী নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের উৎপাদনের ভিত্তিতে শীর্ষস্থানীয় দশটি জেলার উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো:

Table: 4.4: Ten largest cloth producting zilas[৬২]

('000' metre)

Zila (in order of rank)	Total cloth production	Saree	Lungi	Bedsheet	Others
Sirajganj	18217	13115	4897	21	184
Tangail	6218	5858	335	8	17
Narayanganj	5736	3617	113	1	2005
Pabna	5603	3565	2024	2	12
Narsingdi	5141	2078	2619	2	442
Kushtia	3719	2202	1390	10	117
Bogra	1829	1679	45	-	105
Dhaka	1315	415	550	-	350
Brahmanbaria	1291	223	1015	2	51
Satkhira	907	44	-	-	863
Total	49976	32796	12988	46	4146
Bangladesh %	87.3	86.2	92.7	77.2	80.8

Note: Gamcha (napkin) is included in others.
Note: Production is monthly production.

From the table 8.19 it is observed that 10 largest cloth producing zilas namely Sirajganj, Tangail, Narayanganj, Pabna, Narsingdi, Kushtia, Bogra, Dhaka, Brahmanbaria and Satkhira account for about 87,3% of total mothly cloth production in the handloom industry. They produce about 86.2$ saree, 92.7% lungi, 77.2 bedsheets and 80.8% other cloths of total production in the handloom industry. They produce about 50.0 million metre clothes of which about 32.8 million metre about 86.2% are sarees, 13.0 million metres lungi and 4.1 million metre other clothes.

৪.১৭.১ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার ঐতিহ্যবাহী ও সনাতনী সাংগঠনিক কাঠামো

বিভিন্ন উত্থান পতনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের তাঁতপণ্য বাজারজাতকরণের একটি সাংগঠনিক কাঠামো দাড়িয়েছে। এই ধরনের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের তাঁতী সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ হাটবাজার কর্তৃপক্ষ ও ভোক্তারা অভ্যস্ত। সংক্ষেপে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক দিক নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায়:

উৎপাদনকারী	বিপণন স্থান	মাধ্যমসমূহ			পণ্য ব্যবহার
তাঁতী	হাট/বাজার	পাইকার	পাইকারী ব্যবসায়ী	খুচরা ব্যবসায়ী	ভোক্তা
তাঁতী	হাট/বাজার	ফরিয়া (মধ্যস্বত্বভোগী)	পাইকারী ব্যবসায়ী	খুচরা ব্যবসায়ী	ভোক্তা
তাঁতী	হাট/বাজার	মহাজন	পাইকারী ব্যবসায়ী	খুচরা ব্যবসায়ী	ভোক্তা
তাঁতী	হাট/বাজার	-	পাইকারী ব্যবসায়ী	খুচরা ব্যবসায়ী	ভোক্তা
তাঁতী	হাট/বাজার	-	-	খুচরা ব্যবসায়ী	ভোক্তা

৪.১৮ তাঁতী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে দামের পার্থক্য

অধিকাংশ সময়ই তাঁতীরা উৎপাদিত পণ্য নগদ মূল্যে বিক্রয় করেন-মাঝে মধ্যে বাকিতেও বিক্রয় করেন। বাকির মেয়াদ সাধারণতঃ এক থেকে দু' সপ্তাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত জানা যায় যে, তাঁতীরা ৭০%-৭৪% কাপড় পাইকার ও পাইকার ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করেছেন, খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করেছেন ৫%-১৬%, ফরিয়াদের নিকট ৪%-৫%, মহাজনদের নিকট ১%-৪% এবং সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করেছেন ৭%-১৫%। তদুপরি অন্যান্যভাবে বিক্রয় করেছেন ১.৩৬%। অন্যান্য এজেন্টদের মধ্যে সমবায় প্রধান। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাপড় বাজারজাতকরণে সমবায়ের ভূমিকা অতি নগণ্য। গবেষক বিভিন্ন এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনে দেখতে

পান যে, তাঁতীরা নগদ মূল্যে বিক্রয় করেন ৭৪%-৮৩% কাপড় এবং বাকিতে বিক্রয় করেন ১৩%-১৬%।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পযায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বাজারজাতকরণের বিকল্প কোন দক্ষ ব্যবস্থা না থাকায় প্রয়োজনের তাগিদে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে এ ধরনের শ্রমবিভাগ। কিন্তু এ ধরনের সংগঠন অত্যন্ত ব্যয়বহুল বা উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে বস্ত্রের দামের বড় রকমের পার্থক্য বা বিস্তার (price spread)ঘটায়। দেখা গিয়েছে যে উৎপাদক যে দামে কাপড় বিক্রয় করেন, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের কয়েকবার হাত বদলের পরে, ভোক্তাদেরকে তার চেয়ে ৩০%-৪০% বেশি দামে তা ক্রয় করতে হয় (Latif: 1985)। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের বেলায় মূল্যের বিস্তার ৫০%-৬০% হয়ে থাকে। অথচ মিল বস্ত্রের বেলায় এ মূল্য বিস্তার ২০%-২৫% এর বেশি নয়। সুতরাং তাঁতবস্ত্রের ক্ষেত্রেও মূল্যবিস্তার ২০%-২৫% এ সীমাবদ্ধ থাকতে পারত।

সারণি-৪.৫: তাঁতীদের কাপড় বিক্রয়ের উপর তথ্য

বিবরণ	১৯৭৯/৮০	১৯৮৬/৮৭
ক. কাপড় বিক্রয়ের মাধ্যমে		
পাইকার/পাইকারী বিক্রেতা	৭০.৫১	৭৩.৬৯
খুচরা বিক্রেতা	১২.৮৯	৪.৮৯
ফরিয়া	৫.৩৩	৪.৩৬
মহাজন	৩.৯৪	১.০৭
ভোক্তা	৭.৩৩	১৪.৬৩
অন্যান্য	–	১.৩৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০
খ. নগদ/বাকি/দাদন বিক্রয়:		
নগদ বিক্রয়	৮৩.০০	৭৪.৩৫
বাকি বিক্রয়	১৩.০৬	২৪.৫৮
দাদন (মহাজন)	৩.৯৪	১.০৭
মোট	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, 1997, Dhaka.

তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণে এ ধরনের সমস্যার জন্য দায়ী মূলত এ শিল্পের নিজস্ব অসংগতি। তাছাড়া মধ্যস্তত্ব ভোগীদের অতিরিক্ত সুবিধা নেবার কারণে এ শিল্পের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

৪.১৯ উৎপাদনশীলতা ও তাঁতীদের পারিবারিক আয়

একটি নমুনা জরিপের ভিত্তিতে তাঁতশিল্পের উৎপাদনশীলতা-শ্রম উৎপাদনশীলতা ও পুঁজি উৎপাদনশীলতা এবং শিল্প উদ্যোক্তা বা তাঁতীদের পারিবারিক আয় নিয়ে আলোচনা করা হলো। কিন্তু তার আগে পুঁজির গঠণ সম্বন্ধে একটু ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

৪.১৯.১ পুঁজির গঠন

সারণিতে স্থির, চলতি পুঁজি ও মোট পুঁজির উপর নমুনা জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হলো। স্থির পুঁজিতে চলতি মূল্যে কর্মশালা, তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন খরচ (replacement cost) ধরা হয়েছে। চলতি পুঁজিতে ধরা হয়েছে চলতি সম্পদ (Current asset) যথা: উৎপাদিত ও আধা উৎপাদিত দ্রব্য এবং মজুদকৃত কাঁচামালের মূল্য এবং নগদ অর্থ ও ক্রেতাদের কাছে পাওনা টাকার পরিমাণ।

সারণি থেকে দেখা যায় যে, তাঁত প্রতি মোট পুঁজির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সনে ছিল ৪,০১৪ টাকা এবং ১৯৮৬/৮৭ সনে ৯,৬৭৩ টাকা অর্থাৎ আগের জরিপের তুলনায় পরের জরিপে ১৪০% বেশি। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ১৪০% এর মধ্যে ৭০% হয়েছে তাঁত, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে, ৬০% প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের (উন্নতির) জন্য এবং বাকি ১০% ধরা যায় নমুনা পার্থক্যের (sonokubg variatio) জন্য।

সারণি-৪.৬: হস্ত চালিত তাঁতশিল্পে পুঁজির গঠন

বিবরণ	১৯৭৯/৮০	১৯৮৬/৮৭
ক. স্থির পুঁজি (টাকা): শিল্প ইউনিট প্রতি গড়ে তাঁত প্রতি গড়ে	৭৫১৫ ২৮১৭	২৫৯৪৪ ৫২২০
খ. চলতি পুঁজি (টাকা): শিল্প ইউনিট প্রতি গড়ে তাঁত প্রতি গড়ে	৩১৯০ ১১৯৬	২২১৩০ ৪৪৫৩
গ. মোট পুঁজি (টাকা): শিল্প ইউনিট প্রতি গড়ে তাঁত প্রতি গড়ে	১০৭০৫ ৪০১৪	৪৮০৭৮ ৯৬৭৩

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, 1997, Dhaka.

উপরে উল্লেখিত সারণি থেকে হিসেব করা যায় যে, তাঁত প্রতি মূল্য সংযোজন স্থির মূল্যে ১৯৭৯/৮০ অর্থ বৎসর থেকে ১৯৮৬/৮৭ অর্থ বৎসরে ৩০% বেড়েছে। এর কারণ প্রধানত প্রযুক্তিগত উন্নতি। আবার, পুঁজির একক প্রতি মূল্য সংযোজন উক্ত কালপর্বে কিছুটা কমেছে, অর্থাৎ পুঁজি, ঘনত্ব (capital intensity) কিছুটা বেড়েছে। তাঁতশিল্পে ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং এর পুঁজি ঘনত্ব বাড়ছে।

৪.১৯.২ পুঁজি ও শ্রম উৎপাদনশীলতা

পুঁজি উৎপাদনশীলতা দু'ভাবে হিসেবে করা হয়েছে: তাঁতপ্রতি মূল্য সংযোজন (value added) ও মোট পুঁজির একক প্রতিমূল্য সংযোজন। অনুরূপভাবে, শ্রম উৎপাদনশীলতাও ভাগ করা হয়েছে দু'ভাবে: শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজন এবং মজুরির একক প্রতি মূল্য সংযোজন। পুঁজি ও শ্রম উৎপাদনশীলতার উপর নমুনা জরিপের ফলাফল সারণিতে প্যানেল ক ও খ-এ দেখান হলো:

শ্রম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে সারণি থেকে আমরা হিসেব করতে পারি যে ১৯৭৯/৮০-৮৬/৮৭ সময়ে শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজন ৬% বেড়েছে এবং প্রায় আনুপাতিক হারে বেড়েছে মজুরির একক প্রতি মূল্য সংযোজন। এর কারণও প্রধানত প্রযুক্তিগত উন্নতি।

সারণি-৪.৭: হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদনশীলতা ও আয়

বিবরণ	১৯৭৯/৮০	১৯৮৬/৮৭
ক. পুঁজি উৎপাদনশীলতা: মূল্য সংযোজন/তাঁত মূল্য সংযোজন/মোট পুঁজি	৭৩৭৯ ১.৮৫	২১৫০০ (৯৫৫৬) ১.৭৮
খ. শ্রম উৎপাদনশীলতা: মূল্য সংযোজন/শ্রমিক মূল্য সংযোজন/মোট মজুরি	৩৩৭৩ ১.৪৪	৮০৭৯ (৩৫৯০) ১.৫১
গ. পারিবারিক মোট আয়: মোট আয়/ইউনি মোট আয়/তাঁত	১১৫৪৫ ৪৩২৯	৩৮৯০০ (১৭২৯০) ৯৭০০ (৪৩১২)

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, 1997, Dhaka.

উপরে উল্লেখিত সারণি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁত প্রতি ও শ্রমিক প্রতি মূল্য সংযোজন মোটামুটি স্থিতিশীল।

৪.১৯.৩ পারিবারিক আয়

তাঁত ইউনিট প্রতি (per handloom enterprise) বার্ষিক মূল্য সংযোজন থেকে ভাড়া করা শ্রমিকের মজুরি ও ঋণের পরিশোধিত সুদ বাদ দিয়ে পারিবারিক আয়ের পরিমাণ হিসেব করা হয়েছে। উপরের সারণি এর প্যানেল গ থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৯/৮০ সনের নমুনা জরীপ থেকে বার্ষিক গড় পারিবারিক আয় হিসেব করা হয়েছে ১১,৫৪৫ টাকা এবং ১৯৮৬/৮৭ সনের জরীপ থেকে ৩৮,৯২০০ টাকা। ১৯৮৬/৮৭ সনের ৩৮,৯০০ টাকা ১৯৭৯/৮০ সনের আয় ৫০% বেশি। এর প্রধান কারণ হল শেষোক্ত বছরে প্রথমোক্ত বছরের তুলনায় ইউনিট প্রতি তাঁত সংখ্যা অনেক বেশি। সারণি থেকে আমরা আরও দেখতে পাই যে তাঁতপ্রতি পারিবারিক আয় স্থিরমূল্যে উভয় জরিপেই প্রায় সমান।

তাঁতশিল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অনেক। তাই সরকার এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অনুভব করেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও ইহার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন। প্রধানত: দু'ধরনের নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়: সংরক্ষণ নীতি (protective policy) এবং উন্নয়ন নীতি (development policy)। তাঁতশিল্পের নিজস্ব কাঠামোগত সুবিধার সাথে সংযুক্ত হয়ে সংরক্ষণ নীতি এ শিল্পের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। উন্নয়ন নীতি কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের (building up of institution) মাধ্যমে।

দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশের তাঁতশিল্প প্রাথমিক অবস্থায় সংকটের মধ্যে পতিত হলেও পরবর্তী কয়েক বৎসর এ শিল্পের ব্যাপক প্রসারলাভ ঘটে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি দিকে পাকিস্তানে, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে, কারখানাভিত্তিক বস্ত্রশিল্পের দ্রুতহারে প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আন্তঃআঞ্চলিক অবাধ বাণিজ্যের (interwing face trade) মাধ্যমে বস্ত্র আমদানিও বৃদ্ধি পায়। এভাবে কারখানা বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বঙ্গের তাঁতশিল্প পতনের মুখোমুখিহয়। তাই এ শিল্পকে মিল খাতের প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে এ শিল্পকে সহযোগিতা করেছিল।

যান্ত্রিক ও বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য মিলবস্ত্রের উৎপাদন খরচ, অযান্ত্রিক ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবস্থায় চালিত তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচের তুলনায় অনেক কম। তাই রাজস্ব নীতির মাধ্যমে মিলবস্ত্রের উপর অধিক হারে আবগারি শুল্ক ধার্য করে এবং তাঁতবস্ত্রকে শুল্ক মুক্ত রেখে এ দুটি খাতের উৎপাদন খরচের ব্যবধান কমিয়ে দিয়ে তাঁতশিল্পকে মিলখাতের তীব্র প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক অবস্থায় রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে মিল বস্ত্রের উপর মূল্যভিত্তিক ৫% আবগারি শুল্ক ধার্য ছিল। পরবর্তীতে তাঁতশিল্পকে বাঁচানোর জন্য ১৯৫৩/৫৪ অর্থ বছরে উক্ত শুল্ক বাড়িয়ে ১২.৫%-এ এবং পুনরায় ১৯৬৩/৬৪ অর্থ বছরে ১৫% এ উন্নীত করা হয়। পরে ১৯৬৯/৭০ অর্থ বছর পর্যন্ত উক্ত শুল্ক কয়েকবার সংশোধন করা হয় এবং মূল্যভিত্তিক প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনভিত্তিক (গজ প্রতি) করা হয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে ১৯৬৩/৬৪-১৯৬৯/৭০ সময়কালের কোন সময়েই মূল্যভিত্তিক ১৫% এর কম ছিল না। ফলে এ দুটি খাতের উৎপাদন খরচের ব্যবধান অনেক কমে আসে (Latif: 1985)।

তাঁতশিল্পের অন্যান্য কতগুলি সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে। প্রথমত: মিলের তুলনায় এখানে ওভারহেড ও ব্যবস্থাপনা খরচ অনেক কম। দ্বিতীয়তঃ এ শিল্পের ৯৯% গ্রাম এলাকায় অবস্থিত বলে এখানে সস্তায় শ্রমনিয়োজন হয়। তৃতীয়তঃ ঐতিহ্যগত কারণে এবং কিছুটা গুণগতমানের পার্থক্যের জন্য ভোক্তাদের মাঝে তাঁতে তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি ও গামছার (যা তাঁদের মোট বস্ত্র ব্যবহারের প্রায় ৬০-৭০% অধিকতর পছন্দ (preferencef for handloom saree, lungi and gamcha over mill-made cloth)। সুতরাং, এ সমস্ত ক্ষেত্রে থেকে মিলবস্ত্রের দিকে ভোক্তাদের চাহিদা পরিবর্তন (shifting of demand) করতে হলে এ দুয়ের মাঝে দামের একটা বিরাট রকমের পার্থক্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকারি রাজস্ব নীতি, শ্রমের মজুরির পার্থক্য এবং ওভারহেড ও ব্যবস্থাপনা খরচের পার্থক্যের জন্য উৎপাদন খরচের পার্থক্য অনেক কম ছিল। ফলে তাঁতশিল্প মিলখাতের সাথে তার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। তাই বলা যেতে পারে যে সরকারি রাজস্ব নীতি প্রান্তিকভাবে হলেও তাঁত শিল্পকে সহায়তা করেছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৭২ সনে অন্যান্য বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্রকলগুলো জাতীয়করণ করে এর মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ভার নিয়ে নেন সরকার। তাতে করে তাঁত শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করে নতুন মিল স্থাপন (পরিকল্পনামাফিক) বা পুরাতন মিলে সুতা ও কাপড় উৎপাদনে ভারসাম্য নীতি মেনে চলা হয়। ১৯৭৩/৭৪ অর্থ বছর থেকে বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানির ব্যাপারে তাঁতশিল্পের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন বস্ত্র যেমন শাড়ি ও লুঙ্গির উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয় যা তাঁতশিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৮৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৬ সাল নাগাদ দেশের প্রায় অর্ধেক বস্ত্র ও সুতাকল পুনরায় বিজাতীয়করণ করা হয়। তবে নতুন মিল স্থাপনে পরিকল্পনা মাফিক বস্ত্র ও সুতা উৎপাদনে ভারসাম্য নীতি বজায় রাখা হয়। যার কারণে দেশীয় তাঁতশিল্প উপকৃত হয়েছে।

৪.২১ দেশীয় বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা

তাঁতের কাপড় সুলভ, পরিবেশবান্ধব ও আরামদায়ক তাই তাঁত বস্ত্রের প্রতি দেশের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষের চাহিদা রয়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান এশিল্পকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করছে এবং নিজেরা ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছে। দেশে তাঁত শিল্পের বাজার বৃদ্ধিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল:

আড়ং: আড়ং বাংলাদেশের একটি হস্তচালিত ও কারুপণ্য বিষয়ক উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আড়ং এর যাত্রা শুরু ১৯৭৮ সালে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অন্যতম বৃহৎ এনজিও ব্র্যাক এর মূল উদ্যোক্তা। বর্তমানে রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামসহ সারাদেশে আড়ং এর ২১টি শো-রুম আছে। সমাজের উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবৃত্ত সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আড়ং এর বিক্রিযোগ্য মালামালের মধ্যে বেশী পছন্দ হলো পোশাক। তার মধ্যে হরেক রকম শাড়ী, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি বেশিরভাগই তাঁতের তৈরী। তাছাড়া আড়ং এর অন্যতম জনপ্রিয় আইটেম পাঞ্জাবী, থ্রী পিস, চাদর বেশীর ভাগ কাপড়ই তাঁতের তৈরী।

গ্রামীণ উদ্যোগ (গ্রামীণ চেক): গ্রামীণ চেক (Grameen Check) হচ্ছে বাংলাদেশের খুব জনপ্রিয় একটি পোশাক নকশা। এটি মূলত ডাই থ্রেডের বিভিন্ন রং থেকে গঠিত চতুর্ভূজ বা আয়তনের একটি প্যাটার্ন গঠন করে। গ্রামীণ চেক ডিজাইনের বস্ত্র বাংলাদেশের কুটির শিল্প শ্রমিকদের দ্বারা ক্রমাগত পদ্ধতিতে বোনা কাপড় দ্বারা তৈরী হয়। গ্রামীণ চেকের কাপড়গুলো সম্প্রতি গ্রামীণ উদ্যোগের শো-রুমগুলোতে পাওয়া যায়। শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি পিস, শার্ট, প্লাউজ পিস ইত্যাদি বহুল প্রচলিত পণ্য। এটি গ্রামীণ ব্যাংক এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান।[৬৩]

বিবি রাসেল প্রোডাকশনস: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশী ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতের কাপড় ও খাদি কাপড় দ্বারা ফ্যাশনাবল সাশ্রয়ী এবং দেশ বিদেশে উপস্থাপনযোগ্য পোশাক প্রদর্শন শুরু করেন। রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিতে শো-রুম প্রতিষ্ঠা

করেন। তার হাউজ বিবি রাসেল প্রোডাকশনস সরাসরি তাঁতীদের অগ্রীম অর্থ ও সুতা সরবরাহ করে ডিজাইন ও চাহিদা মাফিক শো-রুমগুলো এবং দেশ বিদেশে বিক্রির জন্য পণ্য প্রস্তুত করে থাকেন।

শাড়ী, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, গামছা, লুঙ্গি, থ্রি পিস ইত্যাদি তৈরী ও বাজারজাতকরণ দি ডেইলী স্টার পত্রিকার ভাষায়, The slogan of Bibi productions is "Fashion for Development" Bibi productions has provided a livelihood to over 30,000 (Thirty thousand) measures all over Bangladesh, and seeks to employ many more over a mider area এক প্রশ্নের উত্তর ডিজাইনার বিবি রাসেল বলেন, "I believe designer wear require an omph factor that gives it, the status as high fashion. And Bibi productions is out to do just that for Bangladesh.[৬৪]

দেশী দশঃ দেশীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে এদেশের তাঁত, কারু ও বয়নশিল্পের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল দশটি ফ্যাশন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগ দেশী দশ। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো নিপুন, কে-ক্রাফ্‌ট, অঞ্জনস, রঙ, বাংলার মেলা, বিবিয়ানা, সাদাকালো, দেশাল, নগরদোলা ও সৃষ্টি। গত দশ বছরে দেশীয় হস্তচালিত তাঁতপণ্যের প্রসারে দেশী দশ নতুন ধারণায় সূচনা করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর মধ্যে তাঁতে তৈরী কাপড়ের দ্বারা তৈরীকৃত পোশাক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এর মাধ্যমে। একই ছাদের নীচে রাজধানী ঢাকায় ২ (দুই)টিসহ এবং সারা দেশে দেশী দশের ৬ (ছয়)টি বিশাল শো-রুম রয়েছে।

৪.২২ বাজার সৃষ্টিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁত ও বস্ত্র মেলার আয়োজন

রাজধানীতে প্রায় প্রতিবছরই মতিঝিল টিএন্ডটি কলেজ মাঠে, আগারগাঁও তালতলা মাঠে প্রায় মাসব্যাপী বিশেষ করে রোজার ঈদ পূর্ববর্তী আগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহযোগিতায় ০৩ জুন ২০১৮ সালে উত্তরার আশকোনা মাঠে আয়োজন করা হয় মাসব্যাপী তাঁত ও বস্ত্র মেলা। মেলায় ঐতিহ্যবাদী তাঁত ও জামদানী বস্ত্র, শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা, তাঁতে তৈরী থ্রিপিস প্রদর্শন করা হয়। মেলাটি ছিল জমজমাট।[৬৬]

২০১৮ সালে ০৪ অক্টোবর থেকে ০৬ অক্টোবর পর্যন্ত গুলশানের খাজানা গার্ডেনিয়া গ্র্যান্ড হলে "হেরিটেজ হান্ডলুম ফেস্টিভাল" নামে এই প্রদর্শনীর যৌথভাবে আয়োজন করেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন SME এবং এসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনারর্স বাংলাদেশ AFD। তিন দিন ব্যাপী মেলায় জামদানি, নকশীকাথা, মিরপুর বেনারশি, টাংগাইল তাঁত, সিরাজগঞ্জ তাঁত, মনিপুরী তাঁত ও রাঙামাটি তাঁত এর তৈরী পণ্য প্রদর্শিত হয়।[৬৭]

তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই জেলা পর্যায়ে নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, বগুড়া, টাংগাইল, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ঝালকাঠি জাতীয়ভাবে প্রায় প্রতি বছরই সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে তাঁত পণ্যের মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৪.২৩ ডিজিটাল মার্কেটিং

শহরের মধ্যবিত্ত আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন ক্রেতাদের সুবিধার্থে বিক্রেতাগণ বর্তমানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর জোর দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি লিংকের বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

১. **দেশিমেড:** তাঁতশিল্পে সিরাজগঞ্জের রয়েছে বিশেষ খ্যাতি। জেলায় উৎপাদিত শাড়ি, লুঙ্গি বিদেশেও রপ্তানি হয়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় লুঙ্গি ব্র্যান্ডগুলো তাদের লুঙ্গি'র একটা বড় অংশ এই জেলা থেকেই সংগ্রহ করে থাকে। তাছাড়া সিরাজগঞ্জ তাঁত বোর্ডের তথ্যমতে, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৪০ শতাংশবস্ত্র এই জেলা থেকে আসে। সিরাজগঞ্জের তাঁতে উৎপাদিত শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা বিপণনে গত বছর মার্চ মাসে চালু হয় ফেইসবুক ভিত্তিক পেইজ দেশিমেড। শাড়ি, গামছা বিক্রি করলেও তাদের ফোকাস মুলত লুঙ্গিতে। ইতোমধ্যে পেইজের ফ্যান সংখ্যা ১৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দেশিমেড পেইজে যেকোনো পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন লুঙ্গিতে ব্যবহৃত সুতা কত কাউন্টের, কত সানার সেটারও উল্লেখ করা আছে। ফলে ক্রেতারা পণ্য'র মান সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন।[৬৮]

২. **পটের বিবি:** ফেইসবুক পেইজের বর্ণনায় বলা আছে, সবার জন্য পাটভাঙা শাড়ি। ব্যস! এতটুকুই। তবে এই একটুখানি কথা-ই বলে দেয় শাড়ি নিয়ে তাদের ফ্যাশন এর রকম সকম। শুরুতে তাঁতীদের নকশা করা শাড়ি দিয়ে শুরু হলেও পটের বিবি এখন নিজেদের নকশা, বুনন, ডিজাইন আর রংয়ের বিন্যাস নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তবে, এক্ষেত্রে তারা প্রাধান্য দিচ্ছে হারিয়ে যাওয়া পুরোনো সব ডিজাইন। সেগুলোই এখন তারা নতুন করে ফিরিয়ে আনছে। শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদাকে থিম করেও তারা শাড়ি বানিয়েছে। ফেইসবুকে পেইজটির ফ্যান সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। পেইজটি অনলাইনে শাড়ি প্রেমীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।[৬৯]

৩. **রূপকথা জামদানি:** জামদানি শাড়ি আমাদের ঐতিহ্য। জাতিসংঘও একে ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই জামদানি শাড়িকে ফেইসবুকের মাধ্যমে দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রূপকথা জামদানি। রূপকথা জামদানি'র শুরু ২০১২ সালে। এক্সক্লুসিভ জামদানি শাড়ি ছাড়াও তারা জামদানি থ্রিপিস, ওড়না বিক্রি করে থাকেন। পেইজটির ফ্যান সংখ্যা ৩৮ হাজারেরও বেশি।[৭০]

৪. **মণিপুরি শাড়ি কালেকশন:** সিলেট বেড়াতে গেলে সবার কেনাকাটার তালিকায় থাকে মণিপুরি শাড়ি। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী এই মণিপুরী শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো এর বৈচিত্র্যময় নকশা। এই বৈচিত্র্যময় নকশা'র অনলাইন দোকানদার হলো মণিপুরি শাড়ি কালেকশন অনলাইন। এটা ফেইসবুক ভিত্তিক ক্রেতা-বিক্রেতার একটি গ্রুপ। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৪০০'রও বেশি। ফেইসবুকে লাইক এর সংখ্যা

প্রায় এক হাজার।

৫. **টাঙ্গাইল শাড়িঃ** ঈদ কিংবা বৈশাখ, যেকোনো উৎসবে নারীদের পছন্দের তালিকায় থাকে টাঙ্গাইল শাড়ি। তাই চাহিদার কথা বিবেচনা করে ফেইসবুকে অনেকগুলোই টাঙ্গাইল শাড়ি বিক্রির পেইজ রয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো টাঙ্গাইল শাড়ি নামের পেইজটি। পেইজের ফ্যান সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এই পেইজের মাধ্যমে টাঙ্গাইলে তৈরি বিভিন্ন ধরনের তাঁতের শাড়ি কেনা যাবে।[৭১]

৬. **তাঁতের শাড়ী অনলাইন ইন বাংলাদেশঃ** এটি একটি অনলাইনভিত্তিক শাড়ীর শপিংমল। এই পেজে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী প্রায় সকল ধরনের শাড়ীর ডিজাইন, বৈচিত্রতা, প্রাপ্তিস্থান, গুণাগুন ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে এবং ছবিসহকারে দেয়া থাকে। এই পেজে রয়েছে সুতি তাঁতের শাড়ীর বিশাল কালেকশন।[৭২]

৪.২৪ মজুরি ও মুনাফার রকমফেরঃ সাম্প্রতিক চিত্র

আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মজুরি বা উপার্জনের বিবরণে আমরা দেখেছি যে, সে সময় সুতা কাটুনি, তাঁতী কিংবা তার সহকারী তুলা চাষীদের আয় উর্পাজন খুব বেশি ছিল না যদিও এই বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে দালাল, পাইকার ও বিভিন্ন দেশি বিদেশি বণিকেরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছিল। মজুরি ও মুনাফার ভেতর এই অসঙ্গতির চিত্রটা এত বছর পরও খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। ২০১৭ থেকে ২০১৮এই কালপর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরেজমিনে অনুসন্ধান করে গবেষক দেখেছেন, অঞ্চলভেদে ও পণ্যভেদে তাঁতি ও তাঁতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবী উপার্জন বা মজুরির মধ্যে ভিন্নতা আছে। যেমনঃ ডেমরা রূপগঞ্জ অঞ্চলের একজন জামদানি তাঁতি একটি কারখানায় ওস্তাদ হিসেবে কাজ করলে সপ্তাহে প্রায় ২০০০-২৫০০ টাকা টাকা মজুরি পান। সে হিসাবে তার মাসিক আয় দাঁড়ায় ৮০০০-১০০০০ হাজার টাকা। আর সাগরেদের সাপ্তাহিক ১৫০০/- হিসেবে মাসে ৬০০০/-টাকা। আবার, নরসিংদীর ডাঙ্গা এলাকায় বেডশিট, বেডকভার ইত্যাদি তৈরী করে যেসব তাঁতি, তারা দিনে ৩০০-৪০০/- টাকা হিসেবে মাসে ১০০০০-১২০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করে থাকে।[৭৩] ফলে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তাঁতপণ্যের মজুরি বা তাঁতিদের উপার্জন সমান নয়। আমরা এখানে তাঁতসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকার পেশাজীবী মানুষের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আনুমানিক আয়ের ধারণা পেতে নিচের সারণির মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

সারণি-৪.৮: বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতি/কারিগরদের আয়: ২০০৮-২০১০

তাঁত অঞ্চল	তাঁতপণ্য	মজুরি প্রদানের ধরন	সাপ্তাহিক আয় (টাকা)	মাসিক আয় (টাকা)	উৎপাদনের পরিমাণ ও অন্যান্য মন্তব্য
রংপুর কুড়িগ্রাম	শতরঞ্জি (ফুল কটন)	১০-১৫/ বর্গফুট	৫০০-৭৫০	২১০০-৩২০০	প্রতি সপ্তাহে ৫০ বর্গফুট
	শতরঞ্জি (ট্যাপেস্ট্রি/ ওয়ালম্যাট)	১৮-২০/বর্গফুট	১৩০০-১৪৫০	৫৩০০-৬০০০	১১ ফুট/দিন (সীমিত আকারে বয়ন করা হয় এবং এর করিগরের সংখ্যাও কম)
	শতরঞ্জি (২.৫ ফুট/৪ ফুট)	১২-১৫/ বর্গফুট	৭৫০-৯০০	৩০০০-৩৮০০	১টি/দিন
	শতরঞ্জি (ডিতন ফুট/ পাঁচ ফুট)	১০/ বর্গফুট	৭৫০-৮০০	৩১০০-৩৫০০	৫টি/সপ্তাহ
	বেনারসি	৩২৫-৪০০/প্রতিটি	১৩০০-১৬০০	৫৫০০-৬৫০০	৪টি/সপ্তাহ
দিনাজপুর-পঞ্চগড়	ধোকড়া(বয়নের ঘনত্ব অনুসারে)	২৫০-৩০০/ প্রতিটি	১০০০-১২০০	৪০০০-৪৮০০	৩-৪টি/ সপ্তাহ/বয়নকারীরাই বিক্রি
	সুতিবস্ত্র (লুঙ্গি / ডিজাইন)	৪০-৪৫/প্রতিটি	৭৫০-১০০০	৩১০০-৪২০০	৩-৪ পিস/ দিনে
	সুতি বস্ত্র (লুঙ্গি/ সাধারণ)	৩০-৩৫/ প্রতিটি	১০৮০-১৪৭০	৪৩৫০-৫৯০০	৬-৭ পিস/দিনে
পাবনা-সিরাজগঞ্জ	সুতিবস্ত্র (শাড়ি/ সাধারণ)	১০০-১২০/ প্রতিটি	৬০০-৭২০	২৫০০-৩০০০	১ পিস/দিনে
	সুতিবস্ত্র (শাড়ি/ ডিজাইন যুক্ত)	২০০-২৫০/ প্রতিটি	১০০০-১২৫০	৪২০০-৫১০০	৫ পিস/ সপ্তাহে
রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ	রেশমবস্ত্র (শাড়ি)	২১/ প্রতি গজ	৬০০-৬৫০	২৫০০-২৮০০	৫ গজ/ দিনে
বগুড়া-জয়পুরহাট	উলের চাঁদর (ছোট)	২০/ প্রতিটি	৯৬০-১২০০	৪০০০-৫০০০	৮-১০ পিস/দিন। ডিজাইন যুক্ত। মূলত মৌসুমভিত্তিক কাজ
	উলের চাঁদর (বড়)	২৫/ প্রতিটি	১২০০-১৫০০	৫০০০-৬২০০	৮-১০ পিস/ দিন। ডিজাইন ছাড়া। মূলত মৌসুমভিত্তিক কাজ
ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল	সুতিবস্ত্র (শাড়ি) সাধারণ ডিজাইন	৩০০-৪০০/ প্রতিটি	৬০০-১২০০	২৪০০-৪৮০০	২-৩টি/ সপ্তাহে
	সুতিবস্ত্র (শাড়ি) ভারি ডিজাইন	৪০০-৫০০	৮০০-১০০০	৩২০০-৪০০০	২টি/সপ্তাহে
কুষ্টিয়া-মেহেরপুর	সুতিবস্ত্র (লুঙ্গি)	১৫-২০/ প্রতিটি	৫০০-৭০০	২২০০-৩০০০	৫-৬পিস/ দিন
	সুতিবস্ত্র (রুমাল)	প্রতি পিস হিসেবে	৭০০-৮০০	৩০০০-৩৪০০	নকশি করা। তাঁত কারখানায় তৈরি
	সুতিবস্ত্র (বেডশিট)	প্রতিটি হিসেবে	৭৭০-৯০০	৩২০০-৩৮০০	নকশি করা। তাঁত কারখানায় তৈরি
	সুতিবস্ত্র (বেডশিট)	প্রতিটি হিসেবে	৫০০-৬০০	২২০০-২৬০০	সাধারণ। তাঁত কারখানায় তৈরি
	সুতিবস্ত্র (টেবিল ক্লথ)	প্রতিটি হিসেবে	১২৫০-১৩০০	৫০০০-৫৫০০	বিদেশে রপ্তানি করার জন্য
	সুতিবস্ত্র (চেক বিছানার চাঁদর)	প্রতিটি হিসেবে	১৩০০-১৩৫০	৫৪০০-৫৮০০	বিদেশে রপ্তানি এবং বুটিক হাউসে বিক্রির জন্য

তাঁত অঞ্চল	তাঁতপণ্য	মজুরি প্রদানের ধরন	সাপ্তাহিক আয় (টাকা)	মাসিক আয় (টাকা)	উৎপাদনের পরিমাণ ও অন্যান্য মন্তব্য
	সুতিবস্ত্র (নকশি বিছানার চাঁদর)	প্রতিটি হিসেবে	১৩০০-১৪০০	৫০০০-৫৩০০	বিদেশে রপ্তানি করার জন্য
	সুতিবস্ত্র (রানার)	প্রতিটি হিসেবে	১২০০-১২৫০	৫০০০-৫৩০০	বিদেশে রপ্তানি করার জন্য
	সুতিবস্ত্র (প্লেচমেট)	প্রতিটি হিসেবে	১১০০-১১৫০	৪৫০০-৪৮০০	বিদেশে রপ্তানি করার জন্য
	সুতিবস্ত্র (রুমাল)	প্রতিটি হিসেবে	১২৫০-১৩০০	৫২০০-৫৫০০	সাধারণত বিদেশে রপ্তানি হয়
	সুতিবস্ত্র (ওড়না)	১৫/ প্রতিটি	৯০০-১০০০	৩৮০০-৪২০০	১০ পিস/ দিন
ঢাকা-নরসিংদী অঞ্চল	এন্ডি থানকাপড়	১৫/প্রতি গজ	৯০০-১০০	৩৮০০-৪২০০	১০গজ/দিন
	জামদানি	প্রতিটি হিসেবে	৭০০-১৩৫০	৩০০-৫৫০০	নকশার ওপর কাজের মজুরি কম বেশি হয়
	বেনারসি	প্রতিটি হিসেবে	৫০০-১০০০	২০০০-৪০০০	মজুরি নির্ভর করে নকশার ওপর। যে কারিগর যত ভালো নকশা করতে পারে, তার মুজরি তত বেশি। (এমনও জানা গেছে, একজন কারিগর প্রায় ৩০০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পায়। আমাদের প্রদত্ত হিসাবটি হচ্ছে কম নকশাযুক্ত বেনারসি শাড়ির। এগুলো সপ্তাহে দুটি করে তৈরি করা সম্ভব।
কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া	খদ্দর	প্রতিগজ হিসেবে	৭০০-৮০০	৩০০০-৩৫০০	বুটিক হাউসে বিক্রির জন্য
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার	সুতি	১৫/ প্রতি গজ	৯০০-১০০০	৩৮০০-৪২০০	১০গজ/দিন
খুলনা-বাগেরহাট	সুতি(গামছা/বড়)	১০/ প্রতিটি	৪৮০-৫০০	২০০০-২২০০	৮টি/ দিন
	সুতি(গামছা/ মাঝারি)	৫/ প্রতিটি	৩০০-৩৫০	১৩০০-১৫০০	১০টি/ দিন
যশোর-মাগুড়া	সুতি (গামছা)	১০/ প্রতিটি	৪৮০-৬০০	২০০০-২৫০০	৮-১০টি/ দিন
নোয়াখালী-লক্ষীপুর	সুতি (খাদি)	২০-২৫/ প্রতিগজ (ভারি ডিজাইন)	৫২০-৬৫০	২২০০-২৮০০	৪.৫ গজ (৪ মিটার)/ দিন
সিলেট-মৌলভীবাজার	ফানেক	প্রতিটি হিসেবে	৮০-১০০	৬৪০-৮০০	ব্যাপক মাত্রায় বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয় না। বাড়িতে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়। খুব অল্প পরিমান বিক্রি হয়। পরিবারের নারীরাই তৈরি করে এগুলো। মজুরির পরিমাণ বিভিন্ন মনিফুরি গ্রামে বিভিন্ন রকম।
	শাড়ি	প্রতিটি	২৫০-৩০০	১০০০-১২০০	শাড়ি উৎপাদন সীমিত পরিমাণ
	ওড়না	প্রতিটি	১৮০-২১০	৩৫০০-৪০০০	ওড়না উৎপাদনে সীমিত

তাঁত অঞ্চল	তাঁতপণ্য	মজুরি প্রদানের ধরন	সাপ্তাহিক আয় (টাকা)	মাসিক আয় (টাকা)	উৎপাদনের পরিমাণ ও অন্যান্য মন্তব্য
					পর্যায়ের
পার্বত্য চট্টগ্রাম	আদিবাসী বস্ত্র				বেশিরভাগ উৎপাদিত হয় নিজেদের ব্যবহারের জন্য। কিছু মাত্রায় বাইরে বিক্রি হয়। মজুরির পরিমাণ বিভিন্ন রকম।
	সুতিবস্ত্র (গামছা-বড়) (৫ হাত/ পৌনে তিন হাত	৭০০/ পতি থান (৪টি তে ১থান)	২১০০	৮৫০০	৩থান/সপ্তাহ। সুতার দামসহ
	মশারি	৬৫০-৮১০/ থান হিসেবে ৩ হাত/ ৪ হাত	২০০০-২৪৫০	৮০০০-৯৮০০	৩ থান/ সপ্তাহ সুতার দামসহ
	উল বস্ত্র (থামি)	২৫০-২৮০/ প্রতিটি	৫০০-৫৬০	২০০০-২২৪০	২টি/ সপ্তাহ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
	উল বস্ত্র (লুঙ্গি)–	২৮০-৩৫০ / প্রতিটি	৫৬০-৭০০	২২৪০-২৮০০	২টি/ সপ্তাহ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
বরিশাল-পটুয়াখালী	উলবস্ত্র (শার্ট পিস)	১০০-১৩০/ প্রতিটি	৩০০-৩৯০	১২০০-১৫৬০	৩টি/ সপ্তাহ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
	উলবস্ত্র (ব্যাগ)	২৮০-৩০০/ প্রতিটি	৮৪০-১২০০	৩৫০০-৫০০০	৩-৪টি/ সপ্তাহ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
	উলবস্ত্র (চাঁদর)	২০০-২৫০/ প্রতিটি	১০০-১০০০	৪০০-৪৫০০	৪-৫টি/ সপ্তাহ ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
	উলবস্ত্র (মাফলার)	৫০-১৫০/ প্রতিটি	৬০০-১৮০০	২৪০০-৭০০০	২টি/ দিন ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে। মৌসুমি কাজ। মূলত শীতকালে
	সুতিবস্ত্র (গামছা/ ছোট)	৩৫/ পাতা (৪টিতে ১ পাতা)	৬৩০-৮৪০	২৬০০-৩৫০০	১৮-২৪ পাতা/ সপ্তাহ
	সুতিবস্ত্র (লুঙ্গি)	৩০০/ প্রতি বিম	১৮০০-২০০০	৭২০০-৮০০০	১ (বিম/ দিন (৬টিতে ১ বিম)
ফরিদপুর-রাজবাড়ী	জামদানি	মাসিক	-	২০০০	
	পাটর ম্যাট (৩০ গজ দৈর্ঘ্য)	১২০/গজ	১২০০-১৬০০	৫০০০-৬০০০	১টি/সপ্তাহ

বি.দ্র: সপ্তাহে ৬টি কার্যদিবস হিসাবে ধরা হয়েছে, একদিন ছুটি।

উপরের সারণিটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যারা সাধারণ গামছা,লুঙ্গি বা শাড়ি তৈরি করে; সেইসব তাঁতির মজুরি বা আয় সবচেয়ে কম। যারা নকশাদার শাড়ি বা অন্যান্য বস্ত্র তৈরি করে, তাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক আয় অপেক্ষাকৃত বেশি। এছাড়া যারা শহরের বুটিক হাউস বা বিদেশে রপ্তানির জন্য পণ্য তৈরি করে থাকে, তাদেরও আয় তুলনামূলক হার বেশি। এছাড়া দেশের তাঁত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীর নব্বই দশকের আয়ের বিবরণটাও দেখা যায় পরবর্তী সারণি থেকে।

সারণি-৪.৯: তাঁতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীর আয়

কাজের ধরন	আনুমানিক আয় (সাপ্তাহিক)	আনুমানিক আয় (মাসিক)	মন্তব্য
সুতাকাটুনি	১৫০	৬০০-৭০০	প্রতি ছটাক ৪ টাকা হারে ১ কেজি তুলার সুতা কেটে একজন কাটুনি মজুরি পায় ৮০ টাকা। ১ কেজিতুলার সুতা কাটতে আনুমানিক ? দিন সময় লাগে
রং শ্রমিক	৫০০-৬০০	২১০০-২৫০০	অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়
রং মাস্টার	৮০০-৯০০	৩৪০০-৪০০০	অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়
পারি/ মারি করা	-	-	সাধারণত বাড়ির মেয়েরাই এটা করে থাকে।
বও করা			প্রতিবও বাবদ ২০ টাকা।সাধারণত বাড়ির মেয়েরাই এটা করে থাকে
ববিন করা	২৫০-৩০০	১০০০-১৪০০	অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়
নলি ভরা	২০০-২৫০	৮০০-১২০০	অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়
সানা করা	-	-	সাধারণত বাড়ির মেয়েরাই এটা করে থাকে
টানা হাটা	২০০-২২০	৩০০০-৩৫০০	প্রতি টানা হিসাবে, সুতারদাম তাঁতির
ড্রামমাস্টার	৭০০-১২০০	৩০০০-৫০০০	দক্ষতা ও অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়
জ্যাকার্ড মাস্টার	১০০০-১৫০০	৪২০০-৬৫০০	দক্ষতা ও অঞ্চলভেদে মজুরির পার্থক্য হয়

উৎস: Latif MA, *Handloom Industry of Bangladesh (1947-1987)*, (Dhaka,1997).

এই তালিকা থেকে থেকে তাঁতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীর আয় রোজগার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল। সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে রংমাস্টর, ড্রামমাস্টার ও ক্যাকার্ড মাস্টারের আয়ের পরিমাণ অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু তাঁতি বা তাঁত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের যে মাসিক উপার্জন, তার মাধ্যমে স্বচ্ছল জীবন যাপন করা সম্ভব কী? সাধারণত এই কাজের পাশাপাশি তাদের অন্যান্য আয়ের উৎস না থাকলে জীবন যাপন বেশ কঠিন। অন্তত এখনকার (২০১৭) বাজারদরের পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়। (১ কেজি মোটা চাল = ৪০-৪২ টাকা)

৪.২৫ জামদানি পল্লী ও অন্যান্য এলাকার তাঁত ব্যবসার বর্তমান অবস্থা

বাংলার ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পকে সংরক্ষণ সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে রূপগঞ্জ তারাব অঞ্চলে যে তাঁতশিল্পী সারা সপ্তাহ কাজ করে একটি জামদানি শাড়ি কেনে, তার সাপ্তাহিক গড় আয় ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা। সাগরেদের আয় আরো কম, আনুমানিক ১০০০-১২০০ এক হাজার থেকে একহাজার দুইশত টাকা। এই শাড়িটি স্থানীয় মহাজন কিনে থাকেদুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ কারখানার মালিকপক্ষ বহন করে। সেক্ষেত্রে তাঁতিদের মজুরি+কাচামাল+মুনাফা এই টাকার অন্তর্গত। উৎপাদিত পণ্যটি ঢাকার বিপণিবিতানের মালিকপক্ষসাধারণত কিনে থাকে আড়াই হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে। আর তারা সাধারণত এটা বিক্রি করে থাকে ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকায়।[৭৪]

টাঙ্গাইল শাড়িঃ টাঙ্গাইল শাড়ির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ঢাকার বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস সাধারণত অর্ডারের ভিত্তিতে টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরি করে। তবে অনেক সময় বাজিতপুর হাট বা কোনো মহাজনের

বাড়ি থেকেও তারা শাড়ি সংগ্রহ করে। নকশাদার বা বুটিকযুক্ত তাঁতের শাড়ি সাধারণত যেভাবে কেনা হয়, সেভাবেই বিক্রি করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শাড়ি কেনার পর ফ্যাশন হাউসগুলো বিভিন্ন মাধ্যম নানারকম নকশা যুক্ত করে থাকে।[৭৫]

যেগুলোর নকশা নিজেদের পরিকল্পনামাফিক করা হয় সেগুলো সাধারণত সাড়ে তিনশ থেকে সাড়ে চারশ টাকায় সংগ্রহ করা হয় এবং ঢাকার বাজারে সাড়ে পাচশ থেকে ছয়শ টাকায় বিক্রি করা হয়। তবে যদি নিজেদের কারখানায় শাড়ির সাথে নকশা যুক্ত করা হয়, তাহলে সেটার দাম আরও বাড়ে।

দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়, প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন খরচ খরচা বাদ দিলেও শহরের বিপণিবিতানগুলোর মুনাফার পরিমাণ শাড়ি প্রতি অন্তত শতকরা ত্রিশ ভাগ। ফলে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, তাঁতশিল্পের বাজার ও বিপণনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে লাভবান হয় মহাজন শ্রেণি ও শহরের ব্যবসায়ীরা। ভালো ব্যবসা হলেই তাঁতিদের ভাগ্য খুব যে পরিবর্তন হয়, তা নয়।[৭৬]

৪.২৬ বিশেষ উৎসব ও দিবসগুলিতে ব্যবহার্য তাঁতের শাড়ী

বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী উৎসব যেমন: পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন, একুশে ফেব্রুয়ারী, ২৬শে মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর এবং ভালবাসা দিবসে বাঙালি নারীরা উৎসবভিত্তিক রংবে রং এর তাঁতের শাড়ী পরিধান করে থাকে। প্রতিটি তাঁতের শাড়ী গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে ক্রয় করা যায়। উৎসবভিত্তিক শাড়ীগুলোর ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। শো-রুমগুলো সরাসরি তাঁত কারখান থেকে শাড়ী সংগ্রহ করে থাকে বলে মধ্যস্বত্বদের ভূমিকা কম থাকে।

ব্যবহৃত বিষয়টা বোঝার জন্য তাঁতিদের সাথে মহাজনদের সম্পর্কের ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মহাজনরা তাঁতিদের সুতাসহ বিভিন্ন কাচামাল সরবরাহ করে এবং সংসার খরচের টাকাও দেয়। এর বিনিময়ে তাঁতি শাড়ি উৎপাদন করে দেয। তাঁতির প্রাপ্য শুধু মজুরিটা। সারা বছর এই হিসাবে কাজ চলে। তাঁতি তার প্রয়োজনীয় কাচামাল ও সংসার খরচের টাকা মহাজনেরকাছ থেকে নিয়ে থাকে এবং সারা বছর মহাজনের নির্দেশে তার প্রয়োজনমতো কাপড় তৈরি করে দেয়। বছর শেষে হিসাব হয় এবং সেখানে দেখা হয়, মহাজনের কাছ থেকে তাঁতি বিভিন্ন উপলক্ষে কী পরিমাণ টাকা নিয়েছে এবং এর বিপরীতে কী পরিমাণ কাপড় সে সরবরাহ করেছে। যদি মহাজনের কাছে তাঁতির কিছু ধার থাকে, তাহলে সেটা কাজের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়।আর যদি মহাজনের কাছে তাঁতির পাওনা থাকে, তাহলে সেটা মহাজন দিয়ে দেয় এবং নতুন করে হিসাব শুরু হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহাজনের হিসাবে পাল্লাই বেশি ভারী থাকে এবং বছরের পর বছর মহাজনের কাছে তাঁতির ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে।খুব কম ক্ষেত্রে তাঁতি মহাজনের ঋণ শোধ করে স্বাধীন হতে পারে। অবশ্য এটাও ঠিক যে মহাজনী প্রথার কারণে তাঁতি তার উৎপাদিত পণ্যটি বিক্রি হোক বা না হোক, এক ধরনের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এ বিষয়ে ভিন্ন ধরনের তথ্য উঠে আসে, এক শ্রেণির তাঁতীরা বিভিন্ন ফ্যাশন

হাউজের অর্ডার পেয়ে অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের সংসার ভাল চলছে। তারা পণ্যের ভাল দরও পাচ্ছে। নিজেদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলছে ঘরে ঘরে রঙিন টেলিভিশন শোভা পাচ্ছে। যদিও তাঁতিরা কাজের বিনিময়ে যে মজুরি পায়, তা যথেষ্ট কিনা, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ।[৭৭]

৪.২৭ তাঁত বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজার

মসলিনসহ অন্যান্য সূক্ষ্ম সুতি তাঁত বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজার বরাবরই বিদ্যমান ছিল। যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রমাণ সাম্প্রতিককালে একটি গবেষণায় যেসব তথ্য পাওয়া যায়,

> Ancient Bengal's prominence in producing finest-quality cloth was well blowout across the globe. Textile produced in Bengal and made of hemp, cotton, and silk as well as the cotton fragments and threads found from the burial site in Ban Don Ta Phet and Khao Sam Kaeo of Thailand (Glover & Bellina, 2011; Glover, 1990, Tripati, 2017, p. 11) that indicate the trade of this item with Southeast Asian region. Besides, the resemble textile found in the Ban Chiang in Thailand (Srisuchat, 1996) as well...
>
> A massive amount of coarse and fine cotton textiles (painted and printed), muslin cloth, carpets, and cushions merchandised in the different Southeast Asia countries, and the Bengal's Muslin even had the high demand in the Roman world and beyond.[৭৮]

ইতোমধ্যে বাংলার তাঁতশিল্প বিষয়ক আলোচনায় বাণিজ্য পথ, বিদেশি বণিক ও রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে খ্রিস্টপূর্ব ছয়শতক থেকে (কিংবা তার আগেই) বাংলাদেশে তাঁতবস্ত্র তৈরি হচ্ছে এবং প্রায় খ্রিস্টের জন্মের কাছাকাছি সময় থেকে বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়েছে। বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্রের বাজার ছিল খুবই বিস্তৃত। এই বিস্তৃত বাজারের তালিকায় মেসোপটেমীয়া থেকে গ্রিস, রোম থেকে শুরু করে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এবং থাইল্যান্ড, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, জাভাসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নাম জানা যায়। বিভিন্ন পরিবর্তন ও উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলেও মোটামুটি উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশের তাঁতপণ্যের এই বিশাল বাজার অক্ষুণ্ন ছিল। শুধু ইংরেজ বণিকদের মাধ্যমে উনিশ শতকের গোড়ায় যেসব দেশে বাংলাদেশের তাঁতপণ্য রপ্তানি হয়েছিল, তার একটা তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে এর ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব। এখানে ১৮০২-০৩ এবং ১৮২১-

২২ খ্রিস্টাব্দে যেসব দেশে বা শহরে বাংলাদেশ থেকে তাঁতপণ্য পাঠানো হয়েছে, সেগুলো ছিল- লন্ডন, লিসবন, ক্যানডিজ, আমেরিকা, বাটাভিয়া, ম্যানিলা, আরব ও পারস্য উপসাগরীয় দেশসমূহ, সুমাত্রা উপকূল, মালাবার উপকূল, করমন্ডল উপকূল, পেনাং অ্যান্ড ইস্টওয়ার্ড, চীন, পেগু, মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ, মরিশাস, মাল্টা ও জিব্রালটার, ব্রাজিল, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তমাশা অন্তরীপ, জাভা, নিউ সাউথ ওয়েলস ইত্যাদি।[৭৯] যেসব দেশি-বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে তাঁতপণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপণন হতো, সে সম্পর্কেপ্রথম অধ্যায়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। এখানে আর তা পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

ইউরোপের সাথে ভারতের সরাসরি বাণিজ্যপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসব তাঁতপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আরব বণিকদের ব্যাপক আধিপত্য ছিল। আরব দেশের বণিক সোলায়মান ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যার নাম সিলসিলাত উত তাওয়ারীখ।[৮০] এই গ্রন্থে আরব বণিকদের বিভিন্ন বাণিজ্যপথের আকর্ষণীয় বর্ণনা ছিল। সোলায়মানের বর্ণনায় এবং ভৌগোলিক বিবরণে এমন এক অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে পণ্ডিতদের মতে যা তৎকালীন বঙ্গদেশ। সেই গ্রন্থে এমন কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল যাকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৮১] জলপথে ও স্থলপথে এই আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের দ্রব্যাদি ইউরোপে বা আফ্রিকায় পৌঁছাত। কিন্তু পনেরো শতকের পর থেকে জলপথে ক্রমে পর্তুগিজ বণিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং আরব বণিকদের প্রভাব কমতে থাকে। এছাড়া ফরাসি, ডাচদের কিছু প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে অন্যান্য যেসব ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্যের কারণে এসেছিল, তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা টিকে থাকে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৭) বাংলা ও বিহারের রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেবার পর বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। তাঁতপণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যেও এর প্রভাব পড়েছিল।[৮২]

> The piece-goods production and export began to show upward trend from the early 1790s, is spite of many obstacles thrown by the French Revolutionary War. According to an official estimate of the East India Company, 459190 units of piece-goods of various assortments were exported from Bengal in 1789. But soon piece-goods export obtained such a spurt that it increased manifold within the next five years. According to the Board of Trade's report 2287479 units of piece-goods were exported in 1795/6 by private merchants of Asia, Europe and America the pre-shipment value of about 23% of the total private exports from he country for the year.[৮৩]

তাছাড়া ওলন্দাজ কিংবা ফরাসিরা আরো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বাংলায় বাণিজ্য করেছে। পাশাপাশিইরানি কিংবা আর্মেনিয়ান কিংবা হিন্দু বণিকরাও আরও কিছুদিন বাণিজ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাঁতপণ্যের বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রক্ষমতা নিজেদের দখলে থাকায় অন্য বণিকদের হটিয়ে দিয়ে ইংরেজদের পক্ষে ভারতের তাঁতপণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে। উনিশ শতক পর্যন্ত জল ও স্থলপথে দেশি বিদেশি বণিকদের মাধ্যমে বাংলার বিচিত্র তাঁতপণ্যের সমাহার বিভিন্ন দেশে বিপণণ হতো। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের এই সুবিশাল বাজার ধ্বংস হয়ে যায় উনিশ শতকের মধ্যে। প্রথমত আঠারো শতকে ইউরোপে, ইংল্যান্ডে বয়নশিল্পের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটে এবং দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষ তখন ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল এই দুটি কারণে ভারত, তথা বাংলার তাঁতপণ্য এই বিস্তৃত আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ছিটকে পড়ে। বরং উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলা তথা ভারত পরিণত হয়ে ইংল্যান্ডের মিলের সুতা ও মিলের কাপড়ের বাজারে। এভাবে তাঁতপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের চেহারা এবং রপ্তানি বাণিজ্যের গতিপথ পাল্টে যায়। যেখানে বাংলা ছিল উৎপাদনশীল দেশসেখানে বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়ায়ব্রিটেনের তাঁতবস্ত্রের বাজার। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বস্ত্র সামগ্রীর যে সুবিশাল আন্তর্জাতিক বাজার ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সেটার অবসান ঘটে।[৮৪]

৪.২৮ সমুদ্রপথে বাণিজ্য

সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ফলে ভৌগোলিকভাবে বিশাল এলাকা নিয়ে বস্ত্র উৎপাদনের কার্যক্রম গড়ে উঠেছিল।শতকের মধ্যে সকল আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সংযোগ গড়ে উঠেছিল।[৮৫] একটা পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরবরাহ উৎসের নিকট স্থাপনা তৈরির প্রয়োজন বোধ করল, যেখান থেকে অগ্রিম টাকা দেয়া এবং পণ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করা সহজ হবে। ১৭৫০ সালের মধ্যে প্রধান নদীগুলোর তীরে গড়ে উঠা বাজারগুলোতে এ ধরনের অনেক স্থাপনা গড়ে উঠে। প্রত্যেক কোম্পানি প্রধান কারখানা থেকে অন্যান্য ছোট ছোট কারখানা, প্রতিনিধি এবং আড়ং এর মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করত। দিনেমারদের একমাত্র কারখানাটি ছিল সেরামপুরে; ওলন্দাজদের প্রধান কারাখানা ছিল হুগলি নদীর তীরবর্তী চিনিশুরাতে। উনিশটি প্রধান কারখানা বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রসহ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপক ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি কারখানার অধীন কয়েকটি আড়ং ছিল।

The whole country was divided into many procurement districts, each of which was subdivided into some production centres called auranges. Main aurangs included Dacca, Patna, Tanda, Kasimbazar, Radhanagar, Barnagar, Harripal,

Shantipur, Malda, Beneres, Burreon, Midnapur, Rangpur, Beerbhum, Laxsmipur, Chittagong, Sylhet and Bhagalpur.

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব কারখানাসমূহে নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। কারখানাগুলো বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। কারখানাগুলো ইউরোপ হতে প্রাপ্ত পণ্যের কার্যাদেশ আড়ংসমূহে পাঠানো হতো এবং কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলকাতা, চিনশুরা বা চন্দনগরে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতো।

৪.২৯ আন্ত মহাদেশে বাণিজ্য

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বস্ত্র বাণিজ্য কয়েকটি মহাদেশ ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। ফলে কোম্পানির বিনিয়োগের বিষয়টি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির ব্যাপক জ্ঞান ছিল বিধায় কোম্পানি পণ্যের যথাযথ চাহিদা এবং মূল্য নির্ধারনে বেশ দক্ষ ছিল। বার্ষিক উৎপাদন তালিকা তৈরি, সরবরাহ কাল এবং মূল্য নির্ধারণের বিশাল ব্যবস্থাপনার জন্য এ ধরনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল অপরিহার্য। বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতো তিনটি পর্যায়ে; লন্ডন, ফোর্ট উইলিয়াম এবং কোম্পানির কারখানায়। প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের মধ্যে লন্ডন হতে বিনিয়োগ আদেশ পাঠানো হতো যাতে করে নভেম্বরের মধ্যে তা ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে প্রতিটি কারখানার জন্য পণ্য উৎপাদনের আদেশ আসত। তাঁতীরা কাপড় সরবরাহের কমপক্ষে দু'বছর আগেই পণ্য নির্বাচনের সময় কোম্পানির ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হতো। সময়ের এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে লন্ডন অফিস এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরের দামের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া লন্ডনস্থ যোগাযোগ কমিটি পূর্ববর্তী বছরের দামের ভিত্তিতে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করতো বলে পণ্য উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে এর কোন মিল ছিল না। "This disparity led to acrimonious debate between the Court of Directors and its officials at Fort William. Several measures were introduced to ensure proper supervision of trade."[৮৬] কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের যথাযথ তত্ত্বাবধান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়।[৮৭] বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৭৫৩ সালে আড়ং কমিটি তৈরি হয়। পরে ফোর্ট উইলিয়াম হতে ব্যবসা-বাণিজ্য তত্ত্বাবধান করার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ সালে প্রবর্তিত আইনের মাধ্যমে রাজস্ব বিভাগকে ব্যবসা থেকে আলাদা করা হয় এবং ১৭৭৪ সালে কমিটি অব আড়ং এর স্থলে বোর্ড আব ট্রেড গঠন করা হয়।[৮৮]

৪.৩০ ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের প্রতিযোগিতা

ভারতবর্ষ ও বাংলার ব্যবসায়ে বিদ্যমান ইউরোপীয় কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দালাল বা তাঁতীদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা করা কোম্পানির জন্য কঠিন ছিল। ১৭৮০ এর দশক পর্যন্ত ওলন্দাজ, ফরাসি এবং দিনেমারদের ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ভালভাবেই চলছিল। এমন কি ১৭৬৪ সালে যখন ওলন্দাজদের রপ্তানি বাণিজ্য পতনোম্মুখ ছিল তখনো ভি.ও.সি ৪৭,০০০টি কাপড় ক্রয় করেছিল।[৮৯] আমেরিকা বাংলার সাথে ১৭৯০ পর্যন্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

> Unitl early 1790s America's India trade was conducted from the Indian Ocean Isle of France (Mauritius), and than the base was shifted to Calcutta to cope with the very rapid growth of the East Indies trade from the beginning of the Revolutionary war in Europe. America's China trade was conducted from Calcutta and Canton legue to Operate their eastern trade autonomously.[৯০]

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেলে বিরোধী কোম্পানিগুলো কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসা করা নিরাপদ মনে করে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা, কর্মচারী এমন কি আবাসিক প্রতিনিধিদের কেউ কেউ গোপনে কাপড়ের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। ১৭৭৫ সালে ফরাসি কোম্পানি ঢাকাতে কাপড় ক্রয় করার সময় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদেরকে ৫০,০০০,০০ রুপী ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছিল।[৯১] ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীর অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে নামে-বেনামে বেনিয়া বা সরকার বা সরকারি গোমস্তাদের নিকট হতে কাপড় ক্রয় করে ব্যবসা করতো। স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানির কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে কোম্পানির বিরোধ ঘটে। রপ্তানির উদ্দেশ্যে আড়ংসমূহ হতে যে কাপড় ক্রয় করা হতো তন্মধ্যে ইংরেজ আবাসিক প্রতিনিধির অংশটি ছিল সবচেয়ে বেশি।

ঢাকা আড়ং এ মোট বিনিয়োগ	৬,০০,০০০/-
কোম্পানির বিনিয়োগ	৮,০০,০০০/-
স্বাধীন ব্যবসায়ী	৭,৫০,০০০/-
আর্মেনিয়ান ও গ্রিক	২০,০০,০০০/-
দেশীয় ব্যবসায়ী	১২,০০,০০০/-
আবাসিক প্রতিনিধি	১২,৫০,০০০/-[৯২]

কোম্পানি এবং আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির যৌথ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ৩৪% কিন্তু এই ৩৪% এর মধ্যে আবাসিক প্রতিনিধির শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৫০% যেটা ছিল কোম্পানির পরিমাণের চাইতে বেশি, যেখানে সে চাকুরি করত।[৯৩] এ ধরনের ব্যবসায় তাঁতীদের কি মুনাফা ছিল বোর্ড অব ট্রেডের এক প্রতিবেদনে তা বর্ণিত হয় নিম্নোক্তভাবে:

> The high price the Free Merchants give for cloth enables the weavers to furnish the Company's investment at its present low rates and further enables the weavers who are mostly ryotts to pay their revenues. While the resident availing himself of the Company's name compels the weavers to deliver to him the Company's assortments at the company's rates, which deprive the manufacturer of 15, 20, 30 and in some instances 50% which would be given above the Company's rates by free Merchants.[৯৪]

৪.৩১ বাংলার সাথে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের বস্ত্র বাণিজ্য ও এ বিষয়ের প্রতি মার্কিন নীতি নির্ধারকদের গুরুত্ব

ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভারতবর্ষের বাজার প্রতিযোগিতার সময়েও তখনও বাংলায় বাণিজ্যে আমেরিকানদের উপস্থিতি ছিল।

> The Board of Trade's annual reports tell that it was the presence of Americansin the Bengal *bazaars* that played crucial role in the expansion of the piece-goods market. Piece-goods export on account of the company diminished drastically in the 1790s due to its conquering activities in South India, which consumed most of the surplus revenues of Bengal.[৯৫]

১৭৮০ সালে জন-ক্রি ১,০০,০০০ সিককা মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করেছিলেন। যেসব স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ী দিনেমারদের জাহাজ ব্যবহার করতো তারা বিভিন্নভাবে দিনেমারদের সহযোগিতা করত। সকল জেলাতেই যেসব জায়গায় কোম্পানির বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সেসব স্থানে কোম্পানির কর্মচারীদের পাশাপাশি প্রাইভেট ব্যবসায়ীরাও পণ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। অনেক প্রাইভেট ব্যবসায়ী কাপড় ক্রয় এবং সংরক্ষণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় তাদের কুঠির নির্মাণ করেছিল। ঢাকার আড়ংগুলোতে তিতাবাদী, সোনারগাঁ, ধামরাই এবং শ্রীরামপুরে কমপক্ষে আটজন বৃটিশ ব্যবসায়ীর কুঠি ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়।[৯৬] এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কতগুলি ইউরোপীয়ান এজেন্সি হাউসগুলোর সাথে যোগসূত্র ছিল।

বাংলার তৎকালীন বাণিজ্য পরিস্থিতি গুরুত্ব বুঝা যায় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস এর লেখা একটি পত্র থেকে।

> John Adams, first vice president and second president of the USA, who was more remarkable as a political philosopher than as a politician was enthusiastic about launching foreign trade

with the Orient. He observed, while working as a diplomat in France and Hollan during the Revolutionary War, how mar time Europe was enriching itself from the East India trade. Adams advised his countrymen to follow the footstep of the Europeans and move to the east in search of fortune. Elaborating his idea on the prospects of East India trade. He wrote to his fellow traveler John Jay, chief and negotiator at Paris Peace Conference (1783):

There are many persons in the European factories in India particularly the English who have accumulated large property, which they wish to transmit to Europe [*clandestinely*], but have not been able to do it.... These would be glad to sell us their commodities, and take our bills of exchange upon Europe or America....Therefore, there is no better advice to be given to the merchants of the United States, than to push their commerce to the East Indies as fast as it will go.[৯৭]

৪.৩২ অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর বস্ত্র ব্যবসা

১৭৯৬-৯৭ সালে কলকাতায় সেসব জাতির লোকজন ব্যবসার সাতে জড়িত ছিল তারা ছিল-বৃটিশ, আমেরিকান, পর্তুগিজ, ফরাসি, দিনেমার, ইহুদি, আর্মেনিয়ান, ইরানিয়ান, (হিন্দু), গেন্টুস তেলেঙ্গা ব্যবসায়ী), মোগল, আরব, চীনা এবং বার্মিজ[৯৮] গতিশীল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাঁতী বস্ত্র উৎপাদন কাজে উৎসাহ বোধ করেছিল। যদিও কোর্ট অব ডিরেক্টর বাহ্যত সকলের জন্য ব্যবসার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল কিন্তু এর কর্মকর্তারা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হয়রানি করতো এবং তাঁতীদের সাথে তাদের লেনদেন বাধা সৃষ্টি করত। ওলন্দাজ বাণিজ্যের উপর কোম্পানি কর্মকর্তাদের নানারকম হয়রানি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সাথে চিনিশুরাতে অবস্থিত ওলন্দাজ কর্মকর্তাদের কয়েক দফা দেন-দরবার হলেও বাস্তবে কোন কাজ হয়নি। ১৭৮৪ সালে মালাকার ওলন্দাজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কোম্পানির কার্যাদেশ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁতীরা যাতে অন্য কোন ব্যবসায়ীদের নিকট বস্ত্র বিক্রি করতে না পারে সেজন্য বাধা দেয়া হয়। ১৭৮৫ সালের মধ্যে ওলন্দাজদের বস্ত্র বব্যসা প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের হতে চলে যায়।

The rise and decline of cotton textile manufactures in Bengal in the export sector has a close connection with the contemporary mercantilist commercialism of the Western

corporate companies in the Bay of region. Until their vigorous participation in the Bay of Bengal trade in the seventeenth century Eastern India's foreign market. The Asian traders operating in the India Ocean had close interaction with Bengal traders, but the scale of trade was again limited, and in their trade composition, piece-goods occupied an insignificant portion. It is ofcourse, an undisputed fact that the expansion of the Bengal piece-goods market on a global level was a feat of the Western maritime companies, particularly the French, Dutch and English East India Companies, Piece goods were becoming their favorite items from the 172s, and from the mid-eighteenth century piece-goods became the principal media of their trade in the Indian Ocean. Until these companies created the overseas market for Bengal cotton textiles, cotton manufactures were essentially directed to domestic regional and domestic markets.[৯৯]

৪.৩৩ বস্ত্র ব্যবসা বাণিজ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের দ্বন্দ্ব

বস্ত্র শিল্প ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফরাসিদের সাথে কোম্পানির বিরোধের বিষয়টি ছিল দীর্ঘদিনের। ফরাসি কোম্পানি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি হিসেবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার মোকাবেলা করে। ফরাসিরা দালাাল এবং তাঁতীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছিল ১৭৫৬ এবং ১৭৭৮ সালে তাদের কারখানাসমূহ কোম্পানি কর্তৃক দখলের ফলে সেসব সুবিধা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৫ এবং ১৭৮৩ সালে শান্তি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে সেসব ব্যবসায়িক অধিকার পুনঃবহাল করা হলেও ফরাসি কোম্পানির বিলুপ্তির পর প্রাইভেট ব্যবসায়ীরা তার স্থলাভিষিক্ত হয় যাতে করে বিনিয়োগ কাজে কোন রূপ অবনতি না ঘটে। ঢাকা এবং মালদার মতো বড় বড় বস্ত্র শিল্প শহরগুলোতে একটি বিরাট সংখ্যক তাঁতী ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে তারা দাবি করছিল। তাদের দাবি অনুযায়ী মালদহে তাদের ১২০০ তাঁতী ছিল, অন্যান্য তাঁতীরাও তাদের জন্য অতিরিক্ত সময় কাজ করতো।[১০০] ১৭৬৫ সাল হতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরাসিদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পাঁচ বা ছয়টি প্রধান কারখানায় সীমিত রাখার চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু ফরাসিরা তাদের ব্যবসা সবখানে কমবেশি অব্যাহত রাখে। তারা অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং তাঁতীদেরকে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানানোর জন্য সকল ছোট ছোট বাণিজ্য কেন্দ্রে ফরাসি পতাকা উত্তোলন করত। ১৭৬৫ হতে ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অনুসন্ধান হতে দেখা যায় যে, রাজনগর, সোনামুখী, রংপুরসহ কমপক্ষে ১০টি আড়ং এ ফরাসিদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছিল। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ফরাসিদের বিরোধ সবচেয়ে বেশি ছিল মালদহে।

যাহোক ১৭৮৪ সালের মধ্যে ফরাসি বাণিজ্য আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালের অনুসন্ধান কার্যে এটা প্রমাণিত হয় যে, ফরাসিরা বস্ত্রপণ্য ক্রয়ের জন্য চুনিগাঁ হাট, পরগনা পানজা এবং গনিগঞ্জে কারখানা পরিচালনায় সফল ছিল। ঢাকাতে ফরাসিরা দালালের মাধ্যমে মোটা কাপড়ের ব্যবসা করত। ফরাসি বিপ্লবের পর ভারতবর্ষে ফরাসি বাণিজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফরাসিরা যেমন সরাসরি তুলা এবং বস্ত্র পণ্যের ব্যবসা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল তেমনি পণ্য সংগ্রহের জন্য তারা তাদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব খাটাতে সক্ষম ছিল। খিরপাইয়ের মতো কিছু কিছু এলাকাতে তারা বলপূর্বক পণ্য সংগ্রহ করতো। ১৭৭১ সালে কমিটি অব কমার্স খিরপাইয়ে কমপক্ষে চৌত্রিশটি বলপ্রয়োগের ঘটনা সম্পর্কে বোর্ড অব ট্রেডকে অবগত করেছিল।[১০১]

৪.৩৪ ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসকদের বৈরী নীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ বস্ত্র বাণিজ্য

খুব সাধারণভাবে বলা যায়, যেকোনো দেশের শাসনক্ষমতার কেন্দ্রে বা শীর্ষে থাকে যে শাসকগোষ্ঠী, তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুবিধা-অসুবিধা ও ভালো-মন্দের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে সে দেশের নিয়মকানুন ও রীতিনীতি কোন ধরনের হবে, কী রকম হবে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন-কানুনের ওপর এই শাসকশ্রেণির প্রভাব খুব প্রকট থাকে। যেকোনো দেশের জন্যই এ কথা কমবেশি প্রযোজ্য। আর সেটা যদি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপনিবেশ হয়, তাহলে বোধগম্য কারণেই সে দেশের শিল্প-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সব বিষয়ে বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়নে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর ইচ্ছার ও স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবীতে বহুবার বহু দেশে এই পরিস্থিতি দেখা গেছে, বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

কেননা বাংলার তাঁতশিল্পের সাথেও ঔপনিবেশিক শাসন, ক্ষমতাকাঠামো ও রাজনীতির গভীর সম্পর্ক আছে। যত দিন পর্যন্ত বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে পারেনি, ততদিন পর্যন্ত তারাও আরো অনেক বিদেশি বণিকের মতো এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে কয়েক ধরনের 'ক্যালিকো' ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। মোটা মসলিন ও মিহি ক্যালিকোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় এই আইনের জন্য আরো কয়েক ধরনের মসলিনও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে আরেকটা আইন পাস হয়, সেটাতে ইংল্যান্ডে ছাপা ক্যালিকো ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এই দুটি আইনের ফলে ইংল্যান্ডের বাজারে বাংলার সুতিবস্ত্রের রপ্তানি অনেকাংশে সীমিত হয়ে পড়ে।

আঠারো শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের রাজস্বনীতি বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ওপর প্রভাব ফেললেও ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু ঐ শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৭) বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখলের পর তারা আরো যেসব নীতি গ্রহণ করে ও আইন জারি করে, তা বৃটিশ তাঁতশিল্পের জন্য উপকারী হলেও বাংলার তাঁতশিল্পের জন্য ছিল ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকেও ইংল্যান্ডে ভারত বা

বাংলা থেকে আমদানি করা তাঁতবস্ত্রের ওপর কর দিতে হত শতকরা দশ ভাগ। অথচ এর বিপরীতে ভারতবর্ষে ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা বস্ত্রপণ্যের জন্য কর দিতে হতো মাত্র শতকরা তিন দশমিক পাঁচ ভাগ।[১০২] ইংল্যান্ডে উৎপাদিত পণ্য তখন ভারতে বা বাংলাদেশে বলতে গেলে বিনা শুল্কে বিক্রি হত। এভাবে বিদেশি উৎপাদনকারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলাদেশের মতো তাঁত প্রতিযোগীকে বস্ত্রবাজার থেকে বিতাড়িত করেছে। ভারতের (বা বাংলাদেশের) রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন বৃটিশদের কুক্ষিগত ছিল বলেই তারা তাদের সুবিধামতো যা ইচ্ছে তাই করতে পেরেছে। প্রাথমিকভাবে তারা মসলিনের ব্যবসা করেছে কিন্তু নিজেদের দেশের শিল্পের প্রয়োজনে তারা বাংলার মসলিনের বাজার অবরুদ্ধ করার জন্য নানা রকম নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে রাজনীতি বা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে তাঁত ব্যবসার বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাঁতপণ্যের বাজার ও বিপণনের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁত শিল্পের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিশ শতকের শুরুতে যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় তখন দেশীয় চড়কায় সুতা কেটে কাপড় তৈরী করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। দেশীয় তুলা উৎপাদন ও মোটা কাপড় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং বৃটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছিল, যার কারণে মৃত প্রায় তাঁত শিল্প চাঙ্গা হয়েছিল। এর মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদার একটা অংশ মিটলেও ব্যবসা বাণিজ্যে অনেকটা মন্দা ছিলো এবং তখনকার সময়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তেমন উল্লেখযোগ্য তথ্য মেলেনি।

৪.৩৫ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

পূর্বে আলোচনায় এসেছে বাংলাদেশের তাঁত কারখানায় উৎপাদিত জামদানী শাড়ি, বেনারশী শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি পিস, পাশ্ববর্তী ভারত, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নিয়মিত রপ্তানী হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশসমূহে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি অনাবাসী বাংলাদেশী Non-Resident Bangladeshi (NRB) বসবাস করে। কাজেই দেশীয় তাঁতপণ্যের রয়েছে বিশাল আন্তর্জাতিক বাজার। নিম্নে বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:

৪.৩৫.১ GI পণ্য হিসেবে বাংলাদেশের জামদানীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

জি. আই (GI) পণ্য হলো Geographical Indication বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য। এটি একটি আইন যেটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার পণ্যের পরিচিতি বহন করে। এতে পণ্যটি ঐ দেশের পণ্য হিসাবে খ্যাতি পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। মেধাস্বত্ব বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থা WIPO (World Intellectual Properly Orgination) এই GI পণ্যের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।[১০৩] জামদানী ২০১৬

সালের নভেম্বর মাসে জি আই পণ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এতে তাঁতশিল্পের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ একটি সম্মানজনক অবস্থান পেলো।

৪.৩৫.২ ভারতসহ বিভিন্নদেশে শাড়ি রপ্তানি

শারদীয় দূর্গাপূজাকে সামনে রেখে ভারতে রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশী শাড়ি। পশ্চিমবঙ্গে নারীদের তালিকায় রয়েছে জামদানি, সুতি জামদানি, সুতি কাতান, স্বর্ণলতা, চোষা, বেনারসি ও শেড শাড়ি।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে ব্র্যান্ডের শাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী এখন ব্যস্ত শ্রমিকরা। কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের কোলাহলে সরব হয়ে উঠেছে ব্র্যান্ডের কাপড় তৈরির তাঁত কারখানাগুলো। পাবনার ঈশ্বরদী ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের তৈরি বেনারসি শাড়ি ইতোমধ্যে ভারতসহ দেশের বিভিন্ন দেশের চাহিদা অনুযায়ী কাপড় সরবরাহ দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁত কারখানার মালিকরা।

তাঁতের খট খট শব্দ জানান দিচ্ছে, এ শিল্প করোনার মন্দা কাটিয়ে চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। বাজারে কাপড়ের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে দাম অনেক বেড়েছে। গত বছরের এ সময়ের চেয়ে বেশি দামে কাপড় কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের। জামদানী কাপড় ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম জানান, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মেগিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, কুচবিহার, হওড়া ও হুগলীসহ বিভিন্ন জেলার ছোট-বড় শপিংমল ও বিপণিবিতানগুলোতে বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের শাড়ি শোভা পাচ্ছে। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সেখানে বাংলাদেশী শাড়ির বাজার জমে উঠেছে।

বাংলাদেশের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার তাঁত কারখানাগুলো তৈরি সিল্ক জামদানি, সুতি জামদানি, কাতান, সুতি কাতান, বেনারসি, চোষা, শেড, স্বর্ণলতা শাড়ি ভারতে পাঠাচ্ছে। উন্নতমান, টেকসই, রুচিশীল ও দাম কম হওয়ায় পরিশ্চবঙ্গের নারীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে বাংলাদেশী শাড়ি।

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির আমদানিকারক সেলিম খান শাহজাদপুর হাটে জানান, শারদীয় দুর্গাপূজার বাজার ধরার জন্য প্রায় দুই মাস আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গের আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা তাদের এ দেশীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাহজাদপুর, এনায়েতপুর, করটিয়া ও ডেমরা, পাবনার ঈশ্বরদী, টাঙ্গাইল জেলার পাথরাইল, চণ্ডি, নলসুধা, চিনাখোলা, দেওজান, নলুয়া, হিঙ্গানগর, এলাসিন, বাতুলি, বাজিদপুর, বল্লা, রামপুর হাটসহ ঢাকার মিরপুর ও নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় তৈরি শাড়ি কিনে নিচ্ছেন। প্রতি পিস শাড়ি এক হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে কেনা হচ্ছে। পরে সড়ক পথে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।[১০৪]

তাছাড়া রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের উৎপাদিত জামদানি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা যায় বিশ্বখ্যাত অনন্য মসলিন শাড়ির অধুন সরবরাহকৃত জামদানি শাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে সৌদি আরব, কানাডা, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে।[১০৫]

৪.৩৫.৩ ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে লুঙ্গি রপ্তানী

পাবনাসহ চার জেলার তাঁতীদের তৈরি লুঙ্গির সুনাম দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন বিশ্ববাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। ২৫ দেশে প্রায় দুই কোটি পিস লুঙ্গি রফতানি হচ্ছে। বছরে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। বিদেশে অনেক বাংলাদেশি কাজ করছেন। তাদের চাহিদা পূরণ করতেই মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, বাহারাইন, দুবাই, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রসহ ২৫ দেশে লুঙ্গি রফতানি হচ্ছে। এসব দেশে বসবাসকারী বাঙালিরাই মূলত এ লুঙ্গির ক্রেতা। ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক দেশের লোকজন শখ করে এ দেশের লুঙ্গি কিনেন।

দেশে বর্তমান বিদ্যুৎচালিত পাওয়ারলুম, চিত্তরঞ্জন ও পিটলুমে লুঙ্গি তৈরি হচ্ছে। পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও নরসিংদীর ছোট-বড় মিলিয়ে লুঙ্গি প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সোয়া এক লাখ। তাঁতীরা জানান, একসময় নামে-বেনামে বিক্রি হওয়া লুঙ্গি এখন পরিচিতি পাচ্ছে নিজস্ব ব্যান্ডে। দেশে প্রথম লুঙ্গি ব্যান্ডিং শুরু করে নরসিংদীর হেলাল অ্যান্ড ব্রাদ্রাস। সোনার বাংলা টেক্সটাইল, ডিসেন্ট, ইউনিক, জেএম, স্কাই, ওয়েস্ট, রংধনুসহ ১২৫ ব্র্যান্ডের লুঙ্গি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। মান ভেদে প্রতিটি লুঙ্গি ৩৫০ থেকে ৭০০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ভালো ডিজাইনের কারণে বাংলাদেশের লুঙ্গির দিকে নজর এখন বিদেশিদেরও। বাংলাদেশি লুঙ্গির বড় ক্রেতা ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। তারা বাংলাদেশ থেকে লুঙ্গি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাজারে প্রতি পিস এক হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি করছেন।

ভারতের মালদহ জেলার আমদানি ও রফতানিকারক এম এম ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী অজিত দত্ত জানান, বিভিন্ন রাজ্যের ১২ জন আমাদনি-রফতানিকারক এখান থেকে লুঙ্গি নিয়ে ভারতের বিভিন্ন নামি প্রতিষ্ঠানের স্টিকার লাগিয়ে অন্য দেশে রফতানি করছেন। ভারতীয় আমদানিকারকরা বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ২৫ লাখ পিস লুঙ্গি কেনেন বলে তিনি জানান। শাহজাদপুরের পাইকারি কাপড় ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল মাসুদ জানান, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, এনায়েতপুর, পাবনার আতাইকুলা, টাঙ্গাইলের করটিয়া ও নরসিংদীর বাবুরহাট থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২৫ কোটি কাটার কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এতে এ অঞ্চলের তাঁতশিল্প প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

কলকাতার কাপড় ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র সেন জানান, উন্নত মানের হওয়ায় তারা বাংলাদেশ থেকে লুঙ্গি ও শাড়ি কিনছেন। সোনার বাংলা টেক্সটাইলের মালিক রফিকুল ইসলাম বলেন, এখন ক্রেতারা লুঙ্গি কেনার পাবনা জেলা তাঁতী দলের সভাপতি মো. শাহজাহান আলী আশরাফী বলেন, কয়েক বছর ধরে সুতার অস্থিতিশীল বাজার, রঙ ও কেমিক্যালের অস্বাভাবিক মূল্য বাড়ায় লুঙ্গি তৈরির খরচ বেড়েছে। এ অবস্থায়ও কয়েক বছরে লুঙ্গি খাতের ব্যাপক প্রসার হয়েছে। বাংলাদেশ লুঙ্গি ম্যানুফ্যাকচারার্স, এক্সপোর্ট অ্যান্ড ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ও আমানত শাহ গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. হেলাল মিয়া সমকালকে জানান, সরকারি সহযোগিতা পেলে তৈরি পোশাকের পর লুঙ্গি দিয়ে বিশ্ববাজারে নতুন জায়গা করে নেওয়া যাবে।[১০৬] অন্যদিকে অপর একটি রিপোর্টে জানা যায় ইউরোপ, আমেরিকা ছাড়াও মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, দুবাই, ইরাক, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ প্রায় ২৫টি দেশে প্রায় ২ কোটি পিস লুঙ্গি রপ্তানি হয় যার সিংহভাগই তাঁতের তৈরী। এসব দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী এবং স্থানীয় মুসলিম নাগরিকরা এগুলোর ক্রেতা। ইন্দোনেশিয়াতে বাংলাদেশী লুঙ্গির কদর অনেক বেশী। এখান থেকে বছরে প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। এসব লুঙ্গির ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে হেলাল এণ্ড ব্রাদার্স, আমানত শাহ লুঙ্গি, সোনার বাংলা, ডিসেন্ট, ইউনিক, স্ট্যান্ডার্ড, রুহিতপুরী, স্মাট, অমর, পাকিজা, এটিএম, বোখারী ফজর আলী, অনুসন্ধান, জে.এম.স্কাই ওয়েস্টসহ প্রায় ১২৫ ধরনের ব্র্যান্ডের লুঙ্গি। সোনার বাংলা টেক্সটাইলের মালিক রফিকুল ইসলাম জানান লুঙ্গি কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতারা ব্র্যান্ডকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ডিজাইন ও মানের কারণে প্রতিবছর তাদের ৭০ থেকে ৭৫ কোটি টাকার লুঙ্গি বিক্রি হচ্ছে।[১০৭]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় বর্তমান বাংলাদেশে তাঁত শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিকে তাকালে অত্যন্ত আশাবাদী হওয়া যায় কারণ এ শিল্প একটি ক্রমবর্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যের একটি শাখায় পরিণত হয়েছে।

৪.৩৬ উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশী আন্দোলনের কারণে দেশীয় তাঁত শিল্প সাময়িকভাবে চাঙ্গা হলেও ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের অবস্থা ছিল ক্রমাবনতশীল। এর প্রধান কারণ ছিল মিলখাতের সাথে এ শিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতা। তাছাড়া মাদ্রাজভিত্তিক তাঁতশিল্পের সাথেও এ অঞ্চলের তাঁত শিল্প প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হত। দেশ বিভাগের অব্যহতির পরে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প সাময়িকভাবে তীব্র সুতা সংকটের মধ্যে কাটায়। সরকারি উদ্যোগে অচিরেই এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং এর দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জরিপ ও শুমারিতে এ শিল্পের প্রবৃদ্ধি চোখে পড়ে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার জন্য কিছু বিষয় তাঁত শিল্পের জন্য সহায়ক হয়েছে যেমন- প্রথমত:

তাঁতশিল্পের নিজস্ব সাংগঠনিক সুবিধা। সাংগঠনিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পারিবারিক শ্রম ব্যবহারের পাশাপাশি সস্তায় ভাড়া-শ্রমের ব্যবহার। তাছাড়া এ শিল্পে কারখানা সংগঠন বা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারও ঘটেছে অনেক। দ্বিতীয়তঃ এ শিল্পে প্রযুক্তিগত ক্রমোন্নতি ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পরে ক্রমান্বয়ে বেশি কাপড় উৎপাদনশীল চিত্তরঞ্জন/আধা-স্বয়ংক্রিয় তাঁত স্থাপন করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সাথে সাথে প্রাক-বুনন কর্মকাণ্ডেও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাঁত শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্র বিশেষ করে শাড়ি ও লুঙ্গির (যা বাংলাদেশের মোট বস্ত্র ভোগের (৫০%-৬০%) ক্ষেত্রে ভোক্তারা তাঁতের তৈরি দ্রব্য অধিকতর পছন্দ করে। তৃতীয়তঃ তাঁতশিল্প রক্ষায় সরকারি নীতির প্রতিফলন।

আঠারোও উনিশ শতকে বৃটিশ পুঁজি নিয়োজিত হয়েছিল তাঁতশিল্পে। সে কারণে বৃটিশ তাঁতশিল্প বা বৃটিশ পুঁজিকে রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁতপণ্য আমদানি রপ্তানি বিষয়ে নানারকম নিয়ম কানুন করা হয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। যদিও পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ ছিল পাট উৎপাদনর মূলকেন্দ্র, কিন্তু পাকিস্তান আমলের পূর্ব পর্যন্ত পাটকলগুলো ছিল মূলত কলকাতা ও হুগলির আশপাশের এলাকায়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আদমজী জুট মিলসহ আরো অনেক জুট মিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সত্তর ও আশির দশকে পাওয়ার লুমের পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতশিল্প প্রবাহমান ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে পাওয়ার লুমের মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এবং হস্তচালিত তাঁতশিল্প গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়। লক্ষণীয় আশির দশক থেকে বাংলাদেশে পুঁজির একটা অংশ যেমন পাওয়ার লুমভিত্তিক বিভিন্ন মিল কারখানায় যুক্ত, পাশাপাশি পুঁজির একটা অংশ নগরকেন্দ্রিক একটা নতুন বাজার তৈরির কাজেও সচেষ্ট। অনেক তাঁতি মহাজন সত্তর ও আশির দশকেও হস্তচালিত তাঁতে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি তৈরি করে টিকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু নব্বই এরদশকে দেখা যায়, এই সব তাঁতি মহাজন কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর কারণ ছিল কারখানার বড় পুঁজি এসব ছোট পুঁজিকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল, যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা নতুন প্রযুক্তির সাথেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা হস্তচালিত তাঁতের ন্যায় পাওয়ারলুমে সুতি কাপড় ও লুঙ্গি উৎপাদন শুরু করেন।

এদিকে শহরাঞ্চলে পাওয়ার লুমের পণ্যের পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতশিল্পের নতুন বাজার তৈরি হয়। সত্তরের দশক থেকে শুরু হলেও মোটামুটি নব্বইয়ের দশকে এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্থানীয় ছোট পুঁজি নয়, এর পেছনে নাগরিক পুঁজির একটা বড় অংশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এই নগরকেন্দ্রিক বড় পুঁজি গ্রামের ছোট পুঁজির বাজার দখল করার পাশাপাশি তাঁতিদের নতুন ভূমিকাও নির্ধারণ করে দেয়। এই ভূমিকা হলো শ্রমিকের। প্রায় একশ বছর ধরে বিভিন্ন বস্ত্রকলে শুরু থেকেই প্রচুর তাঁতি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে আসছে। তবে গ্রামের অধিকাংশ হস্তচালিত তাঁতি সাধারণত কাজ করত মহাজনের সাথে

দাদনের ভিত্তিতে। প্রান্তিক কিন্তু স্বাধীন তাঁতিও ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। মহাজনরা মূলত উৎপাদন ও বিপণনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করত। কিন্তু নগরের বড় পুঁজি, বাজারগুলো দখল করার পর গ্রামের মহাজনরা সংকটে পড়ে। বড় পুঁজি এবার মহাজনদের ভূমিকাও নির্ধারন করে। তাদের অনেকে এখন শহরের হস্তচালিত তাঁতপণ্যের নতুন বাজারের জন্য ফ্যাশন হাউসগুলোর চাহিদাও অর্ডারমাফিক কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ করার এজেন্ট বা প্রতিনিধি। যেসব মহাজন পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে, অর্থাৎ ভূমিকা পরিবর্তন করেছে, তারা বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে। অনেকে তাঁতের কাজ এর পাশাপাশি নতুন কোনো পেশায় যুক্ত হয়েছে। পুঁজির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে গ্রামের প্রান্তিক ও স্বাধীন তাঁতি এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে প্রায় অধিকাংশ তাঁতসমৃদ্ধ এলাকায় মহাজনরা আছে। তাদের অনেকের কারখানায় শহরের পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কাপড় তৈরি হয়। সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তাঁতিরা। এছাড়া দাদন পদ্ধতিতেও কাজ চলছে। দাদন পদ্ধতিতে তাঁতি তার বাড়িতেই তাঁতে কাপড় উৎপাদন করে দেয় মহাজনের দেয়া ডিজাইন ও নির্দেশ মাফিক। মহাজনকে নির্দেশ দেয় শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এভাবে হস্তচালিত তাঁতপণ্য উৎপাদন বিপণনে শহরের বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস বা পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। তাঁতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা বাণিজ্যে গতি এসেছে তবে এর পেছনে পুঁজি, সংগঠন, অবকাঠামো, পণ্যের সহজলভ্যতার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যনির্দেশিকা

১. Philip Kotler is an American Marketing Consultant and Professor, Currently the S.C, Johnson Distrnguished Professor of International Marketing at the Kellogg School of Management at North Western University. He gave the definition of Marketing Mix.

httttps//en.m.wikipedia.org>wiki

২. *www.investopedia.com.*

৩. *www.investopedia.com>terms>trade.*

৪. G. Evans, "A Brief History of Experimental cotton cultivation in the plains of Bengal" 1921, Bulletin, Vol. 1, p. 1.

৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৭২)।

৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন, ২০১৫।

৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন, ২০১৫।

৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন, ২০১৫।

৯. সাক্ষাতকার: আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৪৭, সভাপতি, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আবেদ টেক্সটাইল, ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী, ২০১৭।

১০. সাক্ষাতকার: এ কে ফজলুল হক, পেশা: সাংবাদিকতা, বয়স: ৫৩, ভেলানগর, নরসিংদী-২০১৬।

১১. সাক্ষাতকার: আব্দুল হালিম, পেশা: সাংবাদিকতা, বয়স: ৪২, সাপ্তাহিক নরসিংদীর খবর, ভোলানগর, নরসিংদী, ২০১৮।

১২. সাক্ষাতকার: আলহাজ্ব মনজুর ইলাহী, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৪৯, ব্রাহ্মনদী, জেলা: নরসিংদী

১৩. সাক্ষাতকার: মোস্তফা ভূইয়া, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৪৭, গ্রাম: ভুলতা, উপজেলা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ, ২০১৭।

১৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৫ নভেম্বর, ২০১৯।

১৫. Robert Orme was a British historian of India son of a British East India companysphigicean & sargeon. He was appointed as histrographer of the British East India company.

১৬. বাংলা প্রেসিডেন্সি (*The Bengal Presidency* was established in 1765, following the defeat of the last independent Nawab of Bengal at the Battle of Plassey in 23 June 1757, and the Battle of Buxar in 22 October 1764. Bengal was the economic, cultural and educational hub of the British Raj). The Bengal Presidency, later reoganized as the Bengal Province, was once the largest subdivision of British India, with its seat in Calcutta. It was primarily centred in the Bengal region.

১৭. K.K Datta 1905-1982, *Alivardi and His Times*, (Calcutta, 1939), pp. 180-81.

১৮. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ৮১।

১৯. James Taylor, A sketch of the Topography & statistics of Dacca, (Calcutta, 1840), p. 8.

২০. James Taylor, A sketch of the Topography and Statistics of Dacca (London, 1940), p. 9. (এখান থেকে গ্রন্থটি Taylor, *Dacca...*,পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে.)

২১. William Bolts, *Consideration on Indian Affairs*, (London, 1772), p. 194.

২২. ১৫৮৩ ভারত ভ্রমণকারী র‍্যাফল্ ফিৎস (Ralph Fiteh)-এর মতে, ঢাকা থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে তেরো মাইল দূরে অবস্থিত সোনারগাঁও ছিল "এমন একটি শহর যেখানে সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে মিহি কাপড় তৈরি করা হতো"। প্রায় একই সময়ে আবুল ফজলও লিখেন, "সরকার সোনারগাঁও-এ এমন এক জাতের মসলিন উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত মিহি এবং যার পরিমাণও বিপুল।

২৩ সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, পেশা: ফোকলের গবেষক, বয়স: ৭৭, গ্রাম: বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী- ২০১৬।

২৪. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৯৮-৯৯। (এখন থেকে গ্রন্থটি করিম, *মসলিন...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

২৫. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৮৮।

২৬. M. Mufakkharul Islam, *An Economic History of Bengal (1757-1947)*, (Dhaka, 2012), p.71.

২৭. দালালদের নামের তালিকা : ১। রাম নারায়ণ দালাল, ২। শ্যামসুন্দর দালাল, ৩। সোনাময়ী দালাল, ৪। ব্রিজ দালাল, ৫। নেহাল দালাল, ৬। দীন দয়াল আনন্দ, ৭। বেহারী দালাল, ৮। গোপী দালাল, ৯।বিষ্ণুদাস পাইকার, ১০। বিষ্ণুদাস দীনদয়াল, ১১। বিষ্ণুদাস বেহারী, ১২। জিতুরাম দালাল, ১৩। হর গোবিন্দ দালাল, ১৪। জগন্নাথ পাইকার, ১৫। গোপী নরহরি, ১৬। কমূল নুন্দরাম পাইকার, ১৭। জয়কৃষ্ণ সোনামনি, ১৮। কমূল নন্দরাম পাইকার, ১৯। হাফিজুল্লাহ পাইকার, ২০। মুক্তগালাব পাইকার, ২১। মুক্তারাম রায়জী, ২২। অভয়রাম দালাল, *আবদুল করিম*, পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০-৯১, মূল সূত্রঃ Dacca Factory Records, Vol. ii, 13 March 1744.

২৮. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৯১।

২৯. করিম, *মসলিন...*, পৃ. ৯৩।

৩০. Hameeda Hossain, The company weavers of bengal: the east India Company and the Organization of \Textile production in Bengal 1750-1813, The University of Press Limited, Dhaka, 2010, পৃ. ১০৮। মূল সূত্রঃ Home Miscelliancous Seriies, vol. 206, pp. 213-413. রিচার্ড বারওয়েল ঢাকা প্রভিনসিয়াল কাউন্সিলের নেতা (Chief) ছিলেন, পরে রেগুলেটিং এ্যাক্ট মতে তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। বারওয়েলের রিপোর্টের কোন তারিখ পাওয়া যায় না, মনে হয় তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা প্রভিনসিয়াল কাউনসিলের নেতা থাকাকালীন রিপোর্ট খানা লিখেন।

৩১. Hossain, *The company...*, পৃ. ১০৯।

৩২. Hossain, *The company...*, p. 71.

৩৩. Hossain, *The company...*, p. 64.

৩৪. Sirajul Islam: *American Trade in Bengal*, Dhaka-2018, p. 113. (এখন থেকে গ্রন্থটি Islam, *American Trade...,* পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে।)

৩৫. Hossain, *The company...*, p. 64.

৩৬. Hossain, *The company...*, p. 67.

৩৭. Hossain, *The company...*, p. 70.

৩৮. Hossain, *The company...* , p. 76.

৩৯. O, Feldback, *India Trade under the Danish Flag*, pp. 52, 88-89.

৪০. Islam, *American Trade...,* pp. 83-84.

৪১. Hameeda Hossain, Source: IOR, BCSC, Vol. 75, pp. 50-61 for complaint by Bhabani Shankar Mukerji, gumasta to Mr. Tutin at Dhamrai; pp. 412-17 for abanbandhi of Nimidas, weaver at Jalapur Diwani Adalat.

৪২. Hossain, *The company...,* p. 85.

৪৩. Mazharul Huq, *Op., cit.,* p. 143

৪৪. Hossain, *The company...*, p. 93.

৪৫. Eighth Report, pp. 413-15.

৪৬. Islam, *American Trade...,*p-83.

৪৭. N. K Sinha, 'Drain of Wealth from Bengal in the Second Half of the18th Century', *BPP,* Vol. 71, Serial No. 134, 1952, p. 35.

৪৮. Hossain, *The company....,* p. 99.

৪৯. Hossain, *The company....*, p. 104.

৫০. IOR, BCSC, 1794, Range 156, vol.12. No page references are given. The dates are 31 March Letter No. 7., para 7

৫১. Hossain, *The company...*, p. 99.

৫২. Hossain, *The company....*, p-100.

৫৩. Hossain, *The company...*, p. 86.

৫৪. Hossain, *The company...*, p. 88.

৫৫. Hossain, *The company...*, p. 88.

৫৬. Dacca District Census Report 1891

৫৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগরজীবন (১৮৪০-১৯২১)*, (ঢাকা, ২০০১), পৃ. ১১৭।

৫৮. Davidson Lt.Col, C.J.C 'Dacca in 1840: Bengal East and Present, XIII, 1.1931,43.

৫৯. G.N. Gupta, A Surveyof the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908, Eastern Bengal and Assam Secretariat Printing Office, Shillong, 1908, P. 13.

৬০. "Report on Bangladesh Handloom Census 2003", Bureau of Statistics. Planning Division, Ministry of Planning, (Dhaka, 2005).

৬১. "Report on Bangladesh Handloom Census 2003", Bureau of Statistics. Planning Division, Ministry of Planning, (Dhaka, 2005).

৬২. "Report on Bangladesh Handloom Census 2003", Bureau of Statistics. Planning Division, Ministry of Planning, (Dhaka, 2005).

৬৩. *bn.m.wikipedia.org.*

৬৪. *The Daily Star*, 5 November, 2005.

৬৫ *প্রথম আলো* মে, ২০১৮।

৬৬ *সময় টিভি বুলেটিন*, ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

৬৭ bdnews24.com.

৬৮ https://www.facebook.com/deshimade

৬৯ https://www.facebook.com/poterbibi/

৭০ https://www.facebook.com/Rupkotha.Jamdani/

৭১ https://www.facebook.com/tangailtantersaree/

৭২ m.ajker deal.com→category→women.

৭৩. সাক্ষাতকার: মো: মোমেন সরকার, পরিচালক, নরসিংদী চেম্বর অব কমার্স, পেশা-ব্যবসা, বয়স, ৫২, শিলমান্দী, নরসিংদী, ২০১৬।

৭৪. সাক্ষাতকার: সাইদুল ইসলাম সাধু, পেশা: জামদানি ব্যবসায়ী, বয়স: ৪৫, নোয়াপাড়া জামদানী পল্লী, রূপসী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ-২০১৬।

৭৫. সাক্ষাতকার: মিসেস মুনিরা এমদাদ, স্বত্বাধিকারী, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৬৫, বেইলি রোড, ঢাকা-২০১৯।

৭৬. সাক্ষাতকার: মিসেস ফারিয়া মৌ, পেশা: সংবাদকর্মী ও গবেষক, বয়স: ২৫, মণিপুরীপাড়া, ফার্মগেইট, ঢাকা, ২০১৮।

৭৭. সাক্ষাতকার: মোঃ বিল্লাল হোসেন, ভুরভুড়িয়া, শিবপুর, নরসিংদী-২০১৫।

৭৮. Sharmin Akhtar & Hanizah Idris Tracing Early Maritime South East Asia Through Archaeological Elements and Bengals Contact (400 Bc-800 Bc)

Tati-Journal of South East Asian Studies, Volume 25(1) June-2020, Dhaka & Kulalampur ref: Dol:https://doiorg/10.22452/jati.vol 25 no. 13 p. 41.

৭৯ এ. জেড এম ইফতিখার-উল-আউয়াল 'দেশি শিল্পের অবস্থা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ২য় খণ্ড পৃ. ৩৪৭। মূল উৎস: India Office Records, p.174/41, Bangladesh Report 1802-03.

৮০. *Silsilat-ul-Tawarikh :Ancient Account of India and China* by two muslim travelors Solaiman and Abu Zeidal Hasan, Paris-1811.

৮১. আলী ইমাম, *বাঙলা নামে দেশ*, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ২৭।

৮২ শাওন আকন্দ,*বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, (ঢাকা, ২০১৮)।

৮৩. Sirajul Islam: *American Trade in Bengal*, Dhaka-2018, p-84.

৮৪. শাওন আকন্দ, শাওন আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, (ঢাকা, ২০১৮)।

৮৫. Hossain, *The company...*, p. 71.

৮৬ Hossain, *The company...*, p. 73.

৮৭. Hossain, *The company....* p. *73.*

৮৮. Hossain, *The company...*, p. 74

৮৯. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, (Calcutta, 1961), Vol. I, p.47.

৯০. Islam, *American Trade...*,,p. i.

৯১. Hossain, *The company...*, p. 74.

৯২. Hossain, *The company...*, p. 75

৯৩. Hossain, *The company...*, p. 76.

৯৪. Hossain, *The company...*, p. 76. Source: Home Miiscellaneus Series, Vol. 206, pp.213-413. p.19

৯৫. Islam, *American Trade...*, P.87.

৯৬. Hossain, *The company...*, p. 77.

৯৭. Islam, *American Trade...,*, P. 240

[John Adams to John Jay, 11 November 1785, in The Works of John Adams, vol. 8. p. 343-44; The phenomenon has also been discussed in details in Journal of External Commerce of Bengal, 1750-1830, MSS Eur, D. 281.]

৯৮. Hossain, *The company...*, p. 77.

৯৯. Islam, *American Trade...,*p. 94.

১০০. Islam, *American Trade*, p. 79.

১০১. Islam, *American Trade...*, p. 81.

১০২. ইফতিখার-উল-আউয়াল, দেশিশিল্প, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ২৭৬-২৭৭।

১০৩. *প্রথম আলো*, ২১ অক্টোবর, ২০১৬।

১০৪. শফিউল আযম, নয়াদিগন্ত, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (dailynayadigant.com/economics)।

১০৫. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৩ জানুয়ারী, ২০১৪ (শুক্রবারের বিশেষ প্রতিবেদন)।

১০৬ এবিএম ফজলুর রহমান, *দৈনিক সমকাল*, ২৫ মার্চ ২০১৮ (samakal.com-online edition) ।

১০৭ breaking news.com.bd/economics-business/article/60438. 27 May, 2018.

পঞ্চম অধ্যায়

তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

পঞ্চম অধ্যায়

তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

৫.১ ভূমিকা

সভ্যতার শুরু থেকেই বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন শুরু হয়। ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থনীতি ইত্যাদি কাজ করেছে এ বিভাজন তৈরীতে। তাঁতীদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁত শিল্পের সুতা ও তাঁতযন্ত্র ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এর যন্ত্রী বা তাঁতী। সাধারণভাবে যারা তাঁতযন্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র বয়ন করে থাকে তাদের তাঁতী বা তন্তবায় বলা হয়।[১] তাঁতীদের পাশাপাশি যারা তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করছে, সেই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক দিকগুলো আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৫.২ সামাজিক অবস্থা

৫.২.১ প্রাচীন বাংলায় তাঁতি সম্প্রদায়

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় তাঁতশিল্প যে দারুন উৎকর্ষতা লাভ করেছিল তা বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়। এ দেশের তাঁতশিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী এর কৃতিত্বের দাবীদার। প্রাচীনকালের তাঁতীদের সম্পর্কে তথ্য জানা গেলেও জাতভেদ বা সমাজ জীবনে সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। বিভিন্ন সাহিত্যিক উৎস ও ধর্মীয়গ্রন্থ থেকে আমরা প্রাচীন বাংলার তাঁতীদের সামাজিক অবস্থা যা জানা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

৫.২.২ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) বঙ্গদেশের তাঁতশিল্প সম্পর্কে বলা হয়েছে।[২] এই গ্রন্থে তাঁতীদের কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, তাঁতীদের কী পরিমাণ সুতা নিয়ে কী পরিমাণ কাপড় বুনে দিতে হবে এবং এর যদি ব্যতিক্রম ঘটে, তাহলে তাঁতীর কী ধরনের শাস্তি বা জরিমানা হবে? কিংবা উন্নত সুতা নিয়ে তাঁতী যদি খারাপ কাপড় বোনে, তাহলে তাঁতীর কী ধরনের দন্ড হবে ইত্যাদি।[৩] এমনকি 'সূত্রাধ্যক্ষ' নামে একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পদবীও জানা যায় অর্থশাস্ত্র থেকে। সূত্রাধ্যক্ষের কাজ ছিল সুতা কাটা এবং বস্ত্র বুননের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও তদারক করা। তার কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দিতে গিয়ে কৌটিল্য যেসব শ্রেণীর মানুষকে দিয়ে সুতা কাটা ও কাপড় বুননের কাজ করানোর কথা উল্লেখ করেছেন–সেখানে সবাই বিভিন্ন শ্রেণীর নানা বয়সী নারী, আলাদা করে কোনো পুরুষের উল্লেখ নেই। তবে কি সে সময় শুধু নারীরাই সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

তা বোধ হয় না। তবে সুতা কাটা এবং বস্ত্র বয়নের কাজে নারীদের সংখ্যাধিক্য উপস্থিতি হয়তো অস্বাভাবিক নয়। কৌটিল্য সুতাকাটুনি বা বয়নশিল্পীদের সাথে সূত্রাধ্যক্ষ কী ধরনের ব্যবহার করবে, কী হিসেবে ও কী পরিমাণ বেতন বা মজুরি দেবে ইত্যাদি বিষয়ে বিবিধ নিয়ম-কানুনের উল্লেখ করেছেন।[৪] উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে তাঁত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালীন তাঁতীসমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো চিত্র পাওয়া যায় না।

৫.২.৩ চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও তাঁতীদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। কাহ্নপার একটি পদে বলা হয়েছে, 'তান্তি বিকণা ডোম্বি অরবণা চাংগেড়া'। অর্থাৎ ডোমরা যে বাঁশের তাঁত ও চাঙারি তৈরি করে বিক্রি করত, এই পদ থেকে সেটা জানা যাচ্ছে। আরেকটি পদে পদকর্তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তন্ত্রীপাদ। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'তন্ত্রীপাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, তাঁত-শিক্ষক অথবা তাঁত-গুরু। ইহাই বোধহয় এই পদ-রচয়িতার পূর্বতন বৃত্তি ছিল পরে তিনি 'সিদ্ধ' হইয়াছিলেন।[৫] বৌদ্ধ ধর্ম মতে, চর্যাপদ হলো সাধন ভোজনের তত্ত্ব প্রকাশ এবং গানের সংকলন। চর্যাপদ সান্ধ্য বা সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। সম্ভবত, এসব পদকর্তা সমাজের যে নিচু স্তরে বসবাস করতেন, সেখানে তাঁতের কাজের প্রচলন ছিল বলে তাঁরা বিভিন্ন পদে তুলা, ধোনা, কার্পাস, তাঁত ইত্যাদি রূপক ব্যবহার করেছেন। কিছু তথ্য বা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও চর্যাপদ-এ তাঁতীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সমাজ জীবনে বিভিন্ন পেশার সাথে বর্ণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রাচীন বাংলায় বর্ণভিত্তিক সমাজে একেকটি পেশা একেকটি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণত এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। বাংলা অঞ্চলের সামাজিক কাঠামো ও বর্ণবিন্যাসের নিরিখে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ- এই দুটি গ্রন্থকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই দুটি গ্রন্থের রচনাকাল দ্বাদশ শতক থেকে চৌদ্দ শতকের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। গ্রন্থ দুটিতে বাংলাদেশে বর্ণবিন্যাসের যে কাঠামো পাওয়া যায় এবং সেখানে তাঁতের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল, তাদের অবস্থান কোথায় ছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.২.৪ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এর বিবরণ অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের আর যত বর্ণ আছে, সবই সংকর বর্ণ। অর্থাৎ চার বর্ণের যথেচ্ছ যৌনমিলনের ফলে উৎপন্ন মিশ্র বর্ণ এবং তারা সবাই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। এগুলোকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। উত্তম-সংকর, মধ্যম সংকর এবং অধম সংকর বা

অন্ত্যজ। এর মধ্যে তন্তবায় বা তাঁতীদের স্থান হয়েছে উত্তম-সংকর পর্যায়ে এবং রজকদের স্থান হয়েছে মধ্যম সংকর পর্যায়ে।[৬]

৫.২.৫ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

ব্রাহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী এ সমস্ত মিশ্র উপবর্ণগুলোকে সৎ ও অসৎশূদ্র- এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে কুবিন্দক বা তন্তুবায়দের স্থান হয়েছে সৎশূদ্র পর্যায়ে; কিন্তু যুগী, কাপালি, জোলা ও রজকদের স্থান হয়েছে অসৎশূদ্র পর্যায়ে।[৭]

লক্ষ্যণীয়, উভয় গ্রন্থে তাঁতী বা কুবিন্দক উত্তম সংকর বা সৎশূদ্র হিসেবে পরিগণিত হলেও (অর্থাৎ শূদ্রদের মধ্যে যাদের স্থান উঁচুতে) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ- এ জোলা, কাপালি কিংবা যুগীদের কোনো উল্লেখ নেই। কিছু ভিন্নতা থাকলেও এই দুটি গ্রন্থের মূল ভাষ্য ও বিবরণ মোটামুটি একই। এটিকে বাংলাদেশের আদি পর্যায়ের শেষ পর্বের অর্থাৎ সেন-বর্মণ শাসনামলের বর্ণবিন্যাসের চিত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে বলা যায় যে, একই পেশাজীবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁতের কাজের সাথে যারা যুক্ত ছিল, তারা সামাজিকভাবে একই বর্ণের ছিল না।

৫.২.৬ তাঁতীদের শ্রেণী বিভাগ

একই পেশাজীবী হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম-বর্ণ-গোত্র লিঙ্গভেদে তাঁতীদের মধ্যে আছে ভিন্নতা এবং রয়েছে আলাদা পরিচয় রয়েছে। যেমন, মুসলমান তাঁতীদের মধ্যে মোটা কাপড় বুননকারীরা, সাধারণভাবে ‘জোলা’ নামে পরিচিত। ‘জোলা’ শব্দটি তুচ্ছার্থে ও অবজ্ঞাসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মোমিন বা কারিগর বলে তারা নিজেদের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। আবার একই ধর্মের অনুসারী হওয়ার পরও মুসলমান তাঁতীদের একটা অংশ যারা জামদানি বোনে, তারা নিজেদের কোনোভাবেই ‘জোলা’ বলে স্বীকার করে না। তারা নিজেদের জামদানি তাঁতী বা কারিগর বলতে পছন্দ করে। পাশাপাশি একই ধর্মের (হিন্দু) অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বসাক ও দেবনাথ সম্প্রদায় পরস্পর নিজেদের আলাদা জাত হিসেবে দাবি করে। দেবনাথরা সাধারণভাবে যোগী নামে পরিচিত। তাদেরকে তুচ্ছার্থে ‘যুগী’ নামে ডাকা হয়। এর মধ্যে বসাক তাঁতীরা নিজেদের যোগী বা জোলাদের চেয়ে উঁচু শ্রেণীর বলে মনে করে।

পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে তাঁতী বলতে বোঝায় মূলত নারীদের। পুরুষরা সেখানে তাঁতের কাজ তুলনামূলকভাবে কম করে। সমতলভূমিতে যোগী বা জোলাবাড়ির মেয়েরা তাঁতের কাজ করলেও বসাক তাঁতীদের ঘরের নারীরা তাঁতে কাপড় বোনার কাজ করে না। তারা প্রাক বুনন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে থাকে।

তাঁতীদের সূক্ষ্ম বিচারের মধ্যে নানা প্রকারভেদ ও ভিন্নতা আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে একবার দেখে নেয়া যাক প্রাচীনকালে বাংলায় যারা তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের অবস্থা কেমন ছিল।

ব্রাহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর বিবরণে আমরা দেখেছি যে তন্তুবায় বা তাঁতী সৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত হলেও যোগী, জোলা ও কাপালিরা অসৎশূদ্র পর্যায়ভুক্ত চার শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাঁতের কাজ করে। একই পেশাজীবী হওয়ার পরও তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

উনিশ শতক থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা পাই বিভিন্ন ইংরেজ সিভিলিয়ানের লেখা থেকে। এঁদের মধ্যে জেমস টেইলর, জেমস ওয়াইজ ও এইচ এইচ সিলির নাম উল্লেখযোগ্য। জেমস টেইলরের (১৮৪০) ভাষ্য থেকে জানা যায়,

> Most of the weavers are Hindoos, They weave the plain muslins in Dacca, Dumroy, Teethbadhee, Junglebaree and Sunurgang. At the latter place the Mussulmans who form the principal body of weavers there, are engaged in making the Jamdanee muslins, Coarser cloths are made by the lower castes of Hindoos and Mussulmans called Joogees and Joolahs.[৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই হিন্দু ও মুসলমান-উভয় ধর্মালম্বীদের মধ্যে যারা তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের বিভিন্ন রকম পরিচয় ছিল। বিষয়টা আরো স্পষ্ট করে বোঝার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

৫.২.৭ তাঁতী বা তন্তুবায় (হিন্দু)

হিন্দু তাঁতী বা তন্তুবায়রা বর্ণবিন্যাসের দিক থেকে শূদ্র পর্যায়ভুক্ত, তা আগেই বলা হয়েছে। যে নয়টি বিশুদ্ধবর্ণ নিয়ে বল্লাল সেনের নবশাখ গঠিত হয়েছিল, তাঁতীরা তার অন্তর্গত ছিল। জেমস ওয়াইজ (১৮৩৬) তাঁতীদের চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন, 'বঙ্গদেশে হিন্দুদের বিভিন্ন জাতের মধ্যে তাঁতিরা হলো এক কৌতূহলদ্দীপক জাত। ...তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মালদা থেকে তাদের নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় আনা হয়।[৯]

৫.২.৭.১ বসাক তাঁতী

হিন্দু তাঁতীদের মধ্যে যারা 'বসাক' উপাধি ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে এই উপাধি বর্তমানেও প্রচলিত আছে। তাঁতীদের বসাক উপাধি গ্রহণ বিষয়ে জেমস ওয়াইজ এর ভাষ্য, 'তাঁতীরা সবাই গ্রহণ করত বসাক পদবি। শুরুতে এই পদবি গ্রহণ করত একমাত্র ধনী তাঁতীরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধনী তাঁতীরা এই

পেশা ছেড়ে দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করত। এই তাঁতীদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ আড়ং-এ যেসব উপাধি গ্রহণ করত এখনও এরা তাই করে। যেমন: যাচানদার যে যাচাই করে; মুখিম-পরিদর্শক সরদার বা মহাজন, দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করত। অনেকে পারিবারিকভাবে এসকল পদবীর উপাধি হিসেবে ব্যবহার করত অন্য জাতের মত।[১০] জেমস ওয়াইজের ভাষ্যকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করলে মনে হয় 'বসাক' উপাধিটি তেমন পুরানো নয়। সব তাঁতী 'বসাক' উপাধি ব্যবহার করত না- এই তথ্যও স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাঁতী হিসেবে তো বটেই, ব্যবসায়ী হিসেবেও বসাক তাঁতীদের খ্যাতি ছিল এবং আছে। ঢাকার বসাক তাঁতীদের সম্পর্কে শরীফ উদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেন, 'বসাকরা ছিল আদিতে তাঁতী। পরবর্তীতে এদের অনেকে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। কোম্পানি আমলে এদের অনেককেই ইংরেজরা পাইকার, দালাল, যাচনদার এবং মুকিম অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় সুতি বস্ত্রের বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠে ঢাকার ও আশেপাশের তাঁতীদের কাছ থেকে এরা ঢাকাই শাড়ি, ধুতি আর বাফতা বা মোটা কাপড়, যা চাদর হিসেবে ব্যবহার করা হত, কিনে মূলত কলকাতায় রপ্তানি করত। সেখানে তাদেরই জ্ঞাতি ভাইয়েরা যারা স্থানীয় পণ্যের পাইকারী ব্যবসা করত, তারা এগুলি কিনে নিয়ে বিক্রি করত। এদের অনেকেই আবার ঢাকার তাঁতী ও সুচিশিল্পকর্মীদের টাকা লগ্নী দিত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করার জন্য সুচিকর্ম করা সুতি রেশমের মিশ্রিত বস্ত্রের জন্য। এ ধরনের কাপড়কে কাসিদা বলাহতো। এই কাসিদার ব্যবসা ছিল বেশ লাভজনক এবং গোটা উনিশ শতক ধরেই এই ব্যবসা চালু ছিল। স্থানীয় কাপড় আর কাসিদার ব্যবসায়ে ঢাকার বসাকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন মদন মোহন বসাক। তিনি সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যেও তার কাসিদা বস্ত্র রপ্তানি করতেন। পরবর্তীতে তিনি তার ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত করেন এবং শেষ পর্যায়ে পাটের ব্যবসা শুরু করেন। বিত্তবান হওয়ায় ঢাকায় তার সামাজিক অবস্থানেরও উত্তরণ ঘটে। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন। ঢাকায় তার নামে একটি রাস্তার নামকরণও করাহয়। এই মদন মোহন বসাক রোড এখনো বিদ্যমান।[১১] এই মদন মোহন বসাক রোডই এখনকার টিপু সুলতান রোড।

তাঁতী হিসেবে তো বটেই, ব্যবসায়ী হিসেবেও বসাক তাঁতীদের খ্যাতি ছিল এবং আছে। ঢাকার বসাক তাঁতীদের সম্পর্কে শরীফ উদ্দিন আহমেদ মন্তব্য করেন, 'বসাকরা ছিল আদিতে তাঁতী। পরবর্তীতে এদের অনেকে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। কোম্পানি আমলে এদের অনেককেই ইংরেজরা পাইকার, দালাল, যাচনদার এবং মুকিম অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিয়োগ করত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে এদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় সুতি বস্ত্রের বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠে ঢাকার ও আশেপাশের তাঁতীদের কাছ থেকে এরা ঢাকাই শাড়ি, ধুতি আর বাফতা বা মোটা কাপড়, যা চাদর হিসেবে ব্যবহার করা হত, কিনে মূলত কলকাতায় রপ্তানি করত। সেখানে তাদেরই জ্ঞাতি ভাইয়েরা যারা স্থানীয় পণ্যের পাইকারী ব্যবসা

করত, তারা এগুলি কিনে নিয়ে বিক্রি করত। এদের অনেকেই আবার ঢাকার তাঁতী ও সুচিশিল্পকর্মীদের টাকা লগ্নী দিত, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি করার জন্য সুচিকর্ম করা সুতি রেশমের মিশ্রিত বস্ত্রের জন্য। এ ধরনের কাপড়কে কাসিদা বলাহতো। এই কাসিদার ব্যবসা ছিল বেশ লাভজনক এবং গোটা উনিশ শতক ধরেই এই ব্যবসা চালু ছিল। স্থানীয় কাপড় আর কাসিদার ব্যবসায়ে ঢাকার বসাকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন মদন মোহন বসাক। তিনি সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যেও তার কাসিদা বস্ত্র রপ্তানি করতেন। পরবর্তীতে তিনি তার ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত করেন এবং শেষ পর্যায়ে পাটের ব্যবসা শুরু করেন। বিত্তবান হওয়ায় ঢাকায় তার সামাজিক অবস্থানেরও উত্তরণ ঘটে। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হন। ঢাকায় তার নামে একটি রাস্তার নামকরণও করাহয়। এই মদন মোহন বসাক রোড এখনো বিদ্যমান।[১২] মদন মোহন বসাক রোডই এখনকার টিপু সুলতান রোড।

বসাক উপাধি গ্রহণ করুক আর নাই করুক, বাংলায় তাঁতীরা খুবই প্রভাবশালী ছিল। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, 'বিহারে তাঁতীরা নিচু পর্যায়ের বলে বিবেচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে এতটাই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী যে তারা বিশুদ্ধ শূদ্র বলে বিবেচিত। নবশাখদের পুরোহিত ও তাঁতীদের একই শ্রেণীর। কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, 'তাঁতী কি ধরনের মাড় ব্যবহার করে তার ওপর নির্ভর করে তার বিশুদ্ধতা। জলে খৈ সেদ্ধ করে গলিয়ে মাড় হিসাবে ব্যবহার করে, শূদ্র তাঁতীরা। খয়ের মাড় হিন্দুদের কাছে এঁটো নয়, আবার মুসলমানদের কাছে "ঝুটা" নয়। যোগীরা ভাতের মাড় ব্যবহার করে বলে ঘৃণার পাত্র।[১৩] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, মাড় ব্যবহারের ধরনের ওপর নির্ভর করছে জাতের শুদ্ধতা। আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও যোগীদের সাথে বসাক তাঁতীদের ভিন্নতার কারণটি খানিকটা বোঝা যায়। এছাড়াও তাঁতীদের মধ্যে নানা ভেদাভেদ ছিল। সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা প্রয়োজন।

৫.২.৭.২ ছোট ভাগিয়া ও বড় ভাগিয়া

ঢাকার তাঁতীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায় জেমস ওয়াইজের বিবরণ থেকে। তিনি বলেন, 'ঢাকা শহরের তাঁতীরা ছিল অবস্থাপন্ন। এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীকে বলত বড় ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া, আরেক শ্রেণীকে বলত ছোটো ভাগিয়া। ছোটো ভাগিয়ারা আগে ছিল কায়স্থ, তাঁতী পেশা গ্রহণ করায় এদের জাতিচ্যুত করা হয়েছে। ছোটো ভাগিয়া বা কায়েত তাঁতিরা আগে স্বর্ণকারের কাজ করতো। তাঁতের কাজ বেশি লাভজনক হওয়ায় পরে তাঁতের কাজ শুরু করেছিল। তারা বসাকদের সঙ্গে একত্রে খাওয়া দাওয়া করে এবং বসাকদের বাড়িতেও যাতায়াত করে কিন্তু বসাকরা এদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে না এমনকি এদের বাড়িতে আসে না। ছোট ভাগিয়া শ্রেণীদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তারা সামাজিক মর্যাদার জন্য বসাক পরিবারে আত্মীয়তা করত।[১৪] জেমস টেইলর ১৮৪০ এর বিবরণ অনুযায়ী ঢাকা শহরে ছোট ভাগিয়া পরিবারের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন।[১৫]

আর জেমস ওয়াইজের ১৮৮৩ বিবরণ অনুসারে ঢাকা শহরে তাদের সংখ্যা হবে বিশ থেকে পঁচিশ ঘর।[১৬]

জেমস টেইলর বলেছেন, বড়ো ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়ারা বিয়ের মিছিলে পালকির পরিবর্তে ঝাঁপা বা একপ্রকার আসনে করে কণেকে বহন করত। এই অদ্ভূত প্রথা থেকে এই পদবির উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, শহর ও গ্রামের শিল্প কারখানায় এদের সংখ্যা অনেক।[১৭] জেমস ওয়াইজ বড় ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়াদের বিভিন্ন গোত্রের নামও উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো : ভরদ্বাজ, আলিমন, কাশ্যপ, কুলিয়া, ঋষি, সবর্ণ, অগস্ত-ঋষি ও মগী।

৫.২.৭.৩ বঙ্গতাঁতী

উনিশ শতকে শহরের তাঁতী ছাড়াও আরো এক শ্রেণীর তাঁতী বাস করতো গ্রামে। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, গ্রামের এই তাঁতীরা দাবি করে যে তারাই হলো বঙ্গদেশের আদি তন্তুবায় শ্রেণী। জাহাঙ্গীরের বাদশাহীর আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশের মানুষ এদের বানানো সুতি কাপড় পরত। এরা বসাক তাঁতীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলেও বসাকরা তা মানতে চাইত না। তবে জেমস ওয়াইজ মন্তব্য করেছেন, 'এ কথা ঠিক যে বসাক তাঁতীদের চেয়ে বঙ্গদেশে এরা প্রাচীন।'[১৮]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বসাক তাঁতী ছাড়াও আরেক ধরনের তাঁতী ছিল, যারা বসাক তাঁতীদের থেকে পৃথক এবং তারা মনে করে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারাই এ অঞ্চলে তাঁতের কাজ করে আসছে। জেমস ওয়াইজ এই বঙ্গতাঁতীদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, ঢাকা থেকে বিশ মাইল উত্তরে প্রাচীন শহর ধামরাইয়ে ছিল প্রধানত বঙ্গ তাঁতীদের বাস। তাদের বিয়ের পোশাক ঢাকার তাঁতীদের মতো লাল সিল্কের ছিল না, বরং তাঁদের বিয়ের পোশাক ছিল সাদা। বঙ্গতাঁতীরা জাঁকজমকের সাথে চাম দেবের পূজা করত। পক্ষান্তরে ঢাকার তাঁতীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল।

৫.২.৭.৪ ধামরাইয়া তাঁতী এবং চৌহাটিয়া তাঁতী

বসাক ও বঙ্গতাঁতীদের মধ্যে, এমনকি ছোট ভাগিয়া এবং বড় ভাগিয়াদের মধ্যে জাতভেদ বা পার্থক্য ছিল, তা সম্ভবত কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমশ কমে গিয়েছিল। অন্য তাঁতী গোত্রগুলো ক্রমে বসাক উপাধি গ্রহণ করেছিল বা বসাক তাঁতীদের সাথে মিলেমিশে গিয়েছিল। যদিও আচরণে এবং পদবিতে যে একেবারে একত্রীভূত হয়ে গিয়েছিল, তা মনে হয় না। যেমন- ধামরাইয়ে যারা তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত ছিল, তাদের কথা বলা যায়। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, ধামরাই অঞ্চলের সাবেক তাঁতী পরিবারগুলো নিজেদের বসাক তাঁতী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। আলাদা করে বঙ্গ তাঁতী হিসেবে কোনো পরিবার টিকে নেই। তারা অনেকেই চৌধুরী, মন্ডল, শিকদার- এসব পদবি ব্যবহার

করত এবং এখনো করে। কারণ এই যে, তারা আদতে বসাক তাঁতী নয়, বঙ্গতাঁতী বর্তমানে ধামরাইতে কর্মরত বসাক তাঁতী খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৯] ধামরাই এলাকার বর্তমান টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ইলিয়াস পাল এর সাথে কথা বলে জানা যায় এক সময় অত্র এলাকায় তাঁতীদের অনেক কর্মযজ্ঞ ছিলো। বর্তমানে অনেকেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পেশার যোগদান করছে তথাপি তাঁতশিল্প ধামরাই অঞ্চলের ঐতিহ্য বলা যায়।[২০]

টাঙ্গাইলের পাথরাইল ও অন্যান্য এলাকার বিখ্যাত বসাক তাঁতীদের আদিবাস ছিল মূলত ধামরাই ও চৌহাট। এই দুই স্থান থেকে তারা শতাধিক বছর আগে টাঙ্গাইলে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু উভয়ের পদবি বসাক হওয়া সত্ত্বেও, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের ভেতরে সামাজিক সাংস্কৃতিক আচরণে কিছু পার্থক্য ছিল এবং আছে।

এই দুই গোষ্ঠী পরস্পর 'ধামরাইয়া' ও 'চৌহাটিয়া' নামে পরিচিত। একই সম্প্রদায়ের এই দুই গোষ্ঠীর ভেতর তীব্র বিরোধ ছিল, যা মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণকে ভিত্তি করে বিস্তার লাভ করেছিল। যেমন–তাদের এক গোত্রের সাথে অপর গোত্রের বিবাহ হতো না। বাংলাদেশের আদি তন্তুবায় গোষ্ঠী বা বঙ্গ তাঁতীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণ বরাবরই আলাদা।

৫.২.৭.৫ যোগী সম্প্রদায়

তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত এ রকম আরেকটি সম্প্রদায় হলো যোগী বা যুগী এরা হিন্দু তাঁতীদের একটা অংশ। তারা বসাক বা বঙ্গ তাঁতী থেকে পৃথক সম্প্রদায়। জেমস টেইলরের লেখা থেকে যোগী সম্প্রদায় সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের সর্বত্র যোগীদের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত জেলাগুলোতেই তাদের সংখ্যা প্রচুর। এরা সকলেই তাঁতী, এবং নারী-পুরুষ সবাই তাঁতের কাজ করে থাকে। তারা সাধারণ গ্রাম্য মোটা কাপড়চোপড় তৈরি করে, এবং খইয়ের পরিবর্তে তারা সিদ্ধ ভাতের মাড় ব্যবহার করে এবং সে কারণে অন্যান্য তাঁতীর নিকট তারা মাত্রাতিরিক্ত অবিশুদ্ধ জাতি রূপে গণ্য হয়।[২১]

টেইলর এর বর্ণনা অনুযায়ী 'জনশ্রুতি এই যে, এরা হচ্ছে কোনো এক সন্ন্যাসীর বংশধর যিনি দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধন এবং বিচ্ছেদের পর এ ধরনের জীবন পদ্ধতিতে ক্লান্ত হয়ে যোগ ভেঙে ফেলেন, এবং তার পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে আসেন। সম্ভবত পাল রাজাদের রাজত্বকালে তারা আসে পশ্চিম ভারত থেকে। রংপুরে তিনি এদের অবিরাম গোপীচন্দ্রের স্তুতি করে গান গাইতে শুনেছেন।[২২] যোগীদের উৎস সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'বৌদ্ধ-যুগের শেষাবস্থায় একদল যোগাচারী বৌদ্ধ এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহারা "নাথ" উপাধিধারী বলিয়া ঐ সম্প্রদায়কে নাথ

সম্প্রদায় বলা হয়। .... নাথযোগীগণ সেন রাজত্বে বঙ্গের অনেক স্থানে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। .... নাথগণ বঙ্গদেশে নানা জাতি হইতে বহু শিষ্য গ্রহণ করিয়া শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেন। ইঁহারাই বর্তমান যোগী জাতির পূর্বপুরুষ।'[২৩] যোগীদের নিয়ে নানা লোককথা বহুল প্রচলিত রয়েছে। কৃষ্ণের জন্মদিনে প্রতিবছর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে আড়ম্বরপূর্ণ জন্মাষ্টমীর মিছিল ঢাকা শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করত। ঢাকার নবাবরা থাকত এই মিছিলের অগ্রভাগে নিজেদের খাস বাদকদলসহ। ঢাকা শহরের তাঁতী বাজার এবং নবাবপুর- এই দুটি স্থানে দীর্ঘদিন থেকে তাঁতীদের বাস ছিল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই দুই স্থান থেকে দুটি মিছিল বেরিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এই দুই মিছিলের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এরপর নিয়ম করে দেয়া হয় যে, এক বছর তাঁতীবাজার থেকে মিছিল বের হলে পরের বছর বের হবে নবাবপুর থেকে। গ্রাম থেকে অসংখ্য মানুষ এই মিছিল দেখতে শহরে আসত। গ্রামের তাঁতী সম্প্রদায় অর্থাৎ বঙ্গ তাঁতীরা জন্মাষ্টমী উদ্যাপন করত বসাকদের থেকে আলাদাভাবে। দুজন বালকের মধ্যে একজনকে সাজানো হত কৃষ্ণ, আরেকজনকে সাজানো হত কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দগোপাল। তারপর জাঁকজমকের সাথে ঢাকঢোল পিটিয়ে মিছিল করা হত।[২৪]

ওয়াইজের বিবরণ অনুসারে, বসাক বা বঙ্গ তাঁতীরা উভয়েই বিশ্বকর্মার পূজা করত। বসাকদের মতো গ্রামের তাঁতীরাও তাঁত-মাকুসহ অন্য সব তাঁতের যন্ত্রপাতিকে পূজা করত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁতীরা বেশির ভাগই ছিল বৈষ্ণব। এরা খরদহের গোসাইদের অন্ধভক্ত ছিল। এদের পঞ্চায়েত বা প্রধান ছিল না। প্রতিপত্তিশালী তাঁতীরা এদের দরিদ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করত। আর তাদের পেশাদারী স্বার্থ রক্ষা করত দল। দলের পরিচালক ছিল দলপতি।

এ ছাড়াও মগবাজারের আরেক শ্রেণী তাঁতীর কথা উল্লেখ করেছেন জেমস ওয়াইজ। তাঁর মতে, 'মগবাজারে বাস করে এক অদ্ভূত ধরনের তাঁতী সম্প্রদায়। মগ কুমারেরা যে কারণে জাতিচ্যুত সেই একই কারণে এরাও জাতিচ্যুত।'

ঢাকার মসলিন বিশ্বখ্যাত হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববঙ্গে তাঁতীর সংখ্যা বেশি ছিল না। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, 'বাংলাদেশে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁতীর সংখ্যা ছিল ৩,৫৮,৬৮১ জন। এর মধ্যে মাত্র ৩১,৪০৭ জনের বাস ছিল পূর্ববঙ্গের নয়টি জেলায়। একই বৎসরে আদমশুমারি অনুসারে ঢাকা জেলার তাঁতীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮,৯০৬ জন।এদের মধ্যে কতজন ছিল বসাক তাঁতী আর কতজন ছিল বঙ্গ তাঁতী, তা অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি।

৫.২.৭.৬ যোগী তাঁতীদের ধর্মীয় আচার আচরণ

যোগীদের মধ্যেও কিছু গোত্রভেদ থাকলেও সব যোগীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হতো একইভাবে। জেমস ওয়াইজ এর চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন, 'খোলা জায়গায় প্রায় আট ফিট গভীরে গোল করে কবর খোঁড়া হয়। কবরের নিচের দিকে কুলুঙ্গির মত করা হয়, যেখানে রাখা হয় শবদেহ। সাতটি ঘটির জল দিয়ে

মৃতদেহকে স্নান করিয়ে কাপড় দিয়ে পেঁচানো হয়। মুসলমানদের সঙ্গে পার্থক্য করার জন্য আগুনের স্পর্শ লাগানো হয় ঠোঁটে। গলায় জড়ানো হয় তুলসীর মালা, আর ডান হাতে দিয়ে দেয়া হয় একটি জপমালা। বাহু ভাঁজ করে রাখা হয় বুকের ওপরে। বুদ্ধের মূর্তির মতো ভাঁজ করে রাখা হয় পা। বাঁ দিকের ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয় একটি থলে, তাতে থাকে চারটি কড়ি। সমাধিতে মৃতদহে নামাবার পর মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হয় উত্তর-পূর্ব দিকে। এরপর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয় সমাধি। বুকের উপর রাখা হয় একটা বড় মালা। পিন্ড হিসেবে রাখা হয় ভাত ভর্তি একটি বাটি। সমাধির ওপরে লাগানো হয় একটি গাছ। সমাধির মধ্যে দেয়া হয় পান-সুপারি, ছিলিমযুক্ত একটি হুঁকা, কিছুটা তামাক আর সামান্য কাঠ কয়লা। সব শেষে বিশ্ব-মাতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে কবরের ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয় সাতটি কড়ি। একইভাবে কবর দেয়া হয় মেয়েদেরও।[২৫]

জেমস ওয়াইজের বিবরণ অনুসারে, শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এক রকম হলেও এরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি শাখার নাম সাম্য। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করত এক মাস পর, সে কারণে এই নাম। ঢাকা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় এরা সংখ্যায় বেশি ছিল। অপর শাখার নাম-একাদশী। তারা শ্রাদ্ধ করত এগারো দিন পরে। এদের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত বেশি। বিক্রমপুরের উত্তরাঞ্চলে এবং ঢাকা জেলার সর্বত্র এদের দেখা যেত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিয়ে-শাদি হতো না। একে অন্যের রান্না খাবার খেত না। তবে এক পাত্রে জল পান করত। সাম্য ও একাদশী-এই উভয় শাখার যোগীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন জেমস ওয়াইজ তাঁর গ্রন্থে। ওয়াইজের মতে, এদের বেশির ভাগই পূজা দিত শিব বা মহাদেবের। তবে কিছুসংখ্যক ছিল বৈষ্ণব।[২৬] ওয়াইজ এর মতে, 'সাধারণত যোগীরা অশিক্ষিত।' কিন্তু সতীশচন্দ্র যোগীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'জীবিকার জন্য এখন যোগীরা বস্ত্র বয়ন বা বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্ম-তত্ত্বালোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচর্চা এখন তাঁহাদের আছে। ... আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগীগৃহে তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষের স্বহস্তলিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অযত্নে রক্ষিত হইতেছে।[২৭] ফলে মনে হয়, বিশ শতকের গোড়া থেকে যোগীদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল।

৫.২.৮ মুসলমান সম্প্রদায়ের তাঁতীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন

সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা তাঁতে কাপড় বোনে, তাদের 'জোলা' নামে ডাকা হয়। কিন্তু সব মুসলমান তাঁতীই 'জোলা' নয়। জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, 'জোলাদের থেকে মুসলমান তাঁতীদের 'কওম' স্বতন্ত্র।' কারণটাও তিনি উল্লেখ করেছেন, 'তাঁতীরা জামদানি বা নকশা তোলা কাপড় তৈরী করে; আর জোলারা তৈরি করে মোটা মসলিন। একসঙ্গে এরা খাওয়াদাওয়া করলেও এদের মধ্যে বিয়েশাদি হয় না। তাঁতীদের জোলা বললে ভীষণ চটে যায়। কারিগর কিংবা জামদানি তাঁতী বললে খুশী।[২৮] জেমস

টেইলরের বিবরণ অনুযায়ী, 'খুব সম্ভবত মুসলমানরাই জামদানি মসলিনের বুননের প্রচলন করেন এবং আজও তাদের হাতেই প্রধানত এর উৎপাদন একচেটিয়া।'[২৯]

৫.২.৮.১ জামদানি উৎপাদনকারী তাঁতী

জেমস ওয়াইজ উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমান তাঁতীদের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা স্পষ্টতই জামদানি তাঁতীদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'বিশেষ করে এরা বাস করে ডেমরা-নবীগঞ্জ ও লক্ষ্যা (শীতলক্ষ্যা) নদীর পার বরাবর। ব্যবসার মন্দা মওশুমে এরা হালচাষ করে। কখনও তাঁতে কাপড় বোনে না এদের মেয়েরা। তার বদলে ওরা জামদানিতে চিকনের কাজ করে অর্থাৎ নকশা তোলে। জোলা-বৌরা কাপড় ধোয়া, আঁশ সাফ করা ও সুতা বোনার কাজ করে বলে তাঁতী-বৌরা ওদের মনে করে ছোটো জাত।[৩০]

জামদানি বয়নকারী এই মুসলমান তাঁতীদের তাঁত জোলাদের তাঁত থেকে আলাদা। জামদানী তাঁতীদের তাঁত হালো দুই সানা ও দুই প্যাডেল-বিশিষ্ট। এই তাঁতে তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট কাপড় বোনা যায়। জামদানি তাঁতে মূল তাঁতীর সাথে কাজ করে একজন বালক, শিক্ষানবিশ হিসেবে, যে কিনা কাজ করতে করতে শিখে নেয় কয়টি সুতা ছাড়তে হবে, কয়টি সুতা ধরতে হবে ইত্যাদি। এভাবে ওস্তাদের কাছে জামদানি বয়ন শেখে ছেলেটা। ক্রমে সেও পাকা তাঁতী হয়ে ওঠে। জামদানীর কারিগরী শিক্ষাটি একটি গুরুমুখী বিদ্যা।[৩১]

জেমস ওয়াইজের এর মতে, হিন্দু তাঁতীরা জামদানি বানায় খুবই কম। হিন্দু তাঁতীদের অর্ডার মুসলমান তাঁতীরা নেয়। হিন্দু পুঁজিপতিকে বলা হয় মহাজন বা সর্দার আর মুসলমান হলে সাওদা। এরা বিশেষ কাজের জন্য টাকা অগ্রীম দেয়। কাজ ভাগ করে দেয়া হয় বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে। কথা থাকে, একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কাজ শেষ করে দিতে হবে। জামদানির বিরাট বাজার হলো লক্ষ্যার (শীতলক্ষ্যা) তীরে ডেমরায়। প্রতি শুক্রবারে বসে এক বিরাট মেলা। জামদানি কেনাবেচনা হয় বহু টাকার। জেমস ওয়াইজ জানিয়েছেন, তাঁতীরা পীরের ওরসে যোগ দেয়, মহররমের তাজিয়া বানায় এবং অন্যান্য ভারতীয়দের মতো পাঁচপীর, জিন্দাপীর মানে। হোলি উৎসবে যোগ দেয়।[৩২]

৫.২.৮.২ জোলা তাঁতী

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মোটা কাপড় বোনে, তারা 'জোলা' নামে পরিচিত। জেমস ওয়াইজ এর মতে, 'জোলা কথাটি সব শ্রেণীর মুসলমান তাঁতীদের কাছেই নিন্দনীয়। শুধু তাই নয়, জোলা শব্দটি গালিগালাজ হিসেবেও ব্যবহৃত। আরবি শব্দ "আহম্মক"- মানে বোকা, জোলা শব্দের সমার্থক।'[৩৩]

জোলা সম্প্রদায়ের বোকামির নানা গল্প প্রচলিত আছে। উদাহরণ হিসেবে দু'-একটি গল্পের নমুনা হাজির করা যাক। জেমস ওয়াইজের মাধ্যমে ঢাকার বহুল প্রচলিত গল্পটি জানা যায়। সেটা হচ্ছে, ঢাকার

অনতিদূরে ডেমরার একদল জোলা রাতের বেলা পালিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে নদীতে নৌকায় চেপে সারারাত বৈঠা বাইল, দাড় টানল কিন্তু খেয়াল করেনি যে, নৌকাটি নদীর কিনারে লগির সাথে বাঁধা আছে। ফলে সারা রাত দাঁড় বাইলেও নৌকা যেখানে ছিল, সেখানেই রইল। পরদিন সকালে আলো ফুটলে দেখল যে যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। তখন তারা অনেক মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বের করল যে, আসলে তারা ডেমরা ছাড়তে চাইলে কী হবে, ডেমরা তাদেরকে ছাড়তে চাইছে না। তা না হলে সাথে সাথে ডেমরা চলে আসে! তখন ওরা যার যার বাড়ি ফিরে গেল।

জোলাদের সম্পর্কে প্রচলিত আরেকটি গল্প হল : অনেক দিন আগে কোনো এক গ্রামে রাস্তার ধারে কাচারিঘরে বসে এক মুসলিম ভদ্রলোক সকালে পুঁথি পাঠ করছিলেন। সেখানে দিয়ে যেতে যেতে পুঁথি পাঠ শুনে এক জোলা খুব কাঁদতে লাগল। তখন সবাই অনেক সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পুঁথি পাঠের কোন অংশ শুনে সে এরকমভাবে কাঁদল? পুঁথি পাঠের কোন অংশটা তাকে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত করেছে, নাড়া দিয়েছে? তখন জোলা বলল, আসলে পুঁথি পাঠ নয়, পুঁথি পাঠরত ভদ্রলোকের দাড়ি দেখে নিজের একটা ছাগলের কথা মনে পড়ে গেছে, যেটা গত বছর মারা গেছে। ছাগলটারও এ রকম দাড়ি ছিল। সেই ছাগলের শোকে সে কাঁদছে।[৩৪] জোলাদের নিয়ে এমন অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

৫.২.৮.২.১ জোলা তাঁতীদের ধর্মীয় আচরণ

জেমস ওয়াইজ জোলা তাঁতীদের নবদীক্ষিত মুসলমান বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, 'এ রকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অতীতে এরা ছিল অবহেলিত বর্ণের হিন্দু। কোনো এক সময়ে একত্রে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে সবাই। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেছেন, 'নতুন ধর্মে দীক্ষিত লোকেরা নব আচার অনুষ্ঠান পালনে যে রকম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে, এরা শিয়া রীতিনীতি অনুসরণেও সে রকম বাড়াবাড়ি করে। মহররম মাসে তারা চুল আঁচড়ায় না, পান খায় না কিংবা মাছ-রান্না-করা হাঁড়ির রান্না খায় না। এ ছাড়া মহররম মাসের, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে তারা দুই শহীদানের স্মৃতিতে 'বদ্দিদ' ও কাফনি পট্টি বাঁধে হাতে।[৩৫]

জোলাদের সম্পর্কে প্রচলিত একটা গল্পেও হঠাৎ ধর্মান্তরিত হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জোলাদের সম্পর্কে অন্যান্য মুসলমানরা বলে থাকে, 'ও জোলা! ওরা তো শুনে মুসলমান।' 'শুনে মুসলমান' বিষয়টি কী? সেটা বুঝতে হলে গল্পটি জানা দরকার। সেটা এ রকম, জোলারা সাধারণত বাড়ির বাইরে খুব একটা যায় না। নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে তারা দুনিয়ার খবরাখবর একটু কমই রাখে। অতীতের কোনো এক সময় হঠাৎ তারা একদিন খবর পেল যে পাশের গ্রামের সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে তারা জানল, আশেপাশের আরো অনেক গ্রামের পরিচিত অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে। তখন জোলারা সবাই আলোচনায় বসল এবং সেই আলোচনায় তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, আজ থেকে তারাও সবাই মুসলমান।[৩৬]

ইসলাম ধর্মের মুল ভাবনা ও দর্শন এবং ইসলামি রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের মুসলমান দাবি করায় জোলারা আশেপাশের মুসলমানদের কাছে হাসির পাত্র হয়। প্রকৃত ইসলামি জ্ঞান ওদের মধ্যে নেই বলে অনেকে মনে করে থাকে। সেই সূত্রে জোলাদের সম্পর্কে এই গল্প ও প্রবচন প্রচারিত যে, 'জোলা! ওরা তো শুনে মুসলমান।[৩৭]

জেমস ওয়াইজের বিবরণ থেকে উনিশ শতকের জোলা সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো তথ্য জানা যায়। যেমন, ইসলামি নিয়মানুসারে বিয়েতে মুসলমানরা যে কাবিননামা বা বর-কনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে, তারা এটা করত না। পরবর্তীকালে এই প্রথা চালু হয় এবং 'দেনমোহর' প্রচলন হয়। এই সম্প্রদায়ের দলপতিকে বলা হতো মাতব্বর। মন্ডল, কারিগর বা শিকদার হলো এদের পদবি।[৩৮]

> যে সকল এলাকার তাঁতী সম্প্রদায় জোলা নামে পরিচিত সেই এলাকায় অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায় যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল বা এখনো আছে তারা নিজেদের 'চাষা' বলে পরিচয় দেয়। কারণ তারা এই বলে গর্ববোধ ও স্বস্তিবোধ করে যে তারা অন্তত জোলা নয়।[৩৯]

বর্তমানে অবশ্য জোলাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। সমাজে, বিশেষত শহরাঞ্চলে তাদেরকে এখন আলাদা করে চিহ্নিত করা মুশকিল। তাঁতের কাজের সঙ্গেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ এখনো যুক্ত। এরা মূলত বাস করে গ্রামে বা মফস্বলে। বাংলাদেশের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, রায়পুরা, মাধবদীর চরাঞ্চলে জোলা সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি দেখা যায়, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁত ও বস্ত্র শিল্পের সাথে যুক্ত।

৫.২.৮.২.২ চাষা তাঁতীদের সাথে জোলা তাঁতীদের বৈসাদৃশ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান তাঁতীদের মধ্যে যারা মোটা কাপড়ের কাজ করে, অর্থাৎ জোলা সম্প্রদায় এবং যারা কৃষিকাজ করে, অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়- এই উভয় পেশাজীবী মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাঁতশিল্পে জড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হওয়ায় অনেক কৃষক কৃষি পেশার পাশাপাশি নিজ বাড়িতে তাঁত স্থাপন করে কাপড় উৎপাদন করে। এই কৃষকদের একটা বড় অংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। একই ধর্মের অনুসারী হওয়ার পরও তাদের ভেতর পেশাগত ভিন্নতার কারণে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্ব বিদ্যমান। তাঁতের কাজ করে বলে মুসলমান তাঁতীদের 'জোলা' বলে কৃষকেরা। আগেই বলা হয়েছে, জোলা শব্দটি তুচ্ছার্থে এবং গালাগাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, জোলারা কৃষকদের বলে, 'তোরা তো চাষা-পাও ফাটা'। নামে ডাকা হয় ব্যাঙ্গার্থে। কেননা, কাপড় বয়নের কাজ তো মাঠে নয়, ঘরে বসে করতে হয়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে

পরস্পর বিয়ে-শাদি হওয়াটা কঠিন। গ্রামাঞ্চলে এখনো চাষার ঘরের মেয়েকে জোলা পরিবারের বউ হয়ে আসা কিংবা জোলার ঘরের মেয়ে বউ হিসেবে যাবে চাষার ঘরে, এটা ভাবা মুশকিল। তবে শহরাঞ্চলে এই বিরোধটা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। জোলা ও চাষাদের মধ্যে বিয়ে বা সামাজিক লেনদেন হওয়াটা এখন আর খুব অস্বাভাবিক বা বিরল নয়।

চাষা ও জোলাদের এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণ বিষয়টি খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে বলা মুশকিল। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের এই দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বয়সী মানুষের সাথে আলাপ করে ঢাকা, নরসিংদী, রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও, আপাতদৃষ্টিতে এটা গোষ্ঠীগত বিরোধ বলে মনে হলেও এর আসলে কিছু ব্যবহারিক কার্যকারণ আছে। বিষয়টা হলো, চাষা ও জোলা- এই উভয় পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ গৃহের নারীদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল তাদের কাজের জন্য। যেমন– চাষা পরিবারের নারীদের অবশ্য কর্তব্য হলো নিয়মিত উঠান লেপা, ধান ভানা, ধান সিদ্ধ করা, পরিবারের জন্য রান্না করা ইত্যাদি। এই কাজগুলো কৃষক পরিবারের প্রাত্যহিক কাজ কিন্তু তাঁতী বা জোলা পরিবারের মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই এসব কাজের সাথে পরিচিত থাকে না কিংবা তারা অভিজ্ঞতার অভাবে এসব কাজে দক্ষও হয় না। ফলে কৃষক পরিবারে কোনো জোলা পরিবারের মেয়ে বউ হয়ে এলে সেটা মেয়েটির জন্য এবং সেই কৃষক পরিবারের জন্য একটা বিরাট বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য চাষা পরিবারের মেয়েটির জন্যও। চাষা পরিবারের মেয়েটিকে দিয়ে নলি ভরা, সুতা প্যাঁচানো, তানা দেয়া, বও করা ইত্যাদি কাজ করানো কঠিন। অথচ এগুলো যেকোনো জোলা পরিবারের প্রাত্যহিক কাজের অংশ। ফলে কৃষক পরিবারের মেয়েকে বউ হিসেবে আনা জোলা পরিবারের জন্য মোটেই লাভজনক নয়। এই ব্যবহারিক অসুবিধাগুলো জোলা ও চাষাদের মধ্যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্ব তৈরির জন্য অনেকাংশে দায়ী। কেননা, লক্ষণীয় বিষয় হলো, শহরে যারা লেখাপড়া শিখে চাকরি বা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে,তাদের মধ্যে কিন্তু চাষা-জোলার ঐতিহ্যবাহী বিরোধটি থাকলেও, তা তেমন একটা কার্যকর নয়। বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকাজ- এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে দূরত্বের হওয়ার কারণে এবং নতুন বিকল্প পেশার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় চাষা-জোলার সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রাচীন বাধা বা বিরোধের তেমন কোনো প্রয়োজন বা কার্যকারিতা থাকছে না। বাংলাদেশে মূলত পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে চাষা-জোলার এই দ্বন্দ্ব ও সংকট বেশি দেখা যায়।

৫.২.৯ একই অঞ্চলে তাঁতীদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন

(ক) নিলক্ষার তাঁতী

রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা একটি তাঁত সমৃদ্ধ ইউনিয়ন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময় এবং পুরো আশির দশক জুড়ে মোঃ হারুন মিয়াসহ অনেক তাঁত কারখানার মালিক শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা তৈরীতে সুনাম

অর্জন করেছিল। কিন্তু রায়পুরার অন্য এলাকা হাইরমারা, চরসুবুদ্ধি, করিমগঞ্জ, হাটুভাঙ্গা অর্থাৎ হাসনাবাদ বাজারকে ঘিরে যে সমস্ত তাঁত সমৃদ্ধ গ্রাম আছে তারা সমজাতীয় পেশার জনবহুল নিলক্ষা এলাকার তাঁতীদের সাথে আত্মীয়তা, বিয়ে শাদী করতে বা দিতে আগ্রহী ছিল না, এখনও নেই। কারণ তাদেরকে (নিলক্ষা) এলাকার তাঁতীদের নিম্ন শ্রেণী, চৌরা (চরাঞ্চলের) মানুষ এবং অশিক্ষিত মনে করতো।[৪০]

(খ) মাধবদীর তাঁতী

শেখের চর, মাধবধী এলাকা বাংলাদেশের একটি প্রধান তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা। কাঠালিয়া ইউনিয়ন, সদর উপজেলার নুরালপুর ইউনিয়ন, আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী, খড়িয়া ইউনিয়ন তাঁতসমৃদ্ধ এলাকা তথাপি তাঁতী হওয়া সত্বেও পলাশ উপজেলার ডাঙ্গা এলাকার তাঁতীসম্প্রদায় এবং সদর উপজেলার হাজীপুর, শিলমান্দী এলাকার তাঁতীরা মাধবদী এলাকার তাঁতীদের সাথে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী নন। তেমনি, গোপালদী, মাধবদী এলাকার তাঁতীরা নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা করতে আগ্রহী।[৪১]

৫.২.১০ বেনারসি উৎপাদনকারী তাঁতী

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বেনারস থেকে কিছু অবাঙালি মুসলিম তাঁতী ঢাকায় চলে আসে এবং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস শুরু করে। নতুন বসতিতে তারা তাঁতের কাজ শুরু করে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অবাঙালি মুসলমানরা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে আসে এবং বসতি গড়ে তোলে। দেশান্তরি অবাঙালি মুসলমানদের একটা বড় অংশ ছিল বেনারসি তাঁতের কারিগর। তারা প্রথমে ঢাকার মোহাম্মদপুরে এবং পরে মিরপুরে স্থায়ী হয়। বেনারস ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা অবাঙালি মুসলমানরাও তাঁতের কাজ শিখে এই পেশায় যোগ দেয়। ক্রমে ঢাকার মিরপুরে অবাঙালি মুসলমানদের হাতে বিখ্যাত বেনারসি শাড়ির নতুন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। সংখ্যায় এই অবাঙালি মুসলমান বেনারসি তাঁতীদের পরিমাণ কম হলেও বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের ইতিহাসে তাদের মাধ্যমে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে তাঁতীদের ব্যবসার প্রসারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে মিরপুর বেনারশী পল্লী। মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকার তাঁতীরা এখানে তাদের পণ্যের বাজারজাত করে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে নারী পুরুষ আগ্রহী ক্রেতাগণ ব্যক্তিগতভাবে সুলভমূল্যে নকশী করা শাড়ী কেনার জন্য এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা আসেন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। বিষয়টি গবেষক মিরপুর এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছেন।

পরবর্তীতে বাঙালি মুসলমানরাও এই কাজে যোগ দেয়। যারা বংশপরম্পরায় এই কাজের সাথে যুক্ত, তাদেরকে বলা হয় 'জাত তাঁতী'। আর যারা তাদের কাছ থেকে এই কাজ শিখেছে, তাদেরকে বলা হয়

'হাত তাঁতী। ঢাকার মিরপুরে এখন হাত তাঁতীদের সংখ্যাই বেশি। বেনারস বা ভারত থেকে আসা আদি তাঁতী পরিবার এখনো কিছু আছে বটে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে (১৯৭১) এ দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে কারণে আদি বেনারসি তাঁতীর সংখ্যা কমে গেছে বরং বাঙালিরা এই কাজটা শিখে ঢাকাই বেনারসির ধারা অক্ষুণ্ন রেখেছে।[৪২]

৫.২.১১ ভিন্ন সম্প্রদায়ের তাঁতী

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন বয়নশিল্পীগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরাই মূলত বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রধান ধারা। তবে এর বাইরেও আরো কয়েকটি গোষ্ঠী/গোত্র/সম্প্রদায় আছে, যারা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র। তাদের মধ্যে কাপালি ও কারনিদের নামে দুটি বিলুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়।

৫.২.১২ কাপালী সম্প্রদায়ের তাঁতী

মধ্যযুগের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-এ বর্ণবিন্যাসের স্তর অনুসারে কাপালিদের স্থান হয়েছে অসৎ শূদ্র পর্যায়ে, ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জেমস টেইলর (১৮৪০) লিখেছেন, 'কাপালিকগণ চটের কাপড় বোনে এবং দড়ি, পাকানো সুতা ও থলে ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। এদের অনেকে আবার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবেও কাজ করে।'[৪৩] জেমস ওয়াইজ (১৮৮৩) কাপালিদের সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'বুকানন এদের ছাতা বানাতে দেখেছিলেন রংপুরে। এরা পূর্ববঙ্গে বাস করে। প্রধানতঃ এরা পাটের চাষাবাদ করে ও পাটে জাঁক দিয়ে তা থেকে শন বরে করে। তারপর মোটা চট থেকে থলি বানায়। স্ত্রী ও পুরুষ সবাই তাঁতে কাপড় বোনে। এদের তাঁত দেশি, তবে তাঁতীদের ব্যবহৃত তাঁতের চাইতে কিছুটা জটিল। এই তাঁতের মাকুর নাম বাঁয়া। এই তাঁতে সানা নেই। এরা মাকু চালায় হাত দিয়ে যোগীদের মতো পা দিয়ে নয়।

৫.২.১৩ কাপালি তাঁতীদের জীবনযাত্রা

প্রধানত তিন ধরনের চট বানাত কাপালিরা। সরিষাদানা বহনের জন্য, জিনিসপত্র বেধে রাখার জন্য এবং মেঝের মাদুরের জন্য বা নৌকার পালের জন্য। বিক্রমপুরের সুপারি বহনের জন্য মিহি এক ধরনের চটের বস্তা বানানো হতো, যেটাকে বলা হতো 'বড় বস্ত্র'। ইউরোপ থেকে চটের বস্তা আমদানি করায় উনিশ শতকের শেষদিকে তারা সমস্যায় পড়েছিল এবং তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৪৪] তবে তার পরও তারা তাঁতের কাজে টিকে ছিল। এর কারণ, মাদুর বানাবার চটের বাজার নষ্ট হয়নি। জেমস ওয়াইজ বলেছেন, 'বঙ্গ দেশে বাঁশের মাদুরের ব্যবহার সর্বত্র। দুর্গা পূজার বিজয়দশমীর দিনে পূর্ববঙ্গের সব দোকানদার এমনকি মুসলমানারা পর্যন্ত মেঝে পাতা পুরনো চটের মাদুর ফেলে দিয়ে নতুন চট বিছায়।'[৪৫]

জেমস ওয়াইজ কাপালিকদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন। যেমন- এরা সাধারণত গ্রামে বাস করত। সচরাচর পাট চাষ করা যায় এমন স্থানের কাছাকাছি তারা বসবাস করত। সাধারণত কাপালিরা ছিল দরিদ্র। তবে কয়েকজন তাদের মধ্যে তালুকদার পর্যন্ত হয়েছিল। কেউ কেউ জাত ব্যবসা পরিত্যাগ করে হয়েছিল নৌকার মাঝি বা মুদি দোকানদার। এরা অধিকাংশই ছিল বিষ্ণু পূজারি এবং এরা হিন্দুদের প্রধান প্রধান সব উৎসবই পালন করত।[৪৬] পতিত ব্রাহ্মণ এদের পুরোহিত হতো। এদের একমাত্র গোত্র হলো কাশ্যপ। এদের পঞ্চায়েত প্রধানকে বলা হতো মাতব্বর। কাপালি জাতির উপাধি হলো মাঝি, মন্ডল শিকদার, মালা ও হালদার। প্রচলিত লোককথা বা কিংবদন্তি অনুসারে তাদেরকে কর্মকার বাবা ও তেলিনী নারীর বংশধর বলে মনে করা হয়।[৪৭]

সরকারি নথিতে, বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের কুটির শিল্পবিষয়ক জরিপেও (১৯২৯) বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন-বৃহত্তর বরিশালে, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ঢাকা ইত্যাদি জেলায় কাপালিয়া সক্রিয় ছিল বলে জানা যায়।[৪৮] তাঁতের কাজ করে বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না তাদের। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ এই শিল্পের, কাপালিদের কাজের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কিছু কর্মসূচি ও উদ্যোগ নিয়েছিল। তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এই জরিপ প্রতিবেদন থেকে। সেখানে বাকেরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার বিবরণে উল্লেখ রয়েছে,

> There is a class of people called kapalis who weave gunny bags from jute... The Kapalis get their supply of jute locally while a few grow their own jute. They are Hindus by religion. There are mahajans also who help them with loans. Bags larger than 27 by 72 in size cannot be made on their looms, which are very primitive and the method of weaving is very slow. Gunny-making is not the primary occupation of the Kapalis. This jute waving is done by the women also in their leisure hours. The industry has long been in vogue among the Kapalis, but as the profession is not a paying one the Kapalis have also taken to agriculture. A loom does not cost them more than Rs. 2-8 to 3. Each bag requires ¾ seer of jute and the production does not exceed one bag per day of 10 to 12 hours. Three or four bags are sold for Rs. 1. Thus the average profit of workers does not exceed more than annas 2 to annas 3 per day or Rs. 5 per month. By the effort of the Department of industries, some improvement has been effected in this industry. Improved spinning machines have been constructed and their working has

been demonstrated among the Kapalis. Improved looms have also been made and worked among them. The Kapalis appreciate the demonstrations but progress in adoption is slow.

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, শিল্প বিভাগের উদ্যোগ সত্ত্বেও ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাপালিদের মধ্যে তাঁতের কাজের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। পাকিস্তানপর্বে বাংলাদেশে বিভিন্ন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাপালি সম্প্রদায় আর তাঁদের পাট সংশ্লিষ্ট তাঁতের কাজ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ পেশা পরিবর্তন করে বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। আলাদা তাঁতী সম্প্রদায় হিসেবে এদেরকে এখন চিহ্নিত করাই বেশ মুশকিল।[৪৯]

৫.২.১৩.১ কারান সম্প্রদায় তাঁতী

প্রায় একই কথা প্রযোজ্য কারনি সম্প্রদায় সম্পর্কেও। জেমস ওয়াইজ তাদেরকে নিম্ন বর্ণের তাঁতী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কারনি শব্দের অর্থ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্য আছে। কারো কারো মতে, সংস্কৃত শব্দ 'কর' থেকে শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃত 'কর' শব্দের অর্থ করা, তাই আক্ষরিক অর্থে কারনি অর্থ 'না করা'। সংখ্যায় এরা অত্যন্ত কম ছিল। ঢাকা জেলার পশ্চিমের থানাগুলোতে, পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর ও পশ্চিমের কয়েকটা থানায় এদের বাস ছিল। পাবনা ও ফরিদপুরে কারনিদের পাওয়া যেত। এরা অধিকাংশই ছিল বৈষ্ণব। তবে কিছুসংখ্যক ছিল শৈব মতাবলম্বী।

কাপালিদের মতো কারনিরাও তাঁত বুনত ও কৃষিকাজ করত। প্রধানত তারা মুলত ধুতি, গামছা ও রঙিন বিছানার চাদর বুনত। তা ছাড়া, হিন্দুরা নিকটাত্মীয় মারা গেলে শোক প্রকাশের জন্য যে কাপড় পরে, তাও বুনত এরা।[৫০]

> কাপালিদের মতো কারনিরাও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে বা এমনভাবে অন্যান্য পেশাজীবী ও ধর্মের মানুষের সাথে মিলেমিশে গেছে যে আলাদা করে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করাই কঠিন...। এই দুই বয়ন সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের প্রেক্ষাপটে এখন 'বিলুপ্তপ্রায়' বলা হলে তা অসঙ্গত হবে না।

৫.২.১৩.২ আদিবাসী তাঁতী সম্প্রদায়

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বয়নশিল্পীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিভিন্ন আদিবাসী তাঁতী। আদিবাসী তাঁতী বলতে মূলত নারীদেরকেই বুঝায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠী গুলোতে নারীরাই একচ্ছত্রভাবে তাঁতের কাজ করে থাকে।[৫১] উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে বসবাসরত কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ধারার তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত তারা হলো- পার্বত্য চট্টগামের

তিনটি জেলায় চাকমা, বম, ম্রো, কুমি, পাংখোয়া, চাক ইত্যাদি। কক্সবাজার ও বরগুনায় রাখাইন জনগোষ্ঠীতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মান্দি, মণিপুরি, হাজং ইত্যাদি জাতিসত্তার ভেতর এবং উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বিভিন্ন কোচ বংশোদ্ভূত আদিবাসী নারীদের ভেতর (যারা পলিয়া, দেশি ইত্যাদি নামে পরিচিত) একটি বিপুল অংশ দীর্ঘকাল ধরে তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত। আদিবাসী নারীরা মূলত ব্যবহার করে কোমর তাঁত। তবে কোথাও কোথাও সম্প্রতি গর্ত তাঁত, ফ্রেম তাঁত বা চিত্তরঞ্জন তাঁতের ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো, কক্সবাজার ও বরগুনার রাখাইন, সিলেট অঞ্চলের মণিপুরি এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের মান্দি জনগোষ্ঠীর ভেতর নারীদের তাঁতের কাজ শেখাটা অত্যাবশকীয় গুন হিসেবে বিবেচিত হয়। সব নারীকেই কম-বেশি তাঁতের কাজে পারদর্শী হতে হয় এবং এটা তারা খুব ছোটবেলা থেকে পারিবারিক পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা লাভ করে থাকে। সাধারণত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা নবীনদের এই কাজের শিক্ষা দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য আদিবাসী সমাজে যে মেয়ে তাঁতের কাজ জানে না, একসময় তার বিয়ে দেয়া কষ্ট হতো। অধিকাংশ আদিবাসী নারী শৈশবেই কোমর তাঁতে কাপড় বোনা শিখে নিত এবং বছর অন্তত একবার নিজের জন্য বা পরিবারের জন্য বস্ত্রবয়ন করার রীতি প্রচলিত ছিল। ইদানীং আদিবাসী নারীদের ভেতর আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটায় অনেকে শৈশবে কোমর তাঁতে কাপড় বোনা শিখলেও এর চর্চাটা কমে এসেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একমাত্র মণিপুরিদের ভেতর অল্পসংখ্যক পুরুষ তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত। পুরুষদের তাঁতের কাজ করা উচিত নয়-তা নিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কারও প্রচলিত আছে আদিবাসী সমাজে। যেমন- ত্রিপুরা সমাজে প্রচলিত আছে, কোনো পুরুষ যদি কখনো তাঁতের কাজে অংশ নেয়, তাহলে সে বজ্রপাতে মারা যাবে। আবার তংঞ্চঙ্গা সমাজের বিশ্বাস এরকম যে, যদি কোনো পুরুষ তাঁতের কাজ করে, তাহলে সে যখন বনের মধ্যে যাবে, তখন বন্য মুকর তাকে আক্রমণ করবে।[৫২] প্রকৃতপক্ষে এটাকে মেয়েদের কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুরুষেরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করলেও কখনো সরাসরি তাঁতের কাজে অংশ নেয় না। শাওন আকন্দের গ্রন্থে পার্বত্য এলাকার তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে।

> পার্বত্য এলাকায় নারীরা জুম চাষের মাধ্যমে যে তুলা পাওয়া যায় তা দিয়েই আগে চরকায় সুতা কাটত। এবং তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক রঙে রঞ্জিত করে, তারপর সেই সুতা দিয়ে কাপড় বুনত। এখন বাজারে রং করা মিলের সুতা যথেষ্ট পাওয়া যায়। আদিবাসী নারীরাও অধিকাংশ সেই সুতা ব্যবহার করে। আর সত্তরের দশক থেকে সুতির চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে রেয়ন। ব্যবহৃত সুতা হিসেবে রেয়নের ব্যাপক দাপট রয়েছে পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভেতর। সুতি সুতার কাজ এখন প্রায় হয় না বললেই চলে। আদিবাসী নারীরা এই পরিবর্তনের সাথেও নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তুলা থেকে চরকায় সুতা কাটা বা প্রাকৃতিক রঙ দিয়ে সুতা রাঙ্গানোর প্রচলন অনেক কম এখন আদিবাসী নারীদের

ভেতর। তবে একেবারে যে নেই, তা নয়। উত্তরাঞ্চলের কোচ বংশোদ্ভূত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর ভেতর পাটের আঁশ থেকে সুতা কেটে তা দিয়ে কোমর তাঁতের সাহায্যে চট বোনার প্রচলন আছে। এই কাজের প্রবণতাও এখন ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু।[৫৩]

৫.২.১৪ তাঁতীদের স্বভাবসুলভ জীবনধারা

তাঁতের কাজের ধরনটি যে রকম, তাতে যেকোনো তাঁতশিল্পীকে মানসিকভাবে স্থির ও শান্ত মস্তিষ্কের হতে হয়। রগচটা, অল্পেই অধৈর্য হয়ে ওঠে-এমন মানুষের পক্ষে তাঁতের কাজ করা সম্ভব নয়। ফলে যেকোনো তাঁতীই আসলে শান্ত ও নির্বিরোধী ধরনের মানুষ হয়ে থাকে। এমনও দেখা যায়, কোনো তাঁতীকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে রাগানোর চেষ্টা করলেও তারা সচরাচর রাগে না। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যেকোনো মানুষের ওপর তার পেশার প্রভাব পড়তে পারে। সে হিসেবে এ রকম বলা যেতে পারে, সুতা দিয়ে যারা সূক্ষ্ম বা মোটা কাপড় বুনে থাকে তাঁতযন্ত্রের সাহায্যে, সেই সব তাঁতী, জোলা কিংবা যোগী সম্প্রদায়-সবাই সাধারণত মানসিকভাবে স্থির হয়ে থাকে এটা তাঁতিদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পদ্ধতি ও করণকৌশলগত কারণে তাঁতশিল্পীদের ওপর এই প্রভাব পড়ে থাকে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

পেশাগত কারণেই তাঁতীদের মধ্যে খুব সম্ভবত এ কারণেই একধরনের ঘরকুনো স্বভাব গড়ে ওঠে। তাঁতীরা সাধারণত নিজের বাড়িতেই কিংবা বাড়ির কাছাকাছি কোনো কারখানায় কাজ করে থাকে। কিছু তাঁতশিল্পী অবশ্য বেশি রোজগারের আশায় দূরবর্তী জেলাগুলোতেও কাজের জন্য গিয়ে থাকে এবং অনেকে সময় সংসার পেতে স্থায়ী হয়। (যেমন- দিনাজপুরের রাণীরবন্দর এলাকার অনেক তাঁতী কাজ করে টাঙ্গাইলের বল্লা এলাকায়। আবার, কুষ্টিয়া কিংবা কুমারখালীর অনেক কারিগর কাজ করে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, এনায়েতপুর এলাকায়।) কিন্তু সারা দিন- সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা তাঁতের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে বলে বাইরের দুনিয়ার খোঁজখবর খুব একটা রাখে না। স্বাধীন তাঁতী হলে বাইরে যাওয়া বলতে কখনো কখনো সপ্তাহান্তে হাটে যাওয়া। দাদনের তাঁতী হলে সেটুকুও দরকার পড়ে না। খুব গন্ডিবদ্ধ জীবন যাপন করে বলে তাঁতশিল্পের সাথে যারা যুক্ত, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসলে ঘরকুনো স্বভাবের হয়ে থাকে। বাইরে তারা খুব একটা বের হয় না বা বের হতে চায় না কিংবা বের হতে পারে না। ফলে দেখা যায়, ঘরকুনো স্বভাবও বিভিন্ন ধরনের তাঁতীদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে সবাই যে এই স্বভাবের অন্তর্গত, তা নয়। অনেক সময় উদ্যমী তাঁতশিল্পীও দেখা মেলে, যাদের কোনোভাবেই ঘরকুনো বলা যাবে না। তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

৫.২.১৫ আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও পরম্পরাগত জ্ঞানের সংকোচন

বাংলাদেশের তাঁতীদের পেশাগত কাজের শিক্ষাটা যতটা না প্রতিষ্ঠানভিত্তিক,তার চেয়ে অনেক বেশি বংশপরম্পরা ও গুরু-শিষ্যপরম্পরাগত। বংশপরম্পরা বা গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত ঐতিহ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু ক্রমশ এই ধারা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে এবং কার্যকারিতা কমে আসছে। তবে বর্তমানে তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে তাঁত শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ নেয়া শুরু করেছেন।

৫.২.১৬ সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ

যারা বংশপরম্পরায় তাঁতের কাজের সাথে যুক্ত, অর্থাৎ বসাক তাঁতী, জোলা, যোগী, কিংবা আদিবাসী নারী- তারা সবাই তাঁতের কাজের চেয়ে অন্যান্য কাজের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করছে। এর ফলে যে, সব ধরনের বা সব জাতের তাঁতীর ভেতর আধুনিক শিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে তাঁতশিল্পীদের আগ্রহ উল্লেখ করার মতো। প্রায় একশ বছর আগেই, যশোহর খুলনার ইতিহাস- এর লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র যোগীদের শিক্ষানুরাগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এখন বিভিন্ন তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট। বিশেষ করে যরা একটু অবস্থাসম্পন্ন, থাকে গ্রামে কিংবা মফস্বলে, তারা পরবর্তী প্রজন্মকে রাজধানী ঢাকা কিংবা অন্য কোনো শহরে রেখে কলেজে কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে। নরসিংদী থেকে শুরু করে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রংপুর কিংবা কুমিল্লায় এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামেও এটি খুব সাধারণ দৃশ্য। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই শিক্ষিত প্রজন্ম বাড়িতে তাঁতের কাজ দেখে বড় হয়েছে ঠিকই কিন্তু অধিকাংশই তাঁতের কাজে পরদর্শী নয়। কিংবা হয়তো তাঁতের কাজ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, এ রকম কিছু নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধির সাথে আলাপ করে আমি দেখেছি, তারা তাঁতের কাজের ব্যাপারে কোনোক্রমেই আগ্রহী নয়। এমনকি তার পরিবারও চায় না শিক্ষিত ছেলেটি বা মেয়েটি তাঁতের কাজে যুক্ত হোক।

এখানে আমাদের বলার কথা এই যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে তাঁতীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যেমন বাড়ছে, তেমনি বংশপরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত কৃৎকৌশলগত জ্ঞানের ধারাটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তাঁতসংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রবাহ বাংলাদেশে ক্রমশ বিলুপ্ত হবার পথে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁতীদের বিভিন্ন কোর্সভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করছে যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় এসেছে।

ব্যাপারটা সহজ করে এভাবে বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা নেবার পর চাষীর ছেলে যেমন চাষী হতে চায় না, বরং কৃষিকাজকে নিম্নমানের কাজ বলে মনে করে, তেমনি তাঁতীদের মধ্যেও যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে বা করছে, তারাও তাঁতের কাজটিকে ভালো বা সম্মানজনক বলে মনে করে না।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁতীদের সবাই পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে না নানা কারণে। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর বয়নশিল্পীরা তাদের সন্তানদে স্কুলে পাঠালেও অল্প বয়সেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁতের কাজে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে উপার্জনে লাগিয়ে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়।

আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ফলে তাঁতীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এর ফলে তাঁতীদের জন্য নানা ধরনের সম্ভাবনা যেমন তৈরি হচ্ছে, পাশাপাশি বংশ পরম্পরায় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাঁতের কাজ বিস্তারের পথটিও ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

৫.২.১৭ সাংস্কৃতিক চর্চা

কয়েকটি এলাকা ঘুরে তাঁতীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে ঈদ পরবর্তী সময়ে এবং শীতকালে তাঁত প্রধান এলাকাগুলোতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে যেমন- হাডুডু, কাবাডি খেলা এবং পল্লীগান, যাত্রাপালা ইত্যাদি। এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিলো নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার হাসনাবাদ, আমিরগঞ্জ, হাইরমারা, চরসুবুদ্দি, মনিপুরা ও নিলক্ষার বৃহৎ তাঁতী সম্প্রদায়। তাঁতী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী স্থানীয় অভিনেতা ও নাট্যকার জালাল উদ্দিন ছিলেন একজন বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সংগঠক। অন্য অধ্যায়ে উল্লেখ আছে হাসনাবাদ বাজার ছিলো স্বাধীনতা পরবর্তী সুতার বাজারের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং তৈরি শাড়ি, লুঙ্গির বৃহত্তম বাজারজাতকরণ কেন্দ্র। আর রায়পুরা উপজেলা ছিলো সুতী শাড়ী, লুঙ্গি ও গামছা উৎপাদনের শীর্ষে। তাঁতীদের বিনোদনের জন্য হাসনাবাদ বাজার এ প্রায়শ:ই বিভিন্ন মেলা, পাশ্ববর্তী আমিরগঞ্জে ফুটবল, দাড়িয়াবাধা খেলা এমনকি ঘোড়দৌড় ও ষাড়ের লড়াই ইত্যাদি বিনোদন উপভোগ করতো বলে এক সময়কার তন্তবায় সমিতির কর্মকর্তা রায়পুরা উপজেলার ডৌকারচর ইউনিয়নের সুলতান উদ্দিন মোল্লা[৫৪] ও সুতা ব্যবসায়ী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সদস্য সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সেলিম রেজা জানান।

৫.২.১৮ বিভিন্ন অধিকার আদায়ে আন্দোলন, বিদ্রোহে তাঁতী সমাজের ভূমিকা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কাজের ধরনেরকারণেই তাঁতীরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির হয় এবং সচরাচর উগ্র ও রাগী স্বভাবের হয় না। এমনকি, তাঁতী জেলা কিংবা যোগীদের ভেতর যারা উগ্র স্বভাবের, তারা বয়নকাজে পারদর্শী হয় না। তাঁতীদের এই নির্বিরোধী চরিত্রের আরেকটি প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে বহুবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছে, সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছে; কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায় হবার পরও কখনোই তাঁতী বিদ্রোহের কথা কিন্তু শোনা যায়নি। বিভিন্নভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হলেও তারা কখনোই সম্মিলিতভাবে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করেনি। এমনকি, বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তারা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আন্দোলন-সংগ্রামেও তেমন একটা অংশ নেয়নি।

তাঁতীদের অবস্থা ও স্বভাব সম্পর্কে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রধান মি. রুজের লেখা চিঠি থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'সাধারণভাবে তাঁতীরা অসহায় ও ভীরু প্রকৃতির। বেশিরভাগ হলো চরম দরিদ্র। ব্যবসার হিসাব রাখতে তারা অক্ষম। সহজভাবে এরা কঠোর পরিশ্রমী। নির্যাতিত হলে রুখে দাঁড়াতে জানে না। নিয়োগকর্তার কাছ থেকে যদি তারা ন্যায় ও মানবিক আচরণ পায় এবং একটানা পরিশ্রমে তার পরিবারের জীবিকা নির্বাহের মত উপার্জন হয় তাইলেই তারা খুশী।[৫৫]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে (১৮৩০) বাংলাদেশে ফরায়েজি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল এবং বিপুলসংখ্যক মুসলমান তাতে অংশ নিয়েছিল। এই আন্দোলন উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত (১৮৬০) সক্রিয় ছিল। কিন্তু মুসলমান তাঁতীরা তাতে তেমন একটা অংশ নেয়নি। জেমস ওয়াইজের লিখেছেন মুসলমান তাঁতী (জোলা নয়) সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন, 'একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফরাজি মতাদর্শ একেবারেই কল্কে পায়নি। এর কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি। খুব অল্পসংখ্যক তাঁতী যারা ভিড়েছিল ফরাজিদের সঙ্গে তাদের বহিস্কার করা হয়েছে কওম থেকে। তাই তারা আর পেশায় নেই।[৫৬]

রায়পুরা উপজেলার চরসুবুদ্ধি গ্রামে কয়েকটি প্রভাবশালী পরিবার ফরায়েজী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল বলে জানা যায়। তাদের পরবর্তী বংশধর মরহুম আ: হাই ফরায়েজী ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা।[৫৭] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অল্প কিছু মানুষ ফরায়েজি আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, বৃটিশ আমলজুড়ে (কিংবা তার আগে বা পরে) দুই বাংলায় তাঁতীদের ওপর এত যে জুলুম-অত্যাচার হলো, কখনোই কি তাঁতীরা কোনো বিদ্রোহে সামগ্রিকভাবে অংশ নেয়নি? খুব সম্ভবত এর উত্তর- না। তাদের পেশাগত কাজের ধরনের কারণেই তারা বিদ্রোহী মনোভাবের নয়। বঙ্গদেশে তাঁতী বিদ্রোহ না ঘটার আরেকটি বড় কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ (তুলা চাষী, রঞ্জনশিল্পী, ধুনুরি, সুতাকাটুনি, তাঁতী, সুচিশিল্পী প্রভৃতি) শক্তিশালী জাত-ভেদ প্রথা দ্বারা বিভক্ত ছিলো যদিও তারা একই অর্থনৈতিক কাজের সুফল ভোগ করতো। তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত এইসব পেশাজীবী মানুষেরা আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে সমাজে বসবাস করত। তাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় জাতভেদ প্রচলিত থাকার কারণে সামাজিক সম্পর্ক এবং ঐক্য খুব নিবিড় ছিলো-এরকম মনে হয় না। তাঁতীদের সাংগঠনিক শক্তি ও কাঠামো সম্পর্কে বলতে গিয়ে হামিদা হোসেন বলেছেন,

> The weaver lacked both organizational stregth and bargaining power, In spite of a community of interests which developed amongst the weavers and other artisans who supplied their

goods for the export trade, they failed to evolve an effective social organization. In their work a division of occupational caste groups into panchayats had given a loose organizational structure.[৫৮]

তার মানে এই নয় যে তাঁতীরা কখনোই কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। পলাশী যুদ্ধের পর, বিশেষ করে কোম্পানি আমলে তাঁতীদের উপর অন্যায় অত্যাচার চরমে উঠলে তাঁতীরা বিভিন্নভাবে এই অত্যাচার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলো যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের অংশ হিসেবে তারা কখনও কখনও উৎপাদনের গতি বা পরিমাণ কমিয়ে দিতো কিংবা অগ্রীম নিতে অস্বীকার করতো। এছাড়া বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁতীরা কোম্পানির এজেন্ট বা গোমস্তাদের সাথে চুক্তি করার সময় কাপড়ের দাম নিয়ে দর কষাকষি করেছে। এমনকি বাধ্য হয়ে কমদামে বস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করার পর ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁতীরা অনেক সময় ভালো সুতার পরিবর্তে খারাপ মানের সুতায় দিয়ে কাপড় বুনে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, কম দামে বা অন্যায্য মূল্যে চুক্তি করতে বাধ্য হবার পর তারা কখনও কখানও নিজ গ্রাম ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছে কিংবা পেশা পরিবর্তন করেছে এমন কথাও জানা যায়।[৫৯] কিন্তু কখনোই সার্বিকভাবে সহিংস বিদ্রোহ করেনি। তাঁতীদের প্রতিরোধের ধরণ সম্পর্কে হামিদা হোসেন মন্তব্য করেন,

While different forms of resistance were adopted there was little possibility of the weavers being able to organize a collective response. Most of them ostensibly accepted the system imposed on them, while surreptitiously they continued to work for other purchasers.[৬০]

তারপরও তাঁতীদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রকট আকার ধারণ করেছিলো। বিশেষ করে, যখন তাঁতীরা প্রকাশ্যে কোম্পানির কাছ থেকে অগ্রীম নিতে অস্বীকার করে। তাঁতীদের এই সংগঠিত প্রতিরোধ এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো যে, এই সংগঠিত প্রতিরোধ ভাঙ্গতে ঢাকায় কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জন টেলর তাঁতিদের ছয় জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বিচারের জন্য ফৌজদারী আদালতে পাঠিয়েছিলো।[৬১]

ঢাকা ছাড়াও বঙ্গদেশের কোথাও কোথাও তাঁতীদের একধরণের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিলো। এ বিষয়ে শান্তিপুরের তাঁতীদের কথা বিভিন্ন লেখক-গবেষক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন,

"The weavers of Santipore assembled daily by the sound of horn and discussed their grievances amongs themselves."[৬২]

শান্তিপুরের এই প্রতিরোধ আন্দোলন বিনষ্ট করতে নয় জন নেতৃস্থানীয় তাঁতীকে গ্রেফতার করা হয়, পরে তাদের ছয় জনকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয এবং বাকিদের শাস্তি দিয়ে জেলে পাঠানো হয়। শান্তিপুরের তাঁতীদের এই আন্দোলনকে কোন কোন লেখক ও গবেষক (যেমন, সুপ্রকাশ রায়, মোহিত রায়) মহিমান্বিত অতিরঞ্জিত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[৬৩] এবিষয়ে ডি.বি. মিত্র'র ভাষ্য প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলছেন,

> But it was true that circumstances were lessfavorable and the success of much resistance was very limited and henceforward they had mainly to depend upon more petitons for the redress of their grievances.[৬৪]

তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, তাঁতীদের এই প্রতিরোধ এবং অসহযোগী আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের ভিতর কোম্পানির দালালদের (যাদেরকে ১৭৭৪ সালে বাতিল/খারিজ করা হয়েছিলো) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে সন্দেহ করা হয়।[৬৫] যেমন, শান্তিপুরের তাঁতীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিজয়রাম, লোচন দালাল, রামহরি দালাল প্রমুখ। অধ্যাপক হরিরঞ্জন ঘোষাল শান্তিপুরের তাঁতী বিদ্রোহকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অনুরূপ বলে মন্তব্য করেছেন।[৬৬]

এছাড়া সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন যে, তাঁতীদের একটি অংশ সন্ন্যাসী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলো।[৬৭] তবুও, বঙ্গদেশে কোন অঞ্চলে তাঁতীরা সার্বিকভাবে কোন বিদ্রোহ করেছে বলে জানা যায় না।

১৯৪৭ এর দেশভাগের পর বাংলাদেশেও বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বিভিন্ন বাঁকে তাঁতীদের সম্প্রদায়গত কোনো বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায় না। তবে তাঁতীদের ভেতর থেকে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে সেই সব আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকতে পারে। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাঁতীগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনে নেমেছে, সে কথা জানা যায়। যেমন ষাটের দশকে বস্ত্রমিলের শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলনের খবর জানা যায়। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে তাঁতীরা আন্দোলন করেছে। কখনো সুতার দাম বৃদ্ধি বা এজাতীয় বিষয় নিয়ে তাঁতী ও বস্ত্রশ্রমিকদের আন্দোলনের খবর পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে (এপ্রিল-মে, ২০১০) সুতার দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেমের হস্তচালিত তাঁত ও পাওয়ার লুমের তাঁতীরা একযোগে আন্দোলনে নেমেছিল। এর বিভিন্ন বিবরণ জানা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থাপিত হলো,

সুতার দাম প্রতিদিন, এমনকি দিনের মধ্যে কয়েক দফা বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে স্থানীয় কাপড় উৎপাদক ও তাঁতীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সুতার অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের সব ধরনের তাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে তাঁতীরা কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। এর প্রতিকার দাবি করে দেশের বিভিন্ন ধরনের তাঁতীরা একযোগে আন্দোলনে নামে, যা শেষে ধর্মঘট পর্যন্ত গড়ায়। সেই সময়ে দৈনিক প্রথম

আলো পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম দেখলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। 'নরসিংদীতে হাজার হাজার তাঁতকলে উৎপাদন বন্ধ' (১৮ এপ্রিল ২০১০)[৬৮], দেনার ভয়ে তাঁতীরা ঘরছাড়া' (২১ এপ্রিল ২০১০), 'তাঁতীদের অনেকে এখন রিকশাচালক' (২৪ এপ্রিল ২০১০) ইত্যাদি।[৬৯]

সুতার দাম কমানো, বেনাপোল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির অনুমতি প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে তাঁতকলের মালিক ও শ্রমিকেরা গত ২০ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে নরসিংদীর মাধবদীতে গণতাঁতী সমাবেশ, পাবনায় তাঁতী সমাবেশ করে। এ ছাড়া পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদীর বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়ক অবরোধ করে তাঁতীরা। এ সময় তাঁরা 'সুতার দাম কমাও, তাঁতশিল্প বাঁচাও', 'লুটেরা সিন্ডিকেট চক্র ভেঙে দাও' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়।

তাঁতীদের দাবির মুখে সরকার বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ৮২/১, ১০০/২ ও ১২০/১ এই চার কাউন্টের সুতা আমদানি সিদ্ধান্ত নিলে ১৫ মে, ২০১০ থেকে তাঁত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয় বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে সিরাজগঞ্জের তামাই অঞ্চলের তাঁতীরা মিছিল করে।

৫.২.১৯ তাঁতীদের সাংগঠনিক অবস্থা

তাঁতীদের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি ও দরকষাকষির ক্ষমতার অভাব ছিল। তাঁতী এবং অন্যান্য কারিগররা রপ্তানি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণীর উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হলেও তারা কার্যকরী কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেনি। শ্রমিকদের মধ্যকার সামাজিক বিভাজন বিভিন্ন পেশাজীবী দলের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। একমাত্র রপ্তানি বাণিজ্যের কারণে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর কর্মী তাঁতী, ধুপা,নকশী কারিগর ইত্যাদি পেশাভিত্তিক দলের বিকাশ ঘটেছিল। বাজারের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ এবং এক সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তাদের মধ্যে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জোগায়। তাঁতীরা প্রধান তাঁতী থেকে শুরু করে নিম্ন পযার্য়ের সাধারণ তাঁতী শ্রমিক পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে কর্তৃত্বের বিন্যাস গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের জাতি ও সম্প্রদায় ভিত্তিক সংগঠনের ক্ষমতা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিলনা। বিশেষ করে বাজার নিয়ন্ত্রনকারী দলটি যেখানে ছিল অধিক শক্তিশালী, কেন্দ্রীয়ভাবে সুসংগঠিত।

কোম্পানির কার্যাদেশ পালন এবং অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হয়ে তাঁতীরা বিভিন্ন রকম প্রতিরোধ ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়। তাদের প্রতিরোধ কৌশল শুধুমাত্র কোম্পানির কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি বরং যারা তাঁতীদের নিকট থেকে সরাসরি আত্মসাৎ করতো তাদের বিরুদ্ধেও ছিল। বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ কৌশল অবলম্বন করা হলেও সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো সম্ভাবনা তাঁতীদের মধ্যে খুব কমই ছিল। তাঁতীদের অধিকাংশই তাদের উপর অরোপিত নিয়ম পালনে রাজি ছিল এবং অন্যদিকে গোপনে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্যও কাজ করতো। তাঁতীদের কেউ

অবশ্য গ্রাম এবং পেশা ছেড়ে পলায়ন করেছিল। কখনো আবার তাঁতীরা পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কোম্পানির অগ্রিম অর্থ গ্রহনে অস্বীকার করতো। ১৭৭৫ সাল থেকে কাপড়ের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলে তাঁতীরা প্রকাশ্যে কোম্পানির জন্য কাজ করতে অস্বীকার করে। এজন্য তাঁতীদের অনেক সময় শাস্তিও পেতে হয়েছিল। তাঁতীদের মধ্যে এরূপ প্রতিবাদ গড়ে উঠার জন্য কোম্পানি বহিঃশক্তিকে দায়ী করেছিল। এই বহিঃশক্তিটি ছিল- দালাল শ্রেণী যাদেরকে ১৭৭৪ সালে বাদ দেয়া হয়েছিল অথবা ঐসব জমিদার এবং তাদের লোকজন যারা রাজস্ব বিভাগে কোম্পানির বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল।[৭০]

তাঁতীদের মধ্যকার জোট প্রথমদিকে কোম্পানির পণ্য সংগ্রহে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করলেও আইনী ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে সবধরনের সম্মিলিত দরকষাকষি কার্যত দুর্বল করে দেয়া হয়। বিশেষ করে ১৭৯৩ সালের পর গ্রামের বাজারগুলোতে তাঁতীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় এবং সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে কারখানার উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে সে বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার নীতি প্রবর্তনের ফলে তাঁতীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁতীরা কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদনের সময়সীমা বৃদ্ধি অথবা তাদের বাতিলকৃত কাপড় কম দামে বিক্রির জন্য অনুরোধ করতে পারতো। জমিদারদের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি তাঁতী প্রধান বা চৌধুরীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করা হতো। ১৭৯৩ সালের মধ্যে তাঁতীদের উপর নানা রকম আইন কানুন আরোপের ফলে পণ্য উৎপাদন এবং বাজারের সাথে তাদের স্বাধীনতা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

৫.২.২০ শিক্ষা, পেশাগত অবস্থান ও সামাজিকতা

গবেষক সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছেন, জামদানী পল্লীর তাঁতীদের মধ্যে বেশিরভাগই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। তার মধ্যে এস.এস.সি পাস শতকরা প্রায় ১০% এর বেশি নয়। সাম্প্রতিকালে তাঁত সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য কাজে জড়িত আছেন তাঁতী, মহাজন, কারিগর প্রায় সবার সন্তানগণ। বর্তমানে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা প্রায় শতভাগ। পল্লীর পাশের তাঁতসমৃদ্ধ গ্রাম এলাকায় অধিকাংশ মানুষই স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। শিশুশ্রম সাগরেদ হিসেবে বা অন্যান্য পর্যায়ে সহযোগী হিসেবে বর্তমানে ১০% এর বেশি নয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা এলাকা থেকে শিশু কিশোররা কাজ শেখা এবং জীবিকা দুই কারণেই সাগরেদ হিসেবে কাজ করতে আসে।

সাধারণত তাঁতীরা উদ্যমী ও কর্মতৎপর হলেও তাদের কারো কারো অলস হিসেবে দুর্নাম আছে। বিশেষ করে জোলা ও যোগীদের সম্পর্কে কেন অভিযোগ বেশি শোনা যায়। তাঁরা সময়মত ক্রেতাদের অর্ডার সরবরাহ করে। বসাক তাঁতীরাও কখনো কখনো এই অভিযোগ থেকে বাদ যায় না। এ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও করা হয়। তাদের এই দুর্নীতি ও অলসতা সম্পর্কে বলা হয- তারা অনেক সময় অগ্রীম টাকা নিয়েও অলসতা করে কাজটি শেষ করে না বা টাকা-পয়সা আগেই খরচ করে ফেলে। পরে যে সুতা দেয়ার কথা, তা না দিয়ে অন্য সুতা দিয়ে কোনোক্রমে কাপড় বোনা শেষ করে। ফলে

কাপড়ের মান ঠিক থাকে না। এই অভিযোগ মূলতঃ করে ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা করে থাকেন। অনেকে মনে করেন যে, এটা ব্যক্তি বিশেষ করলেও সব তাঁতী এ রকম নয়। ব্যক্তি বিশেষের ভুল বা দুর্বলতার জন্য সমগ্র তাঁতী সমাজকে দায়ী করাটা ঠিক হবে না বলে তারা মনে করে। সরেজমিন অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাঁতীদের বিরুদ্ধে আশেপাশের ভিন্ন পেশার মানুষ সুযোগ পেলেই নানা রকমের অভিযোগ করে থাকে, সেসব অভিযোগের সত্যতা থাকুক আর নাই থাকুক। তবে সেসব অভিযোগের কতটা সত্যি কিংবা মিথ্যা, তা তলিয়ে দেখা সব সময় সম্ভব নয়। বুঝা যায় সমাজের মূল ধারার লোকজন তাদের অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখে।

৫.২.২০.১ জামদানী অধ্যুষিত এলাকার তাঁত সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা

গবেষকের সাথে আলাপকালে রূপগঞ্জের জামদানী পল্লীর কারিগর ও ব্যবসায়ী সাইদুর রহমান সাধু জানান, জামদানী পল্লীর ভিতরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সে কারণে এখানকার শিশুদেরকে অন্য গ্রামে গিয়ে শিক্ষা লাভ করতে হয়। নিম্নে প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১। নওয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,	বিসিক জামদানী পল্লীর সবচেয়ে নিকটবর্তী।
২। দক্ষিণ রূপসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নোয়াপাড়া বিসিক জামদানী পল্লীর পাশের গ্রামে এই দুইটিতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ আছে।
৩। ক্রিয়েটিভ মডেল স্কুল	৮ম শ্রেণী পর্যন্ত (পাশের গ্রামে অবস্থিত কিন্ডার গার্টেন)
৪। কাজী মহিউদ্দিন হাই স্কুল	এস.এস.সি পর্যন্ত (লাগোয়া পাশের গ্রাম)

৫। দাখিল ও আলীম পর্যায়ে পাঠদান করা হয় এমন ৪টি মাদ্রাসা আছে (দাখিল ৩টি, আলিম ১টি)।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জামদানী পরিবারের (তাঁতীদের) সন্তানগণ পড়ালেখা করছে। সাইদুর রহমান সাধু জানান, বিসিক জামদানী পল্লীতে প্রায় চারশত পরিবার আছে। বর্তমানে বাবা-মা তাদের ছেলে মেয়েদের তাঁত পেশায় আনতে ইচ্ছুক নয়। সবাই ছেলে মেয়েদের সাধ্যমত শিক্ষা লাভের চেষ্টা করছেন।

৫.২.২০.২ জামদানী পল্লী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সামাজিকতা

জামদানী পল্লী এলাকায় কোন মহিলা ডাক্তার নেই বললেই চলে অর্থাৎ ০%, পল্লী চিকিৎসক ৭/৮ জন, পাশ্ববর্তী এলাকার মেরী স্টোপস ক্লিনিক, বিশ্বরোড, তারাবো, বরাবো এলাকায় বেশ কিছু ক্লিনিক ও ফার্মেসী রয়েছে। প্রসূতি মায়েদের কোন সেবা নেই বললেই চলে। প্রসূতি মায়েদের বা শিশুদের কোন সমস্যা দেখা দিলে হাইওয়েতে এসে প্রাইভেট চিকিৎসা নিতে হয়।

বিয়ে এবং আত্মীয়তা

আজ থেকে দুই দশক আগেও নিজেদের মধ্যে বেশীর ভাগ আত্মীয়তার সম্পর্ক হতো। বর্তমানে বাইরে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরিমাণ বেশি। স্থানীয় তাঁতীদের ভাষ্য অনুযায়ী এখন নিজেদের মধ্যে বিয়ে শাদী ও আত্মীয়তা আগের মতো হয় না বললেই চলে।

জামদানী কারিগররা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হতে আগ্রহী, অনেকে কৃষির পাশাপাশি জামদানী কারিগর হিসেবে কাজ করছেন। জামদানী পল্লী সংলগ্ন গ্রামগুলোতে আবার অনেকে দুর-দুরান্ত থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন জেলা থেকে জামদানী কারিগরী বিদ্যা শিখতে অনেকে আসেন।[৭১]

৫.২.২১ সাধারণ তাঁতী থেকে যারা রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েছেন)

সাধারণ তাঁত শ্রমিক থেকে যারা রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের বিবরণ দেয়া হলোঃ

- মোঃ হামিদুল্লাহ, কাউন্সিলর, ৫ নং ওয়ার্ড, তারাবো পৌরসভা, নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত কাপড়ের পাশাপাশি সাধারণ তাঁতীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কাপড় টাংগাইল শাড়ী কুটির, বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজ, বুটিক হাউজসমূহে জামদানী সরবরাহ করে থাকেন।
- তারাবো ইউনিয়নে ৭ নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার নুরুল ইসলাম, পিতা-সফিল উদ্দিন, নিজে পারিবারিকভাবে তাঁতী ছিলেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।
- মোঃ জহিরুল ইসলাম (রূপসী), সাধারণ জামদানী কারিগর থেকে পরিশ্রমের মাধ্যমে সফল ব্যবসায়ী হয়েছেন, তিনি টেক্সটাইল মিলের মালিক হয়েছেন এবং তিনি বর্তমানে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়াম লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৫.২.২২ নরসিংদী মাধবদী বাবুরহাট, রায়পুরা অঞ্চলে অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী তাঁতী পরিবারের কয়েকজন সদস্য

- আলহাজ্ব মনজুর এলাহী, পিতাঃ হাজী আবেদ আলী, গ্রামঃ শেরপুর, ডাকঘরঃ পুটিয়া, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী। বর্তমান নিবাস পূর্ব ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী সদর। জনাব এলাহী পর পর দুইবার নরসিংদী সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন (২০০৯-২০১৯ পর্যন্ত)। তার বাবা হাজী আবেদ আলী প্রথম জীবনে তাঁতের কারিগর ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি ৪টি তাঁত স্থাপন করে শাড়ী, লুঙ্গি তৈরী করার পাশাপাশি বাবুরহাটে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৮০ এর দশকে

তিনি কয়েকটি পাওয়ারলুম স্থাপন করে আধুনিক তাঁত ব্যবসায় আসেন। বর্তমানে তার পরিবার আবেদ টেক্সটাইল মিলের মালিক। তাদের কারখানায় শাড়ী, লুঙ্গি এবং থ্রিপিস তৈরী হয়।

- হাজী মো: হেলাল উদ্দিন, প্রোপ্রাইটর, আমানত শাহ্ লুঙ্গি, যিনি প্রথম জীবনে তাঁত কারখানার কারিগর ছিলেন। নিজে এক সময় কারখানার মালিক হন এবং পরবর্তীতে পাওয়ারলুম স্থাপন করে। উন্নতমানের লুঙ্গী তৈরী করতে শুরু করেন। বর্তমানে দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি।
- আবু তাহের খন্দকার, সাবেক চেয়ারম্যান, আইয়ুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ, নিজেরা তাঁত কারখানায় কাজ করতেন। পরবর্তীতে পাওয়ারলুম স্থাপন করে লুঙ্গি তৈরী করেন।
- সমীর ভূইয়া, সাবেক পৌর প্রশাসক, মাধবী, নরসিংদী। প্রথম জীবনে হস্ত চালিত তাঁতকারখানা চালাতেন। বর্তমানে টেক্সটাইল মিলের মালিক।
- আবু সালেহ চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান, নুরালাপুর ইউনিয়ন, তাঁতীপরিবার থেকে টেক্সটাইল মিলের মালিক।
- মো: সাদেকুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, নুরালাপুর ইউনিয়ন, তাঁত ব্যবসায়ী থেকে কাপড় ব্যবসায়ী টেক্সটাইল পাওয়ার লুমের মালিক।

৫.৩ তাঁতীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

তাঁত শিল্প প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ভূখণ্ডের গর্ব ও ঐতিহ্যের একটি অংশ হলেও যারা প্রকৃতপক্ষে এই শিল্প শত শত বৎসর ধরে রেখেছেন এবং সম্মান এনে দিয়েছেন সেই তাঁতী সম্প্রদায় বরাবরই ছিল অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী। কোন কোন সময় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান ভাল থাকলেও বিষয়টি স্থিতিশীল পর্যায়ে খুব কম সময়ই ছিল। কোম্পানী আমলের পূর্বে তাঁতীদের অবস্থা সম্পর্কে হামিদা হোসেন বলেন,

> The competitive exports of the European Companies made possible a stable relationship between trade and production, backed by adequate resources of capital. It had allowed producers considerable freedom of production, and flexibility in their market transactions. This had not necessarily brought much prosperity to the weavers, but the traditional market relationships which had linked them to the merchants' capital through the distributive network of dalals, had at least offered them a range of options for selling their products.

৫.৩.১ তাঁতীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সুবিধা

কোম্পানির বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যে শক্তিশালী অবস্থান করে নিলেও তাঁতীগণ সর্বদাই পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। এর কারণ ছিল দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁতীরা কাপড়ের মান কমিয়ে দেয় বা কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। কিন্তু কোম্পানি তাঁতীদের মজুরী ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি না করেই ব্যবসা ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কোম্পানির যুক্তি ছিল একবার যদি তাঁতীদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করা হয় তবে তা আর হ্রাস করা যাবে না।

> Direct links between factory, arang and the village weavers didnot evert the crisis in the purchase of piecegoods. The weavers were squezed from both sides, while the company insisted on unrealistically low prices for its procurement.[৭২]

অধিকাংশ তাঁতী তাদের প্রকৃত মুনাফা থেকে বঞ্চিত ছিল বলে তারা কোন মতে দিনাতিপাত করছিল। কোম্পানিও তাদের দাবী-দাওয়া বিবেচনায় আনেনি। কোম্পানির মূল্য নীতি ও তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে উৎপাদনের মান যেমন নীচে নেমে যাচ্ছিল তেমনি শ্রমিকের অবস্থানও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাছাড়া ভারত থেকে ইউরোপীয়রা সুতা আমদানি করতো বিধায় পণ্যের চাহিদা বেড়ে গেলে সুতার দাম বেড়ে যেত। সেটি তাঁতিদের জন্য ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। “The author ventured, from the prices of cotton in the latter part of 1846, to state that “the increased price of cotton in this country will cause large importations, and the average import will again rise.”[৭৩] মাঝে মধ্যে শুধুমাত্র কোম্পানির ব্যবসার মাধ্যমে টিকে থাকতে না পেরে তাঁতীরা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্য মোটা ও মধ্যম মানের বস্ত্র পণ্য উৎপাদন কার্যাদেশ গ্রহণ করতে থাকে। এতে তাঁতীরা কিছুটা লাভবান হয়। কারণ তারা কমদামী সুতা ব্যবহার করে অল্প সময়ে প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের কার্যাদেশ সম্পন্ন করতে পারে। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা নগদ টাকায় পণ্য ক্রয় করতো বলে চাষীরা যথাযথ মূল্য পেতো।

১৭৮৯ সালে শান্তিপুরের বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, “there was considerable competition amongst foreign buyers, which meant full employment for weavers even after they finished the company work and turned to private worders”[৭৪] কোম্পানির কাজের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ করার ফলে তাঁতীদের উপার্জন সামান্য হলেও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোন কোন তাঁতী অবশ্য তাদের বুনন কর্মের সংগে কৃষি কাজকেও যোগ করেছিল। তাঁতের কাজ থেকে উপার্জিত অর্থ তারা খাজনা দিতো, কৃষি কাজের আয়

দিয়ে কোনমতে দিনাতিপাত করতো। তাঁতের কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় অপর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁতীরা কোম্পানির জন্য কাপড় উৎপাদন করতো। একটা কারণ হতে পারে যে, জমিদারের খাজনার চাহিদা মেটাবার জন্যই তাঁতীরা এই কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। আর একটি বাধ্যবাধকতা এই ছিল যে, তাঁতীরা কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত ছিল বিধায় তারা কাজ করতে বাধ্য ছিল। পাশাপাশি কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা ও তাঁতীদের কোন অন্যায় অনিয়মের বিচারের জন্য প্রত্যেক পরগণায় আদালতও স্থাপন করা হয়েছিল। তা হামিদা হোসেন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে,

> The setting up of judicial courts in each pargana enabled the weaver to answer a summons quickly without disrupting work too greatly. For civil cases, jurisdiction was exercised by the Sadar diwani adalats at Jalapur over Dhaka. Sonargaon, and Dhamrai, at Tipperah over Chandpur, Narainpur and Srirampur; and at Mymensingh over Jangalbari-Bajitpur and Titabdi. Criminal disputes concerning weavers were referred to mukhtearkars posted at Mymensingh for Dhamrai and the northern arangs, and at Rosnabad for the southern ones.[৭৫]

তবে স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমানে তাঁতীরা পূর্বের চেয়ে মুক্তভাবে কাজ করছেন। গবেষক নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া জামদানীপল্লী, রূপসী, কাজীপাড়া জামদানী অঞ্চলগুলো সরেজমিন পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পেরেছেন বর্তমানে তাঁতীরা অগ্রীম অর্ডার অনুযায়ী ঢাকার ফ্যাশনহাউজ, শোরুমগুলোর কাজ সরবরাহের পাশাপাশি তারা নিজেদের মত করে ভোক্তাদের কাপড় তৈরী করতে পারছেন বাজারের চাহিদানুযায়ী। তারা পূর্বের মত কোম্পানী, মহাজনদের দ্বারা শৃংখলিত নয়।

৫.৩.২ তাঁত শিল্পে পুঁজির প্রভাব

কোম্পানি যে অগ্রিম পুঁজি দিতো তার মাধ্যমে তাঁতীরা সুতা ক্রয় করে উৎপাদন কাজ কিছুটা হলেও অব্যাহত রাখতে সক্ষম ছিল। অন্যান্য কোম্পানি দাদন পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তারা অধিকাংশ পণ্যই নগদ টাকায় চড়া মূল্যের বাজার হতে ক্রয় করতো। কোম্পানির অগ্রিম পুঁজির আরেকটি সুবিধা এই ছিল যে, কোম্পানির ঋণ ছিল সুদ মুক্ত অথচ সে সময় বাংলায় প্রচলিত সুদেও হার ছিল শহর ও গ্রামে যথাক্রমে ১২%-১৫% এবং ৭% থেকে ৮%.[৭৬] অগ্রিম টাকার পরিমাণ হ্রাস এবং কিস্তি পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ফলে তাঁতীদের কাজে মারাত্নক সমস্যা দেখা দেয়। ১৭৫০ এর দশকে মোট উৎপাদন খরচের ৫০-৭৫ ভাগ এপ্রিল মাসের মধ্যেই প্রদান করা হতো। বাকী অর্থ দুটো কিস্তিতে প্রদান করা

হতো। এটা করা হয়েছিল যাতে করে উৎপাদনকারীরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা ক্রয় করতে পারে। এজেন্সী পদ্ধতি অনুসারে গোমস্তাদের মাধ্যমে অগ্রিম অর্থ মাসিক কিস্তিতে প্রদান করা হতো। এর ফলে বছরের প্রথমার্ধে তাঁতীরা তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুতা কম দামে ক্রয় করতে সক্ষম ছিলনা বলে তাঁতীদের কাজের চাপ বেড়ে যায়। কারণ প্রয়োজনীয় সুতার জন্য তাতীদেরকে হাটে হাটে ধর্না দিতে হতো। মালদা, লক্ষীপুর, ঢাকা, হরিপুর প্রভৃতি অঞ্চলের আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধিরা মাসিক পদ্ধতির বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করলে ১৭৭৯ সালে গর্ভণর জেনারেল ত্রৈমাসিক পদ্ধতি চালু করতে রাজী হয়। কিন্তু ত্রৈমাসিক পদ্ধতি তাঁতীদের জন্য খুব একটা উপকার বয়ে আনতে পারেনি।[৭৭] পুঁজির স্বল্পতার কারণে কাপড়ের মান এক রকম ছিল না। কারণ তাঁতীরা তাদের খরচ কমানোর জন্য কম এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের সুতা ব্যবহার করতো। দ্বিতীয়ত, তাঁতীদের কাজের ধরনেও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাতীরা প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের পণ্য উৎপাদনে কোম্পানির অগ্রিম অর্থ ব্যবহার করতো এবং নগদ অর্থে তা প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করতো। এভাবে তাঁতীরা কোম্পানির অগ্রিম টাকায় সুতা ক্রয় করতো এবং মৌসুমের প্রথমাংশ কোম্পানির পণ্য উৎপাদনের পিছনে ব্যয় করতো। একই সময়ে প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের জন্য কম দামের সুতা দিয়ে পণ্য উৎপাদনের জন্য তাত প্রস্তুত করতো।[৭৮] প্রাইভেট ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রি করে তাঁতীরা যে অর্থ পেতো তা তখন কোম্পানির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করতো। মোটা ও মধ্যম মানের বস্ত্র পণ্য তৈরির জন্য ততটা পারদর্শীতার প্রয়োজন ছিল না অথচ লাভ ছিল বেশী। তাঁতীরা মোটা ও মধ্যম মানের কাপড় বুননে গুরুত্বারোপ করলেও তারা কোম্পানির সাথে তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতো। কোম্পানির প্রতিনিধিরা যাতে তাঁতীদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেজন্য কোম্পানির বহির্ভূত কাজগুলো চুপি চুপি করা হতো।[৭৯] যাহোক- উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়াতে পণ্যের মান যে খারাপ হচ্ছিল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে মালদা, লক্ষীপুর, বারুন এবং সোনামুখীর আবাসিক প্রতিনিধিরা তাদের প্রতিবেদনে প্রায় একই ধরনের কারণ উল্লেখ করে বলে আসছিল যে, পুঁজির অভাবে তাঁতীরা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে ছিল অক্ষম। তারা মোটা কাপড় তৈরিতে গুরুত্ব দেয়ার ফলে কোম্পানির পণ্যের মানে অবনতি হতে থাকে। কেবলমাত্র উন্নত প্রযুক্তির অনুপস্থিতি এই অবস্থার জন্য মোটেই দায়ী ছিল না। বস্তুত প্রকৃত উৎপাদন খরচ হতে তাঁতীদের বঞ্চিত করাই ছিল এর মূল কারণ।

উৎপাদনের সময়সূচী সংকুচিত করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে তাঁতীদের কার্যক্ষমতা খর্ব করেছিল। সুতা তৈরি ও কাপড় বুনার উত্তম সময় ছিল বর্ষাকাল। কারণ এ সময় আবহাওয়া আর্দ্র থাকার কারণে সুতা নরম থাকতো। একইভাবে জুন-জুলাই এবং আগষ্ট এই তিনমাস ছিল কাপড় ধৌত করার উপযুক্ত সময়।

চাহিদা সীমিত হলে এ সময়ের মধ্যে কার্যাদেশ শেষ করা সম্ভব হতো। সারা বছর ব্যাপী উৎপাদনের অর্থ হলো যে, মৌসুমের তারতম্যের সাথে কাপড়ের মানের তারতম্য হতো।[৮০]

উৎপাদন মান কমে যাবার বহুমুখী প্রতিক্রিয়া ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল কোম্পানি আস্তে আস্তে উৎপাদিত পণ্য বাতিল বলে ফেরৎ পাঠাতে শুরু করে। এজন্য তাঁতীদের কোন ক্ষতি পূরণ দেয়া হতো না। তাঁতীরাও ফেরৎ কাপড় বিক্রি করতো পারতো না। কোম্পানি কর্তৃক বাতিলকৃত পণ্য পুনরায় নতুন করে তৈরি করে দিতে হতো। ফলে বার্ষিক হিসেব অধিবেশন কোম্পানির নিকট দায়িত্ব শেষ করার জন্য একজন তাঁতীকে আরো অগ্রীম অর্থ গ্রহণ করতে হতো। “The cycle of advances, faulty production, rejection of goods and a renewal of advances tied the weavers permanently to the company; inevitable, it reduced their capacity for production and increased indebtness”[৮১] যখন কোম্পানির কর্মচারীরা অভিযোগ করছিল যে, তাতীরা ঋণ ফেরৎ দিতে অক্ষম কাজ করতে অনিচ্ছুক তখনি কোম্পানি তাঁতীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ব্যবস্থা নেয়।

কাঁচামালের সহজলভ্যতা, কম মজুরী এবং শ্রমিকের আধিক্য অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য বাংলার বস্ত্র শিল্পের একটি কার্যকরী বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্যাগুলো একটার সাথে আরেকটা জড়িত ছিল। পশ্চিম ভারত থেকে সুতা আমদানি অব্যাহত থাকলেও তা বাংলার বাজারের চাহিদার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। কোম্পানি তাঁতীদের সাথে সম্পর্কের পরিবর্তন আনয়নের জন্য চেষ্টা করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো তাদের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে প্রচলিত বাণিজ্যিক মাধ্যমগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল। কোর্ট অব ডাইরেক্টর তাঁতীদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ পদ্ধতি গড়ে তুলতে চেয়েছিল। মুঘল আমলে সরকারী কর্মকর্তারা যেভাবে ছোট ছোট কারখানাগুলোতে উৎপাদন কাজ সরাসরি তত্ত্বাবধান করতো। কোম্পানি ঠিক একইভাবে এগিয়ে যাওয়ার আশা করছিল। কিন্তু কোম্পানি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নেয়নি। এরজন্য প্রয়োজন ছিল উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করা সেই সাথে উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা। এ দুটোর কোনটাই কোম্পানি করতে পারেনি।

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে পুঁজির প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে আরো বেড়েছে যেমন: জামদানীপল্লী বা বেনারশী পল্লীতে যারা প্লট বা দোকান বরাদ্দ পেয়েছেন তারা বেশীরভাগই প্রকৃত তাঁতীনন। কারণ প্রকৃত তাঁত কারিগরদের সরকারী বিধিমোতাবেক যে অর্থ জমা করার কথা সেই পরিমান সামর্থ্য তাদের ছিলো না। তাঁতীদের মধ্যে কিছু সামর্থ্যবান ব্যক্তি আছেন যারা প্লট বরাদ্দ পেয়ে জামদানী পল্লীতে তাঁত স্থাপন করেছেন। বেশীরভাগ কারিগরই দরিদ্র শ্রেণীর, তারা অন্যের তাঁতে কাজ করে মজুরীর বিনিময়ে। তবে গবেষক কাজীপাড়া, রূপসী, বেহাকুড়, সোনারগাঁও এলাকায় কিছু স্বাধীন তাঁতীদের সাথে কথা বলেছেন

যারা নিজের ঘরে তাঁত স্থাপন করে শোরুম, ফ্যাশন হাউজ থেকে অর্ডার নিয়ে কাপড় সরবরাহ করে থাকে, এই জাতীয় তাঁতীদের সংখ্যা বেশী নয়। তাই দেখা যায় পুঁজির একটা প্রভাব সর্বদা থেকেই যায়।

৫.৩.৩ উপনিবেশিক শাসকের ব্যবসায়িক স্বার্থ: তাঁত শিল্পীদের শোচনীয় পরিণতি ও পেশা ত্যাগ

বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৭২ সালের মধ্যে কোম্পানির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠে এবং প্রশাসনে দু'ধরনের প্রতিনিধিত্ব মূলক কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি হয়। একটি উৎপাদনকারী হিসেবে তাঁতীদের কার্যক্রম নির্ধারণ করত অন্যটি খাজনা প্রদানকারী প্রজাদের কার্যক্রম দেখাশুনা করত। যেখানেই দুটো বিভাগের স্বার্থ এক সঙ্গে চলে আসতো সেখানে একটি অন্যটির উপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতো। বাণিজ্যিক ও রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্ধ শুরু হলে তাঁতিরা এই দ্বন্ধের প্রধান কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ ও তাঁতীদের কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে। কোম্পানি তাঁতীদের উৎপাদনের জন্য অগ্রীম অর্থ প্রদান করতো বলে তাদের কাজের উপর কোম্পানির কর্মচারীদের নজরদারী অব্যাহত ছিল। তবে অন্যান্য বিরোধী ক্রেতাদের উপস্থিতির ফলে কোম্পানির পক্ষে নিয়মিত পণ্য সংগ্রহ অনেকটা কঠিন ছিল। কারণ এর ফলে বেচা-কেনায় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল।

তাঁতীদের অবস্থান এবং বাজারের সাথে তাদের সম্পর্ক এ বিষয়টি নিরূপন করার জন্য কোম্পানি ১৭৭৩ সালে হতে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত অনেকগুলো বিধি বিধান জারী করেছিল। এসব বিধি বিধান জারী করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস দাবী করে আসছিল যে, they had evolved a set of rules for the free trade of the weavers."[৮২] কিন্তু প্রত্যেকটি বিধি-বিধান প্রবর্তনের পূর্ব পরিস্থিতি থেকে এটা বুঝা যায় যে, আসলে কোম্পানি তার বিনিয়োগ সুরক্ষার জন্যই এসব করেছিল।

৫.৩.৪ তাঁতীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ আইন প্রবর্তন

১৭৭২ সালে বাংলায় বিচার পদ্ধতি চালু করার সময় কোম্পানি দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ বিচার ব্যবস্থায় তাঁতীদের জন্য বিশেষ আইনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭৩ সালের ১২ই এপ্রিল কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আইনি বিধান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। কোম্পানি প্রদত্ত অগ্রিম অর্থের বিপরীতে উৎপাদন কর্মকান্ডে সমন্বয় সাধন এবং কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কমানোর জন্য জারীকৃত এই বাণিজ্যিক বিধানটি ছিল নিম্নরূপ,

> That all weaver and manufacturers shall, in future, have full liberty to work for whom they please, and shall, on no pretence whatever, be obliged to recive advances against their inclination, either from the company or from private merchants. It is intended, however, that they shall compleat [sic] any engagements which they may have already made for this year.That we will receive proposals, from all native merchants, who may be willing to contract with the company for any quantty of goods (not amounting to less than 20,000 Rupees) of the proper assortments for their investment, and to give satisfactory security for the performance of their engagements. That we will receive, for ready money, whatever goods, of peoper assrtments, may be tendered upon suitable terms.As our honourable Masters, with a view to the freedom of trade, and the welfare of the country, have thought proper relinquish the influence of their authority in the provision of their inestment, they expect an equal attention from their servants. Whoever therefore shall attempt dorectly or indirectly, to force advances upon the weavers, or make them enter into engagements against their will, or in any way exercise an undue influence over them, shall be immediately suspended from the companys service; if any collector shall, upon their complaining to him, neglect to give them proper redress, he shall be removed from his station....[৮৩]

এসব বিধি-বিধান নীতিগতভাবে পণ্য সংগ্রহের সুষ্ঠু পরিবেশ ও উৎপানকারীদের স্বাধীনতার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করলেও আইনের ক্রটির কারণে তা বাস্তাবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বস্তুত তাঁতীদের স্বাধীনতার বিষয়টি আড়ং কর্মকর্তাদের কর্তৃত্ব দ্বারা সীমিত ছিল। এক্ষেত্রে তাঁতীদের বিকল্প পথ খোলা ছিল না। কোম্পানির পক্ষে কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সর্বদা সম্ভবপর হয়নি। ইংরেজ গোমস্তা, দালাল এবং পাইকারদেরকে তাঁতীদের উপর শক্তি প্রয়োগ না করার জন্য হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছিল। যেখানে এসব বিধি-বিধানের লক্ষ্য ছিল তাঁতীদের রক্ষা করা। কোম্পানির প্রতিনিধিরা অভিযোগ করেছিল যে, এসব বিধি-বিধানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে এবং আড়ং এর পণ্য সংগ্রহ কাজে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তাঁতীদের বিরুদ্ধে কোম্পানির কার্যাদেশ পুরোপুরি সমন্বয় না করেই চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। গোমস্তারা অভিযোগ করে যে, এসব বিধি-বিধান বাজারে তাদের

কার্যকারিতাকে খর্ব করেছে। বিধিটি চালুর এক মাসের মধ্যেই বাজারে তাদের কার্যকারিতাকে খর্ব করেছে, তার প্রেক্ষিতে ফোর্ট উইলিয়াম একটি নির্দেশনা পত্র প্রেরণ করেন, "Fort William sent a circular letter to the provincial councils qualifying the liberty it had given to the weavers to deal with a variety of traders.:[৮৪]

১৭৭৫ এবং ১৭৮২ সালে আরো দুটি বিধান জারী হলেও দেশীয় কালেক্টরদের হস্তক্ষেপ, দেশীয় আদালতের বিচার প্রক্রিয়া, উৎপানদকারীদের অসততা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের অসাধুতার ফলে এ বিধান কোম্পানির ব্যবসায়িক অন্তরায়গুলো দূর করতে পারেনি। ১৭৮৬ সালের বিধানের ৯নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানির তাঁতী হিসেবে তাঁতীদের অবস্থান প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পায়। কোম্পানির তাঁতীদের নাম স্থানীয় আড়ং গুলোতে নিবন্ধিত হয়। প্রতিটি তাঁতীর নাম ঠিকানা, দিহী, গ্রাম এবং বার্ষিক হিসেব নিকেশ লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবে এসব বিধানের মাধ্যমে তাঁতীরা উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা হারায়। তাঁদের কাজের মাধ্যমে এ বিষয়টি উপলব্ধি হয়েছিল যে, তাঁতীরা কোম্পানির একটি কঠিন দায়িত্ব কাধে নিয়েছে।

৫.৩.৫ তাঁতীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সীমাবদ্ধকরণ

১৭৮৬ সালের বিধানের ১২ এবং ১৩ নং ধারা অনুযায়ী তাঁতীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য গোপন ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৮৭ সালে তাঁতীদের জন্য বিশেষ করে কোম্পানির তাঁতীদের জন্য একটি বিধান জারী করা হয়। এই বিধান অনুযায়ী তাঁতী সমাজের বিরাট সংখ্যক সদস্য কোম্পানির আইনের অধীন চলে আসে। এই বিধান অনুসারে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট গোপনে পণ্য বিক্রির অপরাধের জন্য তাঁতীদের আদালতে ডাকা হতো এবং জরিমানা ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। এর ফলে তাঁতীদের কাজের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ধারণা করেছিল আইনী ক্ষমতার মাধ্যমে কোম্পানির সাথে তাঁতীদের চুক্তি মানার বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে। মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলা হলেও কোম্পানির কর্মচারিদের নীতি বিরোধী কার্যকলাপের ফলে বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের তাদের পক্ষ থেকে হুশিয়ার করা হয়েছিল। কোম্পাানির গোমস্তা, আড়ং কর্মকর্তা ও কর্মচারী এমনকি কোম্পানির আবাসিক বাণিজ্যিক প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বোর্ড অব ট্রেড এবং প্রাদেশিক পরিষদে অভিযোগ করা হয়। ১৭৮৯ সালে ঢাকার আটজন ব্যবসায়ী কোম্পানির আবাসিক প্রতিনিধি জন বেবের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে উল্লেখ করে যে,

জন বেব শুধু অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল তা নয় বরং তিনি কোম্পানির অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন করেছিল।[৮৫]

৫.৩.৬ জমিদারদের বার্ষিক ফি প্রবর্তন

সকল গ্রামীণ শ্রমিক ও শিল্পী-কারিগরদেরকে একটি পেশাজীবী দলের অধীনে প্রতিটি কারিগরকে কাজ করার জন্য স্থানীয় জমিদারদের নিকট হতে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হতো। এর বিনিময়ে তাকে এক মাসিক বেতনের পরিমাণ অর্থ বার্ষিক ফি হিসেবে জমিদারকে প্রদান করতে হতো। বস্তুত এসব বিধি-বিধান সামাজিক ও পেশাগত সম্পর্কের বিষয়টি নিয়মিতকরণ ছাড়া আর কোন অবদান রাখতে পারেনি। এসব কারণে তাঁতীদের হয়রানি বেড়ে গিয়েছিল।

৫.৩.৮ তাঁতীদের আর্থিক সংকট

৫.৩.৮.১ কোম্পানির দ্বৈতশাসনে তাঁতীদের স্বার্থহানি

কোম্পানির কর্তৃত্বের বিভাজনটি বিভিন্ন পর্যায়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে আড়ং কর্মচারী বা গোমস্তরা বাণিজ্য বিভাগের জন্য কাজ করছিল। অন্যদিকে জমিদার, তালুকদার এবং তাদের গোমস্তরা ভূমি রাজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ শুরু করে। বড় বড় জমিদারদের ক্ষমতার অবসান হলে স্থানীয় অভিজাত লোকেরা প্রভাবশালী রাজস্ব আদায়কারীতে পরিণত হয়। এমন কি জমিদারদের ভূমির উপর গ্রামের স্থানীয় অভিজাত লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁতীরা কোম্পানির ঋণে আবদ্ধ হয়ে মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। গ্রামীণ কাঠামোতে মন্ডলদের প্রভাব হতে পালানোর আর কোন সুযোগ তাঁতীদের ছিলনা এই অজুহাতে যে, তারা কোম্পানির স্বার্থের জন্য কাজ করছে।

৫.৩.৮.২ দুর্ভিক্ষের প্রভাব এবং তাঁতীদের আর্থিক দুরাবস্থা

১৭৭০ সালের পর কোম্পানির ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাহিদা চাষী এবং উৎপাদনকারী এই উভয় শ্রেণীর জন্য বিরাট বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের পর খাদ্য ঘাটতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে তাঁতীদের জন্য সময়টা ছিল সবচেয়ে বেশি দুর্বিষহ। জীবনধারণের জন্য যেটুকু অর্জন একজন তাঁতী করতে পারতো জমিদারদের চাহিদার ফলে তাও আবার নিঃশেষ হওয়ার পথে। কোম্পানির দ্বিমুখী স্বার্থ এবং জমিদার ও গোমস্তাদের টানা হেচড়ার ফলে তাঁতীরা দ্বিমুখী চাপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়।

৫.৩.৮.৩ রাজস্ব আদায়ে তাঁতীদের উপর জুলুম, নির্যাতন

১৭৮০ এর দশকে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে গ্রামাঞ্চলে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। জমিদারদের প্রতিনিধি ও সশস্ত্র

রক্ষীদেরকে শুধু মাত্র বার্ষিক "জমা" আদায়ের কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি বরং অন্যান্য অবৈধ খাজনা বা আবওয়ার কর আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তাঁতীরাও এসব অবৈধ খাজনার শোষণ হতে বাদ পড়েনি। অনেক সময় জমিদারের লোকজন খাজনার জন্য তাঁতীদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করতো। জমিদার ও খাজনা আদায়কারীদের নির্যাতনের ফলে তাঁতীদের মধ্যে মারাত্মক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে জমিদারদের দুঃসহ অত্যাচারের নানা রকম প্রমান পাওয়া যায়। স্থানীয় জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত হাট-বাজারে তাঁতীরা স্বাধীনভাবে বেচা-কেনা করতে পারত না। জমিদারদের লোকজন বিভিন্নভাবে তাঁতীদের কেনা-বেচা ও লেনদেনে বাধা সৃষ্টি করতো।

১৭৮৮ সালে মালদার নতুন আবাসিক প্রতিনিধি স্থানীয় রাজস্ব প্রতিনিধির দুর্ব্যবহার, লুণ্ঠন তাঁতীদের আটক এসব বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ উপস্থাপন করেন। এর ফলে শ্যামগঞ্জ কারখানায় মারাত্মক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। "Weavers are carried away by the peons, confined, . . . beaten and forced to give the excessive rent demanded of them . . . They have deserted their houses and their looms . . . ."[৮৬]

১৭৮৯ সালে ঢাকার কমিশনার তার প্রতিবেদনে তাঁতীদের উপর থেকে অবৈধ কর তুলে নেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেও তাতে কোন লাভ হয়নি। কারণ সে সময় জেলাগুলোতে রাজস্ব আদায়কারীরা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের এর ভাষায়,

> On the collector devolved the harsh task of levying the taxes; the commercial resident had the pleasant duty of redistributing them...Mr. Keeting the collector was the company in the form of Siva ... while Mr. Cheap the Commercial Resident was the Company in the form of Vishnu...[৮৭]

রাজস্ব আদায়কারীদের অধীনে জমিদার, তালুকদার এবং ইজারাদারগণ আত্মসাৎকারীতে পরিণত হয়েছিল। এটা করার জন্য তারা চাষী এবং উৎপাদনকারী এই উভয় শ্রেণীর উপর তাদের কর্তৃত্ব খাটাতো। কখনো কখনো তারা কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রমকেও অবজ্ঞা করতো। তাঁতীদের উপর তাদের আধিপত্য উৎপাদন কর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো। এসব দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৬ সালের ১ জুলাই কোম্পানির তাঁতীদের জন্য একটি আইনী বিধান জারী করা হয়। ১৭৮৬ সালের এইসব আইনী বিধানের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিভাগের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি এবং রাজস্ব বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কার্যকর করা।

৫.৩.৯ তাঁতীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে তৎকালীন বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের ব্যর্থ উদ্যোগ

বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পক্ষ থেকে একটি লিখিত আবেদনে তাঁতীদের সহযোগিতা ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং কোম্পানির বিনিয়োগ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব আদায়কারীদের অনুরোধ করা হয়।[৮৮] এসব বিধি-বিধান আসার পরেও কোম্পানির দুটি বিভাগের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলে গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং উৎপাদন কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে।[৮৯] লক্ষ্মীপুরের তাঁতীরা অভিযোগ করে যে, কোম্পানির অগ্রিম টাকার বিপরীতে উৎপাদিত "খাস" কাপড় রাজুগঞ্জ বাজারে বিক্রির জন্য জমিদারদের লোকজন জোর করে। কারণ,

> The zamindar of the district put peons on us and enquired by whose authority we had accepted advances without his orders and ordered us not to give Company cloths. ...We are the zamindars ryotts and without his permission we cannot give cloths.[৯০]

জমিদারদের লোকজন তাঁতী-শ্রমিকদের শারীরিকভাবে নির্যাতনের হুমকি দিতো। এ ধরনের হুমকীর ফলে তাঁতীরা উৎপাদন কাজে নিরাপত্তা বোধ করতে পারেনি। প্রতিদিন ঢাকার আড়ং-এ জমিদারের লোকজন এবং গোমস্তার মধ্যে সংঘর্ষ এবং দিনাজপুর ও রংপুরে একই ধরনের পরিস্থিতি গ্রাম-বাংলার তাঁতীদের চরম দুর্দশার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে তাঁতীরা তাদের তাঁত পেশা ছেড়ে দিয়ে চাষাবাদের দিকে ঝুকে পড়ে। ১৭৭০ এবং ১৭৮৭-৮ সালের দুর্ভিক্ষের পর বাংলায় যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল তাতে কৃষি কাজের বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর গ্রামাঞ্চলে কিছুটা স্থিতিবস্থা ফিরে আসে। বিভিন্ন উত্থান পতন নিয়ম কানুন তাঁতীদের উপর নানামুখী চাপ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় তাঁত শিল্প ছিল একটি চালিকাশক্তি।

৫.৩.১০ জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁতশিল্প

বাংলার জাতীয় অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। কৃষির পরেই বস্ত্র উৎপাদন ছিল অধিকাংশ জনগণের জাতীয় পেশা। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বাংলার তাঁতবস্ত্রের একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাজার ছিল। নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান এই বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করা হল:

১	২	৩	৪
দেশসমূহ	তাঁতবস্ত্র রপ্তানি সিক্কা টাকা	বাংলা থেকে সামগ্রিক রপ্তানি সিক্কা টাকা	সামগ্রিক রপ্তানির অনুপাতে তাঁতবস্ত্রের অংশ কম বেশ
ডেনমার্ক	৩,৩৭,৬৩২	৬,৫১,৩০৮	৫১.৮৩%
লিসবন	১২,১৩,৩৫৩	১৩,৯৬,৩৪৩	৮৬.৯০%
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৪৭,৬৩,১৩২	৬২,৭৮,০৫৫	৭৫.৮৬%
মালাবার	১৩,৬৫,০৯৩	৫৩,৬০,৭৮১	২৫.৪৬%
কোরমন্ডল	৪,০৭,৯৪২	২৪,১০,২৫৩	১৬.৯০%
সুমাত্রা	৮৫,০৮৯	৪,৯৪,৩৭১	১৭.২৪%
সিংহল	১,০৩,৯৯৪	৪,০০,০৭৩	২২.৫৮%
পারস্য ও আরব	৮,৪৫,৭৮৮	২১,৮৫,২৮৭	৩৮.৭১%
পেনাং	৮,১৬,৬১২	৩৪,৮০,৪১৬	২৩.৪৬%
ম্যানিলা	৯,১৫,৭৬৯	৯,৮৪,৯৫৬	৯২.৯৬%
চীন	৩,৭৯,৪৬৯	৭০,৭৯,৬৪১	৫.৩৫%
বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য	১,১৮,৪৯,৬৭০	৩,৭৩,৯৫,৮৭৭	৩১.৬৭%
মোট	২,৩০,৮৩,৫৭০	৬,৮১,১৭,৩৬১	৩৩.৮৮%

সূত্রঃ D. B Mitra, *The Cootton Weavers of Bengal 1757-1833*, Culcutta, 1978, p.182.

৫.৩.১১ উনিশ শতকে তাঁতবস্ত্র তথা সুতিবস্ত্রের বাজার

১৮০৬ সালের পর থেকে নেপোলিয়ানের বার্লিন ও মিলান ঘোষণার ফলে বাংলার তাঁতবস্ত্রের চাহিদা ইউরোপীয় মহাদেশীয় বাজারে অনেক কমে যায়। বিক্রি যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা নয়। বরং প্যারিসের বাজারে বাংলার সুতিবস্ত্রের চাহিদা এতটা বেশি ছিল যে সেখানে একটি লাভজনক চোরা ব্যবসা গড়ে ওঠে। শুধু প্যারিসেই নয়, সারা ফ্রান্সেই চোরা বাজারে বাংলার তাঁতবস্ত্র বিক্রি হতে থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, গোপন ব্যবসা নেপোলিয়ানের মত একজন সমরনায়কের কড়া শাসনকে উপেক্ষা করে চলতে থাকে। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের মন্তব্য স্মরণীয় অর্থাৎ নেপোলিয়ন বাণিজ্যিক সৈন্যদলের মত কুচকাওয়াজ করাতে পারেন নি। এমনকি ফ্রান্সের সীমান্ত বরাবর প্রায় এক লক্ষ মানুষ এই বেআইনি ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। হেলিগোল্যান্ড, জারসী, সিসিলি, স্যালোনিকা, ডালমেশিয়াতে ব্যবসা চালাতে গিয়ে সংঘর্ষ বেঁধেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবসা একেবারে থেমে যায়নি। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র অতি সূক্ষ্ম এবং মিহি কাপড়েরই চাহিদা ছিল। কারণ কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস তাই ১৮০৭ সালে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে ফ্রান্সের বাজারে একমাত্র অতিসুক্ষ্ম মসলিনেরই চাহিদা রয়েছে। এই সঙ্গে তারা জানায় যে ইংল্যান্ডের বাজারে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা একেবারে নেই কারণ সেখানকার যন্ত্রে বোনা কাপড় বাজার ছেয়ে গেছে। তাই সূক্ষ্ম মসলিন ছাড়া বাংলা থেকে আর কোন প্রকার সুতিবস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

১৮০৮ সালের মার্চ মাসে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস ইউরোপের বাজারে বাংলার সূতিবস্ত্রের চাহিদা কমে যাবার কথা পুনরায় জোর দিয়ে বলেন। এবার তারা শুধু যে ক্যালিকো এবং অন্যান্য সুতিবস্ত্রের চাহিদা পড়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছিল তাই নয়, মসলিনের চাহিদাও যে কমে গেছে একথাও বিশেষভাবে

জানায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় তারা আগের বছরের তুলনায় ১৮০৮ সালে সুতিবস্ত্র খাতে কম বরাদ্দ করতে বাধ্য হয়। ঐ বছর কোম্পানির মোট বরাদ্দ ৬৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এই প্রথম সূতিবস্ত্রেই ছিল। ১৮০৮ সালে যেখানে সিল্কে বরাদ্দ করা হয় ২৪ লক্ষ টাকা, সেখানে সূতিবস্ত্রে মোট বরাদ্দ হয় মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা।

বাংলায় সুতিবস্ত্রশিল্পে কোম্পানির বিনিয়োগ ক্রমশ কমতে থাকে এবং এর ফলে এই শিল্পে অবনতির যে প্রক্রিয়া ১৭৯০ নাগাদ শুরু হয় ১৮১৩ এর পর থেকে আরও দ্রুততর হয়ে ওঠে। ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা এর পর থেকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সামগ্রিক অভিঘাতের মুখে পড়ে। ইংল্যান্ডের কারখানা সমূহে ভাল জাতের মসলিন (সিল্ক, নাইলন মিশ্রত) অতি অল্প খরচে ও অল্প সময়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল। ১৭৯২-৯৩ সালে ইংরেজ কোম্পানি ভারত থেকে লন্ডনে মোট ৬১,৫৭,৮৫১ সিক্কা টাকার সূতিবস্ত্র রপ্তানি করে। ১৮১৩-১৪র এই রপ্তানি কমে দাঁড়ায় ৩৪,৪১,১৪১ টাকায়; ১৮২১-২২ এ তা দাঁড়ায় ৫,৪৩,৩৭৬ টাকায় এবং ১৮২৩-২৪ এ মাত্র ৩,৪২,৮৪৩ টাকায়। বাংলার সূতিবস্ত্রের সবচেয়ে বড় বাজার ছিল ইংল্যান্ড। এখন এই ইংল্যান্ডই ইউরোপের অন্যান্য বাজারে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াল। স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের ১৮৩৫ সালের রিপোর্টে বাংলার সূতিবস্ত্রের চাহিদা কিভাবে বিদেশের বাজারে নষ্ট হয়ে যায় তা বুঝতে পারা যায়।

৫.৩.১২ প্রতিকূল অবস্থায় তাঁতীদের বাজারে টিকে থাকার চেষ্টা

রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, পেশা হিসেবে তাঁত বোনা বাংলাতে একেবারে উঠে গিয়েছিল। তবু এটা ঠিক যে, বিদেশের বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেসব তাঁতীরা অতি সুক্ষ্ম কাপড় বুনত, তাদের বেশ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এই সব তাঁতীদের তাঁতবোনা ছিল একমাত্র পেশা এবং সারা বছর ধরে তারা এই কাজে ব্যস্ত থাকত। তাদের বোনা অতি সুক্ষ্ম মসলিনের প্রায় কোন চাহিদাই ভারতের বাজারে ছিল না। কিছুকাল আগেও বাদশাহ্ ও নবাবরা এই সব মসলিন কিনতেন এবং তাঁতীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পরবর্তী সময়ে ভারত ও বিদেশের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও বাজারে সুতি সুক্ষবস্ত্রের কদর কমে যাওয়ায় ঢাকার তাঁতীরা পেশাহীন হয়ে পড়ে। জেমস টেইলরের বর্ণনা হতে জানতে পারা যায় যে ১৮৩৯ সালেও কিছু তাঁতী ফুলতোলা মসলিন বুনতে থাকে, কিন্তু তা আগের তুলনায় খুবই কম। মসলিন বোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের জনসংখ্যাও কমতে থাকে। ১৮০০ সালে ঢাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ২,০০,০০০ কিন্তু ১৮৩৯ সালে এই সংখ্যা কমে হয় মাত্র ৬৮,০৩৮।[৯১]

অনেকে যুক্তি দেখিয়েছেন যে সুতিবস্ত্রের বিদেশী বাজার বন্ধ হয়ে গেলেও ধীরে ধীরে বাংলায় এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একটি আভ্যন্তরীন বাজার গড়ে উঠতে থাকে। শুধু তাই নয়, ১৮২৪-২৫ সাল থেকে ইংল্যান্ডের সুতো আমদানি হতে থাকে এবং এর দাম ছিল খুবই কম। তাই বাংলার তাঁতীরা সস্তায় এই

সুতো কিনে এবং তা দিয়ে কাপড় বুনে বাজারে বিক্রি করা শুরু করে। একথাও বলা হয় যে, ইংল্যান্ড থেকে সস্তা সুতোর আমদানি বাংলার তাঁতীদের ইংল্যান্ডের বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে।

৫.৩.১৩ বাংলার অর্থনীতিতে ইউরোপীয় বস্ত্রশিল্পের বিকাশের নেতিবাচক প্রভাব

ইংল্যান্ডের কাপড় বাংলাতে আসতে শুরু হয় ১৯১৩-১৪ সাল থেকে। কিন্তু সুতো আমদানি আরম্ভ হয় ১৮২৪-২৫ সাল থেকে। এই দশ বছরে ইংল্যান্ডের যন্ত্রে বোনা সস্তা কাপড় ভারতের বাজার ছেয়ে যায় এবং এই সময়ের মধ্যেই বাংলার অধিকাংশ বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র বাজারের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সস্তা সুতো পেয়ে তাঁতীদের কোনো উপকারই হয়নি কারণ তাদের কাপড় বুনতে হত কায়িক পরিশ্রমে এবং হাতে, যেখানে ইংল্যান্ডের বস্ত্র বোনা হত যন্ত্রের সাহায্যে। হাতে বোনা বস্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের বোনা বস্ত্রের যে প্রতিযোগীতা হত তা ছিল অসম এবং বলা বাহুল্য এই অসম প্রতিযোগীতায় তাঁতে বোনা বস্ত্র খুব বেশি দিন টিকতে পারেনি। সস্তা সুতো ব্যবহার করে ইংল্যান্ডের তাঁতীরা যন্ত্রের সাহায্যে তাদের উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় প্রতিদিন বাড়তে থাকে। ভারতের তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যন্ত্রে বোনা কাপড়ের পার্থক্য ছিল। কিন্তু দামের দিক থেকে বাংলার তাঁতীদের ভয়ানকভাবে মার খেতে হয়। তাঁতবস্ত্রের মূল্য অনেক বেশি, কিন্তু যন্ত্রে তৈরী ইংল্যান্ডের বস্ত্রের দাম ছিল অবিশ্বাস্য রকমের কম। তাই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বয়লার তথা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে ইংল্যান্ডের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। বাংলার কাপড়ের চাহিদা আনুপাতিক হারে কমতে থাকে। বাংলাকে কেবলমাত্র কাঁচামাল উৎপাদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫.৩.১৪ বাংলার তৈরী বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ

ইংল্যান্ডের বাজারে বাংলার সুতিবস্ত্রের চাহিদা কমে যাওয়ার আরও একটি বিশেষ কারণ হল সেদেশে বাংলার বস্ত্রের উপর ভারী শুল্ক ধার্য করা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক জারীকৃত (Charter Act of 1813) যা ২৬ জুলাই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। ১৮১৩ সালের এ আইন অনুযায়ী বাংলার মসলিনের উপর শতকরা ৪০ ভাগ এবং ক্যালিকো ও অন্যান্য বস্ত্রের উপর প্রায় ৮৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়। অপরদিকে বাংলা সরকার ভারতে আমদানি করা ইংল্যান্ডে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর শুল্ক কমিয়ে নামমাত্র শতকরা ২.৫ টাকা করে। স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের হিসাব অনুসারে বাংলা থেকে প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটি টাকার কাপড় বিদেশের বাজারে রপ্তানি হত। এ ছাড়াও প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কাপড় বিক্রি করে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে। ক্রমে এই দুটো বাজারই তাঁতীদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। যে সামান্য পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানি করা হত তাও বোনা হত ইংল্যান্ডের তৈরী সুতোতে। বিপুল সংখ্যক তাঁতী ও সুতো কাটুনি এর ফলে কর্মচ্যুত হয়। এদের বিকল্প পেশার ব্যবস্থা ছিল না। বাংলার কোম্পানি সরকার কর্মচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুই করেনি। অবশ্য কোম্পানির পক্ষ থেকে এই শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচানোর কোন উপায় ছিল না, কারণ বিদেশের বাজার বজায় রাখা ছিল

কোম্পানীর সাধ্যের বাইরে। অন্যদিকে বাংলায় আমদানি করা ইংল্যান্ডের মিলে তৈরি কাপড়ের উপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোম্পানিকে নানা সুযোগ-সুবিধার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের উপর নির্ভর করতে হত। তাই ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

৫.৩.১৫ তাঁতশিল্প ধ্বস, বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট

বস্ত্র শিল্পের পতনের ফলে বাংলায় প্রায় ১০,০০,০০০ জন তাঁতী বেকার হয়ে পড়ে। প্রতিটি পরিবারে যদি দু'জন করে সদস্য ধরা হয় তবে ক্ষতিগ্রস্থ লোকের সংখ্যা হবে ৬০,০০০। তাঁত শিল্পের ধ্বংস হয়ে যাবার সময় বাংলায় কি পরিমাণ জনসংখ্যা ছিল তা বলা কঠিন। কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কাপড় বুনা, সুতা কাটা এবং অন্যান্য সংশিষ্ট কাজের সাথে জড়িত লোকের সংখ্যা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য।

তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বাজিতপুর, তিতাবদি, লক্ষ্মীপুর,পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, ভাগলপুর, পাটনা, গয়া এবং সাহাবাদ জেলার তাঁতীরা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা হারায়। পুর্ণিয়াতে ১৩,৫০০ তাঁতী ছিল এবং সেখানকার তাঁতীরা মিহি এবং মোটা দুরকম কাপড়ই তৈরি করত। প্রায় সমস্ত তাঁতই বন্ধ হয়ে যায় এবং বুকাননের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তাঁতীরা বার্ষিক ৪,৭৩,০০০ টাকার নীচে আয় থেকে বঞ্চিত হয়। মেয়েরা সুতো কাটার কাজ করত। পূর্ণিয়া জেলাতে মেয়েরা ১০ লক্ষ টাকার বার্ষিক নীট আয় থেকে বঞ্চিত হয়। ভাগলপুর জেলাতে ১,৬০,০০০ মহিলা সুতো কেটে জীবিকা আহরণ করত এবং ৭২৭৯ টি তাঁত চালু ছিল।[৯২] ১৮৩৩ সালের পর এই সব তাঁত অচল হয়ে যায় এবং তাঁতীরা তাদের পেশা হারায়। সাহাবাদ জেলায় ১,৫৯,৫০০ মহিলা সুতো কাটার কাজ করত। এদের বার্ষিক আয় এমন কিছু বেশি ছিল না, কিন্তু এই আয় তাদের পরিবারের মোট আয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। সাহাবাদের কমবেশি ৭০২৫টি পরিবারের লোকেরা তাঁতবোনার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাঁতের সংখ্যা ছিল ৭৯৫০।[৯৩] উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে তাঁতবস্ত্রজাত জিনিসের চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে এইসব তাঁত একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। পাটনা ও গয়া জেলাতেও তাঁতের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁতীরা অশেষ দুর্গতির মুখোমুখি হয়।

৫.৩.১৬ আর্থিক বিপর্যায়ের মুখে সাময়িকভাবে পেশা পরিবর্তন

ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সীর তাঁতীদের অবস্থার শোচনীয় অবনতি হয়েছিল। সুতিবস্ত্রে অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির এবং বেসরকারী বণিকদের লগ্নীও অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অধিকাংশ তাঁতীই তাদের পেশা হারায়। তাদের অন্য কোন পেশা নেবার প্রশিক্ষণ না থাকায় কুলি মজুরের কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিছু সংখ্যক তাঁতী কৃষিকাজ, কিছু

সংখ্যক কল, মিলে হাতের কাজে এবং অল্পসংখ্যক লোক নানা ধরনের ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত হয়। খুব সামান্য তাঁতীই দেশের লোকের ব্যবহারের উপযোগী মোটা ধরনের কাপড় ও চাদর তৈরি করে হাটে বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

৫.৩.১৭ তাঁতীদের দেশান্তর

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কারণে দুটি অঞ্চলের অনেক মানুষ ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বেনারস, বিহার বা ভারতের অন্য কোনো অঞ্চল থেকে অবাঙালি মুসলমানদের বাংলাদেশে চলে আসা এবং বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যাওয়ার ঘটনাটা হলো দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফসল। এ ছাড়াও বাঙালি মুসলমান তাঁতীদের একটা বড় অংশ দেশভাগের পর সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চলে এসেছিল। যেমন: রাজশাহীর চারঘাটে এলাকায় অনুপমপুর গ্রামের অধিকাংশ তাঁতী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নদীয়া বা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে দেশভাগের পর।

তবে সব সময় রাজনৈতিক পট পরিবর্তন নয়, কখনো কখনো প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক কারণেও তাঁতিদের স্থায়ী বা সাময়িকভাবে দেশান্তরি হতে দেখা যায়। যেমন: ক্রমাগত বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে নরসিংদীর চর এলাকার তাঁতীদের একটা অংশ রংপুরের বন্যামুক্ত এলাকায় বসতি স্থানান্তর করেছিল এবং সেখানে নতুন আবাস গড়ে তুলেছিল। রংপুরের সাতমাথার বীরভদ্র বালাটারি গ্রামে এবং কাছাকাছি আরো কিছু এলাকায় এখনো এ ধরনের তাঁতীর দেখা পাওয়া যায়। এদের প্রায় সবাই নরসিংদীর বুইদ্দামারা, করিমপুর, জগৎপুর, বাঞ্চারামপুর, গোপালদী, বিষনগর এলাকা থেকে এসে বসবাস শুরু করছে রংপুরে। নরসিংদী থেকে আসা এই মানুষগুলোর সবাই ছিল মুসলমান এবং এদের 'জাতি পেশা' ছিল তাঁত বোনা। পাকিস্তান আমলে বন্যার কারণে নরসিংদীর নিচু এলাকা ছেড়ে এরা রংপুরের উঁচু এলাকায় চলে আসে বন্যা থেকে বাঁচার জন্য। আসার সময় এরা সেখান থেকে নিয়ে আসে তাঁতযন্ত্র। নতুন এলাকায় নতুন ভাবে জীবন শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এরা তাঁতকেই বেছে নেয়। এরা লুঙ্গি ও শাড়ি তৈরি করত। এই শাড়ি বা লুঙ্গি তারা স্থানীয় হাটে বিক্রি করত। এ ছাড়াও দিনাজপুর জেলার রাণীরবন্দরের বড় বড় মহাজনের কাছেও তারা পণ্য বিক্রি করত।

সম্প্রতি জামদানি পল্লীতে গবেষকের দীর্ঘক্ষণ কথা হয় জামদানী কারিগর ও ব্যবসায়ী সাইদুল ইসলাম সাধুর সঙ্গে। যাদের পূর্বপুরুষের (আদিবাড়ি) ঠিকানা ছিল নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের আমিরাবাদ গ্রামে। বর্তমানে মা, স্ত্রী সন্তানসহ বসবাস করছেন রুপগঞ্জ উপজেলার জামদানি পল্লীতে। আর্থিক অনটনে কাজের সন্ধানে পূর্বপুরুষ ভিটেমাটি ছেড়ে আসেন এখানে।

তাছাড়া জামদানী পল্লীর নিকটবর্তী কাজী পাড়াতে মনোহরদী থেকে আসা তাঁতী আমির হোসেন (পরিশিষ্টতে ছবি সংযুক্ত) তাঁত শ্রমিক হিসেবে কৈশোরে কাজ করতে এসে এখানে যৌবনে এখানেই ঘর বেধেছেন।[৯৪] কথা হয় আলামিন, শাহিন মিয়া (একই পিতার দুই সন্তান) এবং শফিকুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম দুই ভাই (বয়স চল্লিশ এর কোঠায়) এর সাথে।[৯৫] যাদের পিতা নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার সল্লাবাদ গ্রাম থেকে এসে কাজীপাড়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বন্যা ও মেঘনার ভাংগনে বেকারত্ব ঘুচাতে এখানে এসেছিলেন তাদের পিতা।

অর্থনৈতিক কারণেই আরেক দল দেশান্তরি তাঁতীর দেখা মেলে বান্দরবানে। সেখানে গর্ত তাঁতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরিতে নিয়োজিত বাঙালি তাঁতীরা মূলত নরসিংদীর বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী। এরা বেশি বেতনের আশায় তারা বান্দরবানে তাঁতের কাজ করতে গেছে। তারা বেশির ভাগই অস্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে। ছুটি পেলে পূজা-পার্বণে তারা বাড়ি ফেরে, অর্থাৎ নরসিংদীতে ফিরে আসে। কিন্তু কেউ কেউ ওখানেই বিয়ে করে স্থায়ী হয়েছেন। বেশি রোজগারের আশায় নিজ জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় তাঁতের কাজ করে আরো অনেক মানুষ। যেমন- টাঙ্গাইলের বল্লা এলাকায় আমরা কাজ করতে দেখেছি ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার তাঁতীদের। সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর, শাহজাদপুরে কাজ করতে দেখা যায় কুষ্টিয়া-কুমারখালী অঞ্চলের তাঁতীদের। তবে এগুলো অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ উপলক্ষে দেশান্তর। কাজ ফুরালে বা মন না চাইলে এরা আবার ফিরে যায় নিজ নিজ জেলায় বা অঞ্চলে।[৯৬]

৫.৩.১৮ বিসিক জামদানী পল্লীতে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা

৫.৩.১৮.১ সরকারি উদ্যোগের সুফল

১৯৯২ সালে ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাব এলাকাধীন নওয়াপাড়াতে অর্থাৎ যে এলাকায় আদিকাল থেকে কয়েকশত ঘর তাঁতীদের বসবাস ঐ এলাকাকে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বিসিক শিল্পনগরীর আওতায় এনে ৪ (চার) শতাধিক প্লট বরাদ্দ করা হয়। প্রত্যেকটি প্লটের আয়তন ২ (দুই) কাঠা করে। স্বচ্ছল তাঁতীরা ও স্থানীয় আদিবাসীরা সরকারী বিধি মোতাবেক আবেদনের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ পায়।

সম্প্রতি সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে গবেষক দেখতে পান বেশির ভাগ প্লটে তাঁতীরা নিজেদের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি তাঁত স্থাপন করে, জামদানী শাড়ী তৈরী করছে। প্রাণচাঞ্চল্য আছে এই পল্লীতে। হাট বসে নির্দিষ্ট স্থানে পল্লীর ভিতরে সরকার কর্তৃক নির্মিত শেড-এ, প্রতি শুক্রবার ভোর থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত। সরকার ঘোষিত নির্ধারিত অর্থ জোগাড় করতে পরেনি বলে প্রকৃত তাঁতীদের অনেকেই

প্লটের জন্য আবেদন করতে পারেন নি। তারা এখন স্বচ্ছল তাঁতীদের কারখানায় কারিগর হিসেবে কাজ করছেন বলে জানান ক্ষুদ্র জামদানী ব্যবসায়ী মো: সাইদুল ইসলাম সাধু।[৯৭]

কথা হয় তাদের মধ্যে একজন জনাব মো: মোক্তার হোসেনের সাথে। যারা ঐতিহ্যগতভাবে শত বছর ধরে তাঁতী পরিবার। মোক্তার হোসেনের পিতার নাম রহমত আলী, দাদা ছিলেন চাঁনমিয়া সাউদ (সাউদ-স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী তাঁতীদের উপাধি ছিল) যা তাঁতীরা পূর্বে ব্যবহার করতো। স্থানীয় প্রকৃত তাঁতী এবং আদিবাসী হিসেবে আবেদন করে ২ (দুই) কাঠার একটি প্লাট বরাদ্দ পেয়েছে। সেখানে ৩টি তাঁত স্থাপন করেছেন ৬ জন তাঁত কর্মচারী আছেন। মুক্তার হোসেন লেখাপড়া করেছেন এস.এস.সি পর্যন্ত। প্লটের এক কোণে ছোট একটি শোরুমও স্থাপন করেছেন। মোক্তার হোসেন ঢাকা এবং অন্যান্য এলাকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শাড়ীর অর্ডার নেন এবং সে অনুযায়ী শাড়ী সরবরাহ করেন। ঢাকার ব্যবসায়ীরা তাদেরকে সুনির্দিষ্ট ডিজাইন সরবরাহ করে থাকে। তাকে সেই অনুযায়ী শাড়ী তৈরি করে হয় এবং সময়মতো সরবরাহ করতে হয়। জামদানী পল্লীকে কেন্দ্র করে ঐ এলাকায় সুতা ব্যবসা এবং বিভিন্ন শোরুম গড়ে উঠেছে। শোরুমগুলোর মধ্যে মৌসুমী জামদানী (মালিক: জিয়াউল হক), সুমি জামদানী (মালিক: শাহআলম)। সুতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে মো: ছহিম মিয়া, পিতা: আলেক মিয়া, আব্দুল হালিম: পিতা: রুহুচাঁন মিয়া জামদানী পল্লীতে ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন।[৯৮]

৫.৩.১৯ সাধারণ তাঁত কারিগর থেকে যারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন

গবেষক জামদানি তাঁত সমৃদ্ধ এলাকা নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়া, রূপসী, তারাবো, বরাবো প্রভৃতি এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে কিছু তথ্য পেয়েছেন সাধারণ তাঁত শ্রমিক, কারিগর থেকে অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকজনের বিবরণ দেয়া হলো:

১। তাঁতী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা: মো: টুক্কু মিয়া, প্রোপ্রাইটর, আনোয়ার জামদানী, শুরু করেন দু'টি তাঁত দিয়ে পরবর্তীতে বেইলী রোড, টাংগাইল শাড়ী কুটির, বিবি রাসেল প্রোডাকশনে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করেন। বর্তমানের নিজস্ব তাঁত রয়েছে ১৬টি, নগদ টাকা লগ্নি করা আছে ৫০টির বেশি তাঁত কারখানায়।

২। মজিবুর রহমান, দক্ষিণ রুপসী, একসময় নিজে তাঁতী ছিলেন, দীর্ঘদিন তাঁত কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে ২৪টি তাঁতের মালিক। দেশে ও ভারতে জামদানী সরবরাহ, পরবর্তীতে ভারতে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করেন একাধিকবার। ক্ষুদ্র তাঁত মালিকদের কাছ থেকে শাড়ী কিনে ব্যবসা করে ব্যবসায়ী হিসেবে সফল হয়েছেন।

৩। আবদুল মোবারেক (বারেক সাহেব), গ্রাম: দক্ষিণ রূপসী, তার বড়ভাই মো: কাশেম মাতবর গ্রাম: দক্ষিণ রূপসী। উনারা নিজেরা তাঁত বুনতেন। পরবর্তীতে তাঁত স্থাপন করেন, কারিগরদের মাধ্যমে তাঁত

পরিচালনা শুরু করেন। ঢাকার বেইলী রোডে “টাংগাইল শাড়ী কুটির” থেকে অগ্রীম অর্ডার পেতে শুরু করেন সেই অনুযায়ী শাড়ী সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ধানমন্ডিতে স্থাপিত আড়ং এর শো রুমের শুরুর দিক থেকে তাদের অর্ডারমত অগ্রীম টাকা পেয়ে জামদানী শাড়ী সরবরাহ করেন থাকেন এতে ব্যবসায় সমৃদ্ধি আসে। বর্তমান তার বাড়ীতে ২০টি নিজস্ব তাঁত আছে। প্রায় ১০০টির মতো তাঁত কারখানায় দাদন (অগ্রিম অর্থ লগ্নি করা) আছে। দক্ষিণ রূপসীতে (নোয়াপাড়া জামদানী পল্লী লাগোয়া) বাংলাদেশ জামদানী হাউজ তাদের নিজস্ব শো-রুম।

৫.৩.২০ জামদানী কারিগর থেকে যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণ একসময় জামাদানী কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন সেসকল প্রতিষ্ঠানের নাম

- হাজী রহমান এন্ড কোম্পানি, নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- হাজী জয়নাল এন্ড কোং, নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- হাজী রশিদ এন্ড কোং, নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- নুরু হাজী এন্ড সন্স, নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- মোঃ জহিরুল ইসলাম, নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- কফিল উদ্দীন উইভিং ফ্যাক্টরী, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
- সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া, উইভিং ফ্যাক্টরী, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫.৩.২১ জামদানি তাঁতীদের বর্তমান মজুরী

গবেষক বিসিক এর জামদানী পল্লীতে সরেজমিন পরিদর্শন করে জানতে পেরেছেন জামদানী শাড়ী তৈরিতে প্রতিটি তাঁতের জন্য ২ (দুই) জন করে কারিগর প্রয়োজন হয়। একজন হলো মূল কারিগর এবং আরেকজন হলো সাগরেদ বা হেলপার। জামদানী তাঁতে মূল কারিগর সপ্তাহে ৩,৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা থেকে ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা পর্যন্ত মজুরী পায় মাসে। কারিগর ভেদে ১২ থেকে ১৬ হাজার টাকা পায় এবং হেলপাররা পায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১,৫০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ মাসিক ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা থেকে ৮০০০ (আট হাজার) টাকা সাধারণত হেলপারদেরকে তাঁত মালিকরা বাৎসরিক চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কারিগরদেরকে অগ্রিম বাৎসরিক হিসেবে ৮০,০০০-১,০০০০০ (আশি হাজার থেকে এক লক্ষ) টাকা অগ্রিম প্রদান করতে হয়।

৫.৩.২২ সাধারণ তাঁতীদের আয়ের ধরণ

সরকারি সংস্থাসমূহের জরিপের সাথে তুলনা করলে কাছাকাছি একটি চিত্র পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে তাঁত শুমারী অনুযায়ী বিভাগ ভিত্তিক কারিগর/শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মাসিক আয় নিম্নের সারণিতে দেখানো হল:

তাঁত স্থাপনার মাসিক আয়ের ধরন

বিভাগ	তালিকাভুক্ত ইউনিট সংখ্যা	আয়ের ধরন				
		>২০০০ টাকা	টাকা ২০০০/- ৫০০০/-	টাকা ৫০০০- ৮০০০/-	টাকা ৮০০০- ১০,০০০/-	টাকা ১০০০০/-+
বরিশাল	২৩১১	২০৬০	১৯৯	৩২	৭	১৩
চট্টগ্রাম	৯২,০৯৫	৯০,৩৭৭	১১৩২	২৩৬	১১৭	২৩৩
ঢাকা	৩০,৫৫৮	১৮,২৫৫	৭,৯৫৪	২১০৪	৭০১	১৫৪৪
খুলনা	২২,৩৭৯	১৭,৪২৫	৪২৭২	৩৯৯	১১২	১৭১
রাজশাহী	৩২৯৬৮	১৯,৭৫৭	৭৫৭	৮৮১৪	২২৯৬	৮১৬
সিলেট	৩২০১	২৯০৬	২৪৯	২৫	১৬	৫
বাংলাদেশ	১,৮৩,৫১২	১,৫০,৭৮০	২২,৬২০	৫০৯২	১৭৬৯	৩২৫১
বর্তমান	১০০.০	৮২.২	১২.৩	২.৮	১.০	১.৮

উৎস: *Bangladesh Handloom Census-2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, Published 2005, p. 80.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, তাঁত স্থাপনার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে। তাঁতভিত্তিক মাসিক আয় সবচেয়ে কম চট্টগ্রাম বিভাগে এবং তাঁতভিত্তিক সবচেয়ে বেশি মাসিক আয় ঢাকা বিভাগে। সারাদেশে মোট ৩২৫১ স্থাপনার তাঁতভিত্তিক মাসিক আয় ১০০০০ টাকার বেশি।

৫.৩.২৩ বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে অর্থ যোগানের উৎস

২০০৩ সালে তাঁত শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে ব্যাংকিং ও নন ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণের শতকরা হার তাঁত মালিকগনের তথ্য প্রদান সারণি মাধ্যমে দেখানো হলঃ

তাঁত স্থাপনাসমূহের ঋণের উৎস

তাঁত সংখ্যা	মোট		ব্যাংক		নন-ব্যাংক	
	স্থাপনা	%	স্থাপনা	%	স্থাপনা	%
১	১০৫১৫	১০০.০	২২৭৯	২১.৭	৮২৩৬	৭৮.৩
২-৩	৯১৯৭	১০০.০	১৯৩৬	২১.১	৭২৬১	৭৮.৯
৪-৫	৪২৮৭	১০০.০	৮১৬	১৯.০	৩৪৭১	৮১.০
৬-১০	৩৯১৬	১০০.০	৫৭৫	১৪.৭	৩৩৪১	৮৫.৩
১১-১৯	৩১৩৫	১০০.০	৩৯১	১২.৫	২৭৪৪	৮৭.৫
২০+	১০৭৬	১০০.০	১২২	১১.৩	৯৫৪	৮৮.৭
মোট	৩২১২৬	১০০.০	৬১১৯	১৯.০	৩৬০০৭	৮১.০

উৎস: *Bangladesh Handloom Census-2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, p.89.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ ১টি পর্যন্ত তাঁত মালিকগণ নন-ব্যাংকিং খাত থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করছেন ৭৮.৩%, ২-৩টি পর্যন্ত তাঁত মালিকগণ নন-ব্যাংকিং খাত থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করছেন ৭৮.৯% পাশাপাশি বৃহৎ কারখানা ইউনিট ২০ এর অধিক তাঁত মালিকগণ

নন-ব্যাংকিং খাত থেকে আর্থিক ঋণ গ্রহণ করছেন ৮১%। অর্থাৎ, তাঁতের পরিমান বেশি হলেও তাঁত মালিকগণের ব্যাংকিং খাতের চাইতে নন-ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। ২০০৩ সালে তাঁত শুমারী অনুযায়ী তাঁত মালিকগনের স্থায়ী সম্পদ সারণি মাধ্যমে দেখানো হল:

তাঁত স্থাপনাসমূহে সুদে গ্রহণকৃত ঋণ

বিভাগ	মোট		ব্যাংক		সুদমুক্ত ঋণ	
	স্থাপনা	%	স্থাপনা	%	স্থাপনা	%
বরিশাল	২৩১১	১০০.০	৪১৭	১৮.০	৮২৩৬	৭৬
চট্টগ্রাম	৯২০৯৫	১০০.০	১০৩৯	১.১	৭২৬১	৫৮২
ঢাকা	৩০৫৫৮	১০০.০	৭২৩২	২৩.৭	৩৪৭১	৮৪৯
খুলনা	২২৩৭৯	১০০.০	৭৪৫৯	৩৩.৩	৩৩৪১	৫৩৭
রাজশাহী	৩২৯৬৮	১০০.০	১২০৪৭	৩৬.৫	২৭৪৪	১২৬৬
সিলেট	৩২০১	১০০.০	৫৯৮	১৮.৭	৯৫৪	২৪
বাংলাদেশ	১৮৩৫১২	১০০.০	২৮৭৯২	১৫.৭	৩৬০০৭	৩৩৩৪

উৎস: *Bangladesh Handloom Census-2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, p.90.

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুদযুক্ত ঋণ গ্রহণের পরিমান রাজশাহী বিভাগে ৩৬.৫%, খুলনা বিভাগে ৩৩.৩%, ঢাকা বিভাগে ২৩.৭% তাঁতীগণ গ্রহণ করেছেন। সবচেয়ে সুদযুক্ত ঋণের পরিমান চট্টগ্রাম বিভাগে।

মালিকানা ভিত্তিক স্থায়ী সম্পদ

(মূল্য '০০০' টাকা)

বিভাগ	স্থাপনা	মোট তাঁত	মালিকানা ভিত্তিক স্থায়ী সম্পদ				
			মোট	মালিকানা	যৌথ	সমবায়	তঁতী সমিতি
বরিশাল	২৩১১	৪৭৪১	৩৯,২২৫	৩৮,৪০৬	৩৯৯	১৬৪	২৫৬
চট্টগ্রাম	৯২০৯৫	১৫৬,৮২৯	২,৪৮,৬৪৬	২,৪১,৩৬২	৫৭৮০	১৯১	১৩১৩
ঢাকা	৩০৫৫৮	১, ০৫,৪৬৭	১৩,৩৮,৫৮	১২,৯০,৫৫৮	৩২,১৬৮	৪১২৯	৬৭,০০৩
খুলনা	২২৩৭৯	৩৭,৮৫৫	৪,৬৪,৮৪৬	৪,৬০,৩৭৫	৩৪৬৮	৫৪৮	৪৫৫
রাজশাহী	৩২৯৬৮	১,৯৫,৭৪৯	১৮,৫১,১০৩	১৬,৬২,৫৫০	১,৮২,৩৭৯	৪০৮৭	২০৮৭
সিলেট	৩২০১	৪,৯১৫	৩৪,৬২০	৩৪,০০৩	১৭০	১৬৫	২৮২
বাংলাদেশ	১৮৩৫১২	৫,০৫,৫৫৬	৪০,৩২,২৯৯	৩৭,২৭,২৫৪	২,২৪,৩৬৪	৯২৮৫	৭১,৩৯৬

উৎস: *Bangladesh Handloom Census-2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, p.95.

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে স্থায়ী সম্পদ রয়েছে। যার পরিমান মোট সম্পদের ৪৬% এবং ঢাকা বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্পদ রয়েছে ৩৫%।

স্থায়ী সম্পদের ধরন

(মূল্য '০০০' টাকা)

বিভাগ	মোট	মোট তাঁত	মোট সম্পদ	ফ্রাক্টরী/বাড়ী এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	তাঁত/সানা/মাকু/ বঅ/ডবি	অন্যান্য সরঞ্জামাদি
বরিশাল	২৩১১	৪৭৪১	৩৯,২২৫	২৬,৮০৯	১০,৮১৬	১৬০০
চট্টগ্রাম	৯২০৯৫	১৫৬,৮২৯	২,৪৮,৬৪৬	১,৫৯,৭৪৩	৭৫,৩৯৩	১৩,৫১০
ঢাকা	৩০৫৫৮	১, ০৫,৪৬৭	১৩,৩৮,৫৮	৭,১,৬৮৫৭	৫,৩৯,৩২৪	৮৩,৬৭৭
খুলনা	২২৩৭৯	৩৭,৮৫৫	৪,৬৪,৮৪৬	২,২২,৫৯৮	২,২,৩৯২৭	১৮,৩২১
রাজশাহী	৩২৯৬৮	১,৯৫,৭৪৯	১৮,৫১,১০৩	৮,২৫,৬০৬	৯,৫৯,৭৬৪	৬৫,৭৩৪
সিলেট	৩২০১	৪,৯১৫	৩৪,৬২০	২২,৫০৭	১০,৬৩৯	১৪৭৪
বাংলাদেশ	১৮৩৫১২	৫,০৫,৫৫৬	৪০,৩২,২৯৯	১৯,৭৪,১২০	১৮,৭৩,৮৬৩	১,৮৪,৩১৬

উৎস: *Bangladesh Handloom Census, 2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, p.95.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, প্রায় ৯০% সম্পদ হলো কারখানা, ঘর, স্থাপনা, তাঁত, তাঁতযন্ত্র যেমন- সানা, মাকু, ব এবং ডবি। অবশিষ্ট ৫% বিভিন্ন মালামাল রয়েছে।

৫.৩.২৪ শুমারীতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুপারিশসমূহ

পরামর্শ	তালিকাভুক্ত ইউনিট সংখ্যা	%
ন্যায্য মূল্যে সুতা এবং অন্যান্য তাঁত পণ্য সরবরাহ	১৭১৯০০	৯৩.৭
স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ	১১৭৭৩০	৬৪.২
বাজারজাতকরণের অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরী	৭৩১৫৫	৩৯.৯
সরাসরি সরকারি সাহায্য (মাধ্যসত্ত্বভোগী ব্যতীত)	৩৩২৭৯	১৮.১
বিদেশ থেকে কাপড় আমদানি নিষিদ্ধকরণ	১৮৩৫১২	১০০.

উৎস: *Bangladesh Handloom Census- 2003*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, p.98.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ২০০৩ সালে তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেখা যায় তাঁতীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো শুমারীকারকগণ সরকারের নিকট পেশ করেছেন। সুপারিশগুলো হলো: সুলভমূল্যে সুতা এবং তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে, পাশাপাশি স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ দিতে হবে, সহজে বাজারজাতকরণের সুযোগ দেয়া দরকার, কোন রকম দালাল বা মাধ্যম ব্যতীত তাঁতীরা যেন সরাসরি সরকারী সহযোগীতা পায়। তাছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদিত তাঁতপণ্যের সমজাতীয় পণ্য যেন বিদেশ থেকে আমদানী করা না হয়।[৯৯]

অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধির জন্য সরকারী উদ্যোগ: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার তাঁত সংক্রান্ত একটি বিলের উদ্দেশ্য কারণ সম্বলিত একটি বিবৃতি প্রদান করেন,

> "তাঁতশিল্প দেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। এই শিল্প দেশের বস্ত্র উৎপাদনের প্রায় ৬৩% যোগান দিতেছে। তদুপরি এই শিল্পে

বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রহিয়াছে। তাঁত শিল্পের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও ভবিষ্যতে তাঁত শিল্পের বিকাশের জন্য তাঁতী সমিতিসমূহ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালেও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে উৎপাদন ও উপকরণ বিতরণ এবং তাঁতজাত দ্রব্যাদি বিপননের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উদ্যোগে তাঁতী সমিতিকে উচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংগঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরুপভাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলেও তাঁত শিল্পকে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাঁত বোর্ডের প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন করিতে হইবে এবং তাঁতী সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিতে হইলে তাঁতী সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রেশনসহ সমুদয় কার্যাবলী বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের এখতিয়ারভূক্ত করা আবশ্যক"।[১০০]

৫.৩.২৫ অর্থনৈতিক কারণে পেশা পরিবর্তন

বাংলাদেশ বর্ণভিত্তিক শ্রেণীব্যবস্থা চালু থাকার কারণে প্রাচীনকালে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জন্য পেশা নির্দিষ্ট ছিল। সেই বর্ণসীমা সাধারণত রক্ষা করা হতো এবং তা অতিক্রম করার চেষ্টা সচরাচর দেখা যেত না। কিন্তু বাংলাদেশে যখন তাঁতশিল্পের সুদিন ছিল, তখন বিপুলসংখ্যক অন্যান্য পেশাজীবী মানুষ অধিক লাভের আশায় পেশা পরিবর্তন করে তাঁতশিল্পে যুক্ত হয়েছিল। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলা চর ও পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি ইউনিয়নে তাঁত শিল্প ব্যাপক প্রসারতার মূল কারণ ছিলো সেখানে কৃষকরা ঘরে ঘরে তাঁত স্থাপন করেছিল, উপজেলার আমিরগঞ্জ, হাইরমারা, চরসুবুদ্ধি, চর আড়ালিয়া, নিলক্ষা, ডৌকারচর, মির্জানগর, শিবপুর উপজেলার আয়ুবপুর ও পুটিয়া ইউনিয়ন, সদর উপজেলার চিনিশপুর, আলেকবালী শিল্পমান্দি, শেখেরচর, নুরালাপুর মাধবদীতে প্রায় প্রতি বাড়িতেই তাঁতীদের দেখা মিলে। এমন দৃশ্য বাড়ির বাইরে খড়ের গদ্দা, গরুর জন্য গোয়ালঘর আবার টিনের ঘরের ভিতর তাঁতের ঠক্ঠক শব্দ। বাড়ির গৃহিনী যুবক শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, বাবা-মা সবাই যেন কাজে ব্যস্ত, সবাই জানে কৃষি ও তাঁতের কাজ। ছোট ভাগিয়াদের কথা আগেই বলা হয়েছে, যারা ছিল কায়স্থ ও স্বর্ণকার। কৃষকদের একটা অংশ তাঁতশিল্পে যোগ দিয়েছিল, যারা পরবর্তীকালে তাঁতের কাজ ও কৃষিকাজ দুটিই পাশাপাশি চালিয়ে গেছে সিরাজুল ইসলামের মন্তব্যে তা বোঝা যায়।

> One charecterstics of cotton industry in Bengal was that most of the weavers were also peasant producers at the same time.[১০১]

এ ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবী অনেকে তাঁতের কাজে যুক্ত হয়েছিল সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

কিন্তু যখন বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের দুর্দিন নেমে এল, তখন ঠিক উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছিল। সিরাজুল ইসলাম একই প্রবন্ধে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পীদের পেশা পরিবর্তন সম্পর্কে লিখেছেন,

> For survival they turned to agriculture. Turning to agriculture was not a very big problem to them because the weaving class and also the textile traders traditionally maintained some connection with agriculture. Most wevers were part-time argiculturists too.[১০২]

শুধু কৃষিকাজ নয়, তাঁতীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁতের কাজ ছেড়ে অন্যান্য পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেছিল এবং এই ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। বিশ শতকের গোড়া থেকে বসাক তাঁতী কিংবা জোলা কিংবা যোগী সম্প্রদায়ের কোনো কোনো মানুষ তাঁতের কাজ ছেড়ে অন্যান্য পেশা অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেছে বলে জানা যায়। গবেষক বৃহত্তর ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ের প্রচুর সাবেক তাঁতীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যারা (কিংবা যাদের পরিবার) আগে তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এখন অন্য কাজ করে। নতুন যেসব পেশায় বিভিন্ন তাঁতী সম্প্রদায় যুক্ত হয়েছে তার মধ্যে সোনার কাজ, কাঠের কাজ, সরকারি চাকরি, মুদি দোকানদার, দিনমজুর, ভ্যান কিংবা রিকশাচালক ইত্যাদি। পেশা পরিবর্তনের এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

৫.৪ উপসংহার

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকেই চর্যাপদ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও তাঁত ব্যবস্থাপনার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁতশিল্পে জড়িত জনগোষ্ঠী একই সম্প্রদায়ের হলেও তাদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন প্রবল। যেমন, হিন্দু তাঁতীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাজন যুগী, বসাক, নাথ, ধামরাইয়া, চৌহাটিয়া ইত্যাদি। তারা প্রত্যেকেই কাপড় উৎপাদন করলেও কাপড় বুননের ধরন, কাপড়ে ব্যবহৃত মাড় প্রকরণ, ধর্মীয় আচরণ, অভ্যাস, সামাজিক আচার রীতিনীতি ইত্যাদিতে ভিন্নতা রয়েছে যা আলোচনায় উঠে এসেছে যা উৎপাদনের দিক থেকে কাপড়ের শ্রেণী বিন্যাস ও বুনন প্রক্রিয়া ব্যবসার স্থান, মোকাম ইত্যাদির ভিন্নতার উপর তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে। পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের যারা প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বৃহত্তর ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এই পেশায় জড়িত তাদের মধ্যেও রয়েছে শ্রেণী বিভাজন। যেমন: যারা জামদানী বুনন করে তাদের বলা হয় কারিগর। মোটা কাপড় যারা তৈরী করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া অঞ্চলে তাদের বলা হয় জোলা। জোলাদের মুসলমান তাঁতী

সম্প্রদায়ে তুচ্ছার্থে মূল্যায়ন করা হয়। কোন এলাকায় চাষা-জোলা দ্বন্দ্বের কথা শোনা যায়। তাঁতের ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় অনেক চাষা পরিবার তাঁতশিল্পে যখন জড়িত হয় তাদেরকে পেশাদার তাঁতীরা ভিন্ন চোখে দেখে। এই অধ্যায়ে কোম্পানি আমলে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কোম্পানি কর্তৃক তাঁতীদের উপর চাপিয়ে দেয়া অযাচিত নিয়মকানুন, তাদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র ফুঠে উঠেছে। মসলিন ও মিহি বস্ত্র তৈরীকারক তাঁত শিল্পীরা কিভাবে তাঁত পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন তা আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতশিল্প আলোচনা করতে গিয়ে আদিবাসী তাঁতশিল্পে নারীদের ভূমিকা ও প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে জামদানী কারিগরদের অবস্থা, জামদানী পল্লীকে ঘিরে সরকারের উদ্যোগ ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা থেকে জানা যায়। বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে তাঁতশিল্পে জড়িত অনেক প্রান্তিক তাঁতী পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠা করে কীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন তা আলোচনায় এসেছে। এরকম বেশ কয়েকজনের পরিচয় এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে। তাঁত ব্যবসায় জড়িত যেমন সুতা ব্যবসায়ী, রং ব্যবসায়ী, পাওয়ারলুম, টেক্সটাইল মালিকগণের কথাও এখানে এসেছে। তাঁতীদের বিভিন্ন সময়ে দাবি দাওয়াভিত্তিক আন্দোলন, তাদের উদ্যম ও কর্মতৎপরতা এই অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক, সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সর্বোপরি এই অধ্যায়ে তাঁতশিল্প সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার আর্থ-সামাজিক দিক তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশিকা

১. শাওন আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, দেশাল, (ঢাকা, ২০১৮), পৃ. ১২৫।

২. কৌটিল্য তথা চানক্য পণ্ডিত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৮৭ বছর বয়সে খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৩ সালে মৌর্যদের রাজধানী 'মগধ' এ মৃত্যুবরণ করেন। পিতার নাম চানক ঋষি এবং জন্মস্থানের নাম চনক ছিল বলে তাকে অনেকে চানক্য পণ্ডিত বলে থাকেন। কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করে তার জন্মস্থান তক্ষশীলা বলে দাবি করেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, স্থপতি, সমরবিদ, কূটনীতিক, যুক্তিবিদ্যা বিশারদ সমাজবিজ্ঞানী কৃষি-উৎপাদন বাণিজ্য বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ প্রশাসক।

৩. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনূদিত), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম* (দ্বিতীয় খন্ড), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪-৫।

৪. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনূদিত), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (প্রথম খন্ড)*, পূর্বোক্ত, ২০০২, পৃ. ৩৮৯-৩৯১।

৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস: আদিপর্ব*, *দে'জ পাবলিশিং*, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০২ বঙ্গাব্দ (প্র. প্র. ১৩৫৬), পৃ. ১৪৯।

৬. রায়, *আদিপর্ব,...*, পৃ. ২৪৬। (এখন থেকে গ্রন্থটি রায়, *আদিপর্ব...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৭. রায়, *আদিপর্ব...*, পৃ. ২৪৮।

৮. James Taylor, Topography A Sketch of Statistics of Dacca, G. H. Huttman, Military Orphan Press, Calcutta, 1988, p. 175.

৯. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (তৃতীয় ভাগ)*, (অনুবাদ: ফওজুল করিম), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৯৪।

১০. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১৯৫ (এখন থেকে গ্রন্থটি ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

১১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৭।

১২. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১১৭।

১৩. ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি.., পৃ. ১৯৫।

১৪. ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি.., পৃ. ১৯৭।

১৫. জেমস টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, অনুবাদ: মোহম্মদ আসাদুজ্জামান, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০১ (প্র. প্র. ১৮৪০) পৃ. ১২৪

১৬. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*, (প্র. প্র. ১৮৮৩), পৃ. ১৯৭।

১৭. টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, ২০০১ পৃ. ১২৪। (এখন থেকে গ্রন্থটি টেইলর, *কোম্পানি আমালে ঢাকা*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

১৮. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., (প্র. প্র. ১৮৮৩), পৃ. ১৯৬।

১৯. আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*..., পৃ. ১২৮। (এখন থেকে গ্রন্থটি আকন্দ, বাংলাদেশের *তাঁতশিল্প*..., এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

২০. সাক্ষাৎকার: মো: ইলিয়াস পাল, পেশা: ব্যবসা, বয়স: ৬০, ধামরাই, ঢাকা-২০১৬।

২১. টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*..., পৃ. ১২৮।

২২. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ৩৫৫।

২৩. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম খন্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৮৬

২৪. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১৯৬।

২৫. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১১৯-১২০।

২৬. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১২০।

২৭. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড)*, (কলকাতা, ২০০১) , পৃ. ১০৩৩।

২৮. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১৩১।

২৯. টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, পৃ. ৮৯।

৩০. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ৮৯।

৩১. সাক্ষাৎকার: মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, পেশা: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও ফোকলের গবেষক, বয়স: ৭৭, গ্রাম: বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী-২০১৬।

৩২. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি*..., পৃ. ১৩১-১৩২।

৩৩. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ৯৭।

৩৪. সাক্ষাৎকার: নরসিংদী এলাকায় বাংলাদেশ তাঁত সমিতির নেতা আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন মোল্লার কাছ থেকে সংগৃহীত। পেশা: ব্যবসায়ী, বয়স:৭০, সাল ২০১৬।

৩৫. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*পৃ. ৯৮।

৩৬. সাক্ষাৎকার: আলী আজহার, পেশা: শিক্ষকতা, বয়স: ৪৯, গ্রাম: বটতলী, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী-২০১৬।

৩৭. *সিরাজগঞ্জ-কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রচলিত লোকগল্প*। সংগ্রহ কে এম. লিয়াকত হোসেন, বয়স-৫৫, পেশা-কৃষি, গ্রাম-সদরপুর, উপজেলা, কুমারখালী, জেলা- কুষ্টিয়, সাল-২০১৮।

৩৮. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ৯৮-৯৯।

৩৯. সাক্ষাৎকার: কে. এম. লিয়াকত হোসেন, পশা-কৃষি, বয়স-৫৫, গ্রোম-সদরপুর, উপজেলা, কুমারখালী, জেলা- কুষ্টিয়া, সাল-২০১৮।

৪০. সাক্ষাৎকার: আবদুস সাত্তার শিকদার, পেশা: কলেজ শিক্ষক, বয়স: ৪৫, গ্রাম: হাইরমায়া, রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী-২০১৮।

৪১. সাক্ষাৎকার: মো: হুমায়ুন কবীর, পেশা: টেক্সটাইল কাপড় ব্যবসা, বয়স: ৫৩, গ্রাম: চরমাধবদী, জেলা: নরসিংদী-২০১৭।

৪২. সাক্ষাৎকার: হুমায়ুন ইসলাম খান: প্রাক্তন সভাপতি, পেশা: ব্যবসায়ী, বয়স: ৫৮, বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সমিতি ,নয়াপল্টন, ঢাকা-২০১৬।

৪৩. টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা...*, পৃ. ১২৭।

৪৪. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩২ ।

৪৫. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

৪৬. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩৩।

৪৭. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩২।

৪৮. "Industries in Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, Second Edition: 1929, P. 75, 80, 89-90, 106 Government of Bengal, Department of Industries", Report on the Survey of Cottage - 107, 111.

৪৯. আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প...*, পৃ. ১৩৫।

৫০. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩৩।

৫১. *আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্প...*, পৃ. ১৩৫।

৫২. Arshi D. Roy, *Indigenous Textiles of the Chittagong Hill Tracts*, Charthum Publishers, Rangamati, 2005, p. 37-38.

৫৩. আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প...*, পৃ. ১৩৫।

৫৪. সাক্ষাৎকার: সুলতান উদ্দিন মোল্লা, প্রাক্তন সভাপতি, জেলা তন্তবায় সমবায় সমিতি, নরসিংদী, প্রাক্তন সদস্য, তাঁতী প্রতিনিধি, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, পেশা-ব্যবসা, বয়স-৭০, সাটিরপাড়া, নরসিংদী-২০১৭।

৫৫. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৯৯।

৫৬. ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি...*, পৃ. ১৩২।

৫৭. সাক্ষাৎকার: আব্দুস সাত্তার সিকদার, পেশা-শিক্ষকতা, বয়স-৪৫, গ্রাম+পো: হাইরমায়া, উপজেলা-রায়পুরা, জেলা-নরসিংদী, হাইরমারা-২০১৬।

৫৮. Hossain*, The Company...*, p. 123.

৫৯. W. Bolts, Consideration on Indian Affairs, London, 1772; D. B. Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, Calcutta, 1978: Hameeda Hossain, The Company Weavers of Bengal, Dhaka, 2010.

৬০. Hossain, *The Company...*, p. 124.

৬১. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal*, (Calcutta, 1978), p. 139.

৬২. Mitra, *Weavers of Bengal...*, p. 140. (এখন থেকে গ্রন্থটি Mitra, *Weavers of Bengal...*, এই নামে পাদটিকাতে উল্লেখ করা হবে)।

৬৩. যেমন, উইলিয়াম বোল্টস-এর সূত্র উল্লেখ করে সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, '... তন্তুবায়গণও কোম্পানির "মুচলেকা" নামক বলপ্রয়োগে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানিয়া চলিতে অপরাগ হইয়া গোমস্ত ও চৌকিদারগণের নিকট হইতে বস্ত্র বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়অ তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ঘটনাস্থলেই বিক্রয় করিয়অ দেয়।' এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বোল্টস-এর Consideration on Indian Affairs (London, 1772) গ্রন্থের ১৯১ থেকে ১৯৪ পৃষ্ঠার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত তথ্যসূত্রে এরকম কিছু বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৬৪. Mitra *Weavers of Bengal...*, p. 141.

৬৫. হামিদা হোসেন, পৃ. ১২৫। মূলসূত্র: IOR, BPC, Ragne 2, Vol. 10, 12 June 1775. pp 230.

৬৬. Hari Rajan Ghosal, Trade Union Sprite Among the Close of 18th Century. Historical Records Commission, 1951, Vol 28 Part. 2, p. 42.

৬৭. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ৬২।

৬৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ এপ্রিল, ২০১০. পৃ.।

৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ এপ্রিল, ২০১০, পৃ.।

৭০. Hossain, *The Company...*, p. 126-7.

৭১. সাক্ষাৎকার: মোক্তার হোসেন, পিতা: রহমত আলী, পেশা: প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বয়স: ৪০, নোয়াপাড়া জামদানী পল্লী, ২০১৭।

৭২ Hossain, *The Company,* 1988, p.51.

৭৩ Royle. F. Forbes, *On the Culture and Commerce of Cotton India and Elswhere,* London, 1851, p.73.

৭৪ Forbes, *On the Culture ...,* London, 1851. p. 51.

৭৫ Hameeda Hossain, *The Company*, Delhi, 1988. p.149.

৭৬ Debendra Bijoy Mitra, *Cotton Weavers of Bengal*, 1757-1833, Calcutta, 1978 p.145.

৭৭ Mitra, *Cotton ...*, 1757-1833, Calcutta, 1978 p. 58.

৭৮ Mitra, *Cotton...*, 1757-1833, Calcutta, 1978 p. 59.

৭৯ Mitra, *Cotton...*, 1757-1833, Calcutta, 1978 , p.61.

৮০ Mitra, *Cotton...*, 1757-1833, Calcutta, 1978 p.65.

৮১ Evans, Calcutta, 1921, p. 60.

৮২. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal, The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813*, p. 110

৮৩. Hossain, *The Company...,* p. 110

৮৪. IOR, BPC, 1775, Range 2, vol. 10, pp. 227-9; Circular Letter to the Provincial Council dated 27 June 1775 enclosing consultations of (30 May 1775).

85. Hossain, *The Company...*, p. 119.

৮৬. IOR, BCSC, 1789, Range 155, vol. 74, pp. 135-6.

৮৭. W. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal, (*London, 1868), p. 136.

৮৮. J. E. Colebrooke, *Digest of the Regulations and Laws,* Articles 5,6,7 and 15, pp. 458-60.

৮৯. Hossain, *The Company...,* p. 137.

৯০. IOR, BCSC, 1789, Range 155, vol. 76, 28 August 1789, p.195.

৯১. James Taylor: British Author & Historian, Writer A Sketch of the Topography & Statistic of Dacca, 1840, London .

৯২. D. B Mitra, *Op., cit.,* p. 202.

৯৩. Buchanan, *An Account of the District of Shahabad*, p. 408.

৯৪. সাক্ষাৎকার: আমির হোসেন, পেশা: তাঁতী কারিগর (ওস্তাদ), বয়স:৪৫, কাজীপড়া, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ-২০১৪।

৯৫. সাক্ষাৎকার: মো: রফিকুল ইসলাম, তাঁতী কারিগর, কাজীপড়া, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ, ২০১৬।

৯৬. আকন্দ, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প...*, পৃ. ১৩৭।

৯৭. সাক্ষাৎকার: সাইদুল ইসলাম সাধু, পেশা: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বয়স: ৪৫, নোয়াপাড়া বিসিক শিল্পনগরী, রূপসী, তারাব, রূপগঞ্জ, ২০১৬।

৯৮ গবেষকের সরেজমিন পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২০১৬।

৯৯. Bangladesh Institute of Development studies vol. xvii March-June, 1989.

১০০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বিবৃতি, ১০ জুলাই, ১৯৯০।

১০১. Delwar Hossan (ed.), *Commercial History of Dhaka*, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka, 2008, p. 9.

১০২. *History of Dhaka* Hossan (ed.), *Commercial*, p. 17।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকগাঁথা প্রবাদ-প্রবচন, গান, লেখনীতে তাঁতশিল্প

ষষ্ঠ অধ্যায়
লোকগাঁথা প্রবাদ-প্রবচন, গান, লেখনীতে তাঁতশিল্প

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ সাহিত্য, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ একটি দেশ। একটি অঞ্চলের ভৌগলিক সীমারেখা, জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, অভ্যাস, শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি ইত্যাদি সাহিত্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। তেমনি বাংলাদেশের পূর্ববাংলার তাঁত শিল্প নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গল্প, কবিতা, গান, লোকগাঁথায় তাঁত, তাঁত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর হাসি, কান্না সুখ-দু:খ আনন্দ বেদনার চিত্র পাওয়া যায়। বহু গান, কবিতা, শ্লোক, বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এমনও অনেক আঞ্চলিক গান, কবিতা আছে মানুষের মুখে মুখে। গবেষক সরেজমিন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে অঞ্চলভিত্তিক এরকম কিছু গান ও কবিতা সংগ্রহ করেছেন। সব মিলিয়ে এ অধ্যায়ে বিষয়গুলোর আলোকপাত করা হয়েছে।

৬.২ সাহিত্য, সংগীত, লোকগাথা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিতে তাঁতশিল্প: কিছু খন্ডচিত্র

তাঁতশিল্প এ দেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে আছে। খুব স্বাভাবিক কারনেই বাংলাদেশে সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি শিল্পমাধ্যমে এর প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে লোকগান, লোকগাঁথা, বিভিন্ন প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিতে তাঁত ও তাঁতি সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষঙ্গ বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তা ছাড়া আধুনিক সাহিত্যেও তাঁত শিল্প ও তাঁতী জীবন নিয়ে আখ্যান রচিত হয়েছে। সেসবের কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে উদ্ধৃদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হাজার বছরের সাহিত্য ও সংগীতের বিস্তৃত ভান্ডার থেকে অতি অল্প পরিমাণই এখানে উপস্থাপনা করা হলো। এখানে যা উদ্ধৃত করা হলো, তাকে সাহিত্য বা সংগীতে তাঁতশিল্পের সামগ্রিক প্রতিফলন হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। বরং একে নির্বাচিত সংকলন বলা যেতে পারে।

ক. লোকগানে তাঁতশিল্প

তাঁতশিল্পের মতো বাংলাদেশের লোকগানের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন ও গৌরবময়। বিশেষ করে বাউল ঘরানার দেহতত্ত্বের গানে রূপক হিসেবে বারবার বিভিন্ন তাঁত অনুসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। চর্যাপদ থেকে এই ঐতিহ্যের শুরু তা এখনো বিদ্যমান। এছাড়াও মেয়েলি বিয়ের গান, পালকির গান এবং বিভিন্ন অঞ্চলিক গানে তাঁত বা তাঁতবস্ত্র, বিশেষ করে শাড়ির কথা বার বার বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এসবের কিছু উদাহরণও তুলে ধরা হলো।

চর্যাপদ

'তান্তি বিকণা ডোম্বি আবরণা চাংগেড়া।

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ॥'[১]

(কাহ্নু পা বিরচিত পদ:১০)

'তুলা ধণি ধুনি আসু রে আঁসু।

আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥'

তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।

সান্তি ভণই কিণ সভাবিঅই।

তুলা ধুণি ধুণি সুনে আহারিউ।

পুন অইআঁ অপণা চটারিউ[২]

(শবর পা বিরচিত পদ : ৫০)

এই পদগুলো সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। এখানে সহজিয়া তরিকার সাধন ভজনের কথা বলা হয়েছে। তুলা, তাঁতি, তাঁত ইত্যাদি উপাদান রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সে সময় কার্পাস চাষ, তুলা ধুনা বা তাঁতযন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র বয়নের প্রচলন ছিল তা জানা যায়।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যগুলোতে প্রায়শই পাটের শাড়ি, তসরের শাড়ি ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। নিচের এরকম কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

কবি কঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিবাহের অনুষ্ঠানে আসা অতিথিরা যেসব উপহার নিয়ে আসেন তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে-

'কেহ নেত কেহ সেত কেহ পাট শাড়ি

চন্দন কুসুম কেহ বাটা-ভরা করি।[৩]

আবার অন্যত্র কালকেতুর রাজ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে এই ভাষায়-

নিবসে হলিক গোপ, নাজানে কপট কোপ

খেতে উপজায় নানা ধন

গুড় তিল মুগ মাষ, গম সর্ষা কাপাস

সভার পূর্ণিত নিকেতন।[৪]

অর্থাৎ সে সময় অন্যতম কৃষিপণ্য হিসেবে কার্পাসের চাষ হতো সেটা বোঝা যাচ্ছে।

কুবির গোসাইয়ের[৫] গান

ক. যুগীয় ব্যবসা ভাতছানা
এই সুতোর গায়ে মাখিয়ে তাই কাড়াই তানা।
আমার দুইদিকে খাটুনী।
আমি একবার কড়াই একবার করি তাসুনী।
আমি গেঁথে সানা মেড়ো তানা
করি নরাজ গুটানী।
দুই রোয়া জুড়ে গেঁড়েয় পড়ে,
ঝাপে ঝোপে তাঁত বুনি।

খ. ভারি সুতোর বাজার আক্কারা
হেয়ে যুগী তাঁতী পুলিশ-সৈন্য শিখেছে কেয়াজ করা।
এখন কাপড় বোনায় লভ্য নাইক
উল্টোদেনায় হয় সারা।
কাপাস তুলো নেইক দেশে
কেশের ফুলকোয় কাঠ ভরা
তাতে হয় না সুতো অনাহত ভাবছে যত চাষীরা।
এখন দায়ে পড়ে পৈতে ছিঁড়ে দন্তী হবে দ্বিজরা
এখন মাকু বেছে কাঁকু চুষে বেড়ায় যত জোলারা
কলার পেটোর কপ্নি পড়বে যত বাউল নেড়ারা।
মোঘল পাঠান হদ্দ হল
ফার্সী পড়ে তাঁতি।
(ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা যে কাজ করতে পারেনি
অক্ষম ব্যক্তি সে
কাজ করতে চায়।)

গ. অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা।
যখন খেঁই যাবে ছিড়ে লব জুড়ে
ফেলব না তার এক ফোঁটা।
সদা ইষ্ট প্রতি নিষ্টে রতি
আছে আমার মন আটা।
ভসকে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে।

ভয় কি তায় এতো।

কতশত ঘুচাই জড় পটা।

নাটিয়ে করব পাতা দেখব তা বাধবে না।

কোন নেটা।

যখন সুতা করব মাতি।

লাগাব তায় পাতায় খৈ ভিজে মাতি।

দুই এক ঘড়ি ছড়াব জটা

শেষে কাড়িয়ে তান গাঁথা সানা

সাঁ পেতে শাড়ি বটা।

হয় যদি তায় কানা ঘরে গুটিয়ে লব শেষে দিব আলগা খেই পুরে

এক নজরে দেখব সেটা।

শেষে রোয়া গেঁথে নাচলিতে জুড়

ফেলবে তানাটা।

প্রথমে বিশকরম বলে চালিয়ে মাকু

আঁকু বাঁকু করব না ভুলে তায়

ঝাঁপ তুলে ঘা দিব নাটা।

তবে ঝাপে জোপে বুনব কাপড় দিয়ে ও

সারির কাটা।

কালে বলে নালিচালাব।

ছিড়বে না খেঁই খাব সেই দেই

সাঁদ মেরে যাব

খুব দেখাব আমার গুন যেটা।

কাপড় বুনব কিসে নরাজ ঘিসে

রাখব না দশি কাটা।

ভাল কাপড় বুনতে জানি।

চিরুন কোটা শালের বোটা ঢাকাই

জমদানি তার টের কানি তা বুঝে

দেয় কেটা ॥

কুবির চরণ ভেবে বলে

এবার এ দফাতে নাই ঘোট ॥

নরসিংদীর আঞ্চলিক ছড়া

মনিপুরায় সুতা কিনি[৬]

চরসুবুদ্দি করি রং[৭]

হাইরমারায় কাপড় বুনাই

নসুন্দিতে বাছাই করি

বাবুর হাটে কাপড় বেচি

আর পথে পথে যাইতে দেহি ছেরির ঢং

(স্থানীয় কবিতা)

রায়পুরা এলাকার আঞ্চলিক ছড়া

লাল মিয়া বেপারি

বেচে লাল পাইরের শাড়ি

লাল মিয়া বেপারি

লাইতে (রাতে) ফিরে বাড়ি।

ঘরে আছে জোয়ান বেডি

তাও আবার বিয়ে করে আনে

আরেক জোয়ান ছেড়ি।

লালন সাঁইয়ের গান

আমার চরকা ভাঙা টেকো আড়ানে

আমি টিপে সোজা করব কত আর তো প্রাণে বাঁচিনে॥

একটি আঁটি আরকটি খসে

বেতো চরকা লয়ে যাব কোন দেশে আর কতকাল জ্বলবো এ হালে

এ বেতো চরকার গুণে॥

ছুতোর ব্যাটার গুণ পরিপাটি

ষোল কলে ঘুরায় টেকোনি

তার একটি কলে বিকল হলে

সারতে পারে কোনজনে॥

সামান্য কাঠ পাটের চরকা নয়

তার খসলে খুঁট খেটে আঁটা যায়

মানবদেহ চরকা সে তো

লালন কি তা র ভেদ জানে॥[৮]

লালন সাঁইয়ের পালক পিতা ছিলেন মলম তাঁতি

“সাঁই নাম বলরে আমার মন পাখি
ভবে কেউ কারো নয়রে দুঃখের দুঃখী”
(লালন সাইয়ের পালক পিতার মৃত্যুর পর
লালন ভক্তদের গাওয়া গান)[৯]

মহিন শাহ-এর গান

সজনী লো সজনী

এত রাইতে শুইনা যা লেঅ
চাকার গুনগুনি।
চাক্‌কুম চুক্‌কুম
তানায়ম তুনায়ুম
নাইল খান পচা ফেন
মাকুর বুনভুনি।
এত রাইতে শুইনা যা লো
চরকার গুনগুনি॥
বরিশাইল্যা চরকা আমার
চরকা আমার হিয়া-
চরকার দৌলতে আমার
সাত সাতখান বিয়া লো সজনী
এত রাইতে গুইনা যা লো
চরকার গুনগুনি॥
চরকা আমার ছেলে মেয়ে
চরকা নাতি পুতি
চরকার দৌলতে আমার
দরজার বান্ধা হাতি লো সজনী
এত রাইতে শুইনা যা লো
চরকার গুনগুনি॥[১০]

দানেজ বয়াতির গান

ক. ভরের পরে কাপড় তৈয়র
কইরল দীনবন্ধু কারিকর;

মণিপুর কামিনী মিলে
সেই কাপড় তৈয়র,
ওরে পাঁছ পাইড়েতে
দিচ্ছে জুইড়ে
প্রেম রসের মার লাগাইয়ে
তাঁত কলে দিচ্ছে জুইড়ে
ওরে নিশ্বাসে তার
নলী ঘুরে
ঠিক কর মুর্শিদ ধইরে,
ব্যানিকাশে নইল চালাইলে
ভাই, সে কাপড় নষ্ট হবে
সুইত্যা ছিড়ে।

খ. কাপড়ে খায় কাপড় ধইরে
দেইখে হইল্যাম চমেৎকার,
তাহের চান বলে ভাইরে,
অসুম্ভাব ব্যাপার।
কাপড়েরর বাব যে জাইন্যঅছে,
শিখ যাইয়ে তারির কাছে,
তারা করে ডবল ব্যাপার,
ওরে দান না চিন্যা
কাপড় বেইচলে
চালান সহ হবে উজার।
এবার দাগ চিনিয়ে
বেচ কাপড়, ভাই
টাকাতে এক আনা হবে ব্যাপার।
গ. আমার রঙ্গের কাপড়ে দাগ লইগ্যাছে
কষ্ট হয় আমার মনে,
দাগের কাপড় রাগের ছুটায়
ভিজাও সকালে
ও ভক্তি পাটে মার ডলা,

যাবেরে কাপড়ের ময়লা
ভিজাও নিয়া প্রেম রসে
অনুরাগের আড় বন্দিয়ে
শুকক্যাও কাপড় এক রোইদে।
অধীন দানেজ বলে, আমার মন,
সেই কাপড় পড় যাইয়ে
মরার আগে।

বেইন(একটি চাকমা গান)

সজপদর বেছে নাও,
রদংবাঁশে পুতে দাও,
সুতার তুমি দু'টি নাও
দুই নাল সুতায় টানা দাও।
লাগবে আরো লিব্লিব, বগলা,
রানী শেং আরে এক ব/ দলা।
টানা হলে খুলে নাও,
যদনী রশিদে টাঙ্গিয়ে দাও,
কোমরে বেঁধে তাচ্ছিতাম
বোনো লাগিয়ে এক তারাম।
বেনের ভেরায় দুলুক্ রাখ,
চুলের খোপায় কুদুক কাদাক
নাও পানি অল্প ধক্ক্যাতে
রাখ বেনের কার্নিটা পানিতে,
ক্ষণের ক্ষনে দিলে পানিটা
শক্ত হবে অকেক কাপড়টা।
ঢুকাও নলী থুরচুমাতে
নাও ফুলের বিয়ংটা ডান হাতে
এক জোড় ফেলে তিন জোড় তোল
বেগুন বীচির ফুলটা এবার তোল,
করঙা ক্যঅপ্যা নানা রকম অনেক ফুল
ফুলের বিয়ঙে দেখে দেখে সেগুলো তোল।

ফুলের রাজা চাবাং গাছ
করোনা কভু হা হুতাশ।
বোনতে শেখ আলামটা
ধন্য হবে তোর জীবনটা।
পিনন হাদী বোনবে আরো,
বলবে সবাই মেয়েটি ভালো।
বোনাটা যদি না শেখ মা,
শাশুড়ীর কাছে পাবেনা ক্ষমা।
টিটকারীতে জ্বলবে মন
অশান্তিতে থাকবে সারাক্ষণ।
করি আশা-জানবে তুমি বোনাটা,
আর্শীবাদ করি মা সুখী হোক জীবনটা,
আর্শীবাদ করি মা সুখী হোক জীবনটা।

-চিরঞ্জীব চাকমা

অন্যান্য লোকগান

ক. ওলো সুজনী

এ্যাত রাইতে কিসের কর তোরা
চক্ড়ার গুনগুনি
কোন খোয়ারী বলছেরে মোর
চকড়ায় নাইরে হোঁড়া
(ওরে) হ্যেইনা চকড়ার দৌলতে আমার
দরজার বান্দা গোড়া
ও নাগরালী কুমকুম-সাগরালী কুমকুম
আক্কুম বাক্কুম আড়া দেই আর গড়া দেই
ওক্কায় টানে নৈচায় কুড়কুড়ি
দুই জালের বলছে লো সুজনী
এ্যাত রাইতে কিসের কর তোরা
চক্ড়ার গুনগুনি॥
কোন কোয়ারী বলছে রে মোর
চক্ড়ার নাইরে পাতি
(ওর) হ্যেইয়ানা চকড়ার দৌলতে আমার
দরজায় বান্দা আতী

ও নাগরালী কুমকুম-সাগরীলী কুমকুম
ওলো সুজনী
এ্যাত রাইতে কিসের কর তোরা
চক্‌ড়ার গুনগুনি॥
(পটুয়াখালী অঞ্চলে প্রচলিত লোকগান)[১১]

খ. নাচনি কাঠি চানচ করে
মাকুয় করে চলাচল
গেদিটা বইচা গলে
আইল রে কারেন্টের কল।[১২]
(সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত গান।)

গ. দোগাছিল শাড়ি ভাই ভাই
তার ওপরে শাড়ি নাই
স্বামী তোমার ধরি পায়
কিন্যা দেও আমায়
(গোপে দাসের গান, পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত গান।)[১৩]

ঘ. দোগাছির শাড়ি ভাই ভাই
তার ওপরে শাড়ি নাই
স্বামী তোমার ধরি পায়
কিন্যা দেও আমায়।
(গোপে দাসের গান, পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত গান)[১৪]

ঘ. আগে না কইছিলাম নাতিন
যাইস না জোলা পাড়া
কাইল দেখছি তোর কাপড় ছিরা
কাপড় দিল কেরা লো॥
ওলা নাতিন কালা জামাই রসের ভিমরা॥
(ছবকি গান, গায়ক রহিজ মাতাব্বর, গ্রাম: দাঁতপাড়া, ঢাকঘর: সেওয়াইল জেলা: টাঙ্গাইল)[১৫]

ঙ. উত্তর থিকো আইলো রে নওশা
জামে এক বাজিয়া
জামে এক বাজিয়া।
বিবির জন্য আনছে শাড়ি
হ্যারে নিত্তির ওজন দিয়া গো
হ্যারে নিত্তির ওজন দিয়া গো।
(অংশবিশেষ)

(বিয়ের গান, গায়ক : মর্জিনার মা)[১৬]

চ. আজ থুবড়ীর কাঁচন কোচন
কাল থুবড়ীর বিয়ে
থুবড়ীরে নিয়ে যাবে
ঢাকাই শাড়ী দিয়ে।

(পাল্কির গান)[১৭]

ছ. ভাদর মাসে কাঠিলাম সুতা
আশ্বিন মাসের পয়লাতে
বাড়ির কাছে তাঁতীরা ভাইরে
মাড়ি খান বুইনে দে।
সেই কথা শুনিয়অ রে তাঁতী
মনে মনে হাসতাছে
কিবা রংয়ের বুনাবো শাড়ি
ছবিখান দেখায়া দে॥
বুইনে দিলেম সেই শাড়ী খান
মন আনন্দে পড়িয়া
হেলিয়া দুলিয়া পথে চলিও
আঁচল ছাড়াইয়া॥
সেই শাড়িখান পড়ে গেলাম
শরৎ গঞ্জের হাটে
শরৎ গঞ্জের কদম ব্যাপারী
আঁচল ধরেছো॥
ধরেছি ধরেছি শাড়ীর আঁচল
তাতে তোমার লজ্জা কি?
কদম ব্যাপারী নবরে তোমায়
যৌবন ব্যাপারী॥
শ্বশুর হইল গেরামের পরামানিক ভাসুর হলে পেসিডেন্ট
সেই সমন্ধে আইছি হাটে
আঁচল ছাইরে দে॥

(পাবনা-সিরাজগঞ্জ অঞ্চেলে প্রচলিত লোকগান)[১৮]

জ. এক খ্যাও সুতে কাটিব
দামাসের গামছা বুনেবো
ও কি যায়রে দামাদ
আতাই কুলের হাটে কিনারে।
মায়ের আনবো লাল পাড়ে শাড়ি
বোনের আনবো কালা পাড়ে শাড়ি
আমার ছলির আনবো

আগুন কাষ্ঠে শাড়ি কিনারে॥
মায় ফিঁদে ঘরে যায়
বোন ফিঁদে শ্বশুর বাড়ি যায়
আমার ছবিলা ফিঁদে
সামনে সামনে ঘোরে কিনারে॥
এখ খান টাকা বাঙ্গাবো
দামাদের হাতে সপিবো
ওকি যায়রে দামাদ
শরৎ গঞ্জের হাটে কিনারে॥
মায়ের আনবো শষ্যার তেল
বোনের আনবো নারকেলের তেল
আমার ছবিলার আনবো
জবা কুসুমের তেল কিনারে॥
পাঁচ খান টকা ভাঙ্গাবো
দামাদের হাতে সপিবো
ও কি যায়রে দামাদ
নগরবাড়ীর হাটে কিনারে॥
মায়ের আনবো পান সুপারি
বোনে আনবো কাঁচের চুড়ি
আমার ছবিলার আনবো
গজমতির হার কিনারে॥
দশ খান টাকা ভাঙ্গবো
দামাদের হাসে সপিবো
ওকি যায়রে দামাদ
পাবনার শহরে কিনারে॥
মাকে বাড়িত রাখিবো
বোনকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবো
আমার ছবিলাক লিয়া
সিনেমা দেখপের যাবো কিনারে॥

(পাবনা-সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত লোকগান)[১৯]

লোকগানে শাড়ির বর্ণনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকগানে বিভিন্ন শাড়ির বিস্তারিত বিররণ রয়েছে। এসব বিবরণ থেকে আমরা সেকালে শাড়ির নকশার বৈচিত্র্য ও রকমারি রূপ সম্পর্কে জানতে পারি। সেসব নকশা সব কি তাঁতেই বোনরা হতো, নাকি বয়নের পর ছাপাই মাধ্যমে বা সূচিশিল্পির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো-সেই মীমাংসার পৌঁছানো অবশ্য মুশকিল। নিচে আরও কয়েকটি লোকগানের উদ্ধৃতি দেয়া হলো, যেখানে শাড়ির বিস্তারিত বিবরণ আছে।

গোপীচন্দ্রের গান

ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীতের অন্যম গোপীচন্দ্রের গানে লক্ষীবিলাস শাড়ির নকশার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা সম্ভবত একাদশ শতক থেকে চলে আসা এক ধারাবাহিক লোকচর্যার কাহিনী। শাড়ির নকশা কিংবা ডিজাইনের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের ইতিহাসের বিরল। গোপীচন্দ্রের গান থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেয়া গেল।[২০]

লক্ইখবিলাস সাড়ির কথা কহনে না জায়।
দিঘর কৈল্লে সেই কাপড় মথুরাগঞ্জ নুকায়।
গোটা কৈল্লে সেই কাপড় মুটুতে যায়।
লখবিলাসি সাড়ির দাসর নাহি খেও।
দাসর ভিতর নেখিয়া দিছে ত্রিশ কোটি দ্যাও।
হাস ন্যাখচে বাহনা ন্যাখছে গহুরবানে হরি।
কাগের সরস্বতী ন্যাখচে কুবিরের ভাডারি
দরিয়ার জাত মাছ মগ্র দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া।
প্রথিবীর যত পকইখ দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া।
চ্যাঙ্গ চেঙ্গটি, খলসা পুটি আর ডারিকা রাখ॥
পাবা ইলসা রামট্যাঙ্গনা মৌকা ঝাঁকে ঝাঁক।
এইসব মাছ দিছে কাপড়াএ নেখিয়া।
কত সব পাখি দিছে কাপড়াএ তুলিয়া ॥
রাজহঙস বালিহংস সারালি চকোআ।
লাউজালি কদমা পাখি নেখিছে সারা কাপড় দিয়া ॥ ...
রাম ন্যাখছে পউআ ন্যাখছোর ন্যাখছে ঘট।
দলেরউপর কোরা পাখি করছে ডাবাডু
কত সব পকইখ ন্যাখছ পক্খ বুলাবুল।

ঝাড়ের তোতা একটা ন্যাখছে হাজার টাকা মুল॥

এই কাপড় নিরে রনি পরিধান করয়া।

জাইছে এখন রদুনা রানি পরিকখার নাগিয়া॥

সোনাই বিবিরি পালার কিছু অংশ[২১]

আনিল সুবর্ণের ঝাঁপুনী ভাইরে
খুলিল তারই ঢাকুনী
দশ নুখে বাইছ্যা লইর আরও
ভালা শাড়ি খানি রে।
পরথমে পাইড়াইল শাড়ি ভাইরে
শাড়ির নামে গঙ্গার জল
নুখেতে নইরে শাড়ি
আরও করে টলমল রে।
পানিতে থইলে শাড়ি ভাইরে
পিপড়ায় টাইন্যা লইয়া যায় রে।
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ির বানে চায়
মন পছন্দ হয়না শাড়ি
শাড়ি দাসীর পইড়ায় রে।
তারপরে পইড়াইল শাড়ি ভাইরে
শাড়ির নামে গুয়ার ফুল
ছয়মাসে বুনছিন গো মাড়ি
বিশ রকম ঠাকুর রে।
পানিতেই থইলে গো শাড়ি
শাড়ি পানিতেই মিলায়
মুইষ্টেতে লইলে গো শাড়ি
শাড়ি মুইষ্টেতেই মিলায়রে।
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ির বানে চায়
মন্দ পছন্দ হয় না শাড়ি
শাড়ি খসাইয়অ ফলায়রে।
তার পরে পইড়াইল শাড়ি ভাইরে
শাড়ির নামে উনী
চইদ্দ রাজার ধন গো লাগছে
সেই শাড়ির গাঁথুনীরে।
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া কইন্যায়

শাড়ির বানে চায়
মন পছন্দ হয়না শাড়ি
শাড়ি দাসীরে পইড়ায় রে।
তার পরে পইড়াইল শাড়ি ভাইরে।
শাড়ির নামে হিয়া
চইদ্দ রাণীর হইছিল গো বিয়া
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া রে।
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া কইন্যায়
শাড়ির বানে চায়
মন পছন্দ হয়না শাড়ি
শাড়ি দাসীরে পইড়ায় রে।
তার পরে পইড়াইল শাড়ি ভাইরে
শাড়ির নামে ধ্যুতি
সেই শাড়ির কিনারে লেখছে
লেখছে পক্ষী নানা জাতি রে।
"কাঁচি চুরা", "জং-বাদুরা" ভাইরে
হাঁসের নাইরে তলা
করুয়া পক্ষী লেইখ্যা থইছে
যার বা বড় গলারে।
"কুঁড়া পক্ষী" লেইখ্যা থইছে ভাইরে
টুপ টুপ করে,
"পানি খাওরী" লেইখ্যা থইছে
বুড় দিয়অ আধার ধরেরে।
"কাঠ কুড়াল্যিঅ" লেইখ্যা থইছে ভাইরে
গাছে ঠুকর মারে,
"মাইচ্যারংঙ্গ" লেইখ্যা তইছে
চুঁক দিয়া আধার ধরেরে।
"পেঁচায়" বুলে পেগুনী ওরে
সুন্দর বলে কারে?
যার মুখটা বেশি ঘুরে
তারেই সুন্দর বলে রে।
সেই খতা দরীয়া বাজরে
যখন কর্ণেতেই মুনিল পেঁচার মাথাকয় থাপা দিয়া
কেবল আছরাইতে লগিল রে।
পেঁছার মাথায় থাপা দিয়া
কেবল আছরাইতে লগিল রে।
পেঁচনী কয় খুড়াইলারে পেঁচা

যাগারে তুই মরিয়া
তুই পেঁচা মইরা গেলে
বাজের ঘরে আমার হইত বিয়ারে।
"আইট্যঅ বগা" "গাইট্যা" রে বগা
বেশি পানিত চড়ে
টানে থাইক্যঅ "কানি বগা"
গাল ফুলাইয়া মরে।
সেই শাড়ি পিন্দিয়া কইন্যা
শাড়ির বানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ি
শাড়ি বানে চায়
মন পছন্দ হয় না শাড়ি
শাড়ি খলাইয়া ফালারে রে।
তার পরে পইড়াইল শাড়ি ভাইরে
মাড়ির নাম বেনারসী
সেই শাড়ি পিন্ধিয়া কইন্যার
মন হইল খুশী রে।......[২২]

পল্লীগীতি

"সোনামতি মায় আমার
পিনতো তাঁতের শাড়ী
শাড়ী পিন্দা মা'য়
যাইতো বাপের বাড়ি।
আজকে মায়, খালি পায়
শহরে বেড়ায়
বড় বড় দালান দেইখ্যা মায়
আড়ালে লুকায়"
(নরসিংদী চর এলাকায় রায়পুরার নদী ভাঙ্গনে ভিটেমাটি হারিয়ে আসা নারীকে নিয়ে পল্লীগীতি গান)[২৩]

খ. প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা

বাংলা প্রবাদ-প্রবচন, বিভিন্ন ধরনের ছড়া এবং ধাঁধার ভেতেরেও তাঁতশিল্প বা তাঁতসংক্রান্ত নানা উপাদনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এসব প্রবাদ- প্রবচন বা ছড়া বা ধাঁধার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁতশিল্পের সাথে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড়। তাছাড়া। এগুলো তাঁতিদের সমাজজীবন, তাদের শ্রেণীগত অবস্থান, অন্য পেশাজীবীদের তাঁতিদের সম্পর্কে মনোভাব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু নির্বাচিত প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া ও ধাঁধা উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য, এসব প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া বা ধাঁধা-এগুলো যথাযথ অর্থ কী, তা নিয়ে পন্ডিতমহলে কিছু

মতভেদ আছে। আবার এগুলোর সবগুলো যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তা নয়। গবেষক যতগুলোর সম্ভব অর্থ বা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পাঠান্তর থাকলে তা ও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু আঞ্চলিক শব্দের অর্থও দেয়া হল। তবে সবগুলোর ব্যাখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য, কোনো কোনোটার ব্যাখ্যার প্রয়োজনও নেই-নিজেই প্রকাশ।

০১. 'উলশে চিনে ঝুইল্যা খেঁতা
জোলায় চিনে তাঁত
তারা চিনবো কি ভদ্রলোকের জাত॥[২৪]

এই প্রবাদের ভেতর দিয়ে জোলাদের সম্পর্কে নিচু ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। এটাকে শ্রেণীগত বিদ্বেষ প্রকাশ হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

০২. জোলার বুদ্দি তোলা তোলা।[২৫]

জোলারা সাধারণত বোকা বলে পরিচিত। তবে এখানে বুদ্ধিমান হিসেবে জোলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ব্যাঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হতে পারে।

০৩. জোলা বোঝে এক তোলা।
(এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে জোলারা বলে)
'আমরা ষোল আনা বুঝি।[২৬]

০৪. 'উত্তরে স্বপন দক্ষিণে ধনবান।[২৭]

এর অর্থ, তাঁতিরা কাপড় বুনতে বুনতে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সেটা সহসা ঘটে না। অন্যদিকে মালিক ঠিকই দিন দিন আরো অর্থশালী হয়ে ওঠে।

চলনেতে নারী চিনি বেনার মিলন
সুতায় কাটুনী চিনি পদেতে কুলীন

০৫. 'জোলা জেল্লেলা
আব্রু দেনেওয়ালা॥[২৮]

০৬ 'জোলারা ভুতিরও নিচে।'[২৯]

সমাজে জোলাদের কতটা তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করা হয়, এটা তার প্রকাশ।

০৭. 'তাঁত আগলাতে বঠেনী কামাই।'[৩০]

০৮. 'তাঁত সয়, তবু বাত সয় না।'[৩১]

০৯. 'তাঁতকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।[৩২]

১০. 'তাঁতী, গোঁসাই, পচাভুর, তিন নিয়ে শান্তিপুর।'[৩৩]

১১. 'তাঁতী তাঁত গড়েতে খাবি খায়।'[৩৪]

বাংলাদেশের তাঁতিদের একটা বড় অংশ গর্ত তাঁতে কাজ করে। তারা সারা দিন গর্ত তাঁতে কাজ করে। তাঁতগড় বলতে এখানে গর্ত তাঁত বোঝানো হয়েছে।

১২. 'তাঁতী তাঁত বুনতেই মন, তাঁত বুনতেই মন, তাঁতী কৃষ্ণকথা শোন।'[৩৫]

তাঁতিদের ভেতর বৈষ্ণবদের সংখ্যা সুপ্রচুর। তারা সাধারণত শান্ত ও ধীরস্থির স্বভাবের এবং কৃষ্ণভক্ত হয়ে থাকে। এই প্রবাদের ভেতর দিয়ে সে কথাই প্রকাশিত হয়েছে।

১৩. 'তাঁতিনীর চাওড় নেই, বেঠনীর চাওড়।'[৩৬]

(চাওড়=চাড়, গরজ। বঠেনী=যে কার্পাসের সুতা কেটে তাঁতিকে দিয়ে কাপড় বুনে নেয়, তাকে বঠেনী বলে; সুতারাং তার গরজই বেশি।)

এর একটা পাঠান্তর আছে,

'তাঁতীর চাড়, না, বঠেনীর চাড়' (লঙ এর পাঠ)।[৩৭]

১৪. 'তাঁতীর চুরি নলি-নলি, খোদার চুরি থান।'

(নলি=কাপড় বোনার সুতার নল)[৩৮]

১৫. 'তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে, আপন ক্ষতি আপনি করে।'

১৬. 'কায়েত মরে সেয়অনে, বেনে মরে দেয়ানে,
জোলা মরে তাঁতে
কাঙালী বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে।'

(সেয়ানে+খেয়ালে। দেয়ানে+দরবারে, আদালতে)[৩৯]

১৭. 'রাজা যেমন গবচন্দ্র, পাত্র তার তেমনি।
তাঁত-গাড়েতে পড়ে ঘোড়া, ঘাড় কাত্‌ তাই অমনি॥'

(তঁত-গাড়েতে+নিচে পা ঝুলিয়ে বসবার জন্য গাড় বা গর্ত।)[৪০]

১৮. 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে।
কাল করল তাঁততী এঁড়ে বাছুর কিনে॥'[৪১]

তাঁতিদের কাজ হলো সুতা নিয়ে। সেটা খুবই স্পর্শকাতর। তাঁতি পরিবারের সুতা টানা দেয়া, বও করা, সানা করা কিংবা, নরদে তোলা ইত্যাদি কাজ সাধারণত বাড়িতেই করা হয়। সেখানে বাছুরের উপস্থিতি বিপত্তিকর ও বিপজ্জনক। কেননা, এঁড়ে বাছুরের স্বভাবই হলো অকারণে লাফালাফি করা এবং নানা রকম বিপত্তি তৈরি করা। কৃষকের বাড়িতে এঁড়ে বাছুর মানায় কিন্তু তাঁতিবাড়িতে এঁড়ে বাছুর মানায় ক্লিতু তাঁতিবাড়িতে এঁড়ে বাছুরের উপস্থিতি হলো নানা রকম ক্ষতির কারণ। এখানে সে কথাই বলা হয়েছে।

১৯. "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।'[৪২]

২০. 'দিন গেল হেসে খেলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে।'[৪৩]

২১. উযু সম্পর্কে গুডুর নাতি, মাড় ভাত খেয়ে মরল তাঁতী।'

(উডু=উড়ো; গুডু=পাইক)

২২. 'চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকীর পোঁদে বাতি

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাঁতী।'[৪৪]

(তাঁতিরা সাধারণত অশিক্ষিত হয়। সে কারণে তুচ্ছার্তে ও ব্যাঙ্গার্তে এ কথা বলা হয়েছে।

২৩. 'ধীর ধীর বোনে, তাঁতী সকল জিনে।'[৪৫]

২৪. 'ষাড়ে ধান খায়, তাঁতী সকল জিনে।'[৪৬]

২৫. 'সতী মাগীর তাঁতী নাঙ্।[৪৭]

২৬. 'মেঘ করেছে আকাল কূল, ও তঁতীবউ চরকা তুল।'[৪৮]

২৭. 'রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না রা।

তাঁতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা॥[৪৯]

২৮. 'পরের টেকা পরের কড়ি

ফটক্যা জোলার ফরফরি।'

(টেকা=টাকা; ফরফরি=বেশি কথা বলে)

অন্যের টাকায় বাহাদুরি করাকে মানুষ ভালো মনে করে না।[৫০]

২৯. 'জুত পাইলে জোলায় বোনয়।'

মূল অর্থ : সুযোগ হাতে এল সে সেটা কাজে লাগায়। সাধারণ অর্থ : সুযোগ পেলে তাঁতী বুনতে বসে।[৫১]

৩০. "আবর তাঁতী গোবর খায়, মাগের কথায় ডুবতে যায়।"[৫২]

৩১. 'যেমন কন্যা ভানুমতী

তেমন পাত্র জোলা তাঁতী।'[৫৩]

৩২. 'চলনেরতে নারী চিনি বেশর মিলন

সুতায় কাটুনী চিনি পদেতে কুলীন।'[৫৪]

৩৩. 'চরকা আমার সোয়ামী পুত

চরকা আমার নাতি

চরকার দৌলতে আমার

দুয়ারে বান্ধা হাতি॥'[৫৫]

এর আরেকটি সংস্করণে দেখা যায় বলা হচ্চে:

'চরকা আমার ভাতার পুত

চরকা আমার হিয়া

চরকার দৌলতে আমার
সাড়ে সাত বেটার বিয়া।'[৫৬]

৩৪. "আতে যোগী
গাতে পাউ
কুল্লে যোগী
হিয়লেও ছাও ॥"[৫৭]

৩৫. "বুঝলাম না তাঁতীর ভাইল
ঢেঁকি রাইক্যা
মারল নাইল॥"
(ভাইল-হাতে; রাইক্যা=ছালনা; নাইল=নলি)

অর্থাৎ এক তাঁতি ঘরের বারান্দায় কাপড় বুনছে আর উঠানে তাঁতি-গিন্নি কিছু ধান রোদে দিয়েছে। এ দিকে কতগুলো কাক আর চড়ুই বারবার ধার খেতে আসছে। এই দেখে তাঁতি বারন্দায় পাতা ঢেঁকি দেখিয়ে পাখির ঝাঁককে বলছে- "বার বার বিরক্ত করবি তো এই ঢেঁকি দিয়ে মারব।" পাখিরা ভাবল, তাঁতি আবার এত ওজন কাঠের ঢেঁকি তুলে আমাদের কীভাবে মারবে? এই বলে সব কাক-চড়ুই মিলে মেলে দেয়া ধান খেতে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি তার হাতের কাপড় বোনার নলি দিয়ে ঢিল মেরে একটা পাখি মেরে ফেলল। তাই দেখে অন্য পাখিরা সব উড়ে গেল আর উল্লিখিত প্রবাদটি বলল।
এই ছড়াটির আরেকটি সংস্করন আছে। যদিও গল্পের মূল অর্থ একই । সেটা এরকম:

'বুঝলাম না জোলার ঝোল
মারবি খাইটে মাইরলো টুল।[৫৮]

৩৬. জোলা জোলা করিস না
জোলার কী গুণক
আমি জোলা কাম করি
কই তোর বুন।

৩৭. বান আইলো বর্ষা আইলো
ভাইসা আইলো হোলা
হোলার ভেতর পানি যাইয়ে
মারলো শালার জোলা।[৫৯]

৩৮. প্রশ্ন : 'তাঁত্যেতে কুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাড়ে
কিসে শুদ্ধ হলো বক্ত্যা মাড় কর‍্যা কান্ধে॥'

উত্তর : 'পার্বতী কাটিল সুতা বিশ্বর্কঅর নির্মাণ।
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজ্যা করি নিরঞ্জন॥

৩৯. 'ঘর আছে হেতা দুয়ার নাই
দুয়ার খুললে দেশে নাইৎ
বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা। এখানে তসরগুটির কথা বলা হচ্ছে, যা চাষ করা হয় রেশমি সুতার জন্য।

৪০. 'এক হাক গাছটা, পাতা ধরে পাঁচটা,
যদি পাতা লাল হয়, দশ টাকা দাম হয়।'

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ধাঁধা। এখানে তরসগটির চাষ হয় যে গাছে, সেই গাছটির বর্ণনা করা হয়েছে। গাছটি লম্বায় এক হাত, কিন্তু এর পাঁচটা পাতা। যখন পাতা লাল হয়ে যায়, তখন এর দাম দশ টাকা হয় অর্থাৎ চাষের পরে যে রেশন সুতা দাম হয়, সে কথাটিই বলা হয়েছে।[৬০]

৪১. 'ভন্ ভন্ করছি ভোমরা নাই,
পৈতা আছে, বামুন নই।'
পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা। এখানে চরকার কথা বলা হচ্ছে। চরকায় সুতা কাটার সময় যে শব্দ হয়, সেটআকেই সুন্দভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই ধাঁধার মাধ্যমে।[৬১]

৪২. 'আসা লং লং
ফাসা লং লং
হাবে আইয়ে
ফাবে গাইয়ে
হাপে থপ থপ
ফপে থপ থপ।'[৬২]

৪৩. 'চকর চকর ঝন ঝন
ঘাম ঝড়ে শন শন
কর্তায় করে ঘ্যান ঘ্যান।'

এর অর্থ : মাকু আর হুইলের শব্দ হয় ঝনঝন করে। তাঁতে কাজ করতে করতে কারিগরদের শন শন করে ঘাম ঝরে। এত কষ্ট করার পরেও কর্তা অর্থাৎ মালিক বলে, আরো কাজ কর, কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না ইত্যাদি।[৬৩]

নাচনি কাঠি নাচন করে
মাকুয় করে চলাচল
গেদিটা বাইচা গেল
আইলরে কারেন্টের কল

(পাবনা সিরাজগঞ্জ আদলে প্রচলিত গান)

৪৪. 'মুখে মধ্যে বড় হা
প্যাটের মধ্যে বড় ছা
টান দিলে আটআশ
গামছা পড়ে পট্টাশ।'[৬৪]

৪৫. 'আমিন গলে কলিকাতা
আনলো এক মস্ত সুতা
সুতার নাম কালিহাতা
গামছা হয় তিন হাতা।'[৬৫]

৪৬. 'খগের বেটা বকশি
শাড়ি বানায় নকশী
কাপড় হয় টক টকা
আমার বউ ফক্ ফকা।'[৬৬]

৪৭. 'তাঁতীর বাড়ী ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা,
খায় দায় গান গায়-তাইরে নাইরে না।
সুবুদ্ধী তাঁতীর ছেলে কুবুদ্ধি ঘনাল,
আঁকড়া বাড়ী নিয়ে তাঁতী ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা,
লিখন পাঠায়ে দিন পরগণা পরগণা।
আজিডাঙ্গা মধ্যে ধনেখালি,
সেখানে থেকে এল ব্যাঙ চৌদ্দ হাজার ঢালী!
হুগলীর শহরে ভাই, ব্যাঙের অভাব নাই,
সখান থেকে এল ব্যাঙ-সনাতন সিপাই।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতী যায় মণির হাটে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ আগুলিল পথে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতী উঠল গিয়ে জলে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ থাপ্পড় দিল গালে।
সুতানাতা নিয়ে তাঁতী নাবলো গিয়ে ভূঁয়ে,
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ মারলো দিন মুয়ে!

ব্যাংঙের লাথি খেয়ে খেয়ে তাঁতী যায় গড়াগড়ি,
চৌদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের উপর চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতী করে হাই-ফাই,
না মার, না মার মোর তাঁতীরে গোঁসাই।'

এই চড়াটিকে কেউ কেউ শ্রেণিসংগ্রামের প্রতীকী অর্থে করেছে। তাদের ভাষ্যানুষারে, এখানে তাঁতি হলো শোষক এবং ব্যাংক হলো শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। তবে সাধারণ অর্থেও এই ছড়াটি বাংলাদেশে শিশুমহলে বেশ জনপ্রিয়।[৬৭]

গ. লোকগল্প, কাহিনী, হাস্যরস এবং কিংবদন্তি

বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন লোকগাথা ও লোকগল্পের ভেতরও আমরা তাঁত ও তাঁতি সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা রকম উপাদান পেয়ে থাকি। এসব গল্প বা গাথায় কখনো তাঁতি সম্প্রদায়কে অত্যন্ত বোকা, কখনো বা অতি চালাক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জোলাদের নিয়েই সবচেয়ে বেশি গল্প প্রচরিত আছে। নিচে এ রকম কিছু লোকগল্প ও কাহিনী উপস্থাপন করা হলো:

১. টেবরানী না লেপাটানী না টানুনী[৬৮]

এক জোলা বাজরে গিয়া ঘোড়ার ডিম খুঁজিতেছে দেখিয়া এক ফলওয়ালা তাহাকে একটি বাঙি দিয়া বলিল, এইটই ঘোড়ার ডিম। জোলা খুব খুশি হইয়া দশ টাকা দিয়া উহা কিনিল ও সন্ধ্যার আগে আগে বাড়ির দিকে রওয়ানা হইল।

কিছুদূর আসিয়া বাঙিটাকে পথের ধারে রাখিয়া ক্ষেতের আইলে প্রস্রাব করিতে বসিল। জঙ্গল হইতে এক শিয়াল আসিয়া বাঙি দেখিয়া ভাবিল, বোধহয় শিয়ালের কোনো খাদ্য হইবে। নিকটে আসিয়া শিয়াল তাহা শুকিল।এমন সময় জোলা ফিরিয়া আসিল। শিয়াল একটি মানুষকে আসিতে দেখিয়া দৌড়াইয়া পালাচ্ছিল। জোলা ভাবিল, তাহার ডিম ফুটিয়া ঘোড়ার বাচ্চা বুঝি পালাইয়অ যাইতেছে। শিয়ালের পিছনে পিছনে সে জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল।

তখন রাত্র হইয়াছে। এক বাঘ বাহির হইয়াছে। জোলা বাঘকে দেখিয়া বড় খুশি হইল- ভাবিল চোখের পলকে তাহার ঘোড়ার বাচ্চা বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঘ সামনের আসিতেই জোলা লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল ও কোমর হইতে গামছা খুলিয়া বাঘের গলায় লাগামের মত করিয়া কষিয়া বাঁধিল। বাঘ প্রাণ ভয়ে বেদম ছুটিতে লাগিল। জোলা ভাবিল, ঘোড়ার বাচ্চাকে এখনই 'শোয়ার দোয়া' শিখাইয়া ফেলিতে হইবে। সে বাঘাকে সামনে হাত মুঠ কডিরয়া টেবরাইতে ও ঘুষি দিতে লাগিল। এইভাবে সারা রাত কাটিয়া গেল।

ক্রমে ভোর হইল। জোলা চাইয়া দেখে, বাপরে বাপ! সে যে সারারাত এক বাঘের পিঠে সোয়র হইয়াছিল! হঠাৎ সে দেখিল যে, এক গাছের তলা দিয়া সে যাইতেছে হাত বাড়াইয়া সে তক্ষুণি ডালে ঝুলিয়া পড়িল। বাঘ এক জায়গায় আসিয়া হাঁপাইতে লগিল। এমন সময় এক শিয়াল আসিয়া উপস্থিত। শিয়াল বাঘকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজা মশাই, আপনি এখানে বসিয়া হাঁপাইতেন কেন? বাঘ বলিল, "আর বলিও না পন্ডিত! আমাকে রাত্রে টেবরানীতে পাইয়াছিল, সারা রাত সে টেবরাইখয়াছে" শিয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "সে এখন কোথায়?' বাঘ গাছটিকে ইশারায় দেখাইয়া বলিল, "বাপরে, আমি আর যাইতে সাহস করি না, ইচ্ছা হইলে তুমি গিয়া দেখিয়া আস।"

শিয়াল গাছের নিচে আসিতেই জোলা তাহার গায়ের কাঁথাসহ শিয়ালের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল ও খুব করিয়া তাহাকে রগড়াইডল। কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়অ শিয়াল সেখানে হইত পালাইয়া বাঘের নিকট আসিল।

বাঘ জিজ্ঞাসা করিল, "পন্ডিত কেমন দেখিলে?"

শিয়াল বলিল, "রাজামশাই, টেবরানী কোথায়, এ যে লেপটানী।' বাঘ কিন্তু শিয়ালের কথা বিশ্বাস করতে রাজি নয়, কারণ, সারারাত সে তাহার টেবরানী খাইয়াছে। শিয়ালের অভিজ্ঞতা সত্য, সেও নিজের অভিজ্ঞতাকে মিথ্য বলিতে পারে না।

এভাবে রাজা ও শিয়াল পন্ডিতের মধ্যে তর্ক হইতেছিল, তখন এক বানর আসিয়া উপস্থিত, কথা শুনিয়া সে নিজেই বিষয়টি পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল।

জোলা তখন ডাল হইতে গাছের কোটারে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বানর আসিয়া আগে উঠিয়া লাফাইতে লাগিল। এই ডাল হইতে আরেক ডালে যায়, আরেক ডাল হইতে আরেক ডালে যায়।

জোলা দেখিল বানরকে কায়দায় পাওয়া গিয়াছে। কোটর হইতে সে বানরের লেজ ধরিয়া টান দিল। বানর তখন প্রাণের ভয়ে পালাইতে চাইল, কিন্তু জোলা তাহাকে ছাড়ে না। বানরও জোলায় অনেক্ষণ টানাটানি পর বানর কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়া পালাইল।

এইবার সে বাঘ ও শিয়ালের কছে আসিয়া বলিল, তাহার দুইজনই ভুল বলিতেছে, জীবটি 'টেবরানীও' নয়, ' লেপটানীও' নয়, সে টানুনী।

২. জোলার বাপের ফতেহার হাঙ্গামার গল্প[৬৯]

একদেশে ছিলো এক জোলা। মৃত্যুর সময় জোলার বাপ জোলাকে ডাকিয় বলিল, "বাপুরে, আমার মরণের পর সবাইকে দাওয়াত করিয়অ আনিয়া খুব বড় করিয়া একটি হাঙ্গামা করিস।"

মৃত্যুর পর বাপের ফাতেহা উপলক্ষে জোলা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলকে দাওয়াত করিল। ক্তি বাপের মেষ অসিয়ত স্মরন করিয়া 'হাঙ্গামার' জন্য বড় চিন্তিত হইল। বাজারে গিয়া প্রত্যের ঘরে ঘরে সে হাঙ্গামার খোঁজ করিল। কিন্তু কেহই তাহাকে 'হাঙ্গামা' সওদাটি দিতে পারিল না।

শেষ পর্যন্ত এক "খইকরের" সঙ্গে তার দেখা হইল, সে বলিল, তাহার বাড়িতে একটি 'হাঙ্গামা' আছে। তবে ইহার মূল্যস্বরূপ দশ টাকা তাহাকে দিতে হইবে। জোলা খুশি হইয়া খঁইকরের কথায় রাজি হইল। খঁইকরের বাড়ি-তে এক মট্‌কার ভিতরে ভীমরুলের বাসা বাঁদিয়াছিল। সে মটকার মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া জেলেকে তাহা দিয়া বলিল, ফাতেহার দিন মেহমান জামাত্‌ সকলকে ডাকিয়া যে ঘরে বসান হইবে। মট্‌কা ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গে 'হাঙ্গামা' শুরু হইবে।

ফতেহার দিন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে উপস্থিত সকলে জানিতে চাহিল-আর কি বাকি আছে?

সকলে বুঝিল, মিস্টিটিষ্টি আরো হয়ত কিছু আছে। পূর্ব পরিকল্পনা মত দরজা-জানালাগুলি বাহির দিক হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে পর জোলা 'বিস্‌মিল্লা' বলিয়া মট্‌কায় সজোরে আঘাত করিল। তারপর যাহা হইবার তাহাই হইল!

ভীমরুলের কামড়ে সারা গ্রাম বৃদ্ধশূন্য হইল, জোয়ানরা কয়েক মাসের জন্য শয্যাশায়ী হইল।

লোকে বহুদিন পর্যন্ত বলাবলি করিল যে, এতদঞ্চলে এমন 'হাঙ্গামা' কেউ কোনো দিন দেখে নাই।

৩. জোলার প্রতিশোধ কথা[৭০]

একবার এক জোলার প্রতিবেশীর মা মরিয়াছে। প্রতিবেশী তাহার মায়ের লাশের গলায় দড়ি লাগলাইয়া জোলার উঠান দিয়া লইয়া চলিয়াছে শ্মশানঘাটের দিকে।

ইহা দেখিয়া জোলার বড় রাগ হইল। সে ভাবিল, প্রতিবেশী তহাকে অপমান করিয়াছে। নিজের মায়ের লাশ পরের উঠান দিয়া লইয়া গিয়া সে বড়ই বাহাদুরী করিয়াছে।

ঘরে আসিয়া চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহার প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

তাহার মাও বৃদ্ধা হইয়াছিল। সে মায়ের গলায় দড়ি লাগাইল ও তাহাকে প্রতিবেশীর উঠান দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। প্রতিবেশী জোলার প্রতিশোধের নমুনা দেখিয়া তো অবাক। কিন্তু জোলা কি থামিবার পাত্র? সে সোজা শ্মাশানে গিয়া মাকে পুড়িয়া আসিয়া বাড়িতে বসিল।

৪. শীতবুড়ি ও দরবেশের গল্প[৭১]

এক গ্রামে এক বুড়ি ছিল। একবার শীতকালে সে একটি পুকুরপাড়ে বসে ঠকঠকিয়ে কাঁপছিল সকাল বেলা। সেই পুকুররে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক দরবেশ। তিনি বুড়ির অবস্থা দেখে তার কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী হয়েছে বুড়ি মা। বুড়ি বলে, আমার প্রচন্ড শীত করছে। আমাকে একটা কিছু দাও যাতে আমি শীত থেকে রক্ষা পাই। দরবেশ তখন মন্ত্রবলে পুকুরের তীরে একটি ঘর বানালেন। বুড়িকে বললেন, যাও ঘরের ভেতর। বুড়ি ঘরের ভেতর গেল। কিন্তু কোথাও কোনো কাপড়

দেখতে পেল না। কাপড়ের পরিবর্তে সে ঘরের ভেতর সারি সারি যন্ত্রপাতি দেখতে পেল। বেরিয়ে এসে বুড়ি দরবেশকে বলল, কাপড় তো নাই। দরবেশ বললেন, আবার যাও। বুড়ি আবার ভিতরে গেল। এবারও বুড়ি কোনো কাপড় দেখতে পেল না। কিন্তু দেখল যে, যন্ত্রপাতিগুলি চলতে শুরু করেছে আপনা থেকেই। বুড়ি আবার বেরিয়ে এসে বলল, কাপড় পেলাম না। দরবেশ আবার বললেন, আবার যাও, এবার পাবে। বুড়ি আবার ঢুকল ঘরে। এবার সে দেখতে পেল প্রতিটি মেশিনের পাশে রাশি রাশি কাপড় পড়ে আছে। বুড়ি খুশি হল এবং কাপড়গুলো তুলে নিয়ে নিজে শীত নিবারণের জন্য কিছু কাপড় রেখে বাকি কাপড় গ্রামের মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিন। এই বুড়ির উসিলায় দরবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের তাঁতযন্ত্রের এবং তঁতশিল্পের উদ্ভব বলে পাবনা, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গল্প কিংবন্তী প্রচলিত আছে।

৫. জোলার মরণ কাহিনী[৭২]

কোনো এক গ্রামের বোকা লোক গাছের এক ডালে বসে সেই ডালই কাটছিল। এক লোক নীচ থেকে তা দেখে বলেঃ ঐ ছ্যামড়া, তুই তোরে সর্বনাইশা বুদ্ধ। যে ডাইলে বসছস সেই ডাইলই কাটাতাছিস। তোরতো মরণ আসেছে। লোকটি ডাল কাটা বাদ দিয়ে আছে থেকে নেমে পড়ে এবং নচির লোকটিকে বলে, ভাই, আমি যে মরুম তা তুমি কেমনে জানলা? লোকটি মনে মনে বলে এ দেখতাছি এক্কেবারে উল্লুক একটা। এবং একটু জোরেই বলে, জোলা নাকি? গাছের ডাল কাটা লোক বলে, ই ভাই, তুমি কেমনে বুঝলা?নীচের লোক বলে, আক্কল থাকলে বুঝন যায়।

এর পর ডাল কাটা বোকা লিকটি নীচের লোককে নাছোড়বান্দার মতো বলে, ভই, তুমি সবই জান। তুমি এবার বল আমি কবে মরব? বোকা-বুদ্ধ লোকের সঙ্গে রঙ্গ করার জন্য সে বলে, তোমার পিছন দিকের কাপড়ে যেদিন লাল সুতা দেখবা, সেইদিন বুঝবা তুমি শেষ।

দিন যায়। বোকা লোকটি তাঁতের কাজকর্ম করে। তার চিন্তা ওই লাল সুতা নিয়ে। হঠাৎ একদিন পিছনের দিকের লাল সুতা দিখে চিৎকার করে ওঠে, আমি তো মইরা গেছিগা, হায় হায়! পরে, মায়ের কাছে গিয়ে বলে, মা আমি মারা গেছি। আমারে কবর দেবার ব্যবস্থা কর। মা বলে, এসব কিছু না বাবা। তুমি মর নাই।

কার কথা কে শোনে! ছেলে বলে, আমি মইরা গেছি। জলদি কবর দাও। নাছোড়বান্দাকে নিবৃত্ত করতে না পেরে গ্রামের পাঁচজনে বুদ্ধি করে এক বড়সড় কবর খোদাই করে এবং কৌশলে কবরের ওপরে এক বড় ফাঁক রাখে যাতে সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়তে এবং গ্রহণ করতে পারে।

এক অন্ধ লোক ওই পথ দিয়ে যাবার সময় তার লাঠি কবরে ঢুকে যায়। বোকা লোকটি লাঠি ধরে টান মেরে লাঠি ভিতরে নিয়ে।

গভীর রাতে এক দল ডাকাত ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দেখে নতুন একটা অনেক বড় সাইজের কবর। তার ওপর দিকে ম্যানহোলের মতো একটা ফাঁক। সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটা লাঠি একবার

ওপরে উঠছে, এবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। ডাকাতরা লাঠি ওপরে ওঠার সময় ধরে ফেলে এবং জোর করে ওপরে টানে তোলে।

কবরের ভিতর থেকে তখন মানুষের গলার শব্দ এবং হৈচে শোনা যায়। ডাকাতরা তাকে কবর থেকে তুলে ফেলে এবং বৃত্তান্ত শোনে। সে আবার কবরে যেতে চায়। তখন ডাকাত সরদার বলে, না, সে নিয়ম নাই। তুমি মারা গেছো, কবরেরও ছিলা, এখন তোমার কাজ আমাদের সঙ্গে। তাই আমাদের সঙ্গে চল। ডাকাতরা ভাবেই বুদ্ধুকে দিয়ে কাজ সারতে পালে আর মাইরধইর করণ লাগব না। ভালোই হলো।

ডাকাতরা নির্ধারিত বাড়ির কাছে গিয়ে বলে, যা, বাড়ির ভিতরে যা। ওজনের ভারি জিনিস আনবি। কিছুক্ষণ পরে সে পাটা-পুতা নিয়ে ফিরে আসে। ডাকাত সরদার বলে, ব্যক্কল! বাজাইয়া দেইখা আনবি। টং টং করে আওয়াজ হলে আনবি।

অনেক খুঁজে পেতে মাচার ওপরে গিয়ে সে পায় জয়ঢাক। তাতে কয়েকটি বাড়ি দিতেই প্রচন্ড শব্দে বাড়ির সবাই জেগে ওঠে বোকা চোরকে ধরে ফেলে। ইতোমধ্যে ডাকাতরা পলাতক।

বাড়ির লোক ঘটনা কী জানতে চইলে আগাগোড়া বৃত্তান্ত সে খুলে বলে। বাড়ির মালিক ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি সিদ্ধান্ত দেন, এই বোকা মানুষটির জন্য আমরা আজ ধনে-প্রাণে মারা যাইনি, এবং লোকটি পরিস্থিতির শিকার। তাই তিনি বলেন, আমি খুশি হয়ে কিছু টাকা দেই। তুমি তোমার মার কাছে ফিরে যাও।

সে বাড়িতে ফিরে যায়। মাকে বলে, মা মানুষ মারা গেলে খরচ করে। আমার জন্যও ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে খরচ কর। অনেক লোককে দাওয়াত দাও। টাকার জন্য চিন্তা নাই, আমি টাকা দিমু। বড় করে খাওয়া-দাওয়া ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। মৌলবী সাহেব ধর্মমতে মৃত্যুর পর মানুষের কী হবে তার বিশদ বর্ণনা দনে। অনুষ্ঠান শেষে সবাই চলে গেলে বোকা লোকটি বলে, মা, মিলল না, মিলল না। তুমি শোন আমার কাছে। আমি দেইক্যা আইলঅম না! ঘটনা হইল এই রকম,

প্রথমে লাঠি দিয়া খোঁচা মারে। সব শক্তি দিয়া লাঠি ধইরা ভিতরে নিবার পারলে সেই বিপদ শেষ। তারপরে লাঠি ওপরে তুইলা দিলে তখন ৫/৭ জনে পয়লা লঠি ধইরা তোমারে ওপরেতুইল ফেলবো। তারপর ডাকাইতি করবার নিব। প্রথমে পার্ট-পুতা আনলে আবার পাঠাইব। এইবার ঢোল বাজাও। তখন তোমারে ধরব, কিন্তু দুইন্যার মতো পুলিশেও দিব না, মাইরধইরও করব না। অনেক টেকা দিয়া তোমারে বাড়িত পাঠাইয়া দিব।

৬.৩ জামদানি বয়নের শ্লোক ও দোয়া

জামদানি বয়নে একটি বিশেষ ধরনের শ্লোক প্রচালিত আছে। জামদানির কাজে নিয়োজিত শিক্ষানবিশ বা সাগরেদকে উস্তাদের কাছ থেকে এই শ্লোকটি শিখে নিতে হয়। সরেজমিন অনুসন্ধানকালে আমরা

রূপগঞ্জ-তারাব অঞ্চলে একাধিক জামদানি তাঁতির কাছে এই শ্লোকটি শুনি। কিন্তু সেসব শ্লোকের ভেতর ভিন্নতা আছে। এখানে সে রকম কিছু শ্লোক উপস্থাপনা করা হলো। উল্লেখ করা যেতে পারে, এগুলোর কোনো কোনোটি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ০১

"ঘরে বাইরে
ঘরে বাইরে
ঘরে পেঁছে
ঘরে কেও বাঁধে ঘরে
ঘরে কেও বাঁধে পেঁছে
ঘরে বাইরে হয়রে বাইরে॥"

শ্লোক ০২

"হইরে বাড়ে এক খেও
ঘাড়ে বাড়ে এক খেও
প্যাচে বাড়ে এক খেও
হইরে ছুঁড়ে দুই খেও
গাঙের খেও বাড়ে গাড়ে এক খেও
গাডাইল খেও বাডে গাডে দুই খেও।"

শ্লোক ০৩

"হইরে বাড়ে
ঘাড়ে বাড়ে
প্যাচে বাড়ে
ঘাডাল কেও বাদে ঘাড়ে
প্যাচে হৈরে
ঘাডাল খেও বাদে ঘাড়ে
গানের ঘোরা দিয়া হৈর
আগো দিয়া এক খেও বাড়ে
গানের গোড়াদা দুই খেও
ঘাড়ে আলাদা এক খেও
বাড়ে এক খেও প্যাচ হয়।"

শ্লোক ০৪

ফইরে বাড়ে

ফইরে ঘাডে

ঘাডাইলে খেও

ঘাডে বাড়ে

বান্ধে ঘাডে

প্যাচে ফৈর

প্যাচে বাড়ে

এ ছাড়া যেসব তাঁতি জামদানি বয়নের কাজ করে, তারা কাজ শুরু করার সময় একটি বিশেষ শ্লোক বা দোয়া পাঠ করে। সেটি এরকম:

> "বিশকার আলী ধলেশ্বরী
> উস্তাদের চরণ ধরি
> যেই কাম করি
> সেই কাম যেন শিক্ষা করি"

তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলে কাজ করে নতুন সাগরেদ।

আঞ্চলিক কবিতা (নিলক্ষা, রায়পুরা, নরসিংদী)

এইডা কার নাও

ঔই মাঝি কই যাও

এত জোরে কেন বাও

তোমারাও কি নিলক্ষা যাও

তয় একটা কথা হইন্যা যাও

হেই সাবরে কইও গিয়া

মাইয়ার বিয়া বাদর মাস

হারুন মিয়ার ঘরের শাড়ী কাপড় ছাড়া অইবো না বিয়া

এই আমার কথা খাস।[৭৩]

(নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা গ্রামের স্থানীয় তাঁত মহাজন হারুন মিয়ার কাপড় এর প্রতি নিম্নবিত্ত নারীদের প্রবল আগ্রহ ছিল)।

আশালতা দেবীর স্মৃতিচারণ 'সেকালের কথা' থেকে সংকলিত

...গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরে আমি সুশীলা সেন, গিরিবালা দেবী, সরমা গুপ্তা ও সরযু গুপ্তার সহায়তায় 'গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি' স্থাপন করি। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মেয়েদের ভেতর সক্রিয় দেশপ্রেম ও

গান্ধীজীর বাণী এবং কর্মপন্থা প্রচার করা। সমিতির সভ্যরা খদ্দরের বস্তা নিয়ে দূর-দূরান্তর যেতেন আর খদ্দর বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর বাণীও প্রচার করতেন।...

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল ভারত চরখা সখের' সভ্য নির্বাচিত হয়ে আমি খাদি প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ভাবি গান্ধীপন্থী আন্দোলনের জন্য মহিলা কর্মী তৈরি করার জন্য 'কল্যাণ কুটির' নামে আর একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলাম। ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমাকে এই প্রচেষ্টায় বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহায়তা তো ছিলই।...

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আমি 'বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ' স্থাপন করি। এই সঙ্ঘের অনেক সভ্য ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কারাবরণ করেন।...

এই সময় আমাকে প্রতিদিন অনেক মাইল হাঁটতে হতো। রাতে পথের কাছে কোনো গৃহস্থের বাড়িতে থাকতাম। তাঁদের ভেতর হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিল্ ধর্ম নির্বিশেষে তাঁরা সবাই আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।...

এই সময় আমার একটা দুঃখময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়।

সারাদিন সভা করে হাঁটরে পর রাত্রিতে এক মুসলমান তাঁতির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করি। বাড়ির বয়স্ক ছেলে মাত্র এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে। আর অল্পবয়স্কা অন্তঃসত্ত্বা বিধবা তখনো তাঁতের কাজ করছে। বৃদ্ধা মা পাশে বসে ছেলের জন্য কাঁদছে। তরুণী বিধবা আমাকে দেখে কাজ বন্ধ করে চোখের জল ফেলতে লাগলো; কিন্তু একটু পরেই তাকে আবার কাজ শুরু করতে হোত। সংসারের খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। আসন্ন প্রসবের জন্যও সংস্থান করতে হবে। দশ মিনিট অবসর নিলেও আর চলবে না। চোখের জলে ঝাপসা চোখেই সে আবার তাঁত চালানো শুরু করলো। গ্রামের মেয়েরা যে কত অসহায়, দারিদ্রের চাপ যে কত বেশি হতে পারে এবং সুতা কাটা, টানা হাটা, তাঁতের কাজ ইত্যাদি আয় আপাতদৃষ্টিতে শহরের লোকের কাছে যত কমই মনে হোক, গ্রামের দূর মেয়েদের রোজগারের পন্থা হিসেবে তার যে কি দাম তা এই অভিজ্ঞতায় আমি বিশেষভাবে বুঝতে পারলাম। গান্ধীজী খাদির ওপর এত জোর কেন দিয়েছিলেন বুঝলাম।

কায়েস আহমেদ-এর উপন্যাস 'নির্বাসিত একজন' থেকে উদ্ধৃত

... হাফপ্যান্ট পরে এই শহরে এসেছিলাম কাজ শিখতে। হীরা সিং এর ক্লীনার। ট্যাকসী ধোয়ামোছা করি, বালতি বালতি পানি ঢালি রেডিয়টরের মুখে। প্যাসেঞ্জার জোটাই। শ্রীরামপুর ট্যাকসী স্টান্ডে আমি হয়ে গেলাম 'খোকা'।...

বাপ ছিলো চিরকালের উড়নচন্ডি। যুদ্ধের বাজারে কন্ট্রাক্টরী করতো। মিলিটারী কন্ট্রাক্টর। দেদার পয়সা্ সেই পয়সা হওয়াই বাজির মতো উড়ে যেতো রেসের মাঠে, জুয়ার বোর্ড, মদে। বেশ্যা বাড়ি পড়ে থাকতো। ন মাসে ছ'মাসে দেশে ফিরতো। তখন খুব শাহী হালে চলে যেতো ক'দিন। তারপর বাপ চলে যেতো। মদের তলানীর মতো যে টুকু থাকতো তা দিযে আরো কিছুদিন চলতো। তারপর আবার অভাব, টানাটানি। সেই রমরমে দিনগুলোকে দেখিনি আমি।

এ সবই আমার শোনা। আমি দেখেছি, মা পরের বাড়ি ধান ভানে, রশি কলের সুতো, তাঁতের নলি তোলে চরকায়। ফিতে বোনে, পটকা মোড়ে। একটানা অভাব, কষ্ট, আর টানাটানির চেহারা।

পাপড়ি রহমানের উপন্যাস 'বয়ন' থেকে সংকলিত

এই ইটের সারির কমলারঙা ঘোরে পড়ার আগে, সবেদআলি তো সবেদআলি- সবেদআলির বাপ, দাদা, পরদাদা কি পরদাদা, এমনকি তার পরদাদার পরদাদাও নাকি ওই ধুলার ভেতরই গোত্তা খেয়েছিল। আর ওই গোত্তা-খাওয়া শুরু হয়েছিল সেই মোঘল আমল থেকে। মোঘল আমলে তাঁতিরা যখন মসলিন বোনার জন্য ফুটীকার্পাসে সুতা আটতে শুরু করেছিল। একেবারে কেশদামের মতো মিহি-মসৃণ সুতা কাটার জন্য আর কিছু না-হোক, বাতাসে জলীয় ভাব দরকারি ছিল। ফলে সবেদআলির দাদা, পরদাদা বা পরদাদার দাদাও ওই ধুলার না সোঁদা, না ধুলটে, না মাটি-মাটি গ্রন্থে বেদিশা হয়ে উঠেছিল। শুকনার মরশুম শুরু হলেই দুশ্চিন্তা তাদের কপালে ঘন-ঘন ভাঁজ পড়ত। তখন হাতের কাজ-কর্ম গুটিয়ে বাতাস ভিজে-ওঠার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু সবেদআলির পূর্বপুরুষ কেন পবনকুল, মইকুলি, বরাবো, দিঘীবরাবো, তারাবো বা বেকুবের তাঁতিরাও ওই জলদ্র বাতাসের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণত। কারণ খরখরে শুকনা বাতাসে টাকু হাজারবার ঘুরালেও মসৃণ-মিহি সুতা-কাটা সম্ভব ছিল না। ফলে ওই ধুলার ভেতরই খালি-খালি গোপ্তা-খাওয়া ছাড়া তাদের আর করারও কিছু ছিল না। ভেজা-বাতাসের জন্য অপেক্ষা করে করে কাটুনিরা পড়িঘরের দাওয়ায় বসে ঝিমাত্ আর ওই রকম অলস ঝিমাতে ঝিমাতেই গান ধরত-

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা।
যখন খেই যাবে ছিড়ে লব জুড়ে
ফেলব না তার একফোঁটা।
সদা ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠে রতি
আছে আমার মন আটা।
ভসকে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে
ভয় কি তায় এত।
কতশত ঘুচাই জড় পটা।
নাটিয়ে করব পাতা দেখব না বাঁধবে না
কোন নেটা।

গানের সুরে-সুরে অনেক ঝিমুনিভাবে সুরুৎ করে ঘুম ঢুকে পড়লেও বাতাসে ধুলা-ওড়ার কমতি ঘটত না। অর্থাৎ চামড়া টান-ধরা রুঠা-হাওয়া জলজলভার ধরত না। ফলে জলের ধারে কাছে টাকু নিয়ে বসতে হত্ জলের সন্নিকটে থেকে অথবা ভাসমান নাওয়ের ওপর টাকু ঘুরিয়ে সুতা কেটে ঘরে তুলত তারা্ আর তখন জল ছিল অগাধ। নদী-নালা-খাল-বিল-ডোবা-পুকুর-হাওড়-বাওড় সর্বত্রই থই-থই জল। ফলে অনায়াসেই জলস্পর্শ নিয়ে কাটুনিরা মিহি সুতায় কঞ্চি-কে-কঞ্চি ভরে ফেলত। তারপর ওই কেশদামের মতো সুতায় বোনা হতো মলবুস-খাস, আলি-বালি, শবনম, ঝুনা, আর-ই-রওয়ান, তনজেব, তরান্দাম, জামদানি আরো কত কি।

৬.৪ "মানাহর বসাকের উপন্যাস"

নীলাম্বরীর নকশা থেকে উদ্ধৃত

তন্তজীবী সমাজে দু'টিই শ্রেণী, খাদ্য আর খাদক। মুষ্টিমেয় কয়েকজন খাদক আর সকলেই তাদের খাদ্য। ক্রমাগত খাদ্য খেয়ে পুষ্টির আতিশয্যে মহাজনের সহায় সম্পদে স্ফীত হতে থাকে আর খাদ্যকুল উদয়াস্ত তাদের পুষ্টি জোগাতে গিয়ে ক্রমাগত ক্ষীণ হতে হতে কোমরের জোর নিঃশেষ করে দেনার দায়ে ন্যুঞ্জ হয়ে পড়ে। ভারবাহী কষ্টকর জীবনের তিক্তস্বাদ আর অতিসচ্ছন্দ্যের স্বাদু আয়াস, এ দু'য়ের মাঝে তৃতীয় কোনো অবস্থা তাঁতি পাড়ার কোনো মানুষের জীবনেই আসে না। এ এক অমোঘ বিধান-এর ব্যতিক্রম ঘটে কদচ।

পঞ্চাননও তাই এই বিধান মেনে নির্ভাবনায় ফণীর হাঁ-করা হাঁড়িকাঠে গলা বাড়িয়ে দিল।

ফণী ওদেশে থাকতেই মহাজন। নিত পুরুষের মহাজনী কারবার তাদের। দেশ ভাগের পর ফণী এদেশে চলে আসে প্রচুর টাকা পয়সা ও তার কিছু বাঁধা তাঁতি নিয়ে। বৈঁচ্য গাঁয়ে শুরু করে প্রথম তাঁতের ব্যবসা।

তখন ওপার বাংলা থেকে স্রোতের মত উদ্বাস্তরা আসছে-তাঁতিরা আসছে বৈঁচ্য গাঁয়ে, ফণী তাদের ধরে ধরে এনে বাড়িতে বসাচ্ছে। তাদের ঘর করে দিয়ে তাঁত গড়ে দিয়ে সুতা দাদন দিয়ে টাকা জোগান দিয়ে খুব অল্প দিনেই ব্যবসা জমিয়ে তোলে।

তাঁত-কাপড়ের ব্যবসা। পঞ্চনন বলে 'তাঁতি ধরা' ব্যবসা। পঞ্চননের নিজেকেও ধরা দিতে হয় এই ব্যবসায়।

দিনে দিনে আরো মহাজন আসতে থাকে। এসে একই নিয়মে তারাও 'তাঁতি ধরা' শুরু করে। কমে এ গাঁয়ে তাঁতির সংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়ে মহাজনের সংখ্যাও। বাড়ে প্রতিযোগিতা, কে কত তাঁতি ধরতে পারে। নিজের বাড়িতে আর স্থান সংকুলান না হওয়ায় এখানে ওখানে জমি কিনে তাঁতি বসানো শুরু করে মহাজনেরা।

ফণী এ অঞ্চলের সবচাইতে পুরোনো মহাজন। অনেক তার নাম ডাক। তার তাঁতিদের তৈরি শাড়ির সুনাম আছে বাজারে-নক্সার কাজ, রঙের বাহার, বুটির কারুকাজ, বড়ই মনোহর। শাড়ির ভোল, ডিজাইন, রঙের ফণী নিজ হাতে করে, বাছা বাছা তাঁতিদের দিয়ে বোনায়। ফণীর কাপড়ের যেমন সুনাম

বাজারে তার চাহিদাও তেমন। কোলকাতা বড় বাজারের গদিওয়ালারা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে আসে তার বাড়িতে, গাঁট গাঁট কাপড় কিনে নিয়ে যায়। গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন আরো অনেকে-পয়সাওয়ালা সৌখিন বাবুরা, ডাক্তার, উকিল, দারোগাবাবু যায় জেলার হাকিম সাহেব পর্যন্ত। বৈঁচ্য গাঁয়ের ফণীবাবু বলতে একডাকে তাকে বাই চেনে।

মহাজন আরো আছে এ গাঁয়ে-গঙ্গা ব্যাপারী, গন্দু মহাজন, পান্নাথ ব্যাপারী, বেন্দা বিনোদ, মদন ব্যাপারী, নুনু ব্যাপারী, লালমোন মহাজন প্রমুখ। সারা গাঁয়ে তাঁতি সংখ্যা হাজার ছয়েকের কম নয়। মহাজনের সংখ্যাও তেমনি জনা পচিশেক তো হবেই। চালু কারবার সবার, কারো ছোট কারো বড়। তাঁতি খাটিয়ে (পঞ্চননের ভাষায় 'তাঁতি উকিয়ে') মহাজনদের সবারই বাড়ি ঘরদোর জমিজমা ধন সম্পত্তি হয়েছে কমবেশি। তবে জগোর মত এত সাত তাড়াতাড়ি বড় কারবার ফাঁদতে কেউ পারে নি।

ওঁ বো কী কইরা, পঞ্চানন বলে, নিজে তো এক রদ্দি তাঁতি, নিতানতুন 'ভোলবানা' কইরবার বুদ্ধি নি অর আচে? ভালো তাঁতিও ধইরবার পারে নাই। সব অজাত বেজাত। মন্তব্য পঞ্চননের জগো অবশ্য বলে, তার বেশি ভালো'র দরকার নেই। কোনো গদিওয়ালা তার বাড়িতে না আসুক, সে নিজেই ঘারে করে গদিতে মাল পৌঁছে দেয়, কমদামে, অল্প লাভে। তাতে তার ক্ষতি নেই। অন্যান্য মহাজনের তাঁতির যে মজুরি দাবি করে সে তুলনায় তার তাঁতিদের মজুরি কম। তাছাড়া হিসাব নিকাশের কড়াকড়িও জগো পছন্দ করে না। বছর শেষে যেমন তেমন একটা হিসাব ওনিয়ে দিরেই হ'ল। মহাজনের ঋণ তো কেউ সারাজীবনে শোধ করতে পারে না-তাঁতিরা জানে। ঋনের খাতায় তাদের নাম থাকবেই। ও নিয়ে তাই আর মাথা কে ঘামায়।

জগোর তাঁতিদের তৈরি কাপড় নিয়ে এ গাঁয়ের অন্য মহাজনের ঠাট্টা তামাসা করে, কাপড় না'লে বলে 'চোপড়'।

বলুক। জগো গায়ে মাখে না। যারা চিকন সুতার মিহি কাপড় নিয়ে বড়াই করে তাদের বাজার তো একমাত্র পূজোর সময় আর মাঘ-ফাল্গুনে বিয়ের দু'চার দিন। বাকি দিনগুলো তো তাদের হাপিতোশ করে বসে থাকতে হয়। জাগোর চিকন সুতার কাজ কম। মোটা কাপড় সারা বছর সমান তালে চলে। সুনাম যত কম, মুনাফা তত কম নয়।

কবিতা

জসীমউদ্‌দীন-এর কবিতার অংশ বিশেষ

'তবুও আবার রজনী আসিল, জামদানি শাড়িখানি
পেটেরা খুলিয়া সয়তনে দুলী অঙ্গে লইল টানি
হাতে পায়ে দিল আলতার দাগ, আরশিতে বার বার
ঠোটেরে ঘষিল, মুখেরে মাজিল রূপ দেখি আপনার।'
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

‘কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়
আসমান-তারা শাড়ীখানি আজ উড়াব সারাটি গায়।’
(কাল সে আসিবে, বালুচর)
‘কৃষাণ কনের বিয়ে হবে, তার হলদি-কোটার শাড়ী
হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদ রেখা নাড়ি।’
(ধানখেত, ধানক্ষেত)

‘তখন সে হয়ে দূরদেশী কোন পাটের নায়ের ভাগী
যাবে সে পারায়ে কত খাল বিল সুদুর হাটের লাগি
সেথায় জমায়ে বহু টাককড়ি ফিরিয়া আসিবে ঘরে
শপথ করে সে মধুমালা শাড়ী আনিবে দুলীর তরে।’
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)
‘... আর শোন কথা,
শব্দেতে শুনি শাড়ির নাকি গো নাম যে কলমীলতা
বালুচর-শাড়ি, জলে-ভাসা শাড়ী, কেলী-কদম্ব শাড়ি
গোলাপ ফুল যে শাড়িতে নাকি গো গোলাপ ফুলের বাড়ী।’
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতার অংশ বিশেষ

‘যেইখানে করকা পেড়ে শাড়ি প’রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে-আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা
সেইখানে সবচেয়ে বেশী রূপ, সবেচেয়ে গাঢ় বিষন্নতা...’
(যতদিন বেঁচে আছি, রূপসী বাংলা)
‘যেন এ জনমে নয়- যেন ঢের যুগ ধ’রে কথা শিখিয়াছে
এ-হৃদয় স্বপ্নে যে- বেদনা আছে: শুষ্কপাতা শালিখের স্বর
ভাঙা মাঠ-নক্সা পেড়ে শাড়িখানা মেয়েটির রৌদের ভিতর
হলুদ পাতার মতো স’রে যায়।
(পাড়াগাঁর ধু’প্রহর, রূপসী বাংলা)
‘জীর্ণ শীর্ণ মাকু নিয়ে এখন বাতাসে
তামাসা চালাতে আছে পুনরায় সময় একাকী’
(নির্দেশ, আলোপৃথিবী)।

আধুনিক কবিতা

শাড়ি ও প্রিয়া

সৌরভশুভ (কৌশিক)

লাল শাড়িতে লাগে তারে অনেক বেশি ভাল
নীল শাড়িতে জ্বলে যেন জোৎস্না চাঁদের আলো
কালো শাড়ি সেতো যদি কভু পড়ে, রিমঝিমিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি যেন পড়ে।
হলুদ গাঁদা মাথায় গুজে পড়ে হলুদ শাড়ি
চোখের পলক পড়েনা যে, মানায় তাকে ভারি
সবুজ শাড়ি গায়ে জড়ালে যেন গাছের পাতা
ইচ্ছে করে লিখতে থাকি, খুলে কবিতার খাতা
মেজেন্টা রঙের শাড়ি পড়লে পরে গায়
তাকে দেখে অনেরা হিংসায় মরে যায়।
শাড়ি যেতো শাড়ি, দাম যেমনই হোক
পড়লে তাদের লাগে ভালো, ফেরানো যায় না চোখ
পড়লে শাড়ি প্রিয়াকে আমার অনেক সুন্দর লাগে
টপ জিনস আর লেহেঙ্গা তবু নাহি ছাড়ে,
শাড়ি হলো বাঙালির চিরন্তন পোশাক
সবার আগে শাড়ি অন্যগুলো থাক
জামদানি, মসলিন, টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি
আমরা বাঙালি তাই ছাড়তে নাহি পারি।[৭৪]

আধুনিক গান

তাঁতের শাড়ি জড়ির পাড়
দেখেছিলাম প্রথম বার
মেঘলা চুলে বারিবার
আসে যে সে স্বপ্নেতে আমার
ভুলে কি করে গো যাই
সেই ছিল এই শ্যামের রাই
রইসে দিন আশায়
সে নজরে যদি চায়
আসবে সেদিন জানি না কবে
সেই মেয়েটি আমায় বড় লাগে যে ভাল।[৭৫]

তথ্যনির্দেশিকা

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, সহবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০০ (প্রথম প্রকাশ ১৩২৩), পৃ. ১৫৬

২. ঐ, পৃ. ১৪৫

৩. কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, চণ্ডীমঙ্গল, সম্পাদনা, সুকুমার সেন, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১৩৯৩ (প্র, প্র, ১৯৭৫) অধ্যায় ১১২, পৃ. ১২৫

৪. ঐ, অধ্যায়, ১৩৫, পৃ. ৮১

৫. কবির গোসাই (১৮৮৭-১৮৭৯) সাহেব ধনী সম্প্রদায়ের অন্যতম পদকর্তা। জন্মস্থান বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার আলমডাঙ্গার কাছে ঘোষবিলা মুধুপুরে (বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্তগত) বলে অনুমান করা হয়। প্রকৃত নাম কুবের সরকার। জাতে যোগী তাঁতী। তাঁতের কাজ ছিল আদি পেশ। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরু চরণ পালের কাছে দীক্ষা নেন এবং গুরু সান্নিধ্যে ওই গ্রামেই জীবননের বাকি দিনগুলো কাটান। তিনি বারোশর বেশি গানের রচিয়তা।আরো জানতে চাইলে দেখতে পারেন, সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌবধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা), জনপদাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা সংগ্রহ, প্রথম খন্দ গ্রন্থ: লোকধর্ম ও জনসংস্কৃতি (বর্ণপরিচয়, কলকাতা, ২০১০) থেকে নেয়া হয়েছে, পৃ. ১৫-১৫৯।

৬. সুতা কিনি (সুতা ক্রয় করি), নসুন্দি (নরসিংদী) বেচি (বিক্রি), ছেরি, (মেয়ে)

৭. নরসিংদী: বৃহত্তর ঢাকার একটি অংশ (বর্তমানে আলাদা জেলা)

৮. লালন সাঁই: মাহাত্মা লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) মরমী মতবাদে বিশ্বাসী সাধক।

৯. লেখক: বলন কাঁইজি: লালন সাইজি, পৃ. ৯।

১০. মাহিন শাহ এর জন্ম ১৯০২, মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন একজন লালন অনুসারী

১১. মোহাম্মদ সাইদুর: জামদানী ১৯৯৩, পৃ. ৪৮।

১২. তামাই, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, সংগ্রহ অনার্য তাপস, সূত্র: শাওন আকন্দ: বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ২০১৮, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

১৩. শাজাহান প্রামাণিক (আনু. ৬০), কুলনীয়া, সদর, পাবনা। সংগ্রহ: অনার্য তাপস। সংগ্রহ কাল: ১ ডিসেম্বর ২০০৯

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. মো: আবদুল করিম মিঞা, টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১ পৃ- ২১০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

১৭. বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন: ৫৩ (লোকসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ) সম্পাদনা: শামসুজ্জামান খান মোমেন চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯২, পৃ.৭৫।

১৮. পাবনা অঞ্চলের তাঁতী ও গাইয়ে এম এ হানজালার সৌজন্য প্রাপ্ত। তার বক্তব্যনুসারে এই গানের কিছু অংশ তিনি সংগ্রহ করেছেন। বাকি অংশ নিজেই লিখেছেন।

১৯. প্রাগুক্ত

২০. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য,সম্পাদিত, গোপীচন্দ্রের গান, পৃ ৮৫ -৮৫

২১. মোহাম্মদ সাইদুর ,ঢাকাই জামদানি, পৃ ৮৯-৫০। মূল সূত্র: সোনাই বিবির পালা, পান্ডুলিপি, পৃ-৯৫-১০১: বাংলা একাডেমী সংগ্রহ ক্রমিক নং ২১৪/৬৪৬৫ মোমেন-২১

২২. পাবনা সিরাজগঞ্জ এলাকায় প্রচলিত গান

২৩. নরসিংদী চর এলাকায় রায়পুরার নদী ভাঙ্গনে ভিটেমাটি হারিয়ে আসা নারীকে নিয়ে পল্লীগীতি গান

২৪. মোহাম্মদ সাইদুর জামদানী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩।

২৫. সংগ্রহঃ জগদ্বীশ: সূত্র উর্মিলা বিশ্বাস, স্বা, মৃ ব্রজেন বিশ্বাস, কয়া কুষ্টিয়া, ২০০৯।

২৬. সংগ্রহ, জগদ্বীশ: সূত্র মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠ,২০০৯।

২৭. সংগ্রহ, মোঃ সোহেল রানা, চাটমোহর, পাবনা। র্সত্র মনছুর আলী (আনু, ৮০) মথুরা পুর, চাটমোহর, পাবনা ২০১০।

২৮. সংগ্রহ, জগদ্বীশ: সূত্র মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠ, ২০০৯।

২৯. সংগ্রহঃ জগদ্বীশ: সূত্র উর্মিলা বিশ্বাস, স্বা, মৃ ব্রজেন বিশ্বাস, কয়া কুষ্টিয়া, ২০০৯।

৩০. সুশীল কুমার দে, বাংলার প্রবাদ, ছড়া, ও চলতি কথা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম,স, ২০০২ (প্র, প্র-১৩৫২) পৃ. ১০১

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১: প্রবাদ নং: ৩৭৫৫

৩২. প্রাগুক্ত, প., ১০১: প্রবাদ নং: ৩৭৫৭

৩৩. প্রাগুক্ত, প., ১০১: প্রবাদ নং: ৩৭৫৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১: প্রবাদ নং: ৩৭৫৯

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১: প্রবাদ নং: ৮১২৭

৩৬. প্রচলিত প্রবাদ

৩৭. প্রচলিত প্রবাদ

৩৮. প্রচলিত প্রবাদ

৩৯. প্রচলিত প্রবাদ

৪০. প্রচলিত প্রবাদ

৪১. প্রচলিত প্রবাদ

৪২. প্রচলিত প্রবাদ

৪৩. প্রচলিত প্রবাদ

৪৪. প্রচলিত প্রবাদ

৪৫. প্রচলিত প্রবাদ

৪৬. প্রচলিত প্রবাদ

৪৭. সুশীল কুমার দে, পৃ. ১০১: প্রবাদ নং: ৩৭৫৫

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. প্রাগুক্ত

৫২. মো: আবদুল করিম মিঞা, টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১ পৃ-২৮৭

৫৩. ড. আবুল হাসান চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয়: সংগ্রহ : মানিক হাসান

৫৪. ওয়াকিল আহমদ,বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ প্রবচন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. মোহাম্মদ সাইদুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩। মূল সূত্র, মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, লোকসাহিত্য নরসিংদীর ছড়া, পৃ. ১৩৮

৫৭. আবুল মোমিন, প্রধান শিক্ষক, মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠ, কুষ্টিয়া

৫৮. মোহাম্মদ সাইদুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩। মূল সূত্র, মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, লোকসাহিত্য নরসিংদীর ছড়া, পৃ. ১৩৮

৫৯. হারুন অর রশীদ, শাহদাত, কুষ্টিয়া, সংগ্রহ : জগদীশ

৬০. প্রবাদ সিরাজগঞ্জ চন্দ্রঘোনা থেকে সংগ্রহীত

৬১. ড. শীলা বসাক, বাংলা ধাঁধাঁর বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বি, স, ১৯৯, (প্র,স, ১৯৯০) পৃ, ২৯৪। মূল সূত্রঃ পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিতঃ গোর্খ বিজয় (১৩৫৬) পৃ. ১৭০ও ১৭৬

৬২. প্রাগুক্ত

৬৩. প্রাগুক্ত

৬৪. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক, মোহিনী মোহন বিদ্যাপাঠ, কুষ্টিয়া। সংগ্রহঃ জগদীশ

৬৫. মনসুর আলী, মোতুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা, সংগ্রহঃ মোঃ সোহেল রানা, চাটমোহর, পাবনা (সূত্রঃ শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্প, পৃ. ৪২৩)

৬৬. প্রাগুক্ত

৬৭. প্রাগুক্ত

৬৮. প্রাগুক্ত

৬৯. আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, কিশোরগঞ্জের লোক কাহিনী ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২২০

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-৯২

৭১. মনসুর আলী, মতুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা, মোঃ সোহেল রানা, চাটমোহর, পাবনা, অক্টোবর, ২০০৯। সূত্রঃ শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্প, পৃ. ৪২৩।

৭২. শামসুজ্জামান খান,গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা, প্যাপিরাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ৮৯-৯১।

৭৩. গবেষকের সংগ্রহঃ সংগ্রহের স্থান নিলক্ষা রায়পুরা, নরসিংদী-২০১০ খ্রী.

৭৪. golpokobita.com, September, 2012

৭৫. শিল্পী কুমার শানু, Music Private Ltd., The Royalty network publishing venus_pub,BMI_Broadcast Music Inc, Kalkatta, India.

উপসংহার

উপসংহার

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে তাঁতশিল্প। কিন্তু শিল্পের গুরুত্ব, জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গবেষণা সম্ভব হয়নি। কারণ সাধারণের পরিধেয় কাপড় এর সিংহভাগই এই উৎস থেকে আসে। গবেষক তাঁত সমৃদ্ধ বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি নিজে এবং সচেতন পাঠক, সরকারি নীতি নির্ধারক, তাঁত সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাসকারীদের বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। তার গবেষণার যৌক্তিকতা হলো বাংলার বস্ত্র উৎপাদনের যে খ্যাতি তা প্রধানত ঢাকা কেন্দ্রিক। তাই তিনি বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই বিষয়ে কাজ করেছেন। এই গবেষণা সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি এই বিষয়ে প্রাপ্ত বই, পুস্তক, জার্নাল, লেখনী, শ্লোক, প্রবাদ, গল্প ইত্যাদির সহযোগিতা নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁতী, উদ্যোক্তা, মহাজন, সুতা ব্যবসায়ী, কারিগর, ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী, পাইকারী ব্যবসায়ী ও ভোক্তা অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে তাঁত শিল্পের বিকাশ ১৯৭১ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁত শিল্প সম্পর্কে জানতে হলে এই অধ্যায় পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী। যেমন: তাঁত, তাঁতী, তাঁতশিল্পের উদ্ভব নিয়ে শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁত শিল্প বিষয়ক কিংবদন্তী ঐতিহ্য আলোচনা করা হয়েছে। তাঁতশিল্পের সূত্রপাত ও প্রসার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রাচীন যুগ, সুলতানী যুগ, মুগল যুগ, বৃটিশ যুগে তাঁত শিল্পের সংস্কৃতির ইতিহাস, গুরুত্ব, চাহিদা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের দিকগুলো প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, তৎকালীন সময়ে বাংলায় বিদ্যমান ইউরোপের অন্যান্য কোম্পানীগুলো ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মসলিন ও রেশম অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসা, তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা, বিদেশী পর্যটকদের বাংলার ক্ষুদ্র সম্পর্কে বিবরণ বিধৃত হয়েছে তা যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার মসলিন, বৃটিশ ব্যবসায় কোম্পানী, ফরাসী ওলান্দাজসহ অন্যান্য দেশের বণিক শ্রেণীর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এক পর্যায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর বৃটিশদের দাপট ফরাসী ও অন্যান্য দেশীয় কোম্পানীর অসহায়ত্ব দেখা গেছে। আবার ১৯ শতকের গোঁড়ার দিকে বৃটিশদের নতুন আইন ও কৌশল বাংলার মসলিনসহ বস্ত্র শিল্প প্রচন্ত হুমকির মুখে পড়ে; বিলুপ্ত হয়ে পড়ে ঢাকাই মসলিন। এদিকে তাঁতশিল্পের চ্যালেঞ্জগুলো যেমন মারাঠা জলদস্যুদের আক্রমণ, প্রাকৃতিক মঙ্গা, খরা, বন্যা, বাংলার দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে এসেছে। ফকির সন্নাসী হামলা অনিরাপদ পরিস্থিতি, তাঁতীদের পলায়ন, নবাব ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দন্ড, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বৃটিশদের দায়িত্বহীতা ও

নৈতিকতা আচরণ ইত্যাদি গুরুত্ব দিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশং শতাব্দীর শুরুতে স্বদেশী আন্দোলন, দেশীয় শিল্পের উত্থান, তাঁতশিল্পের ইতিবাচক পরিবর্তন নিদের্শের পণ্য সম্পর্কে জনগণের মনোজগতে পরিবর্তন, ১৯৪৭ পরবর্তী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে যা তাঁতশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার একটি বস্ত্র শিল্পে কিভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৎকালীন সরকার অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়নের গুরুত্ব দেয়। প্রথমে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা বিসিকের মাধ্যমে সরকার তাঁতীদের উন্নয়নে কাজ শুরু করে পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড গঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে তাঁতীদের কমদামে তাঁতশিল্পের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁতশিল্প নিয়ে বর্তমান সরকারসহ স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সমূহের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি জরিপ শুমারীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে তাঁত শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা বাজেটে গুরুত্ব ও বাংলাদেশ তাঁতবোর্ড গঠনের বিল উপস্থাপন তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যাবলী, তাঁত বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ট্রেনিং, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এসব বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিসিকের মাধ্যমে জামদানী পল্লী স্থাপন, মিরপুর বেনারশী পল্লী, সরকারি বরাদ্দ, সরকার কর্তৃক ঐতিহ্যবাহী মসলিন প্রযুক্তি পুনরুদ্ধার এর উদ্যোগও আলোচনায় এসেছে। তাঁত শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন, তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণে সরকারের সহযোগিতা এ বিষয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে এ অধ্যায়টি তাঁত শিল্পে বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ধরণ ও প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত তাঁতশিল্পের প্রযুক্তিগত বিষয় জানার ও বোঝার জন্য এই অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এই অধ্যায়ের শুরুতে তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহের উল্লেখ আছে। তাঁত শিল্পের প্রাথমিক কাঁচামাল তুলা যা থেকে সুতা উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন রকম তুলা উৎপাদন ও সংগ্রহ নিয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। তুলা উৎপাদনে বর্তমান সরকারি উদ্যোগ ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যবহুল আলোচনা হলো বাংলাদেশের বিদ্যমান তাঁত যন্ত্রের প্রকারভেদ, বহুল প্রচলিত তাঁত, তাঁতযন্ত্রগুলোর ব্যবহারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এলাকাভিত্তিক এবং কাপড় ভিত্তিক

আলাদা আলাদা তাঁত কারিগর ও তাঁতীরা ব্যবহার করছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে এই অধ্যায়ে। তাঁত শিল্পের প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ তাঁতবস্ত্র বুণনের বিভিন্ন প্রর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সুতা মাড় করা, সুতা মাড় করার উপকরণসমূহ, সুতাকে টানা দিয়ে বীমে গাঁথা, ড্রাফটিং করে মাকু ও সুতার নলির সমন্বয়ে তাঁত স্থাপন করে বস্ত্র বুনন উপযোগী করা ইত্যাদির প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে এই অধ্যায়ে। শাড়ী লুঙ্গির বুণন ছাড়াও বৃহত্তর ঢাকা ও বাংলাদেশের ঐতিহ্য মসলিন ও জামদানীর উৎপাদন প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে নিখুতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাশাপাশি রেশম বস্ত্র উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। ক্রেতাদের মধ্যে জনপ্রিয় ঢাকাই বেনারশি, টাঙ্গাইল শাড়ি, ঐতিহ্যবাহী পাবনা শাড়ি, আদিবাসী তাঁতবস্ত্র ইত্যাদির উৎপাদন প্রক্রিয়াও ব্যবহৃত তাঁতবস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে তাঁত শিল্পের স্থানীয়করণ সম্পর্কে ক্রেতার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণী মাফিক স্থানীয়ভাবে বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের তথ্য আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুরুতে বাংলাদেশে বর্তমানে তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণীর নিকট তাঁতে তৈরী বস্ত্র প্রচলন করা ও পৌঁছে দেয়ার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যেমনঃ আড়ং, গ্রামীণ চেক, বিবি রাসেল প্রডাকশন, দেশী দশ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া তাঁতপণ্যকে জনপ্রিয় করা ও নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে মেলা উৎসবের আয়োজন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁতপণ্যের ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুগল যুগ, কোম্পানী আমলে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ইউরোপীয় বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর ব্যবসা, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বস্ত্র ব্যবসা তৎকালীন ব্যবসা ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যম ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। বর্তমান বাংলাদেশে বৃহত্তর ঢাকার ঐতিহ্য অধুনা মসলিনের রূপ জামদানী কাপড় নিয়ে বিশেষ করে জামদানী GI পণ্য হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বিদেশে রপ্তানি, পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে টাংগাইল শাড়িসহ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জের লুঙ্গি রপ্তানি আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপে লুঙ্গি ও গামছাসহ বিভিন্ন তাঁতপণ্যের বিস্তৃত বাহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে তাঁতপণ্য এগিয়ে যাবার একটি চিত্রও উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁতশিল্প সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায়ের শুরুতে আলোচনায় দেখা গেছে তাঁতীরা একই পেশার জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা, জাতিভেদ, বিভাজন, অবজ্ঞা, অবহেলা ইত্যাদি। যেমন হিন্দু তাঁতীদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য রয়েছে। এদের শ্রেণী বিভাজনে এসেছে বঙ্গতাঁতী, বসাক তাঁতী, ধামরাইয়া তাঁতী, চৌহাটিয়া তাঁতী, আবার যোগী সম্প্রদায়ের তাঁতীদের মধ্যে রয়েছে দুই ভাগ। সাম্য যোগী ও একাদশী যোগী তাঁতী। তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণে রয়েছে বিভক্তি। বিলুপ্ত হিন্দু কাপালি ও কারান সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। মুসলমানদের মধ্যে যারা জামদানী বোনে তাদের বলা হয় কারিগর, আবার যারা মোটা কাপড় বোনে তাদের বলা হয় জোলা। জোলা শব্দটি অনেকাংশে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার যারা সাধারণ শাড়ি লুঙ্গি বোনে তাদের বলা হয় তাঁতী বা তাঁত কারিগর। এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা থেকে তাঁতীদের সামাজিক দিকগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব হবে। একই অধ্যায়ে আদিবাসী তাঁতী, বেনারশী, তাঁতীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁতীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি অতীতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের ভূমিকা আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁতীদের সাংস্কৃতিক জীবন বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ও উপশিক্ষার প্রতি ব্যাপকহারে আগ্রহ এবং শিশু শিক্ষার বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছ।

তাঁতশিল্পে পুঁজির প্রভাব, অতীতে কেমন ছিলো, বর্তমানে কিভাবে তা বিদ্যমান তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁত শিল্প ও তাঁতীদের বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ সুবিধাসমূহ এবং আর্থিক সঙ্কটে পেশা পরিবর্তন, দেশান্তর ইত্যাদিও উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাঁত, তাঁতী এবং তাঁতী সমাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকগাঁথা গান, ছড়া, লেখনী ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো পাঠ করলে তাঁত ও তাঁতীদের জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ে মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের তাঁত সমৃদ্ধ জনপদের তাঁতীদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, গান কবিতা, শ্লোক, বাউল গান, লোকগান ইত্যাদি উঠে এসেছে। এতে এই গবেষণায় রসবোধ এর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁতীদের সমাজ জীবন, আর্থিক জীবন, চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা, সংস্কৃতি অন্যান্য অধ্যায়ে আলোচিত হলেও এই অধ্যায়ের লেখনী ও উপস্থাপন উক্ত গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

মতামত

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন: প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা শীর্ষক গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক বিভিন্ন লেখনী, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তাঁত শিল্প সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা, গোষ্ঠীর ভোক্তা থেকে উৎপাদক মধ্যসত্ত্বভোগী থেকে ফড়িয়া, দালাল, আধুনিক পোশাক তৈরী প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন হাউজের মালিক, নাগরিকসহ অনেকের সাথে মত বিনিময় করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পে এখন নবগতির সঞ্চার হয়েছে এবং তা দিন দিন এগিয়ে চলছে।

ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্র সরবরাহ এবং তাঁত শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে পারলে এ শিল্প অনেকদূর এগিয়ে যাবে। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারলে এই শিল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে এবং দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদিত পণ্যের মান বাড়বে, তাঁত শিল্পে জড়িত জনগগোষ্ঠীর আর্তসামাজিক উন্নয়ন হবে এবং সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

সুপারিশ

তাঁত শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অব্যাহত রাখা, সঠিক বাস্তবায়ন করা, পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে একজন সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে তাঁতী সমিতি, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, আধুনিক ফ্যাশন হাউসগুলোর মালিক শ্রেণী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে তাঁদের আনীত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁত শিল্প বিষয়ে সার্বিক ব্যবস্থা নিতে হবে তবেই এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

১. আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, কিশোরগঞ্জের লোক কাহিনী ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫।

২. ড. মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনু) *কৌটিলিয়ম অর্থশাস্ত্রম*, সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, (কলিকাতা, ২০০২)।

৩. শাওন আকন্দ: *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, ঢাকা, ২০১৮।

৪. মোহাম্মদ আবদুল লতীফ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা: ১৯৪৭-১৯৮৭, সংবাদ, ৭ মে, ১৯৯০।

৫. আলী ইমাম, *বাঙলা নামে দেশ*, (ঢাকা, ১৯৯৭)।

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৭২)।

৭. তোফায়েল আহমদ, *আমাদের প্রাচীন শিল্প*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)।

৮. সুফি মোস্তফিজুর রহমান, "ঐতিহাসিক যুগে মানব-বসতি: প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য", সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৭)।

৯. সুফি মোস্তফিজুর রহমান, হাবিবুল্লা পাঠান, ওয়ারী-বটেশ্বর শেকড়ের সন্ধানে, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।

১০. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস: উনবিংশ শতাব্দী* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭।

১১. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, (ঢাকা, ১৯৯০)।

১২. শামসুজ্জামান খান, *গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪।

১৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ প্রবচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৪. মো: আবদুল করিম মিঞা, *টাঙ্গাইলের লোকসঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।

১৫. ড. গীতা সেনগুপ্ত, *ভারতীয় পরিচ্ছদ ও পাশ্চাত্যধারা*, (কলকাতা, ১৯৯৩)।

১৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য একাডেমী, (কলকাতা, ২০০৪)।

১৭. রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কৃষ্ণা গুপ্ত অনূদিত, (কলকাতা, ১৯৯৩)।

১৮. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড) অনুবাদ:* মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯৬) (প্র.প্র. ১৯৮২)।

১৯. মোহাম্মদ নাসির আলী অনুদিত, *ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা*, (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ২১৭।

২০. রফিকুল্লাহ খান, ইফতেখার-উল-আউয়াল (সম্পা.), *বিদেশী পর্যটকদের চোখে ঢাকা, ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, (ঢাকা, ২০০৩)।

২১. ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা*, কাবেরী বসু অনূদিত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, (কলকাতা, ২০০৪)।

২২. রফিকুল্লাহ খান, *বিদেশী পর্যটকদের চোখে ঢাকা, ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*।

২৩. জেমস টেইলর, *কোম্পানি আমলে ঢাকা*, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত, (ঢাকা, ২০০১)।

২৪. ইফতিখার-উল-আউয়াল, 'দেশিশিল্পের অবস্থা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৭)।

২৫. আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, বাংলা একাডেমি, (ঢাকা, ১৯৬৫)।

২৬. হাকিম হাবিবুর রহমান ও ড. মোহম্মদ রেজাউল করিম (অনুবাদ), "পঞ্চাশ বছর আগে" প্যাপিরাস, (ঢাকা, ২০০৫), (প্র. প্র. ১৯৪৯)।

২৭. অনুপম হায়াৎ, *নওয়াব পরিবারের ডায়েরিতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১।

২৮. আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৫ (প্র. বাংলাদেশ প্র. ১৯৯৬)

২৯. আবুল ফজল আল্লামী, *আইন-ই-আকবরী*, অনুবাদঃ আহমদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩।

৩০. আবুল কাসেম, *রামুর ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৭ (প্র.প্র. ১৯৯৪)।

৩১. আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পা.) *কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী (২য় খন্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

৩২. আর্থার লয়েড ক্লে, *ঢাকা: ক্লে'র ডায়েরী*, *রূপান্তর*: ফজলুল করিম এবং সম্পাদনা: মুনতাসীর মামুন), ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৯০ (প্র. প্র. ১৩৯৭)।

৩৩. ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের মানুসের ইতিহাস-১: প্রাক ইতিহাস*, অনুবাদঃ কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২।

৩৪. ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা*, অনুবাদ, কাবেরী বসু, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৪।

৩৫. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা ২০০১ (প্র. প্র. ১৯৭৪)

৩৬. ওয়াকিল আহমেদ, *মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৮।

৩৭. মুহম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *নরসিংদীর স্থান নাম উৎস ও বৈশিষ্ট্য সন্ধান*, ঢাকা-২০১৬

৩৮. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ: ২০০৩ (প্র. প্র. ১৯১০)।

৩৯. ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন, *চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও তার অধিবাসীবৃন্দ*, অনুবাদঃ হিরহিত চাকমা, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৬ (প্র. প্র. ১৮৯৬)

৪০. জেমস টেইলর, *কোম্পানী আমলে ঢাকা*, অনুবাদঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০১ (প্র. প্র. ১৮৪০)।

৪১. ড. গীতা সেনগুপ্ত, ভারতীয় পরিচ্ছদ ও পাশ্চাত্য ধারা, বেস্ট বুকস, কলকাতা, ১৯৯৩।

৪২. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড)*, অনুবাদঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫ (প্র. প্র. ১৯৬৩)।

৪৩. ড. মোঃ আব্দুর রশিদ, *তুতচাষ ও পশুপালন ম্যানুয়াল*, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা ২০০৭।

৪৪. ডব্লিউ হান্টার, *পল্লী বাংলার ইতিহাস*, অনুবাদঃ ওসমান গনি, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।

৪৫. তোফায়েল আহমদ, *লোকশিল্পের ভুবনে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

৪৬. ত্রৈলোক্যনাথ বসু, *তাঁত ও রং*, *দি নিউ বুক স্টল*, কলিকাতা, আধুনিক সংস্করণ: ১৯৮৯ (প্র. প্র. ১৯৩৯)।

৪৭. নীহারঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দে'জও পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০২ বঙ্গাব্দ (প্র. প্র. ১৩৫৬)।

৪৮. পাপড়ি রহমান, বয়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।

৪৯. প্রেমময় দাশগুপ্ত (সংকলক), *বিদেশীদের চোখে ভারত বর্ষ*, ফার্মাকে এল এম (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৭।

৫০. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশের লোকশিল্প*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৩।

৫১. মনোহর বসাক, *নীলম্বরীর নকশা*, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ১৯৯৮।

৫২. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১।

৫৩. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, অন্যন্যা, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪ (প্র. প্র. ১৯৯৩)।

৫৪. মুনতাসীর মামুন, *পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৮।

৫৫. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-১*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩।

৫৬. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র-৩*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৫।

৫৭. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, এ. এম চৌধুরী, এ. বি. এম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৭।

৫৮. মোঃ আবদুর রশিদ খান, *বাংলাদেশের ঐতিহ্য, রাজশাহী সিল্ক*, উত্তরা সাহিত্য মজলিশ, রাজশাহী, ১৯৯৮।

৫৯. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছেরের বাঙালি সংস্কৃতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৬।

৬০. মোঃ ফজলুল করিম, *মাধবদী বাবুরহাটের ইতিকথা*, প্রতিভা প্রকাশন, নরসিংদী, ২০০৭।

৬১. মোহাম্মদ সাইদুর, *জামদানি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

৬২. শামসুজ্জামান খান, *গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা*, প্যাপিরাস, ঢাকা-২০০৪।

৬৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: ২০০৬ (প্র.প্র.: ২০০১)

৬৪. মিল্টন কুমার দেব, *ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার*, জীবন ও কর্ম, ঢাকা, ২০১৯।

৬৫. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬৬. মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক: *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, ২০১৫, ঢাকা।

৬৭. শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*, নরসিংদী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১৪।

৬৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১* (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড), বাংলাদেশ সোসাইটি, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ: ২০০৭ (প্র. প্র. : ১৯৯৩)।

৬৯. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পা.) *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

৭০. সুশীল কুমার দে, *বাংলার প্রবাদ, ছড়া ও চলতি কথা*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮ (প্র. প্র. ২০০৪)।

৭১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, দ্বি. স. ২০০১ (প্র. প্র. ১৯৮৫)।

৭২. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি, ১৯৯৪।

৭৩. স্বরূপচন্দ্র রায়, *সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস*, (কমল চৌধুরী সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১ (প্র. প্র. ১৮৯১)।

৭৪. সৈয়দ আবু রায়হান, *উলিপুরের ইতিহাস ও লোক সাহিত্য*, রীনা খান কর্তৃক প্রকাশিত, টাঙ্গাইল, ১৯৯৩।

৭৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য একাডেমী, কলকাতা, ২০০৪।

৭৬. হাকিম হাবিবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে* অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫ (প্র. প্র. ১৯৪৯)।

ইংরেজি গ্রন্থ

১. A. B. M. Husain (Ed.), Sonargaon-Panam: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997.

২. Ahmed, Sharif Uddin, *Dhaka, A Study in Urban History & Development 1840-1921*, Academic Press and Publishers, 2003.

৩. Arshi D. Roy, Indigenous Textiles of the Chittagong Hi/1, Tracts, Charathum Publishers, Rangamati, 2005.

৪. A. Z. M. Iftikhar-Ul-Awwal, The Industrial Development of Bengal 1900-1939, University Press Limited, Dhaka, 1983 (Printed in India).

৫. Banerjee, N. N. *Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal*, Calcutta, 1898.

৬. Watson, J. F. *The Textile Manufacture and the Costumes of the people of India*, London, 1866.

৭. Bhattacharya, S., *East India Company and the Economy of Bengal from (1704-1740)*, London, 1954.

৮. Chaudhuri, K. N., The Trading World of Asia and the English East India Company, 1669-1760, Cambridge, 1978.

৯. Chaudhuri, S., *Trade and Commercial Organization in Bengal, 1660-1720.* Calcutta, 1975.

১০. Dani, A. H. *Dacca: A Record of its Changing Fortunes*, Dacca, 1956.

১১. Datta, K. K., *Alivardi and His Times*, Calcutta, 1938.

১২. Datta, K. K., *Survey of India's Social Life and Economic Conditions in the Eighteenth Century (1707-1813)*, Calcutta, 1961.

১৩. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833*, Rrma KLM Private Limited, Calcutta, 1978.

১৪. Delwar Hossain (Ed.), Commercial History of Dhaka, Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka, 2008.

১৫. Dutta, N. K., *Origin and Growth of Caste in India, Calcutta*. Vol. I 1968, Vol. II, 1965.

১৬. Edward Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain, London, 1835.

১৭. Ganguli, B. N., Readings in Indian Economic History, London, 1964.

১৮. Ghose, H. P., *The Famine of 1770*, Calcutta, 1944.

১৯. G.K. Ghosh and Shukla Ghosh, Mian Textiles: Past and Present, APH Publications, New Delhi, 1995.

২০. Hunter, *W.W., Annals of Rural Bengal*, London, 1868.

২১. Karim, A., *Dacca the Mughal Capital*, Dacca 1964.

২২. Milburn, *W. E., Oriental Commerce*, Vols. I and II, London, 1813.

২৩. Mitra, D. B., *The Cotton Weavers of Bengal*, 1757-1833, Calcutta, 1978.

২৪. Mohammad Abdul Latif, *Towards an Estimation of cloth supply in Bangladesh 1955-56-1986-87*, BIDS special Issue Vol. xvii.

২৫. Debendra Bijoy Mitra, *The Cotton Weavers of Bengal* (1757-1833), (Calcutta, 1978).

ইংরেজী প্রবন্ধ

১. Ahmad, MU 1999, 'Development of Small-scall-scale industries in Bangladesh in the New Millennium: Challenges and Opportunities', Asian Affairs, Vol. 21, no. 1.

২. Ahmed, M and Islam, AFMM (1989): Nominal and Effective Rate of Protection in Bangladesh Textile Economy.

৩. BHB 2012, 'Importance of Handlooms in Bangladesh', Article, Bangladesh Handloom Board, Bangladesh Handloom Board, Bangladesh Handloom

Board, Dhaka.

৪. Bangladesh's Handloom Economy in Transition: A Case of market Unequal Growth, Structural Adjustment and Economic Mobility Amid Laissez-faire markets": A Synthesis The Bangladesh Development Studies, Vol. XVII, Nos. 2 & 1.

৫. Banerjee, N. N., 'Dyers and Dyeing in Bengal', Journal of Indian Art and Industry, Vol. 7, No. 59, 1897.

৬. Bhattacharya, S., Cultural and Social Constraints on Technological Innovation and its Migration to East and West', IESHR. Vol. 3. No. 3, 1966.

৭. Burman, D., 'Bengal's Cotton Manufacture', Modern Review, Vol. 74 1943.

৮. Chaudhuri, S., 'Bengal Merchants & Commercial Organization in the Second Half of the XVII Century', BPP. Vol. 90. 1871.

৯. Monwar Hossain and Abdul Hye Mondal, "*Distribution of Year in the Handloom Sector, A Review of Problems and Prospects*", BIDS, Dhaka-1983 1983.

১০. Chowdhury, N 1989, 'Bangladesh's Handloom Economy in Transition: A Case of Unequal Growth, Structural Adjustment and Economic Mobility Amid Laissez-Fair Markets: A Synthesis', Special Issue on The Handloom Economy of Bangladesh in Transition, Vol XVII, no. 1 & 2, pp. 1-22

১১. Edard Baines, History of the Cotton Manufacture in Great Britain, London 1835.

১২. Edward Baine*s, History of Cotton Manufacture in Gre at Britain*, (London, 1835)

১৩. Edward Baines, *History of the Cotton Manufacture in great Britain*, (London 1835), pp. 79-80, Debendra Bijoy Mitra, The Cotton Weavers of Bengal 1757-1833, Firma KLM Private Limited, (Calcutta, 1978).

১৪. Eric Broudy, *The Book of Looms*, First Published 1979, (London, 1993).

১৫. G. N. Gupta, *A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908*, (Shillong, 1908) .

১৬. George Watts and Percy Brown, *Arts and Crafts of India*, Cosmo

Publications, (New Delhi, 1979) (F.ed., 1904).

১৭. Hameeda Hossain, *The Company Weavers of Bengal, The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal 1750-1813*, Oxford University Press, (Delhi,1988).

১৮. James Taylor, *A Sketch of the topography and statistics of Dacca*, Calcutta-1840.

১৯. John Gillow and Nicholas Branard, *Traditional Indian Textiles*, Thames and Hudson, F. P. 1991, (London, 2005).

২০. John Gillow and Nocholas Barnard, *TraditionalIndian Textile*, (London, 2005), 1st Published, 1991.

২১. John Key*, (1704-1779) Was an English Inventor whose most important creation was the* Flying Shuttle, and it was the important prime contribution to the industrial Revolution.

২২. K. N., Chaudhuri, *TheTrading World of Asia and the English East India Company*, 1669-1760, (Cambridge, 1978).

২৩. M. Mufakharul Islam: *An Economic History of Bengal 1757-1947* (Dhaka, 2012).

২৪. Mazhurul Huq, *The East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1784*, (Dacca, 1964).

২৫. Moti Chandra, *Costumes Textiles: Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaeval India*, Oriental Publishers, (Delhi, 1973).

২৬. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, (Calcutta, 1956), Vol. I.

২৭. N. N Banerjee, *Monograph on the cotton Fabrics of Bengal*, (Culcutta 1998).

২৮. Royle. F. Forbes, *on the culture and commerce of cotton India and elswhere, (*London, 1851).

২৯. Sir Georgw Champbell, *Extracys from the Records of the India Office Relating to Famines in Bengal, 1769-78.*

৩০. Sirajul Islam, *American Trade in Bengal*, *Asiatic Society,* (Dhaka, 2018).

৩১. Sukumar Bhattacharya, *East India Company and the Economy of Bengal from (1704-1740)*, (London, 1954).

৩২. Thapar, `State Weaving-Shopsof the Mauryan Period', in *JasleenDhamiija and Jyotindra Jain (ed.)*, Handwoven Fabricsof India, (Ahmedabad, 1989).

৩৩. *The Imperial Gazetteer of India*, Vol-4, 2nd edition, (London, 1885).

৩৪. The periplus of the Erythrean Sea a Roman Period Guide to Trade and navigation in the Indian Ocean.Justly famous for offeringa contemporary and discriptive account of early Indian Ocean Trade.

৩৫. W. H. Schoff (tr& ed,) *The Periplusof the Erythraean Sea*: Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of First Century, (London, 1912).

৩৬. Zulekha Haque, `Sari: Cotton and Silk, Textile Tranditions of Bangladesh, National Crafts Council of Bagladesh, (Second revised version) 2006.

৩৭. Md. Abdul Haum & Masum Saifur Rahman The Bangladesh Labour Code.

৩৮. Sunil Gupta, *Honorable Minister for Textile*, Parliament Budget Session*,* 21 June1979.

৩৯. এ. জেড এম ইফতিখার-উল-আউয়াল 'দেশি শিল্পের অবস্থা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ২য় খণ্ড পৃ. ৩৪৭। মূল উৎস: India Office Records,

৪০. মুহম্মদ জাকারিয়া খান, "ঢাকাই মসলিনের বয়নশিল্প ঃ ইতিহাস ও প্রযুক্তি", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, সপ্তবিংশতি বর্ষ ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র-১৪০০০)।

৪১. *বাংলাপিডিয়া*, পঞ্চম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা, ২০০৬)।

জার্নাল

১. Mohammad Abdul Latif, *Towards an Estimation of cloth supply in Bangladesh 1955-56-1986-87*, BIDS special Issue Vol. xvii.

২. J. Marshall, *Mohenjodaro and the Indus Civilazation*, Vol, 1, 1931.

৩. J. N Sammadar, 'Maratha Invasion of Bengal, bihar and Orissa', *JIH,* 1926.

৪. N. K. Sinha, 'The Famine of 1769-70', *BPP*, Vol. 77, Part. II, July-Dec., 1944.

৫. Ruma Chatterjee, 'Cotton Handloom Manufactures of Bengal, 1870-1921', *Economic and Political Weekly*, Vol. XXII, No. 25, (New Delhi, 1987).

৬. Bangladesh's Handloom Economy in Transition: A Case of market Unequal Growth, Structural Adjustment and Economic Mobility Amid Laissez-faire markets": A Synthesis The Bangladesh Development Studies, Vol. XVII, Nos. 2 & 1.

৭. WW Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, (New York, 1868).

সরকারি রিপোর্ট বাংলা

১. ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ঢাকা, ২০১৮।

২. দেশ তাঁত বোর্ড, *ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন*, ২০১৮, ঢাকা।

৩. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, *ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন*, মার্চ, ২০১৮।

৪. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, ঢাকা, ২০১৬-১৭।

৫. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, তথ্য প্রতিবেদন, ঢাকা, ২০০৭-০৮।

৬. "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন-২০১৮" এবং জেনারেল নোটিশ বোর্ড ডিসপ্লে, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

৭. বার্ষিক তথ্য প্রতিবেদন: "বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড", ঢাকা, ২০১৬।

৮. বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ড: কার্যক্রম প্রতিবেদন, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

৯. তথ্য প্রতিবেদন: "বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোড", ঢাকা, ২০১৮।

১০. ড. আবুল হাসান চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয়: সংগ্রহ : মানিক হাসান

১১. ড. শীলা বসাক, বাংলা ধাঁধাঁর বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বি, স, ১৯৯, (প্র,স, ১৯৯০)। মূল সূত্র: পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত: গোর্খ বিজয় (১৩৫৬) পৃ. ১৭০ও ১৭৬

১২. BHB 2012. 'Importance of Handlooms in Bangladesh' Article, Bangladesh Handloom Board, Bangladesh Handloom Board, Dhaka.

১৩. William Milburn, *Oriental Commerce,* Vol.II, (London, 1813).

সরকারি রিপোর্ট ইংরেজি

১. *Bangladesh Handloom Census-2003* (Bangladesh Burea of Statistics), Ministry of Planning, Dhaka, Published-2005.

২. Department of Agricultrue and Industries, Government of Bengal, File no. 1-W-2, Serial Nos. 1-2, Progs no 1-2, February 1939.

৩. G. Evans, "A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal, Department of Agriculture, Bengal" *Bulletin No-1, 1921, (Calcutta, 1921)*, p.10.

৪. "Report on Bangladesh Handloom Census 2003", Bureau of Statistics. Planning Division, Ministry of Planning, (Dhaka, 2005).

৫. Government of Bengal, Department of Industries, Report on the Survey of Cottage Industries in Bengal, Bengal Secretariat Book Depot, (Calcutta, Second Edition: 1929).

৬. p.174/41, Bangladesh Report 1802-03.

৭. J. A. L Swan, "Report on the Industrial development of Bengal", (Calcutta, 1915).

৮. G. Evans, "A Brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal", Calcutta 1921, Vol. 1, Bulletin.

৯. Dacca District Census Report 1891

সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা

১. Md. Mamunur Rashid, Industrial Estate Officer, Jamdani Industrial Estate, Tarabo, Rupganj.

২. Rahbar Hossain, Sadik Azam and others, '*Historic Jamdani could be the name of good hope',* Textile Today, January 20, 2017.

৩. আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৪৮, ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী, ২০১৬।

৪. মোঃ মুক্তার হোসেন, পেশাঃজামদানী তাঁত মালিক (প্লট গ্রহীতা, নোয়াপাড়া বিসিক জামদানি পল্লী), বয়সঃ৩৫ রূপসী, নারায়ণগঞ্জ-২০১৭।

৫. মোঃ নূরুল ইসলাম, সভাপতি, হাসনাবাদ বাজার ব্যবসায়ী ও দোকান মালিক সমিতি, পেশাঃ ব্যবসা, বয়স ৭০, মোকাম হাসনাবাদ বাজার, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

৬. মোঃ সেলিম রেজা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ডৌকারচর ইউনিয়ন পরিষদ, পেশাঃ সুতা ব্যবসায়ী, বয়সঃ ৫১, মোকামঃ হাসনাবাদ বাজার, হাসনাবাদ, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

৭. মোঃ শাহজাহান আনসারী, পেশাঃ ব্যবসায়ী, বয়স-৫৮, সাধারণ সম্পাদক, করটিয়া বাজার কাপড় ব্যবসায়ী সমিতি, করটিয়া, টাঙ্গাইল, ২০১৬।

৮. হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৫২, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জে. এন্ড জে ফেব্রিক্স লিঃ, মাধবদী, নরসিংদী-২০১৭১।

৯. সাইদুল ইসলাম সাধু, পেশাঃ জামদানি ব্যবসায়ী, বয়সঃ ৪৫, নোয়াপাড়া জামদানী পল্লী, রূপসী, তারাবো, নারায়ণগঞ্জ-২০১৬।

১০. আব্দুল্লাহ আল মামুন, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৪৭, সভাপতি, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আবেদ টেক্সটাইল, ঘোড়াদিয়া, নরসিংদী, ২০১৭।

১১. এ কে ফজলুল হক, পেশাঃ সাংবাদিকতা, বয়সঃ ৫৩, ভেলানগর, নরসিংদী-২০১৬।

১২. আব্দুল হালিম, পেশাঃ সাংবাদিকতা, বয়সঃ ৪২, সাপ্তাহিক নরসিংদীর খবর, ভোলোনগর, নরসিংদী, ২০১৮।

১৩. আলহাজ্ব মনজুর ইলাহী, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৪৯, ব্রাহ্মনদী, জেলাঃ নরসিংদী

১৪. মোস্তফা ভূইয়া, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৪৭, গ্রামঃ ভুলতা, উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, ২০১৭।

১৫. মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান, পেশাঃ ফোকলের গবেষক, বয়সঃ ৭৭, গ্রামঃ বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী-২০১৬।

১৬. হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৫২, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জে. এন্ড জে ফেব্রিক্স লিঃ, মাধবদী, নরসিংদী-২০১৭১।

১৭. মিসেস মুনিরা এমদাদ, স্বত্বাধিকারী, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির, পেশাঃ ব্যবসা, বয়সঃ ৬৫, বেইলি রোড, ঢাকা-২০১৯।

১৮. মিসেস ফারিয়া মৌ, পেশাঃ সংবাদকর্মী ও গবেষক, বয়সঃ ২৫, মণিপুরীপাড়া, ফার্মগেইট, ঢাকা, ২০১৮।

১৯. মোঃ বিল্লাল হোসেন, ভুরভুড়িয়া, শিবপুর, নরসিংদী-২০১৫।

২০. মোঃ মোমেন সরকার, সাবেক পরিচালক, নরসিংদী চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, বয়সঃ৫০, পেশাঃব্যবসা, গ্রামঃ শিলমান্দী, উপজেলা+জেলাঃনরসিংদী, ২০১৭।

২১. আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন মোল্লা, সাবেক সদস্য, (তাঁতি প্রতিনিধি), বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, পেশাঃ ব্যবসায়ী, বয়সঃ৭০,২০১৬।

২২. মোঃ হারুন মিয়া, পেশাঃ তাঁত কারখানার মালিক, বয়সঃ৬৫, গ্রামঃনিলক্ষা, রায়পুরা, নরসিংদী, ২০১৪।

২৩. মোঃ সোলায়মান মৃধা (মুক্তিযোদ্ধা), পেশাঃ ব্যবসায়ী,বয়সঃ ৬২, গ্রামঃ করিমগঞ্জ, উপজেলাঃ রায়পুরা, জেলাঃ নরসিংদী, ২০১৪।

২৪. আবুল মোমিন, প্রধান শিক্ষক, মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠ, কুষ্টিয়া

২৫. হারুন অর রশীদ, শাহদাত, কুষ্টিয়া, সংগ্রহ : জগদীশ

২৬. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, সহকারী শিক্ষক, মোহিনী মোহন বিদ্যাপাঠ, কুষ্টিয়া। সংগ্রহ: জগদীশ

২৭. মনসুর আলী, মোতুরাপুর, চাটমোহর, পাবনা, সংগ্রহ: মো: সোহেল রানা, চাটমোহর, পাবনা (সূত্র: শাওন আকন্দ, বাংলাদেশের তাঁতশিল্প)

Definition (সংজ্ঞা)

1. Country of Origin Certificate issued by the concern government agency, approved authority or organization of the exporting country must be submitted along with the import document to the customs authority at the time of release of goods.

2. Bangladesh small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) provides support services to small, rural, and cottage industry in Bangladesh in the small and cottage industries sector. It was created through an Act of Parliament in 1957 which was later amended in 1992. BSCIC has country-wide institution network to provide door step services for entrepreneurs. Head Office of BSCIC is located entrepreneurs. Head Office of BASCIC is located at 137-138, Motijheel, Dhaka, Bangladesh.

3. GI is a name or sign used on certain products to certify that they possess certain qualities because they are made as per traditional methods or enjoy a certain reputation due to their geographical origin.As per rules, an association of producers or a government organisation that works to safeguard producers' interests can apply for GI tag of a product. More details,

   https://www.thedailystar.net/frontpage/jamdani-finally-gets-recognition-1316581

4. *Economic Nationalism* refers to an ideology that favours state intervention over the market mechanisms with policies such an domestic on the economic systems. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_nationalism

5. *Political Economy* is the study and use of how economic theory and methods influences political ideology.
   https://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp

6. স্বদেশী আন্দোলন: The swadeshi movement was the part of Indian independence movement and the developing Indian Nationalism, was an

economic strategy aimed at removing. The British Empire from power and improving economic conditions in India by the some principle of swadeshi which had some success.

7. মেগাস্থিনিস (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক) এবং নেয়াচারের (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক)। "The Indians use linen chothing as says Nearchus made from the faaz taken from the trees, about which I have already spoken, And this flax is either whiter in colour than any other flax or the people being black make the flax appear whiter in colour than any rcaching down halfway between the kncc and the anklc, and a gament which is partly thrown round the shoulders and partly rolled round the head (Arrian, the Indica in Anabasis of Alexander, togcther with the Indica, F, J Chinnock, tr, (London: Bhon, 1893), ch,1-16).

8. Indika is an account of Mauryan India by the Greek writer Megasthenes. It's fragements have survived in later Greek and Latin works. The earliest of these works are those by Diodorus Siculas, Strabo (Geographical) Pliny and Arrian (Indica) www.https://en.m.wikipedia,org:wiki.

9. Ralph Ftch (1550-1611), British Explorer, Who was among the first Englishmen to travel through Indian and Southeast Asia.

10. Sulaiman al-Tajr (Arabic for "Soloman the Merchant") was a 9th century Muslim merchant, traveler and writer initially from Siraf in modern day Iran. He traveled to India and China and worte the account of his voyages around AD 850."

11. Tavernier (1605-1689), French gem marchant and Travelor was a private individual and merchant travelling at his own expense, covered by his own account 6,0000 Leagues (12,0000) miles in making six voyages to Persian and India between the years (1640-1668).

12. *The Pepriplus of the Erythraean Sea (Latin name as the Periplus Maris Erythraei)* is a Grece-Roman periplus written in Koine Greek that describes navigation and Trading Oppurtunities from Roman Egyptian port like Berenice Troglodytica along the Coast of the Red sea the persian Gulf, and the Arabian Sea, Including the modern day Sindh region of Pakistan and South Eastern regions of India."

13. *The Periplus of Erythraean Sea* খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে লেখা এই গ্রন্থে বাংলা অঞ্চলের তাঁত শিল্প সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা আছে" There is a river near it called Ganges... On its

bank is a market-town which has the same name as the river Ganges, through this place are brought mala bathrum Gangetic spikenard and pearls, and muslins of the finest sorts which are called Gangetic."W. H. Schoff (tr& ed), The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean by a merchent of the first century, London, Bombay & Calcutta, 1912.

14. 'তন্তু' শব্দ দ্বারা বৈদিক ছন্দসমূহ এবং 'ওতু' শব্দ দ্বারা যজু: সমূহ ও যাগকার্য বোঝানো হয়েছে এবং উভয়ের সংগঠন দ্বারা বস্ত্র তৈরি বলতে 'যজ্ঞ' বোঝানো হয়েছে। তবে অপর একটি ঋকে স্পষ্টই মেষলোমের বস্ত্রবয়ন এবং বস্ত্র ধৌতকরণের উল্লেখ আছে। সূত্র: শাওন আকন্দ: বাংলাদেশের তাঁতশিল্প, (ঢাকা, ২০১৮)।

পত্রিকা

১. *The Daily Star*, 17th November, 2016.

২. The Daily Star, Online Report, May 10, 2016.

৩. *Daily Star*, November 18, 2016. https://www.thedailystar.net/frontpage/jamdani-finally-gets-recognition-1316581, citation date and time: 7 May, 2018 at 7:17 pm.

৪. *The Daily Star*, Dhaka, 09 April, 2011.

৫. Bangladesh Textile Today, Editor: A. S. M. Tareq Amin, Dhaka, January-2009, Volume-2, Issue 1.

৬. Rahbar Hossain, *Sadik Azam and Zunaed Tanvir*, *'Historic 'Jamdani' Could be the name of new hope'* Textile Today, 20 January 2017.

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুন, ২০১৫।

২. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২১ এপ্রিল, ২০১৮।

৩. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৪ বঙ্গাব্দ।

৪. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৩ অক্টোরব, ঢাকা, ২০১৮।

৫. *দৈনিক সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭৭, শনিবার, কলাম ৬-৭ ১।

৬. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৫, ২রা মার্চ ১৯৭৮।

৭. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৬-৭, ২৩ জুলাই ১৯৭৯।

৮. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ৩-৪, ১৬ জুলাই ১৯৮০।

৯. *দৈনিক সংবাদ*, কলাম ১, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮১।

ইন্টারনেট

১. Ancient History Sourcebook: Pliny the Elder (23/JI-79 CE): The Grandeur of Rome, c. 75 CE from Natural History, http://www.fordham.edu/halsall/ancient/pliny-natihist-rome-html

২. https://www.thedailystar.net/frontpage/jamdani-finally-gets-recognition-1316581, citation date and time: 7 May, 2018 at 7:17 pm.

৩. I. L Good, J. M Kenooyer and R. M Meadow, *New Evidence for Early Silk in Indus Civiliation*, 2009 p. 2, http://havard.academia.edu/trenegood/papers/82330/New-Evidence for-silk-in-the-indus-Valley.

৪. htttps//en.m.wikipedia.org>wiki

৫. www.investopedia.com

পরিশিষ্টসমূহ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৩/১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন

Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও তাঁতীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977), রহিতক্রমে উহা পুন:প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(২) "তাঁতী সমিতি" অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন নিবন্ধিত কোন তাঁতী সমিতি;

(৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) "বোর্ড" অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড;

(৬) "সদস্য" অর্থ সার্বক্ষণিক সদস্য ব্যতীত বোর্ডের খণ্ডকালীন কোন সদস্য;

(৭) "সার্বক্ষণিক সদস্য" অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত কোন সদস্য; এবং

(৮) "হস্তচালিত তাঁত" অর্থে কায়িক শ্রম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য কোন বস্ত্রবয়ন যন্ত্র, এবং নিম্নবর্ণিত তাঁতও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) আধা স্বয়ংক্রিয় বা চিত্তরঞ্জন তাঁত;

(খ) উপজাতি কর্তৃক ব্যবহৃত বসতবাড়িতে বিশেষ ধরনের তাঁত;

(গ) কার্পেট তাঁত ও টেপ তাঁতসহ শাটেল গর্ত তাঁত;

(ঘ) কুটির তাঁত অর্থাৎ বসতবাড়ীতে স্থাপিত অনধিক তিনটি শক্তিচালিত তাঁত;

(ঙ) ফ্লাই শাটেল গর্ত তাঁত ও ফ্লাই শাটেল ফ্রেম তাঁত;

(চ) ভারী বা হালকা বস্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য বসতবাড়ীতে স্থাপিত অন্য কোন তাঁত; এবং

(ছ) হ্যাটারসলি তাঁত।

৩। **বোর্ড প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, "বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড" নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার একটি স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান ও শাখা কার্যালয়।**—(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **বোর্ডের গঠন।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

সার্বক্ষণিক সদস্য

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক, সরকারি চাকুরিতে কর্মরত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, মনোনীত অনধিক ৪(চার) জন সদস্য;

খণ্ডকালীন সদস্য

(গ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক;

(ঘ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা;

(চ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা;

(ছ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বস্ত্র দপ্তরের পরিচালক;

(জ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত উহার পরিচালক পদমর্যাদার কোন প্রতিনিধি;

(ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেডের সভাপতি;

(ঞ) জাতীয় তাঁতী সমিতির সভাপতি;

(ট) সরকার কর্তৃক, তাঁতীদের মধ্য হইতে, মনোনীত অনধিক ২(দুই) জন তাঁতী; এবং

(ঠ) বোর্ডের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ছ), (ঝ) ও (ঞ) তে বর্ণিত ব্যক্তিগণ পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ট) তে বর্ণিত সদস্যগণ নিয়ুক্তির তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য নিয়ুক্ত হইবেন, তবে যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৬। **বোর্ডের কার্যাবলী**।—বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জরিপ, শুমারি এবং পরিকল্পনা বা যৌক্তিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

(গ) হস্তচালিত তাঁত শিল্প সংক্রান্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান পরিচালনা;

(ঘ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ইউনিটসমূহের উন্নয়ন ও উপদেশমূলক সেবা প্রদান;

(ঙ) হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্টদের জন্য ঋণ সুবিধাদি সৃষ্টি;

(চ) তাঁতী সমিতিসমূহের সহায়তায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন;

(ছ) তাঁতী সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতীগণকে বস্ত্র রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ, সুতা, ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) তাঁতী সমিতিসমূহের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতশিল্পসমূহকে কাঁচামাল সরবরাহ ও তাহাদের নিকট হইতে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়পূর্বক গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকলের জন্য নকশা, সুতা তৈরি, ব্লিচিং, রংকরণ, ইস্ত্রিকরা, ছাপা ও ফিনিশিং এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় ও বিদেশে রপ্তানির নিমিত্ত হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট মান প্রমিতকণের জন্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সুযোগ-সুবিধা এবং দ্রব্যাদির গুণগতমান ও প্রস্তুতকারী দেশ সম্পর্কিত সনদপত্র প্রদান;

(ঞ) দেশে ও বিদেশে তাঁতপণ্য জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(ট) তাঁতী সমিতিসমূহের মাধ্যমে তাঁতজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) তাঁতী ও তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান এবং উহার উন্নয়ন;

(ড) তাঁতীদের বয়নপূর্ব এবং বয়নোত্তর সুযোগ-সুবিধা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; এবং

(ঢ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন কার্য সম্পাদন ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

৭। **চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণের নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও মনোনীত হইবেন এবং তাহারা বোর্ডের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান পদের মেয়াদ, বেতন-ভাতা, মর্যাদা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৪) সার্বক্ষণিক সদস্যগণ এই আইন বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, অর্পিত বা ন্যস্তকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৮। **সদস্যগণের অযোগ্যতা ও অপসারণ।**—(১) কোন ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না বা সদস্য থাকিতে পারিবেন না, যদি তিনি—

(ক) কোন সময় সরকারি চাকুরীর জন্য অযোগ্য ঘোষিত বা সরকারি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন;

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন; অথবা

(ঙ) চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত পর পর ৩(তিন)টি সভায় যোগদানে বিরত থাকেন।

(২) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানসত্ত্বেও, সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা সার্বক্ষণিক সদস্য বা কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে কর্মসম্পাদনে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসমর্থ হন;

(খ) তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা বিশ্বাসভঙ্গ করেন কিংবা বেআইনিভাবে আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধা গ্রহণ করেন;

(গ) তাহার পদের অপব্যবহার করিয়া থাকেন;

(ঘ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত এই আইনের সহিত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন অন্য কোন কাজে জড়িত হন।

৯। **বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে উহার সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ২(দুই) মাসে বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উহার একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) বোর্ডের সভায় কোরাম পূরণের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী**।—বোর্ডের সভায় উপস্থিতির জন্য প্রত্যেক সার্বক্ষণিক সদস্য ও অন্যান্য সদস্যগণ বোর্ড কর্তৃক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

১১। **তাঁতী সমিতি গঠন, নিবন্ধন, ইত্যাদি**।—(১) তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতীদের কল্যাণার্থে তাঁতী সমিতি গঠন করা যাইবে।

(২) তাঁতী সমিতি গঠন এবং উহার শ্রেণীবিন্যাস, নিবন্ধন, পরিদর্শন, নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফি প্রদান সাপেক্ষে হইবে।

১২। **সচিব**।—(১) বোর্ডের একজন সচিব থাকিবেন এবং তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সচিব বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং চেয়ারম্যানের নির্দেশ মোতাবেক তিনি বোর্ডের কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সচিব নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন কর্মকর্তা সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—ধারা ১২ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **বোর্ডের তহবিল**।—(১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) বোর্ডের সম্পত্তি বিনিয়োগ হইতে আহরিত আয়;

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত ফি সমূহ, যদি থাকে; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) বোর্ডের তহবিল হইতে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী, সরকারি নিয়মে বোর্ডের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলি ব্যাংকে তহবিলের অর্থ জমা রাখিতে হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) সচিব এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্য একজন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ—এই ধারায় "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P. O. 127 of 1972) এর article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত "Scheduled Bank" কে বুঝাইবে।

১৫। **বাজেট**।—বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থ, বোর্ডের তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহকরণ সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ করিবে।

১৬। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে বোর্ড প্রতি অর্থ বৎসরের হিসাব যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া অভিহিত, প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদদ্দুশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও বোর্ড কর্তৃক প্রত্যেক বৎসরে একবার Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা বোর্ডের হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) বোর্ড প্রতি অর্থ বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ শে জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনমত, বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ণ ও প্রতিবেদন তলব করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৮। **ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) বোর্ড, এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান, কোন সার্বক্ষণিক সদস্য বা কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, এই আইন বা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী, তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, যে কোন ক্ষমতা বোর্ডের যে কোন সার্বক্ষণিক সদস্য, সদস্য বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৯। **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।**—এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাট (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977), অতঃপর "উক্ত Ordinance" বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, অতঃপর বিলুপ্ত তাঁত বোর্ড বলিয়া উল্লিখিত, ধারা ৩ (১) এর অধীন গেজেট প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত তাঁত বোর্ডের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বিলুপ্ত তাঁত বোর্ডের যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতদসংক্রান্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ বোর্ডে স্থানান্তরিত হইবে এবং বোর্ড উহার অধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত তাঁত বোর্ডের সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে বোর্ডের ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত তাঁত বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা সুচিত অন্য কোন আইনগত কার্যধারা বোর্ড কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বা সুচিত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারসমূহ, অত:পর বিলুপ্ত সেন্টার বলিয়া উল্লিখিত, এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব সুবিধাদি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং ঐ সকল সম্পত্তিতে বিলুপ্ত সেন্টারের যাবতীয় অধিকার ও স্বার্থ এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল হিসাবের বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডস এবং অন্যান্য দলিলাদি বোর্ডে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(চ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরীর শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত তাঁত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরীতে ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তীত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে বোর্ডের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হওয়া সত্ত্বেও উহার অধীনে প্রণীত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণীত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, অনুমোদিত সকল বাজেট এবং কৃত সকল কাজকর্ম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন, প্রণীত, জারীকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে রহিত বা সংশোধীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট-২

Regulations for the Weavers

Appendix-1
No. 1A

The Regulation for weavers of April 1782 was aimed against interlopers. It was recorded in the Proceedings of Board of Trade (Commercial), 3rd June, 1783 Prog no. 30, Vol. 37.

It provided "that the purchasers of the said cloths apparently knowing them to be the property of the Company by the secret and clandestine manner which they take to procure them or by the notoriety of the weavers being in the Company's employ who offers to dispose of them, on proof of the fact, shall be liable to punishment by the adawlut, according to the nature of their offence and cloths so purchased shall be confiscated."

Appendix No. 1B

On 18th July 1786, 21 regulations were passed. Some of the regulations were as follows:

Regulation No. IX provided "And for the better ascertaining the number of weavers in each district in the Company's employ as well as the nature and extent of their respective engagements, it is hereby directed that every weaver be furnished with a ticket specifying the name, the place of abode and cooty under which he works and containing an account of the dates and periods of advances made, the value of the cloths of goods he shall from time to time deliver in return".

Regulation No. X provided "That at the end of each year or expiration of each management, the Commercial Resident or his representative shall sign to the adjustment of such weavers' accounts and receive the weavers' signature to the counterpart thereof, which latter shall remain at the Factory or Cootey to be produced whenever called for".

Regulation No. XI: "upon any weaver failing to deliver cloths according to the stated periods agreed upon, the Company's agent shall be at liberty to place peons upon them and keep them under restraint".

Regulation No. XII : "If any weaver in the Company's service should be convicted of selling cloth either by himself, any of his family, journeymen or by any agent to any other merchants or dealers whatever whilst he is deficient in his

deliveries according to the stated periods of his agreement with the Company, such offender shall be punished in a regular process and conviction in the judicial Courts”.

Regulation No. XIII: “And whereas a practice has prevailed of selling cloths provided by the Company's advances clandestinely to the individuals apparently because it suits private dealers best to buy without risking balances, ready-made goods and those of the finer assortments which the Company's weavers long supported by them and enabled by their advances, produce.”

“It is hereby resolved and ordered that the purchasers of the said cloths apparently knowing them to be property of the Company by the secret and clandestine manner which they take to procure them or by the notoriety of the weavers being in the Company’s employ who offer to dispose of them, on proof of the fact, shall be liable to punishments by the Adauluts according to the nature of his offence and the cloths so purchased shall be confiscated”.

Regulation No. XIV: “And whereas it has been alleged by those whose interest it was to make such purchases that the Company’s weavers cannot be distinguished from others, it is hereby ordered that a list or register of the weavers employed by the Company in every Pergunnah be stuck up by the Commercial Agent those in the Cutcherry of that Pergunnah and the same to be corrected at the beginning of every week or month according to the alteration that shall have happened in the week or month preceding”.

Regulation No. XVII: “Weavers with whom compulsion is used to enter into agreements or who are not paid for their cloths according to the agreements voluntarily made between them and the Company’s servants or contractors, may complain in the first place, if injury is offered by native agents, to the Commercial Resident, or contractor under whom they act; if the injury is offered by the Resident or Contractor himself, or if he gives no redress against his agents, complaints may be made to the Collector of the district in which such weavers reside and the said Collector is hereby required to enter into an intelligent and impartial examination of such complaint and if he judges it expedient to represent the same to the Commercial Resident or Contractor, to receive his answer and determine thereupon either to dismiss the Complaint or to refer it to the Presidency and the weavers if dissatisfied with the conduct of the Collector may themselves represent their case at the Presidency. But in order that the encouragement may not hence be taken for false or frivolous complaints, in the view of eluding the performance of

fair argument or of procuring improper advantages, all manufacturers are hereby informed that Complaints which are found to be really groundless will be duly punished, and of this, Collectors are also desired to take proper notice".

Appendix No. 1C

Another set of Regulations was issued on the 23rd July 1787

Regulation I: "The weavers shall give at least a fortnight's notice when they intend not to take further advances".

Regulation II: "If they have not fulfilled their engagements by the period agreed on, they shall not work for newer engagements nor for bazar sales, until those engagements are completed".

Regulation III: "When any weaver fails to deliver cloths-at the stipulated periods he has engaged for, the Company's agent or representative shall be at liberty to place peons upon him, in; order to quicken his deliveries".

Regulation IV: "If notwithstanding, any weaver shall by himself or any other persons, sell cloths to private merchants,, European or natives, dealers or agents of whatever kind, whilst he is deficient in his stipulated deliveries to the Company, such offender may be prosecuted in, the Dewanee Adaulut and upon conviction shall be adjudged to forfeit cloths so sold with costs of suits besides and moreover be still obliged to complete his engagements".

Regulation V: "Persons procuring from weavers in the Company's service, by the offer of ready money or on pretence of previous engagements which are not avowed, cloths really wrought for the Company and with advances, knowing such cloths to be the right of the Company, either by the-mark upon hem or the transactions between the weavers from whom they procure them and the Company or having reasons for such knowledge from the notoriety of those weavers being in the company's employ, shall on the proof of the fact in the Adauluts, be subjects to such punishments as the nature of the offence may appear to deserve".

Regulation VI: "A list of register of the weavers employed by the Company in every Pergunnah with their places of abode, shall be stuck up by the Commercial Agents there, in the cutcherry of that Pergunnah."

Appendix No. 1D

Additional supplement to the Regulations for weavers 30th September 1789

Regulation XV: "weavers possessed of more than one loom and entertaining one or more workmen shall be subject to the following penalties on failing to deliver cloth at the stipulated period expressed in written agreement. To the Company, or every piece of cloth not delivered according to the agreement, 35 percent on the stipulated price of such cloth, besides the repayment of money advanced for the same".

Appendix No. 2

The form of engagements entered into by the weavers employed under the Dacca factory for the provision of the investment of 1791 was as follows: (Recorded in the Proceedings of the Board of Trade (Commercial) 10th May, 1791, Prog no. 34, Vol. 92).

"We . . . weavers of the aurung . . , fully understanding the contents of the Regulations of the 23rd July 1787 and 30th October 1789 engage to manufacture on account of the Company the several qualities of cloths—the thread of the warp and woof shall be properly twisted and sorted, the 32 folds shall be made well and even throughout and the cloths shall be all of the established dimensions in length and breadth."

"Our deliveries shall consist of three letters, A, B and C. Should any of them being compared with 'the musters be judged inferior to C, they shall be ferretted and held in the deposit in the Cotee and we will in the course of the next Kist replace them with cloths equal to the musters. The cloths will then be returned. Should we fail to replace them with proper cloths within the appointed period they shall be sold at public auction and credit be given to us for the sales after deducting 15 percent as compensation for the interest, risk and charges. In cases, where any of us possessing more than one loom with journeymen fail in our stipulated deliveries, we will pay according to the Regulation of 30th Sept., 1789, a penal of 35 percent on the amount together with repayment of the advance received".

Appendix No : 3

No. 3A

Petitions of the Weavers

Petition from the Dacca Weavers—no date received by the Board of Trade 7th. February 1775 recorded in the Proceedings of-Board of Trade (Commercial) 10th Feb., 1775, Vol. I.

“Time out of remembrance, the goods of this place have been furnished to the Company by means of Dellolls and Pycars and a fine trade allowed.. In 1181 (Bengalee year) when Mr. Barwell was Chief, Mr. Day and Bikkrum Takoor having dismissed the Dellolls and Pvcars received themselves the Company's advances after which Mr. Day and Bikkrum Takoor having called us before them ordered us to bring them cloths equal to the musters of Mr. Cartier and they would give us 20 per cent more than We received from Mr. Cartier. We answered that Mr. Grueber arid Bikkrum Takoor wanted to give us 25 per cent the year before but we gave for answer that by the Famine a great number of peoples died and materials were become scarce and dear and we would not consent to this proposal of Mr. Grueber. Bikkrum Takoor told us that he would have the cloths from us, that they should be equal to Cartier’s musters and that we should have no more than 20 percent advances. When we heard this, we were afraid and ran away. But we were seized by force “by peons and brought back when Mr. Day and Bikkrum Takoor told us to make our cloths better than last and they would take from us, the letters A, B & C at an advanced price of 20 percent. Having said this they gave us money after which we did our business for the Company in security but the cloths we had of our own or belonging to Merchants, Mr. Day and Bikkrum Takoor forcibly took from us and for every Rupee worth wanted to give us 8, 9 or 10 annas for which reason, we would not take the money. After this, peons were placed over us and were forced to take advances and give Receipts for them and obligations were demanded from us that we would furnish no other Merchants with goods. To this, we made great objections but were forced to comply. After this, we made our cloths of the first quality or letter A when our goods were assorted into six letters”.

“We complained of this, but were driven out of this Factory Mr. Day and Bikkrum Takoor took a large quantity of the Company’s cloths for themselves and fixed the price at 10 or 12 annas in proportion to a Rupee which price they wanted us to take. Never any gentlemen behaved in so oppressive a manner before”.

Appendix No. 3B

Petition from the weavers of Sonargong under Dacca factory-no date received by the Board of Trade 10th Feb., 1775 and recorded in the Proceedings of Board of Trade (Commercial) 10th Feb. 1775, Vol. 1.

"From time immemorial our families have worked for the Company under Dellolls and Pycars. We received advances and furnished goods to their account. In the year 1181 (Bengalee year), Mr. Harwell took from Mr. Day and the Dellolls, the charge of this factory, and himself gave orders to the Dellolls. After this Mr. Harwell and his Dewan, Narain Das, came to Sonargong and ordered that we should make cloths equal to the muster of those made in Mr. Cartier's time and he would give us 20 percent more than we had from Mr. Cartier. We answered that the last year Mr. Gruebar offered to give us 25 Rupees advances in each hundred rupees but that a great number of weavers, *Cuttanies* having died in the famine, the price of materials, had been raised and we could not consent to Mr. Grueber's proposition. This year, Mr. Day ordered us to produce cloths of a better quality than the last year of the 1st, 2nd and 3rd quality and he would take them and he would give us 20 per cent more than the price of last year and having made this often, he advanced us money after which Mr. Day confined us and took an obligation from us that we could not be employed for any other Merchants. After this we had made our cloths of a good quality and Mr. Day came to Sonargong and examined them as being of the first three qualities A, B & C after which he returned to Dacca with the cloths when he rated the quality of the cloths at D, E & F and insisted that the prices should be in proportion. We complained heavily of this grievance when Sepoys were ordered to beat us and drive us away. In the same forcible manner, we have been obliged to furnish our cloths for the whole year and have never had the advance of 20 per cent, paid to us as agreed by Mr. Day."

Appendix No. 3C

Petition of the sundry weavers of Santipore, Nuddia and other places (under Santipore) delivered to Mr. Bebb at Santipore, the 12th July 1786 recorded in the Proceedings of Board of Trade (Commercial) 25th July, 1786 Prog. No. 6, Vol: 51, Part II.

"For many years, we have been employed to make cloths for the Company but since the business of the aurung has been carried on by contract, we have suffered great hardships. During the management of Mr. Beauland, Kissore Sandel his gomastah, Iris delloll and the servants who carry on the present contract for the Investment of 1784-85, we have not been able to supply ourselves with food or cloths because superfine cloths are prized as only fine, fine as middling and middling cloths are ferretted and then retained as the Dutch (or ordinary) sort at an under price. Advances are made to us for Nainsooks, and when we deliver them, they are also ferretted, termed Dutch and retained at an under price. From such dealings, we are great sufferers and threads being extremely dear we are under the necessity of selling our households utensils for our subsistence and can no longer remain here. We are at a loss how to represent all we suffer from Mr. Beauland and the present gomastah and servants. We request of you, Sir, to put persons in the aurung who are experienced in the manufacture of cloth and let us deliver cloths agreeable to the Sudder (Export Warehouse) musters and we will cheerfully go on with our work. The cloths that may be ferretted upon the musters, we desire may be returned to us. If the gomasta and all the present servants at this aurung are removed and others sent instead of them, we will remain and carry on the business but if not, we cannot, stay here and live. We are poor people. We await your orders".

Appendix No. 3D

Translate of a petition presented by the weavers of Cooties Mohunpore, Duguapore, Ramchunderpore and Maurker Mokaums subordinate to Sonomooky. No date Recorded in the Proceedings of Board of Trade (Commercial) 8th July, 1791, Prog. No. 46, Vol: 93.

Firstly, "we have from time immemorial been employed by the Company and furnish cloths according to our advances and Have never been beaten or otherwise maltreated but in this pre sent year, the Gentleman at the Sorool Cooty beats and ill-treats us. We are poor artifices and cannot remain and work under such treatment as we now receive".

Secondly, "at the different factories, Taggudgars are employed but notwithstanding this, peons are put upon us who occasion a very great expense to us. We are poor artificers and the unjust charge for peons occasions great loss to us; and therefore cannot at this rate fulfill our engagement but wait your commands".

Thirdly, “we now continue to deliver to the Company cloths of the same quality as we have always been accustomed to deliver but now these cloths are refused to be received and are ferretted and afterwards are purchased from us for ready money which not only occasions a great loss to us in the price but disables us from completing our' deliveries. We are poor people and are ruined by this practice”.

Fourthly, “advances are forcibly made to those weavers among us who are unable to make cloths of the Company’s assortments and therefore these weavers are obliged to purchase their cloths and deliver them to the Company at the loss of one rupee per piece. We are poor men and are not able to support this loss and therefore beg that these weavers may be exempted from taking advances.”

Fifthly, “the Company’s cloths have always been washed at Dignagur Cooty but now the washing place is changed to the Sorool Cooty and the cloths are transported from Dignapur to Sorool Cooty upon bullocks and are during the trip obliged to cross 3 or 4 rivers which during the rainy season occasions the cloths to be stained in many places and are also dirtied by mud getting to them. The occasions the cloths to be ferretted and we are obliged to pay as a fine upon every piece of cloth that is rejected fifteen gundas. This fine was never formerly imposed and we afterwards experience a great loss in selling these cloths which are rejected on account of stains. We are poor people and beg that the washing of the cloths may again be performed at Dignapur and then we shall be able to retain and fulfill our engagements.”

Sixthly, “we last year went to Culcutta and brought from thence a Hookumnamah from the Board of Trade which we gave to the Gentleman at Sorool which Hookumnamah is now in his possession and contained an order that weavers should only worek for the company voluntarilly and without compulsion. Not withstanding this, weavers who are not inclined to take advances from the company are beaten and otherwise forced to receive them and further those weavers who are not inclined to enter into engagements any further than what they could fulfill are forced to recive more advances than they can manufacture for. We are poor artificiers and are labouring underb this injustice. You are the master of the country and we humbly beg for redress that we may be able to remain in security. This is our request”.

Signed Godadhur Dutt, Nayan Doss
Neetaee Kaar, Manick Naik,
Khanoo Sook, Rogonaut Doss

Appendix No. 3E

The petetion of weavers and working men of aurung Hurripaul and six dependent aurungs there. No date recorded in the Proceedings of the Board of Trade (Commercial) 29th November 1791, Prog. NO. 80, VOL.95

"That formerly our piece gods had been measeured in our upresence and if any piece thereof had been a little less in measurement, then price of that less had been deducted according to custom and the proce never had been refused to be taken but in this year on the contrary of the same- Debnath Bundapauda cloth measure, ou of his covetousness of receiving bribe artfully in our absence.made our Gold Head Pieces less in his second measurement, after thwy were washed in their first wash and were sorted by Thomas Philpot Esqr.- tho, be the said cloth measure has made them perfect pieces in hs first measurement when they were unwashed. Thomas Philpot Esqr. Not only refused to take these pieces in customable less price but also cut their four corners in order to render them unvendable for proper rate (which will be 600 to 700 pieces in number and therefore some pieces we bought with us to show you) and also some of us whose piece were so done, he brininging to Factory put their leggs into the stocks till two whole days, without eating and drinking and next day he coming himself then gave each of them twelve strokes with rattan in binding his' hands to a pillar and insisting peons upon him took back from his rupees instead of taking from him in a few days according to custom, other perfect pieces for his so done less pieces. Though at present we have been weaving pieces more broad than sample pieces and yet Thomas Philpot Esqr. by instruction of the said cloth measurer refuses to take them, saying they are less in breadth".

Appendix No. 3F

The following is translated of a petition which has been presented to the Board of Trade by some weavers of Dacca factory: Recorded in the Proceedings of the Board of Trade, 31st March 1794, Prog. No. 22, Vol. 109, Part II.

"We have for a long time taken advances for several sorts of cloths and have delivered cloths of the letters A, B & C agreeable to musters. Whenever any small quantity has been forretted they have been taken into the letter D. Mr. Taylor for the first two years of his Residency acted accordingly. But since the last year that Gentleman colluding with this Jassendar and Gomastah has ruined us and we are left

without the means of support. He lowers the price of every assortment. Cloths of 2100 are taken as 2000 threads in the letters C & D and even as 1900 threads and the handkerchiefs middling are taken as ordinary in the letters C & D. In this manner the aforesaid gentleman takes every other assortment at an undervalue and unfair prizing. Besides this, having made advances on his own account, he received a few pieces as A, B & C and ferretting the remainder, he required us to give writing for the delivery of them as D. We desired that they might be compared with the musters and taken accordingly, but to this he paid no regard and we being remediless gave the writing. Thus, year after year, according to his pleasure, he takes the cloths in 7 and 8 letters. He also takes cloths of 10 Rupees price at Rupee five in the 2nd, 3rd, and 4th letters and thus he takes every assortment. Moreover, last year and also this year, he has taken cloths in 10 and 12 letters. In this manner, large balances have been made to be owing to him on his own account, which afterwards have been deducted from the Company's advances in consequence of which the Company's business had fallen in arrears. Further, the said gentleman complaining in the Dewanee Adawlut has caused 10 or 15 weavers to be confined in the Jail. Never before did any gentleman practice such oppressions. On pretence, of our failure in the Kistbundee, he demands 35% profit and 1% interest. On hearing this, we remonstrated personally with the gentleman but were told by him that the money must be paid. Being this injustice, we were about to come to Calcutta when the gentlemen hearing our intention sent for us and without making any investigation told us that he acted by the Board's orders and that we must pay the money. Afterwards, the gentleman having beaten us said we might apply to the Board but that it would not avail us. In the time of former gentleman, Kistbundees were settled but we who labour for our daily support never then paid any profit or interest. These gentlemen conducted the business so as to conciliate the weavers but Mr. Taylor endeavors to effect our ruin. We request that these matters may be enquired into".

Dated 3rd Choit 1200 B.S.

Appendix No. 3G

Translation of petition of Kallee Churn and others, weavers of Chittagong aurungs dated 12th Jyta, 1200. Recorded in the Proceedings of the Board of Trade (Commercial) 28th May 1795, Prog. No. 32, Vol. 110.

The undersigned persons deputed for Kashoob Kona, Roton Rohunaut, Dyaree Bona, Bobanee Kata, Shanta Bubugan Bona, Gopee Kora and others to the number of three hundred and sixty weavers in the village of Chore Bahamonee in the Pergunnah of Sundeep under the Zillah of Islamabad, humbly represent that from the English year 1789 to 1793 (altogether 5 years) in the time of Mr. Harris and Mr. Coales, Mya Govindee, gomastah, when he made advances for the cloths, grievously oppressed us the particulars of which this petition is going to set forth.

1. At the aurung of Luckipore, no batta upon Sicca rupee is taken but the aforesaid gomastah unjustly takes yearly 17.5 gundas out of every rupee that he pay us.
2. He gets rupee of full weight from the Collector's treasury and gives us those that are deficient.
3. From the year 1789 to 1793 (five years) he deducted from our advances one thousand six hundred and twenty rupees which he said was for the Collector's use.
4. At the end of the year, the said gomastah under the pretence that there is a deficiency in the measurement, deducts four annas, eight annas or a rupee from the price of each piece but was he to act fairly we should get the full value of them. By this means, we never receive above half the wages that are justly our due.
5. We understand that upon the balance due from to theCompany from the weavers, no interest is ever charged but thesaid gomastah takes it from us by force.
6. When a weaver commits a fault, he is fined if he is not able to pay ready money, the said gomastah makes him givea Bond for the amount.
7. He charges five or six annas to each man for Dawan's fee.
8. Kinnor Ram, the writer, Halup Zemmidar and the Zilladar, the servants of the said gomastah make their own private advances of two rupees for a piece of cloth, but take those of four rupees value without the permission of the Company.

9. When we take our cloths to him, he does not put a fair valuation upon them, but prizes them at one rupee or one rupee and four annas less than they are worth.

We, the 360 weavers above mentioned do not like this said Mya Govindee gomastah. We humbly request that another may be appointed and that you will summon him to Calcutta and enquire into the affair or else that you will be pleased to write to the judge to examine into it.

Appendix No. 3H

Translation of a petition from the weavers of Sonabarreah aurung, a dependency of the Santipore factory to the Board of Trade, dated 26th January, received 30th January, 1801. Recorded in the Proceedings of the Board of Trade (Commercial) 3rd February, 1801, Prog. no. 9, Vol. 151.

"We have been in the Hon'ble Company's employ a long time and delivered cloths agreeable to the advances made us which were appraised on musters and received. For the last six or seven years Jogomohun Chowdhury, the gomastah and Ramanund Bhadoory, the Cash Keeper of the under factory at Monohurgunge have taken a perquisite of one rupee upon every eight or nine rupees of the advances made us, before they will pay the money. When we have wove cloths, of the sort for which we have received advances we deliver them to the gomastah of the Under Factory who examines and receives them after which Seebram Sandyal and Pawchoo Jawchondar in concert together change all the descriptions of the cloths in our absence at Sonabarea prize them as third, fourth and fifth letter and after dispatching the same to Calcutta put down the prizing in our tickets. In this manner, they cause us a loss of three or four rupees per piece".

"He deducts half an anna out of every rupee as brokerage. We do not know what species of money they receive from Government but when there is batta on Gold Mohurs, they pay us in that coin and when there is a premium of Gold Mohurs, they give us rupees of all descriptions, deficient, one anna or one anna and a half each, whereby we suffer heavy losses. Labouring under all these oppressions, we going to ruin. We, therefore, pray that the Board will be pleased to summon the Head gomastar Seebram Sandyal, Pawchoo Jawchondar, Jogomohon Chowdhury, the gomastah and the Cash Keeper Ramanund Bhadoory and grant us redress".

Appendix No. – 4

List of Assortments Manufactured in Bengal between 1750 and 1800 Classified by Place of Manufacture and Export

Assortment	Place of Manufacture	Export Market	Quality
Addatis, addis	Harial, Dhaka, Malda, Kassimbazar	London re-export	Fine *malmal* with gold thread
Achhabani	Sonamukhi	London re-export	Fine Cotton
Allabani	Duniakhali, Hughli, Malda	London re-export	Silk and Cotton striped
Allaballi	Songargaon	ab	Very fine white *malmal*
Abrawahs	Dhaka	ab	Fine *malmal*
Baftas	Birbhum, Jagdia, Patna, Chittagong, Lakhipur, Rangpu	Barsra, Acheen, Malacca, Mocha, Jeddah, Pegu, Manilla	Ordinary plain cotton
Bandannoes *(Bandhana)*		London re-export	Silk scarves dyed in the thread
Caradari	Burdwan, Midnapur Harial	London re-export Europe	Silk and cotton striped or checked
Callapatti	Lakhipur	b	
Chillaes		London	Blue and white striped handkerchief
Chucklaes	Midnapur and Patna		Mixed silk and cotton
Cultanis	Sonamukhi		Mixed silk and cotton
Cushtaes (from Kushtia)	Burdwan, Nadia	b	Mixed cotton and silk stripes or checks
Chintz Chaharkhana	Midnapur, Dhakal Hughli	London re-export	Silk and cotton checked cloth
Chowbars	Hughli, Midnapur	a	White thick calicoes
Coopris	Midnapur	ab	Plain white
Mugadhuti	Assam		Wild silk
Malmal	Dhaka, Santipur, Midnapur, Balsore, Malda, Kasijura Shabazar (Lakhipur)	Europe	Finewhite/embroidered
Mushroes Nillaes	Harial Midnapur, Balasore		Striped blue cloth *tasar* and cotton
Nainsukh	Haripal, Dhaka	b	Plain superior used for neck-kerchiefs
Peniascoes *(Panaskil)*	Midnapur, Patna		Colored from pineapple fiber
Photaes	Gollaghar	b	Dyed calico coarse to medium
Roomals *(soot roomals)*	Burdwan, Barangar Gollaghar	Manilla	Handkerchief
Raing	Dhaka	Europe	Transparent *malmal* 1 thread passes through each reed
Sannas	Midnapur, Balasore Patna	Amboyne, Borneo	Plain flax or linen , medium quality

Sera *Sakhara* (Seersucker)	Santipur Midnapur Haripal, Malda		Silk and cotton crepe like turbans
Shalbashta	Midnapur		Shawls
Soosi	Malda, Harial, Burdwan, Radhnagar	Amboyne, Borneo	Striped or checked silk and cotton
SarkarAli	Dhaka		Fine muslin
shabnam	Dhaka	b	Plain muslin
Tanjeb	Buddaul, Dhaka Malda	Manila, London	Superior plain cotton embroidered
Terrandam	Santipur, Dhaka, Buddaul. Haripal, Burdwan, Patna	Manilla	Fine plain muslin

Embroidered	Place of Manufacture	Quality
Chikan	Dhaka(Dhamrai)	*embroidered with Muslin white cotton thread*
Kashida	Dhaka, Malda	*Muslin embroidered with silk thread*
Tartore	Dhaka	New design introduced in 1789
Samadlahar	Dhaka (Sonargaon)	
	(Samadlahar thread was made in Jangalbari and sent to Sonargaon for embroidary)	

Appendix *(Contd.)*

Additional Assortments listed in Private Trade	
Baftas	Dhaka
Saris. Lungis, Dhutis.	Kassimbazar
Koruses,	Birbhum *Cockpattis, Kaberdul, Nababy,*
Brossboy, Chierhari,	Radhnagar
Plachas, Mushroes	Malda
Lawn	Midnapur *Duriya Muga Sarpeach*

Source: D.B Mitra, The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833, p. 186

Appendix No. -5

Types of Merchants/Organizations Involved in Textile Trade

A JOINT STOCK COMPANY (at *entrepots* or nodal market or *arangs)*

East India Company - Calcutta - Fact, residencies - *arangs*
Danish East India Company - Srerampur - through British private merchants
French East India Company - Chandernagore - agencies - *arangs* (either through private agents or Company servants)
Dutch East India Company - Chinsura - private agents and Company servants

B MERCHANTS (at *entrepots* or nodal markets, *arangs)*

1. European — French, British, Dutch, Portuguese
2. Americans
3. Others — Mughals, Poggiahs, Bhutias, Pathans. Gujeratis, etc.

C MERCHANTS (indigenous)

1. Wholesale Merchants (at nodal markets, *arangs):*

a. Mahajans — Small capital, hired vessel*
b. Saudagar — Large capital, possessed vessels — Subarnabanik Caste
c. Goswami — Religious group, small merchants, bought cloth and silk from Bengal, sold West Indian cotton at Mirzapur
d. Basaks and Seths — Kayasths who had taken to weaving. — Chotobhagio tanti

2. Retailers (in the *arangs)*

a. Kupreeas — Capital of Rs 500 to Rs 1000
b. Amdewala

3. Intermediaries (in the small or primary markets):

a. *Paikars* — Capital of Rs 100 to Rs 500;
b. *Shikdars* — Sold cotton at Mirzapur
c. Dalals — Commission agents for merchants and Company

Source: Buchanan Hamilton, *Dinajpur.* Taylor, *Dacca.* Wise, *Castes, Occupations and Trades of East Bengal*

পরিশিষ্ট-৩

গবেষণার বিষয় ঃ "বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তন ঃ প্রেক্ষিত বৃহত্তর ঢাকা"

Rise and Development of Weaving Industries in Bangladesh with Special Reference to Greater Dhaka

প্রশ্নমালা

১. বাংলাদেশের তাঁতশিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

২. আপনার এলাকার তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।

৩. এ এলাকায় তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পিছনে কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন।

৪. আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।

৫. বর্তমানে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলি কি কি ?

৬. কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

৭. বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায়।

৮. শ্রমিকদের বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থা কি ?

৯. শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

১০. মালিক পক্ষের অসুবিধা গুলো কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

১১. মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

১২. আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী / বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারী নাম:..
পেশা: ....

ঠিকানা: ....

বয়স: ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

পিতার নাম ও পেশা: ....

সাক্ষাৎকারসমূহ

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ সবুর মিয়া পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৪৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাইমারী পর্যন্ত পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আবু তাহের, তাঁতী ছিলেন।	

প্রশ্ন-০১ঃ বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

উত্তরঃ তাঁত শিল্পের অবস্থা ভাল না। কাপড়ের দাম পাওয়া যায় না। আগের চেয়ে অনেক কম লাভ হয়।

প্রশ্ন-০২ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ বৃটিশ আমল হতে তাঁত ছিল। আগে গামছা বানাইত। সংগ্রামের পর হতে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-০৩ ঃ আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ রূকুন সাব এক সময় এই দেশে তাঁত আনে। তার দেহাদেহি অন্যরাও তাঁত মেশিন আনে। পরে রূকুন সাব পাওয়ারলুম ফ্যাক্টরি দেয়। এখন তিনি ডাইং চালায়। অনেক বড়লোক।

প্রশ্ন-০৪ ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ হাসনাবাদ বাজারে অনেক তাঁত মাল পাওয়া যেত। অহনও পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-০৫ ঃ বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি ?

উত্তরঃ সুতার দাম বেশি। ময়দা ও বালির দামও বেশি।

প্রশ্ন-০৬ঃ কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

উত্তর ঃ কয়েকদিন আগেও সুতার দাম ছিল ৭০০ টাকা। অহন এইডা ২০০০ টাকা। সুতার দাম কমাইতে অইব।

প্রশ্ন-০৭ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় ?

উত্তরঃ মালিকরা হাটুভাঙ্গা বাজারে বিক্রি করে। বড় ব্যাপারীরা কিইনা নিয়া যায়।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি ?

উত্তরঃ ভালোনা। আমাগো বাপেরাও এইডা কইরা খাইছে। আমরাও এই কাম ছাড়া অন্য কাম পারিনা। লাভ না হইলেও এইডা কইরাই খাইতে অইবো।

প্রশ্ন-০৯ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ আমার বাচ্চারা আল্লার মাল ভালই আছে। আমার তিন মেয়ে। লেখাপড়া করে নাই।

প্রশ্ন-১০ঃ মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

উত্তরঃ	অসুবিধা হয় না। সপ্তাহে একবার টাকা দেওয়ার কথা সেখানে দুই/তিন বারও দেয়।
প্রশ্ন-১১ঃ	মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?
উত্তরঃ	কোন অসুবিধা হয় না।
প্রশ্ন-১২ঃ	আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?
উত্তরঃ	সরকার যদি সুতার দাম কমায় তাহলে আমাগো উপকার হয়। মালিকরা আমাগো বেতন বাড়াইতে পারবো।

---০---

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ হাসান আলী মৃধা পেশা ঃ মোকাম (পূর্বে তাঁতী/মালিক ছিলেন) ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৬৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাই পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত পানা উল্লাহ মৃধা, কৃষি ও বাঁশের কাজ করতেন।	

প্রশ্ন-০১ঃ	বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।
উত্তরঃ	তাঁত শিল্পের অবস্থা ভাল। তবে কাপড়ের দাম পাওয়া যায় না তাই ব্যবসা ছাইড়া দিছি।
প্রশ্ন-০২ ঃ	আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।
উত্তরঃ	৭১-এর পরে তাঁত শিল্পের বিকাশ। আমার ১০০ তাঁত ছিল। তখন সন্ধ্যার পর এলাকা মেলার মত জমজমাট ছিল। ৪০,০০০ তাঁতী পরিবার এই এলাকায় ছিল। ১,২০,০০০ শ্রমিক ছিল। বর্তমানে তা নাই।
প্রশ্ন-০৩ঃ	আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন ?
উত্তরঃ	প্রথম চাঁদপুরের কিছু লোক এই এলাকায় আসে। তারা এই বিদ্যাটা জানতো। তারাই প্রথম আমাগো শিখায়। পরে আস্তে আস্তে এই শিল্প গড়ে উঠে।
প্রশ্ন-০৪ঃ	আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।
উত্তরঃ	প্রথম কিভাবে আসে জানা নাই। পরে নারায়নগঞ্জ থেকে প্রচুর মাল হাসনাবাদ বাজারে আসতো।
প্রশ্ন-০৫ঃ	বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি ?
উত্তরঃ	সুতার বাজার দ্বিগুণ হয়েছে। এলাকায় কোন মেশিন নাই। আগে যেখানে হাজার হাজার মেশিন ছিল সেখানে এক এলাকায় একটার বেশি মেশিন চোখে পড়বো না।
প্রশ্ন-০৬ ঃ	কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

উত্তরঃ মেশিন বসাতে হবে।

প্রশ্ন-০৭ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় ?

উত্তর ঃ আগে হাসনাবাদ অহন হাটুভাঙ্গা বাজারে বিক্রি করতে হয়। নিজস্ব লোগো ও প্যাকেজিং মেশিন থাকলে ভালো হত।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি ?

উত্তরঃ কেউ বিদেশ গেছে, কেউ মাছ বিক্রি করে। কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

প্রশ্ন-০৯ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ স্বাস্থ্য ভলো না। কেউ লেখাপড়া করায় কেউ করায় না।

প্রশ্ন-১০ঃ মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

উত্তরঃ মাল বেইচা লাভ হয় না। শ্রমিকের দাম বেশি। সুতার দাম কমাইতে হবে।

প্রশ্ন-১১ঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ভালো।

প্রশ্ন-১২ঃ আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ আমাদের দেশে যদি তুলা থেকে সুতা বানাইয়া কম দামে বেচতো। আর নারায়নগঞ্জের ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স না দিয়ে আমদানী না করে দেশী তুলার দাম কম রাখতো তবে ভাল হতো।

-----০-----

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ আবদুল হেকিম পেশা ঃ তাঁতী (মালিক) ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৬৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ প্রাইমারী পর্যন্ত পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আবদুল মজিদ, কৃষক ছিলেন।	

প্রশ্ন-০১ঃ বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

উত্তরঃ এক সময় আমাদের দেশে অনেক তাঁত ছিল। পুঁজির অভাবে বর্তমানে তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি সুবিধা পাইনা। কুমিল্লা এখন ভাল। পাবনা ও কুষ্টিয়ায় তাঁতের বাজার অনেক ভাল। তাদের অনেক জাপানি হ্যান্ড লুম আছে।

প্রশ্ন-০২ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ আনুমানিক ১০০ বছর আগে শুরু হইয়া এখনও চলতাছে।

প্রশ্ন-০৩ঃ আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তরঃ চর্চার মাধ্যমে একজন লোক প্রথম শিখছে। সে মানুষরে শিখাইছে। নতুন নতুন জিনিষ আমদানী করছে।

প্রশ্ন-০৪ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ কাঁচা মালের খুব অভাব। নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সিন্ডিকেটরা সুতার বাজার বাড়াইছে। অহন আমাগো অনেক দাম দিয়া মাল কিনতে হয়।

প্রশ্ন-০৫ঃ বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি ?

উত্তরঃ পুঁজি নাই। সুতার দামও বেশি। শ্রমিকরা মজুরিও বেশি চায়।

প্রশ্ন-০৬ ঃ কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

উত্তর ঃ সব কিছুর দাম কমাইতে অইব।

প্রশ্ন-০৭ ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় ?

উত্তরঃ প্রতি হাটে ৪০ টা লুঙ্গি বিক্রি করে। আবার চাহিদা থাকলে বাড়ি থেকেও নিয়া যায়। যদি সরাসরি মোকাম দেওয়া যাইত তাহলে লাভ বেশি হইত।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি ?

উত্তরঃ বেশি ভাল না। দৈনিক ৬টা লুঙ্গি থেইক্কা পায় ১৫০ টাকা। এক বেগুনের দাম ৮০ টাকা। কেমনে হেগও অবস্থা ভাল অইব।

প্রশ্ন-০৯ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ খোঁজ নিতে পারিনা। আমার অবস্থাই ভাল না, আমি কেমনে তাগ খোঁজ লমু ?

প্রশ্ন-১০ ঃ মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

উত্তরঃ শ্রমিকদের চাহিদা বেশি। তাগ বেতন বাড়াইতে অইব।

প্রশ্ন-১১ঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ সম্পর্ক ভাল।

প্রশ্ন-১২ঃ আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ সুতার ব্যাপারীগো সিন্ডিকেট যদি সরকার ভাঙ্গতে পারে তবে কিছুটা উন্নতি অইব।

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ ইসমাঈল পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা ,নরসিংদী বয়স ঃ ৫৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাই পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আব্দুল হাসিম, তাঁত শ্রমিক ছিলেন।	

প্রশ্ন-০১ ঃ বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

উত্তরঃ বাংলাদেশে তাঁত শিল্প আমাগো এলাকায় পরথম। চসুবুদ্ধি, হাইরমারা, রায়পুরা এই এলাকায় পইলা শুরু অইছে।

প্রশ্ন-০২ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ সংগ্রামের পর হইতে শুরু অইছে, অহন খুব বেশি নাই।

প্রশ্ন-০৩ঃ আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ বুঝের পর থেইকা দেখতাছি। কেন অইছে জানিনা।

প্রশ্ন-০৪ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ আগের থেকে এখন মাল অনেক কম পাওয়া যায়। আমরা ছোট বেলা যেই ঘরে তাঁত মাল দেখছি এখন সেই ঘরে কাঁচা তরকারি বেঁচে।

প্রশ্ন-০৫ঃ বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি ?

উত্তরঃ আমাগো শরীর আর কুলায় না। পেটের দায়ে করতে হয়।

প্রশ্ন-০৬ঃ কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

উত্তরঃ এমনে কোন অসুবিধা নাই। বুনতেও কোন সমস্যা হয়না। মালিকরা মাল দেয় আমরা বানাই।

প্রশ্ন-০৭ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় ?

উত্তরঃ মালিকরা হাটুভাঙ্গা বাজারে বেঁচে। সেখান থেকে মোকামরা কিনে নিয়ে যায়। শেখেরচর বাজারে বেঁচলে লাভ বেশি পাইতো।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি ?

উত্তরঃ আমার কোন জমাজমি নাই। এইডার আয় দিয়া আধপেটা থাকি। ২০০০ টাকা ঋণ আছে। মনে হয় কোন দিনও শোধ দিতে পারুম না।

প্রশ্ন-০৯ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ আমার পাঁচ মেয়ে। বড় জনের বয়স ১৩ বছর। সামান্য লেখাপড়া করছে। পরে আর লেখাপড়া করাইতে পারিনা। প্রাইভেট পড়ার টেকা দিতে পারিনা।

প্রশ্ন-১০ঃ মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

উত্তরঃ মালিক বলে সুতার দাম বেশি তাই লাভ হয় না। সুতার দাম কমাইতে অইব।

প্রশ্ন-১১ঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ সম্পর্ক ভাল।

প্রশ্ন-১২ঃ আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ সরকারের সুতার দাম কমাইতে অইব। আর আমাগো মজুরী বাড়াইতে অইব।

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য		ছবি
নাম পেশা ঠিকানা বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা পিতার নাম ও পেশা	ঃ মোঃ হারুন মিয়া ঃ তাঁত শ্রমিক ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী ঃ ৬৫ বছর ঃ নাই ঃ মৃত সিরাজ মিয়া, তাঁতী ছিলেন।	

প্রশ্ন-০১ঃ বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।

উত্তর ঃ বাংলাদেশে রায়পুরা, পাবনা ও কুষ্টিয়ায় তাঁত আছে। এই তাঁত চালাইয়া পরিবারের ভরণ পোষণ হয়। এইডাইতো জানি।

প্রশ্ন-০২ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ ২০০ বছর আগে থেইক্কা শুরু অইছে এবং এই রায়পুরাই পরথম শুরু অইছে। পরথম যহন লাইলন দিয়া আমরা কাজ করি তহন দরজা লাগাইয়া বানাইতাম। কারণ মানুষ শিইক্ষালাইবো। পরে মানুষ দেইক্ষা শিখছে।

প্রশ্ন-০৩ঃ আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তরঃ মনিপুরা যোগি (ভারত থেকে আসা হিন্দু সম্প্রদায়) বাড়ি আছিলো। তাগো একটা বংশ পয়লা শুরু করছে। পরবর্তীতে বংশানুক্রমিক বিস্তার পেয়েছে।

প্রশ্ন-০৪ঃ আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ এখন সব পাওয়া যায়। বাড়িতেও সবাই কাম করে।

প্রশ্ন-০৫ঃ বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি?

উত্তরঃ কোন অসুবিধা নাই।

প্রশ্ন-০ঃ কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায়?

উত্তরঃ অসুবিধা নাই।

প্রশ্ন-০৭ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায়?

উত্তরঃ হাটুভাঙ্গা বাজারে পাইকারগো কাছে বিক্রি হয়। নরায়নগঞ্জ নিয়া বেচলে দাম বেশি পাওয়া যাইবো।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি?

উত্তরঃ আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে। আমার আর্থিক অবস্থা ভাল না। আগে এই আয় দিয়া চলতো। আগে ৬০ টাকা পাইতাম এইডা দিয়া চলতো। এখন ১০০ টাকা পাই তাও ঋণ করতে হয়।

প্রশ্ন-০৯ ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ	অসুখ অইলে ঋণ কইরা অর্ধেক চিকিৎসা করাই। আমার এক ছেলে আমার লগে কাজ করে। পড়ালেখা করে নাই।
প্রশ্ন-১০ঃ	মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায়?
উত্তরঃ	মালিকগর অসুবিধা অইল যা দিয়া বানায় দাম তার থেইকা কম। সুতার দাম কমাইতে অইবো।
প্রশ্ন-১১ঃ	মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?
উত্তরঃ	কোন অসুবিধা হয় না।
প্রশ্ন-১২ঃ	আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?
উত্তরঃ	মালিকগো ঋণ দিতে অইবো। আর সুতার দাম কমাইতে অইবো।

---০---

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান পেশা ঃ তাঁতী (মালিক) ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৫৩ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেণী পিতার নাম পেশা ঃ মৃত মোঃ ইদ্রিস আলী, তাঁতী ছিলেন।	

প্রশ্ন-০১ঃ	বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে আপনার ধারণা বলুন।
উত্তরঃ	বাংলাদেশে সিরাজগঞ্জ, তারাবো, পাবনা, নারায়নগঞ্জ, রায়পুরার বৃহৎ অঞ্চলে তাঁত শিল্প রয়েছে। তবে বর্তমানে আমাদের এলাকায় পুঁজির অভাবে তাঁত শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে এই এলাকার চাহিদাও কমে গেছে। কিন্তু পাবনা এলাকায় এখনো এই শিল্প টিকে আছে।
প্রশ্ন-০২ঃ	আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে বলুন।
উত্তরঃ	সর্বপ্রথম ভারত থেকে নাথ সম্প্রদায়রা আমাদের এলাকায় এসে বসত করে। তাদের মধ্যে জ্ঞান নাথ, ওলঙ্গ নাথ, ক্ষেত্র নাথ উলেখযোগ্য। কেউ কেউ এই সম্প্রদায়কে যোগী সম্প্রদায় বলতো। তারাই প্রথম এই এলাকায় তাঁত শিল্প শুরু করেন। এরপর থেকে আমাদের এলাকার মানুষ দেখে দেখে এর বিকাশ ঘটায়।
প্রশ্ন-০৩ঃ	আপনার এলাকার তাঁত শিল্প গড়ে উঠার পেছনে কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তরঃ	গুলবক্স ভূঁইয়া নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ভুলতা ও কালিগঞ্জে তাঁর সুতার মিল ছিল। এই সুতার মিল গুলোর কারণে এই এলাকায় তাঁত শিল্পে গড়ে উঠে।
প্রশ্ন-০৪ঃ	আপনার এলাকায় তাঁত শিল্পের কাঁচামাল ও তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলুন।
উত্তরঃ	বেক্সিমকো টেক্সটাইল, পদ্মা টেক্সটাইল সুতা তৈরী করে। এখানে তৈরী ভাল সুতাগুলো বিদেশে চলে যায়। তাদের বাদ পড়া সুতাগুলো দিয়ে আমাদের এই হ্যান্ড লুম চলে। এগুলো আমরা স্থানীয় হাটুভাঙ্গা বাজার থেকে সংগ্রহ করি।

প্রশ্ন-০৫ঃ বর্তমানে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের অসুবিধাগুলো কি কি ?

উত্তরঃ বর্তমানে আমরা যে নিম্নমানের সুতা পাই তার দাম অনেক বেশি। যার কারণে শ্রমিকদের বেতন কম দিতে হয়। তাই শ্রমিকরাও কাজ না করে বিদেশ চলে যায়। চাহিদা মাফিক উৎপাদন হয় না।

প্রশ্ন-০৬ঃ কিভাবে এসব অসুবিধা দূর করা যায় ?

উত্তরঃ সুতার দাম কমাতে হবে। কাপড়ের দাম বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন-০৭ঃ বাজারজাতকরণের পদ্ধতি কি ? তা কিভাবে আরো উন্নত করা যায় ?

উত্তরঃ হাটুভাঙ্গা বাজারে বিক্রি করি। এগুলো যদি আমরা ক্যালেন্ডার ও প্যাকেট করে বাজারজাত করি তবে আমাদের অনেক লাভ হত। কিন্তু আমাদের সেই পুঁজি নেই।

প্রশ্ন-০৮ঃ শ্রমিকদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা কি ?

উত্তরঃ তারাও ভাল নাই।

প্রশ্ন-০৯ ঃ শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা ও সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কিরূপ ?

উত্তরঃ তাদের পারিবারিক অবস্থা ভাল না। আমাদের এই রায়পুরা এলাকায় চুরি-ডাকাতির মুল কারণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। তাদের কাজ করে পোষায়না বলেই তারা চুরি করে। সন্তানরা স্কুলে যায় না। বড়দের দেখাদেখি তাই করে।

প্রশ্ন-১০ঃ মালিকপক্ষের অসুবিধাগুলো কি কি ? তা কিভাবে দূর করা যায় ?

উত্তরঃ চালের দাম যদি কমে তবে শ্রমিক পাওয়া যায়। অন্যথায় তাদের Request করে আনতে হয়। মাসের পর মাস বন্ধও থাকে। দ্রব্যমূল্য ও সুতার দাম যদি কমে তবে এই অসুবিধা দূর হবে।

প্রশ্ন-১১ঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ভাল।

প্রশ্ন-১২ঃ আপনার মতে সার্বিকভাবে উক্ত শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নে সরকারী/বেসরকারী কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ?

উত্তরঃ চারটি বিষয়-
১. সুতার দাম কমাতে হবে।
২. কাপড়ের দাম বাড়াতে হবে।
৩. সিন্ডিকেট ভাঙ্গতে হবে।
৪. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই ব্যক্তি আবদুল মান্নান ভূইয়া ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের (২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ) বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী মাহমুদা খাতুন-এর পিতা।

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ আব্দুল হালিম পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৪৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অক্ষর জ্ঞান আছে পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আব্দুল খালেক, তাঁতী ছিলেন।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ জাকির হোসেন পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৫০ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাই পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আব্বাস আলী, তাঁতী ও কৃষক ছিলেন।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ রাইজ উদ্দিন পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ বীরগাঁও, নিলক্ষা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৩৩ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেণী পিতার নাম ও পেশা ঃ মোঃ কালু মিয়া, তাঁতী ছিলেন এখন কৃষক।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ হযরত আলী পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৪৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাই পিতার নাম ও পেশা ঃ শওকত আলী, তাঁত শ্রমিক।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ ফুরুন আলী পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৫৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নাই পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত মোঃ ফজলু মিয়া, ব্যবসা করতেন।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ তপন মিয়া পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৩৩ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণী পিতার নাম ও পেশা ঃ মোঃ সিরাজ মিয়া, শিক্ষকতা।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ আব্দুল হালিম পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৪৩ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৩য় শ্রেণী পিতার নাম ও পেশা ঃ দুদু ভূঁইয়া, তাঁতী।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ আলকাস মিয়া পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ হাইরমারা, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী বয়স ঃ ৩৭ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৭ম শ্রেণী পিতার নাম ও পেশা ঃ মৃত আব্দুল রশিদ, কৃষক ছিলেন।	

স্বাক্ষাৎকার প্রদানকারীর তথ্য	ছবি
নাম ঃ মোঃ গিয়াস উদ্দিন পেশা ঃ তাঁত শ্রমিক ঠিকানা ঃ সলিমগঞ্জ, নবীনগর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া বয়স ঃ ৪৫ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫ম শ্রেণী পিতার নাম ও পেশা ঃ মোঃ রেজাউল মিয়া, কৃষক।	

পরিশিষ্ট-৪

আলোকচিত্র

বেনারশি কারখানা মালিক গুড্ডুর সাক্ষাতকার নিচ্ছেন গবেষক

পাত্তা/ ডিজাইন, বিহারী পল্লী, মিরপুর

বেনারশি মেশিন; বিহারী পল্লী, মিরপুর

জালা, বিহারী পল্লী, মিরপুর

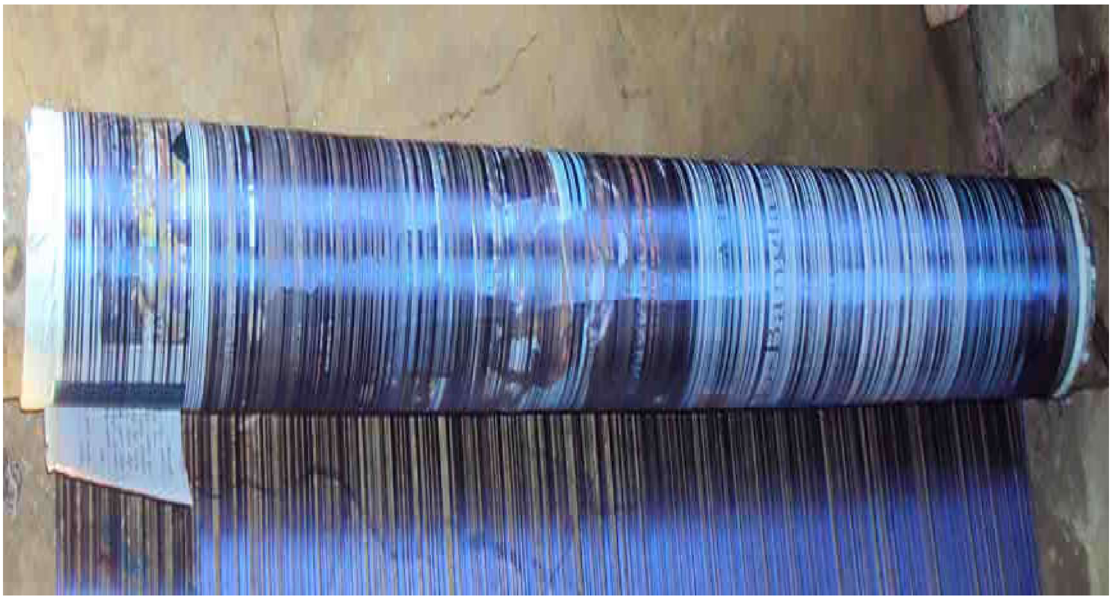

তানি, বিহারী পল্লী, মিরপুর

নাকা, বিহারী পল্লী, মিরপুর

তানি, বিহারী পল্লী, মিরপুর

তুড়িয়া, বিহারী পল্লী, মিরপুর

খুড়া

বানা/জড়িসহ দর্খি/মাক্কু

বেটন

কাপড় বুনার জন্য প্রস্তুতকৃত মেশিন

একজন শ্রমিক বেনারশি বুনছে

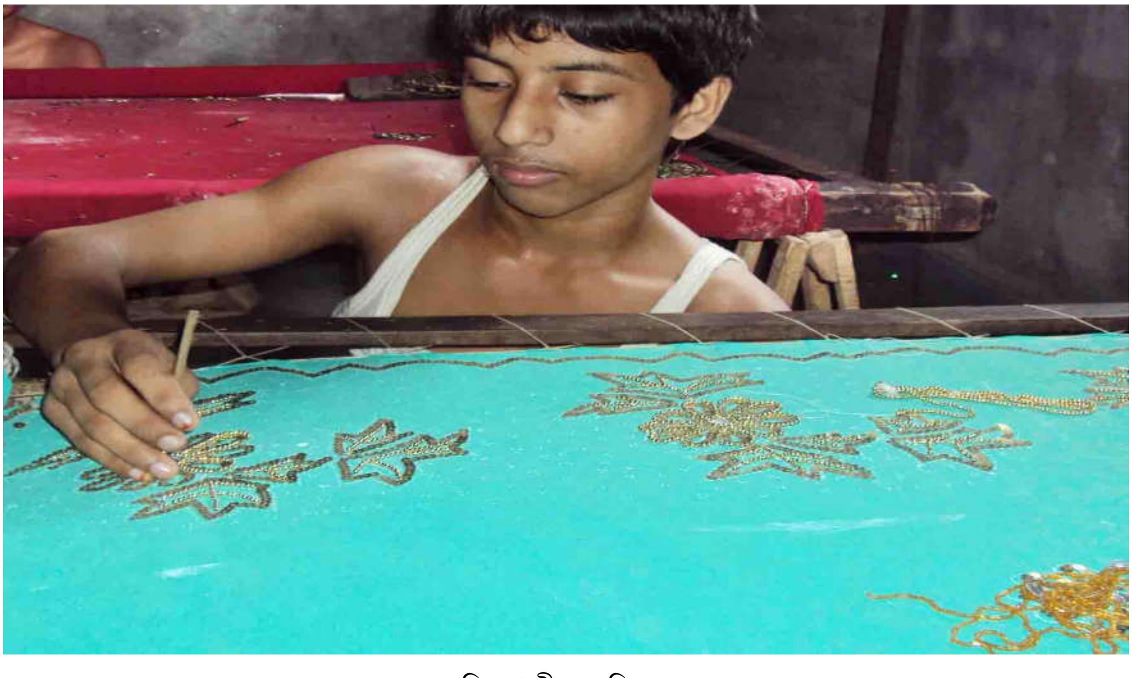

একজন শ্রমিক শাড়ীতে পুতির কাজ করছে

একজন পুতি শ্রমিকের সাথে গবেষক

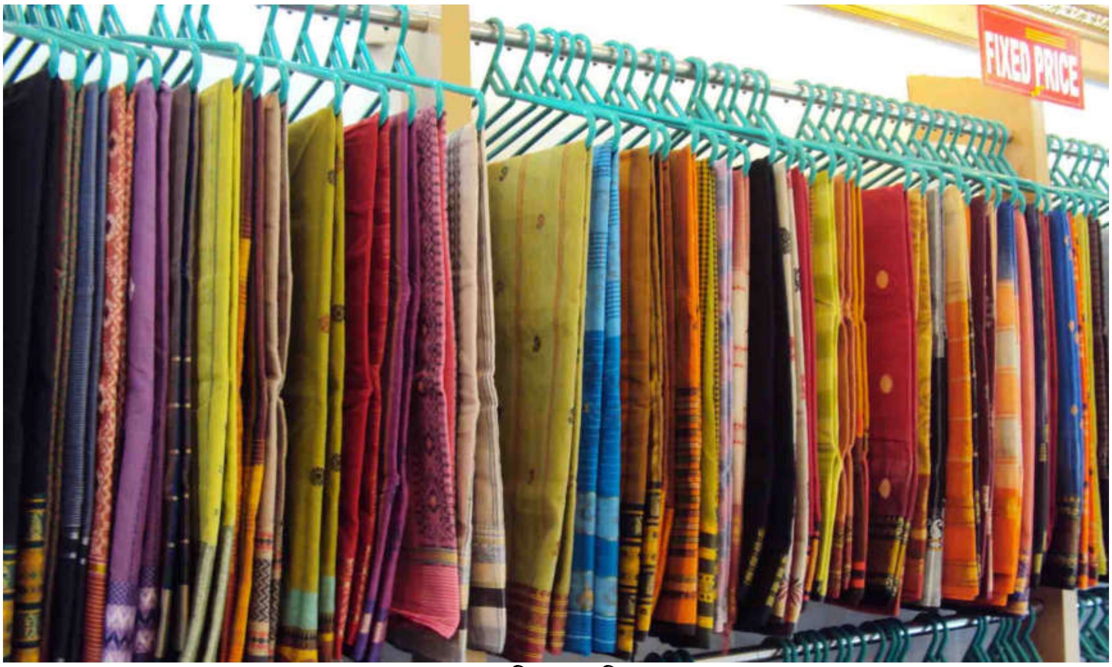

পন্য বিপনন প্রক্রিয়া

পন্য বিপনন প্রক্রিয়া

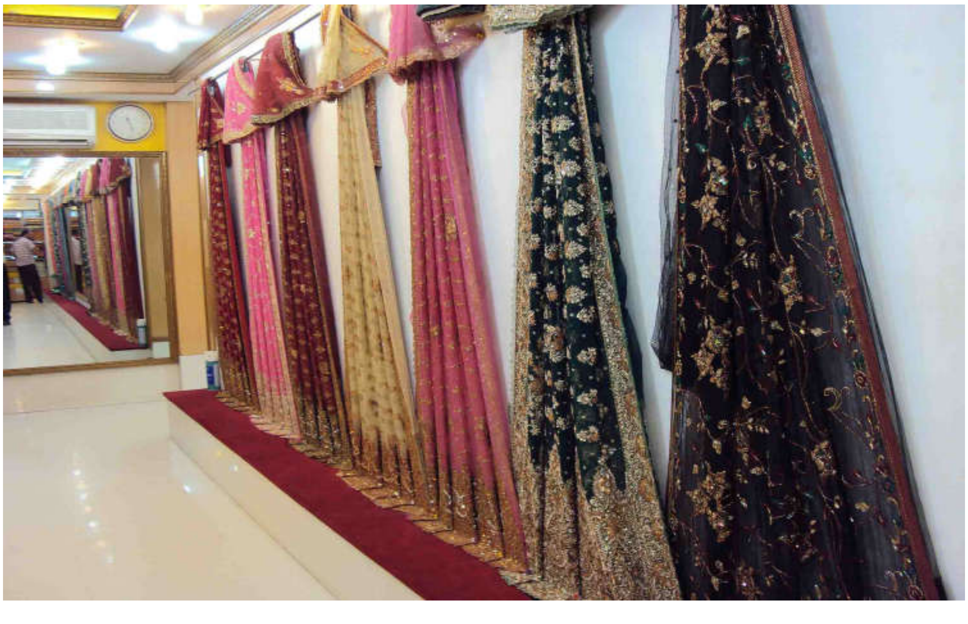

জামদানী পল্লীতে গবেষক তাতী মো: গণি মিয়ার সাক্ষাতকার নিচ্ছেন, কাজী পাড়া, রূপসী নারায়নগঞ্জ।

চরকায় সুতা পেচানো পর্যবেক্ষন করছেন গবেষক

সুতা রোদে শুকানো হচ্ছে

তাঁতীদের শাড়ী বুনার কাজ পর্যবেক্ষন করছেন গবেষক

শাশাড়ী বুনছে তাঁত শিল্পীরা

একজঁন মহিলা তাঁতী শাড়ী বুনছে

তাতের কাজ চলছে

একজন তাতী কন্যা শাড়ী বুনছে

দুজন শ্রমিক তাতের কাজে রত

বুনন অবস্থায় কাপড়ে রং দেয়া হচ্ছে

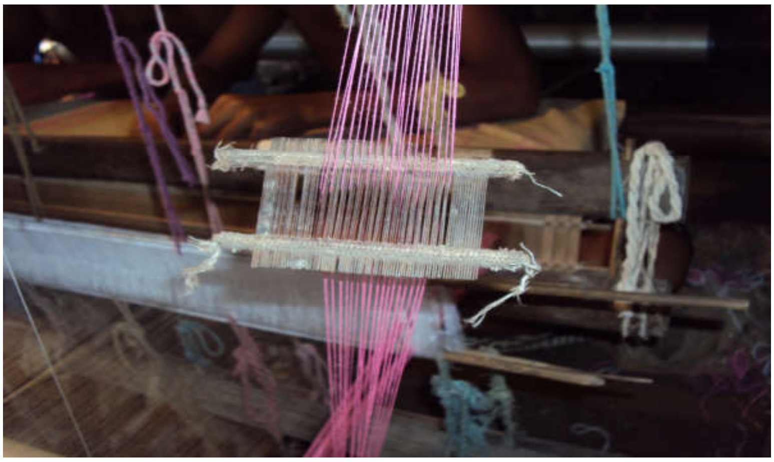

সানা

কাঠের তৈরি কান্ডুল

মাকুর ভিতরে ও পাশে নলি বা ছড়া

সুতা পেচানো ববিন ঝুলানো

পাওয়ারলোম কারখানায় উৎপাদিত কাপড়, যা পরে রং করা হবে

নরথ

কাপড়ের পাড় নকশীর কাজ চলছে

জামদানি কুচি প্রিন্ট নকশা, কাজী পাড়া রূপসী, নারায়নগঞ্জ।

জামদানি শাফলা ফুল নকশা, কাজী পাড়া রূপসী, নারায়নগঞ্জ

জামদানি পোনা ফুল নকশা, কাজী পাড়া, রূপসী, নারায়নগঞ্জ।

হালকা লোহার তৈরি সানা, কাজী পাড়া রূপসী, নারায়নগঞ্জ

গানার সাহায্যে সুতা বয়নের কাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে, কাজী পাড়া রূপসী, নারায়নগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

লুঙ্গী তৈরি জন্য সুতা রোদে শুকানো হচ্ছে, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী

কাঠের তৈরি সনাতনি চরকা (নলি ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়)

কাঠের তৈরি আধুনিক চরকা(নলি ভরার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাঠের চরকায় পেচানো সুতার ববিন (ড্রামে পেঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়)

কাঠের চরকায় পেচানো সুতার নলি (মাক্কুতে বুননের কাজে ব্যবহৃত হয়।)

ফ্রেমের সাহায্যে ববিনের মাধ্যমে ড্রামে সুতা পেচানো হচ্ছে

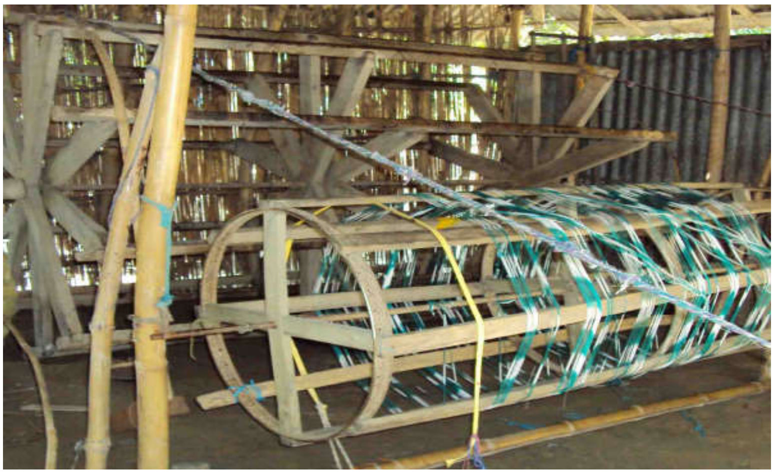

কাঠের তৈরি ড্রাম (নরদে সুতা পেচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।)

কাঠের ড্রামের মাধ্যমে বীম তৈরি (বুননের কাজে ব্যবহৃ হয়)

বীমে সুতা গিট দিচ্ছেন একজন তাতী (বয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে)

Dhaka University Institutional Repository

মেশিনে বয়ন করছে একজন শ্রমিক, হাইরমারা , রায়পুরা, নরসিংদী

কারখানায় লুঙ্গি বুনছে দক্ষ কারিগর, হাইরমারা , রায়পুরা, নরসিংদী

কারখানায় লুঙ্গি বুনছে দক্ষ কারিগর, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী

তৈরিকৃত লুঙ্গি সংগ্রহ চলছে, হাইরমারা, রায়পুরা, নরসিংদী

তৈরিকৃত লুঙ্গি রোদে শুকানো হচ্ছে, হাইরমারা , রায়পুরা, নরসিংদী

Dhaka University Institutional Repository

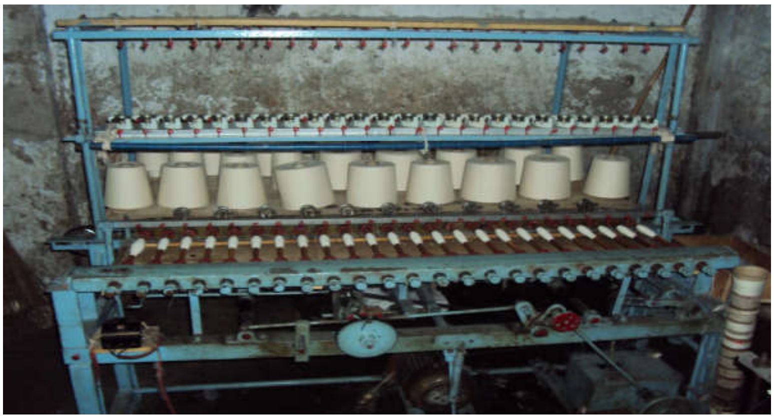

যন্ত্রের সাহায্যে সুতা পেচানো হচ্ছে

নলি থেকে সুতা ড্রামে পেচানো হচ্ছে

ছোট আয়তনের পাওয়ারলোম কারখানা